জগৎ-কথা

প্রকাশক:—

শ্রীকালীকিঙ্কর মিত্র

ইণ্ডিয়ান্ প্রেস লিমিটেড্

এলাহাবাদ।

প্রিণ্টার:—

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ বসু

ইণ্ডিয়ান্ প্রেস লিমিটেড্

বেনারস-ব্র্যাঞ্চ।

জগৎ-কথা

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

প্রকাশক

ইণ্ডিয়ান পাব্‌লিশিং হাউস্‌

২২।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট—কলিকাতা।

১৯২৬

সর্ব্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

মূল্য ২॥০ টাকা

ভূমিকা

স্বর্গীয় রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের গ্রন্থের ভূমিকার প্রয়োজন হয় না। এই অপূর্ব্ব পুস্তকখানি গ্রন্থকারের মৃত্যুর চারি বৎসর পরে কেন প্রকাশিত হইল, তাহার যে-একটু ইতিহাস আছে, তাহাই নিবেদন করিব। এই পুস্তকের কিয়দংশ স্বর্গীয় সুরেশচন্দ্র সমাজপতি-সম্পাদিত "সাহিত্য" পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। তা'র পরে রচনা শেষ করিয়া ত্রিবেদী মহাশয় ইহা পুস্তকাগারে প্রকাশ করিবার জন্য ছাপাইতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। কিন্তু ছাপা শেষ হইবার পূর্ব্বেই তাঁহার মৃত্যু ঘটিল। ছাপানো ফর্ম্মাগুলি কোথায় গেল, সন্ধান হইল না। ত্রিবেদী মহাশয়ের আত্মীয়গণ পুস্তকের পাণ্ডুলিপি লইয়া "সাহিত-পরিষদের" শরণাগত হইলেন। পরিষৎ আশা দিলেন, কিন্তু ছাপাইতে পারিলেন না। শেষে পুস্তক প্রকাশের ব্যবস্থার ভার আমার উপরে পড়িল। দেখিলাম, "জগৎ-কথার" মতো পুস্তক অপ্রকাশিত থাকিলে বঙ্গ-ভাষার যে ক্ষতি হইবে, তাহা কোনো কালে কেহ পূরণ করিতে পারিবেন না। এলাহাবাদের ইণ্ডিয়ান্ প্রেস চিরদিনই সৎ-সাহিত্য প্রচারের পরম সহায়। ইহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক "জগৎ-কথা" প্রকাশের ভার লইলে নিশ্চিন্ত হইলাম।

ত্রিবেদী মহাশয়কে আমি গুরুতুল্য জ্ঞান করি। বঙ্গভাষায় বিজ্ঞান-চর্চ্চায় তিনিই আমাকে পথ দেখাইয়া আসিতেছিলেন। তাঁহার নেতৃত্বে অনেক শিক্ষা ও জ্ঞান লাভ করিয়াছি। তাই আমার তত্ত্বাবধানে আজ "জগৎ-কথা" প্রকাশিত হইল দেখিয়া নিজেকে ধন্য মনে করিতেছি।

শান্তিনিকেতন, বীরভূম
শারদীয়া পঞ্চমী, ১৩৩৩

শ্রীজগদানন্দ রায়

স্থচি

জড় জগৎ	১
জড় কাহাকে বলে?	২
জড়ের তিন অবস্থা	৫
কঠিন পদার্থ	৭
আয়তন ও আকৃতি	১০
পরিমাণ-সমস্যা	১১
স্থিতিস্থাপকতা	১৬
তরল পদার্থ	১৮
তরল পদার্থের চাপ	২৩
প্রাকৃতিক নিয়ম	২৪
অবেক্ষণ ও পরীক্ষণ	২৬
অনিল	৩৫
অনিলের চাপ	৩৭
ভার	৪৬
প্রাকৃতিক নিয়ম	৪৮
বল	৫৩
মাধ্যাকর্ষণ	৫৫
বস্তু	৬০
বস্তুর পরিমাণ	৬৪

মাধ্যাকর্ষণ	৭১
মাধ্যাকর্ষণের জগদ্ব্যাপিতা	৭২
মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম	৭৭
ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া	৮৪
মিশ্র পদার্থ	৮৭
দ্রবণ	৮৯
অর্ক	৯০
শ্রেণী বিভাগ	৯২
মূল ও যৌগিক পদার্থ	৯৬
ধাতুভস্ম	৯৭
দহন ক্রিয়া	১০০
জড়ের নিত্যতা	১০৩
কয়লা-পোড়া অনিল	১০৮
মূল পদার্থ	১১৩
ধাতু ও অপধাতু	১১৪
পৃথিবী	১১৮
রাসায়নিক সম্মিলন	১২১
পরমাণুবাদ	১৩২
প্রত্যক্ষ, অনুমান ও কল্পনা	১৩৪
প্রাচীন ও আধুনিক পরমাণুবাদ	১৩৮
পরমাণু ও অণু	১৪০
ক্ষার, অম্ল, লবণ	১৫১
দহন ক্রিয়া	১৫৫
উত্তাপ	১৬০

উষ্ণতা	১৬১
ঘর্ম্মমান	১৬২
তাপমান	১৬৬
তাপের ধর্ম্ম	১৬৯
বাষ্প	১৭১
বাষ্প ও অনিল	১৭৩
জলের অবস্থা বিকার	১৭৬
তাপের পরিচালন	১৭৭
তাপের স্বরূপ	১৮১
শক্তি ও তাপ	১৮৫
শক্তির রূপ-ভেদ ও অবিনাশিতা	১৮৭
সমানতা ও তুল্যতা	১৮৯
জড়ের গঠন-প্রণালী	১৯৪
কম্প-গতি	২১৭
উপায় কি ?	২২২
জোয়ার-ভাঁটা	২২৮
তরঙ্গ	২৩৫
শব্দ-তরঙ্গ	২৩৯
শব্দ-জ্ঞান	২৪৩
বাদ্যযন্ত্র	২৪৭
প্রত্যক্ষ না অনুমান	২৫৫
আলোক	২৬২
আলোকের স্বরূপ	২৮৭
আকাশ	৩০১

অদৃশ্য আলোক	১
জড় পদার্থের গঠন-প্রণালী	[illegible]
গণা ও মাপা	[illegible]
তড়িৎ	[illegible]
তড়িৎ-প্রবাহ	[illegible]
চুম্বক	[illegible]
তড়িৎ-প্রবাহের চুম্বকত্ব	[illegible]
তড়িৎ-প্রবাহের চৌম্বক ধর্ম্ম	[illegible]

জগৎ-কথা

জড়জগৎ

জগৎ-কথা অর্থাৎ জড়জগতের কথা বলিব। জড়জগতের কথা জড়েরই কথা। জড়ের কথা বলিবার পূর্ব্বে, জড়পদার্থ বলিতে আমরা কি বুঝি, সেটা স্পষ্ট বুঝা আবশ্যক। কোন্ শব্দ কোন্ অর্থে প্রয়োগ করিব, সেটা আগে স্থির করিয়া না লইলে বড় গণ্ডগোলে পড়িতে হয়। লেখক এক অর্থে লিখিতেছেন, পাঠক অন্য অর্থ মনে করিয়া পড়িতেছেন, এরূপ প্রায় ঘটে; ফলে অকারণ উভয়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব ঘটিয়া যায়; মনে নানারূপ খট্‌কা থাকে, তাহার মীমাংসা হয় না।

জড়-শব্দটি আমাদের প্রাচীন দর্শনশাস্ত্র হইতে গৃহীত। সেই প্রাচীন শাস্ত্রে, যাহা চেতন নহে, তাহাকে জড় বলিত। জগতে এমন এক জন কেহ আছেন, তিনিই 'আমি'; আর যাহা কিছু আছে, তিনিই অর্থাৎ সেই 'আমি'ই তাহার জ্ঞাতা। আমি জ্ঞাতা, আর সমস্ত আমার জ্ঞানের বিষয়। চন্দ্র, সূর্য্য, ইট, কাঠ আমার জ্ঞানের বিষয়; আমার দেহ ও চক্ষু-কর্ণাদি অবয়বও আমার জ্ঞানের বিষয়; এমন কি, আমার অন্তরিন্দ্রিয় যে মন, যাহার সাহায্যে আমি চন্দ্র-সূর্য্যের ও ইট-কাঠের তত্ত্ব আহরণ করিয়া থাকি, এবং আমার যে বুদ্ধি, যদ্দ্বারা মনকর্ত্তৃক সমাহৃত সেই তত্ত্বকে পরিপাক করিয়া আমি কাজে লাগাই, সেই মন ও বুদ্ধি পর্য্যন্ত আমার জ্ঞানের বিষয়। শাস্ত্রমতে

কেবল আমিই একমাত্র চেতন পদার্থ; আর যাহা কিছু আছে, তৎসমস্তই আমার জ্ঞানের বিষয় ও চেতনাহীন জড়পদার্থ। অতএব চন্দ্র সূর্য্য ইট কাঠ হইতে আমার মন ও বুদ্ধি পর্য্যন্ত সমস্তই জড়পদার্থ।

প্রাচীন দার্শনিকদিগের এইরূপ বিচারপ্রণালী আমাদের নিকট আপাততঃ হেঁয়ালির মত ঠেকে। ইহার তথ্য-নির্ণয় লইয়া এখন কাজ নাই।

পাশ্চাত্য শাস্ত্রে জগতের দুইটি অংশের কথা শুনা যায়; একটার নাম mind আর এক্‌টার নাম matter; যে শাস্ত্র mind-এর তত্ত্ব আলোচনা করে, তাহাকে আজকাল মনোবিজ্ঞান (mental science) বলা যায়; আর যে শাস্ত্র matter-এর তত্ত্ব আলোচনা করে, তাহাকে জড়বিজ্ঞান (physical science) বলা যায়। আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রকারদের হিসাবে কিন্তু একালের মনোবিজ্ঞানেরও অধিকাংশ জড়বিজ্ঞানের অন্তর্গত হইয়া পড়ে।

জড় কাহাকে বলে ?

সে যাহা হউক, পাশ্চাত্যশাস্ত্রে যাহাকে matter বলে, আজকাল বাঙ্গলায় **জড়**শব্দটিকে সেই অর্থে প্রয়োগ করা হয়। প্রাচীন দর্শনশাস্ত্রে জড়ের অর্থ ব্যাপকতর; হালের ভাষায় উহার অর্থ সঙ্কীর্ণ। আমরা এই গ্রন্থে জড় শব্দটি এই আধুনিক সঙ্কীর্ণ অর্থেই প্রয়োগ করিব। ইংরেজিতে যাহাকে matter বলে, আমরা তাহাকে জড় বলিব।

এই সঙ্কীর্ণ অর্থেই বা জড়পদার্থের প্রকৃত তাৎপর্য্য কি, তাহা স্থির করা আবশ্যক। কোন্‌টা জড়, কোন্‌টা জড় নহে, ইহার মীমাংসা আপাততঃ সহজসাধ্য মনে হইতে পারে। কিন্তু বিজ্ঞানের ইতিহাসে

দেখা যায়, এই মীমাংসা লইয়া বহুদিন ধরিয়া পণ্ডিতে পণ্ডিতে যুদ্ধ চলিয়াছে। তাপ, আলোক, তাড়িত প্রভৃতিকে এক কালে জড়ের মধ্যে স্থান দেওয়া হইত; এখন আবার সদর্পে বলা হয়, উহারা জড় নহে; জড়ের ধর্ম্মমাত্র। ফলে কোন্‌টা জড়, আর কোন্‌টা জড়ের ধর্ম্ম, ইহার নির্ণয় বড় কঠিন ব্যাপার।

আপাততঃ মনে হইতে পারে, জড়ের একটা নির্দ্দিষ্ট পারিভাষিক সংজ্ঞা দিলেই গোল মিটিয়া যাইবে; যে জিনিসটা সেই সংজ্ঞার ভিতর পড়ে, তাহা জড়; যাহা পড়ে না, তাহা জড় নহে। কিন্তু ফলে দেখা গিয়াছে, কোন সংজ্ঞাই ষোল আনা মনে লাগে না; প্রত্যেকটাতেই একটা না একটা গোল থাকে। সম্প্রতি আমরা সেই গোল-ব্যূহ-ভেদের প্রয়াস পাইব না। জড়ের কয়েকটি সংজ্ঞা, যাহা নানা পণ্ডিতে নানা সময়ে প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহাই পাঠকের সম্মুখে স্থাপন করিব, এবং অতি সংক্ষেপে দেখাইব, প্রত্যেকটাতেই একটা না একটা আপত্তি উঠে।

(১) যাহার ওজন বা ভার আছে, তাহা জড়। আপত্তি—এ কালের পণ্ডিতেরা আকাশ-নামক একরূপ জগদ্ব্যাপী পদার্থ মানিয়া লন, উহার ভার আছে কি না, তাহার প্রমাণ নাই; অথচ অনেকে উহাকে জড় বলেন। সম্প্রতি ইলেক্‌ট্রন নামে একরূপ কণিকা আবিষ্কৃত হইয়াছে; অনেকের অনুমান যে, ঐ ইলেক্‌ট্রন-সমবায়ে অন্যান্য জড় নির্ম্মিত হইয়াছে; কিন্তু ঐ ইলেক্‌ট্রনের ওজন আছে কি না কেহ জানে না। উহাকে জড় বলিব কি না?

(২) যাহার দেশব্যাপ্তি আছে, অর্থাৎ যাহা স্থান ব্যাপিয়া থাকে, তাহা জড়। ইহাতেও আপত্তি ঘটে। বৈজ্ঞানিকেরা শক্তি-নামক আর একটা পদার্থ মানেন, তাহা জড় নহে; অথচ তাহার

দেশব্যাপকতা আছে। আলোক উত্তাপ প্রভৃতি এই শক্তির বিবিধ রূপ।

(৩) যাহা চক্ষু কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য, তাহাই জড়। ইহাতে আপত্তি আসে, যাহা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, তাহা জড় স্বয়ং, না জড়ের ধর্ম্ম? সূর্য্য ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, না সূর্য্যের আলোক ও উত্তাপ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য?

অলমতিবিস্তরেণ। আরও অনেক সংজ্ঞা আছে; কয়েকটির উল্লেখ করিলাম মাত্র; কোনটিই নির্দ্দোষ নহে; অতএব এখানে আর পুঁথি বাড়াইয়া কাজ নাই।

কাজটা কিন্তু ভাল হইল না। পুঁথির আরম্ভে বলিয়াছিলাম, শব্দের অর্থ স্পষ্ট না বুঝিয়া তাহার তত্ত্ব-আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া উচিত নহে। আমরা জড়ের তত্ত্ব-আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম বটে, কিন্তু জড়ের একটা নির্দ্দিষ্ট পারিভাষিক সংজ্ঞা দিতে পারিলাম না।

চুল-চেরা পারিভাষিক সংজ্ঞা দিতে পারিলাম না বলিয়া এইখানে পুঁথি বন্ধ করিলে চলিবে না। কোন রকমে কাজ চালাইবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। আপাততঃ অত্যন্ত মোটা হিসাবে কাজ চালাইবার ব্যবস্থা করিব। সূক্ষ্ম বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া যেমন যেমন বিপত্তি ঠেকিবে, তেমনি তেমনি তাহা হইতে উদ্ধারের ব্যবস্থা করা যাইবে।

চুণ-পাথর, ইট-কাঠ, জল-বায়ু, প্রভৃতি জিনিসকে আমরা জড় বলিয়া গ্রহণ করিব। আমার শরীরটা, অথবা যে অস্থি মজ্জা রক্ত মাংস প্রভৃতি মশলায় আমার এই ভঙ্গুর দেহ-যন্ত্র নির্ম্মিত, তাহাকেও জড় বলিব। এই হইল জড়ের স্থূল দৃষ্টান্ত। এখন এই স্থূল দৃষ্টান্তেই কাজ চলিবে। এই মোটা দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিয়া চলিলে আপাততঃ কোনও মোটা ভুলের আশঙ্কা থাকিবে না।

জড়ের তিন অবস্থা।

জড়ের মোটামুটি তিন অবস্থা দেখা যায়—**কঠিন**, **তরল** ও **বায়বীয়** অবস্থা। ইট-কাঠের কঠিন অবস্থা, তেল-জলের তরল অবস্থা, আর বায়ুর বায়বীয় অবস্থা।

এইখানে একটু ভাষাবিভ্রাট আসে। বায়ুর অবস্থা ত বায়বীয় হইবেই, উহা কি আর জলীয় বা তৈলীয় হইবে? কঠিন ও তরল যেমন দুইটি অবস্থাজ্ঞাপক বিশেষণ শব্দ পাওয়া গেল, সেইরূপ এই তৃতীয় অবস্থাজ্ঞাপক আর একটি বিশেষণের ভাষায় অভাব রহিয়াছে। একটা বায়ুর সহিত আমাদের চিরকালের পরিচয় আছে; এই বায়ুতে আমাদের শ্বাসক্রিয়া চলে; উহাই প্রকৃতপক্ষে প্রাণবায়ু; আমরা সেই বায়ুসাগরে ডুবিয়া আছি। কিন্তু সেই বায়ুর মত অবস্থাপন্ন অর্থাৎ "বায়বীয়"-অবস্থাপন্ন আরও নানা বায়ু আছে; তাহাদের সহিত সর্ব্বসাধারণের ততটা পরিচয় নাই। সোডাওয়াটারের বোতল খুলিলেই একটা বায়ু বেগে বাহির হইয়া আসে, উহা প্রাণহানিকর বায়ু। সহরের রাস্তায় আলোক দিবার জন্য যে গ্যাস জ্বালান হয়, উহাও এক প্রকার বায়ু। সোডা-ওয়াটারের বায়ুও বায়ু, জ্বালানি গ্যাসও বায়ু, আর আমাদের চিরপরিচিত বায়ুও বায়ু; এই বায়ুবিভ্রাট হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য একটি নূতন নামের সৃষ্টি করা নিতান্তই আবশ্যক। পাঠককে ভাষার গোলক-ধাঁধায় ফেলিলে লেখকের অধর্ম্ম হইবে।

ইংরেজি ভাষাতেও এককালে ঐরূপ বায়বীয়-অবস্থাজ্ঞাপক বিশেষণ-শব্দের অভাব ছিল। এক air-শব্দ চলিতেছিল; নূতন নূতন আবিষ্কৃত বায়ুকেও air বলা হইত। কোনটা fixed air, কোনটা inflammable air, কোনটা dephlogisticated air।

ইংরেজেরা gas এই শব্দটিকে বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া এই ভাষাবিভ্রাট হইতে অব্যাহতি পাইয়াছেন। ইংরেজিতে এখন বায়ুবৎ পদার্থমাত্রেরই সাধারণ নাম gas. আমাদিগকেও সেইরূপ একটা শব্দ আহরণ করিতে হইবে।

কেহ কেহ gasশব্দটি বাঙ্গলা হরপে লিখিয়া গ্যাস-নামটি বাঙ্গালা ভাষায় চালাইতে চাহেন। আমি তাহাতে কিছুতেই সায় দিব না। ঐ শব্দ ঐরূপে লিখিলে আমাদের ভাষার ধাতের সঙ্গে মিশিবে না; বড় কদর্য্য দেখাইবে। একটা ভদ্রতর শব্দ চাই।

আমাদের প্রাচীন সাহিত্যে নানাবিধ বায়ুর উল্লেখ আছে—প্রাণ অপান ব্যান ইত্যাদি। ঐ সকল বায়ু সম্পূর্ণ কাল্পনিক না হইলেও, কোন্‌টা কি অর্থে প্রযুক্ত হইত, ঠিক করিয়া বলা কঠিন। কাজেই, উহাদের কোনটিকে লওয়া চলিবে না। তবে উহাদের মধ্যে একটা সাধারণ অংশ আছে;—'অন্' ধাতুর অস্তিত্ব;—আমরা ঐ অন্ ধাতুটাকে কাজে লাগাইতে চাহি। সংস্কৃতে বায়ু অর্থে অনিল শব্দ আছে; উহা অন্ ধাতু হইতে উৎপন্ন। আমরা জোর করিয়া ঐ অনিল শব্দটিকে ব্যাপকতর অর্থে, অর্থাৎ যে কোনও বায়বীয় পদার্থের বিশেষণরূপে গ্রহণ করিব। বায়ু-শব্দটি চলিত ভাষায় এত প্রচলিত যে, উহাকে নূতন অর্থ দেওয়া চলে না; অনিল-শব্দটি সংস্কৃত ভাষায় আছে; অথবা সংস্কৃতবহুল বাঙ্গলায় আছে; চলিত বাঙ্গলা, যাহা লোকমুখে প্রচলিত, তাহাতে অনিল-শব্দের ব্যবহার নাই। কাজেই, উহাকে এই নূতন ব্যাপক অর্থে চলিত ভাষায় গ্রহণ করা চলিতে পারে। দার্শনিকদের পঞ্চভূতের অন্তর্গত অন্যতম ভূত মরুৎ; এই মরুৎ নামটা লইলেও চলিতে পারিত। কিন্তু উহার গায়ে অতিরিক্ত পণ্ডিতি গন্ধ আছে; চলিত ভাষায় চলিবে না।

শব্দ সৃষ্টি করা দুরূহ; প্রাচীন শব্দের নূতন পারিভাষিক অর্থ দেওয়া ভিন্ন বৈজ্ঞানিক লেখকের গত্যন্তর নাই। সকল ভাষাতেই এইরূপ করিতে হয়; বাঙ্গলাতেই বা না করিব কেন?

অতএব জড়ের ত্রিবিধ অবস্থা। **কঠিন** অবস্থা, **তরল** অবস্থা ও **অনিল** অবস্থা। ইট-কাঠ কঠিন; তেল-জল তরল; আর বায়ু আর জ্বালানি গ্যাস আর সোডাওয়াটারের হাওয়া অনিল।

তিনটি অবস্থা বলা গেল। কেন না, একই জড়পদার্থ তিন রূপ গ্রহণ করিতে পারে; উহাদের অবস্থান্তরপ্রাপ্তি ঘটে, ইহা সর্ব্বদাই দেখা যায়। যেমন জল। উহা কঠিন হইলে বরফ হয়; আর অনিল হইলে অদৃশ্য হইয়া বাষ্পে পরিণত হয়।

সোণা-রূপার মত কঠিন পদার্থ উত্তাপ পাইয়া তরল হয়। আবার কর্পূরের মত কঠিন পদার্থ উবিয়া গিয়া অনিলে পরিণত হয়। ইহা সকলেই জানেন, সকলেই দেখিয়াছেন। ইহা লইয়া এখানে বাড়াবাড়ির দরকার নাই।

কঠিন পদার্থ

কঠিন পদার্থ নানা রকমের। উহাদের নানা গুণ, নানা ধর্ম্ম। গোটাকতকের ধর্ম্মের উল্লেখ করা যাইতেছে।

সোণা, রূপা, তামা **ঘাতসহ**; আঘাত করিলে ভাঙ্গে না; হাতুড়ির ঘায়ে সোণা-রূপার পাতলা পাত হয়। দস্তার কিংবা সীসার তেমন পাতলা পাত হয় না।

কাচ, কয়লা, হীরা হাতুড়ির ঘা সহে না; উহাদের পাত হয় না; উহারা ভাঙ্গিয়া যায়; উহারা **ভঙ্গপ্রবণ** বা **ভঙ্গুর**।

আবার সোণা-রূপা ছিদ্রের ভিতর দিয়া জোরে টানিলে মিহি তার হয়; সীসা ও দস্তার তত মিহি তার হয় না। কাচ গলাইয়া সেই গলন্ত কাচে সরু তার টানা যায়; কিন্তু কঠিন থাকিতে টানা চলে না; কয়লা, হীরার ত কথাই নাই।

ঐ সকল তারে টান দিলে তার একটু লম্বা হয়; টান তুলিয়া লইলে সে লম্বিতত্বটুকু থাকে না; আগেকার দৈর্ঘ্য আবার ফিরিয়া আসে। টানে দৈর্ঘ্য বাড়ে, টানের অভাবে স্বভাবপ্রাপ্তি ঘটে; এই গুণের নাম **স্থিতিস্থাপকতা**।

কিন্তু এই স্থিতিস্থাপকতার একটা সীমা থাকে। এতটুকু টানিলে তার এতটুকু লম্বা হইল; আবার টান ছাড়িলে স্বভাবে ফিরিল; কিন্তু সীমা ছাড়াইয়া টানের মাত্রা চড়াইলে আর স্বভাবে ফিরিয়া আসে না; পূর্ব্বের তুলনায় একটু লম্বা থাকিয়া যায়। ইহার অর্থ,—স্থিতিস্থাপকতার একটা সীমা আছে; সেই সীমার ভিতরে স্থিতিস্থাপক, সীমা ছাড়িলে আর স্থিতিস্থাপক থাকে না।

টানের মাত্রা আরও বাড়াইলে তার ছিঁড়িয়া যায়; কোনও ধাতুর তার এক মণের ভারে ছিঁড়ে, কোনও ধাতুর তার তেমনই মিহি হইলেও দুই মণ ভার সহ্য করে। যতক্ষণ না ছিঁড়ে, ততক্ষণ টান সহে; যখন টান না সহিয়া ছিঁড়িয়া যায়, তখন হয় ভঙ্গুর। ভাঙ্গা, ছেঁড়ারই প্রকারভেদ। টানের বা আঘাতের মাত্রাধিক্যে সোণারূপার মত ঘাতসহ ধাতুর পাত বা তার ছিঁড়িয়া যায়; ভঙ্গপ্রবণ কাচ বা হীরা ভাঙ্গিয়া যায়। আঘাতটাও টানের স্বজাতীয়—উহা সহসাপ্রযুক্ত টান বা হেঁচকা টান।

তামার বা লোহার ছড়ির মাঝখানে একখানা ভারী পাথর ঝুলাইলে ছড়ি কুঞ্চিত হয় বা বাঁকিয়া যায়; ভার তুলিয়া লইলে সেই বক্রতা থাকে না; ভারের অভাবে আবার স্বভাবপ্রাপ্তি ঘটে;

ইহাও স্থিতিস্থাপকতার পরিচয়। কিন্তু এখানেও স্থিতিস্থাপকতার সীমা আছে; সীমা ছাড়াইয়া ভারের মাত্রা বাড়াইলে এতটা নুইয়া যায় বা বাঁকিয়া যায় যে, আর স্বভাবে ফিরিয়া আসে না। অর্থাৎ সীমার ভিতরে যাহা স্থিতিস্থাপক, সীমা ছাড়াইলে তাহা স্থিতিস্থাপক থাকে না। আবার অতিমাত্রায় ভার দিলে ঐ ছড়ি এতটা বাঁকে যে, ভাঙ্গিয়া যাইতে পারে। যতক্ষণ না ভাঙ্গে, ততক্ষণ উহা ভারসহ; যখন ভাঙ্গে, তখন ভঙ্গুর। ভার সহে বলিয়াই ছাদে আমরা লোহার কড়ি, কাঠের বরগা ব্যবহার করি; কিন্তু সাবধান, অতিরিক্ত ভার কিছুতেই সহে না; সকলের জোর সমান নয়।

হীরা দিয়া কাচ কাটা যায়, কাচে হীরা কাটে না। ঢালাই লোহার আঁচড়ে পেটাই লোহাতে দাগ পড়ে, পেটাই লোহার আঁচড়ে ঢালাই লোহাতে দাগ পড়ে না। ঢালাই লোহা **কঠোর**; পেটাই লোহা **কোমল**। হীরার মত কঠোর জিনিস আর নাই। তামার খাদ মিশাইলে সোণা-রূপার কঠোরতা বাড়ে; গহনা গড়িতে বা টাকা সিকি আধুলি মুদ্রা ছাপিতে সেই জন্য সোণা-রূপাতে তামা মিশায়। সীসা সোণা-রূপার চেয়েও কোমল; উহাতে নখেরও আঁচড় পড়ে। যাহা অতি-কঠোর, তাহাও অতি-ভঙ্গুর হইতে পারে। কাচ খুব কঠোর, উহাতে ইস্পাতের আঁচড় লাগে না; কিন্তু উহার ভঙ্গ-প্রবণতা প্রসিদ্ধ।

আর দৃষ্টান্ত বাড়াইবার দরকার নাই। কঠিন পদার্থে নানাগুণ অল্পবিস্তর পরিমাণে বর্ত্তমান দেখা গেল—কাহারও কোনটা অধিক, কাহারও অন্যটা অধিক। নানাগুণ, যথা—**ঘাতসহতা, টান-সহতা, ভার-সহতা, স্থিতিস্থাপকতা, ভঙ্গুরতা, কঠোরতা**। ইহার মধ্যে স্থিতিস্থাপকতা সম্বন্ধে আর একটু সূক্ষ্ম বিচার আবশ্যক।

আয়তন ও আকৃতি

স্থিতিস্থাপকতার বিচারের পূর্ব্বে একটা কথা বুঝিতে হইবে—উহা জড়পদার্থের দেশব্যাপ্তি। জড়পদার্থমাত্রই, কি কঠিন, কি তরল, কি অনিল, সকলেই খানিকটা দেশ বা স্থান বা জায়গা ব্যাপিয়া অবস্থান করে; ইহাই জড়পদার্থের **দেশব্যাপ্তি**।

কোন জিনিস অল্প জায়গা লইয়া থাকে, উহা ছোট; কোনটা অধিক জায়গা ব্যাপিয়া থাকে, উহা বড়। একটা মটরের চেয়ে একটা কুল বড়, একট কুলের চেয়ে একটা বেল বড়; ভেড়াটার চেয়ে ঘোড়াটা বড়, ঘোড়াটার চেয়ে হাতীটা বড়; ঘটিটার চেয়ে ঘড়াটা বড়; আর ছেলেটার চেয়ে বুড়োটা বড়। এই বৃহত্ত্বজ্ঞাপনের জন্য আমরা একটি শব্দ ব্যবহার করিব,—**আয়তন**। যাহা বৃহৎ, তাহার আয়তন অধিক; যাহা ক্ষুদ্র, তাহার আয়তন অল্প। কুলের চেয়ে বেলের আয়তন বড়, ঘোড়ার চেয়ে হাতীর আয়তন বড়। বলা বাহুল্য, পদার্থের আয়তন এই দেশব্যাপ্তির ফল; কেহ অল্প দেশ জুড়িয়া আছে, উহার আয়তন অল্প; কেহ অধিক দেশ জুড়িয়া আছে, উহার আয়তন অধিক। বলা উচিত, এই ছোটত্ব বড়ত্ব তুলনামূলক বা অপেক্ষাকৃত।

দেশব্যাপ্তির আর একটা ফল আছে। তাহার নাম **আকৃতি**। আকৃতিভেদে কোনটা গোল, কোনটা চেপ্টা, কোনটা ছুঁচল; কোনটা দণ্ডাকার, কোনটা স্তম্ভাকার; সকলেই সাকার, নিরাকার কেহই নহে। ভাঁটার আকার ভাঁটার মত,—তা ছোটই হউক, আর বড়ই হউক; হাতীর আকার হাতীর মত—ছানাই হউক, আর ধাড়িই হউক—ঘোড়ার মত, বা সাপের মত, বা মাছির মত নহে। এই আকৃতি যে দেশব্যাপ্তির ফল, তাহা বলা বাহুল্য। কতটা দেশ জুড়িয়া

বা ব্যাপিয়া আছে, তাহা দেখিয়া আয়তন স্থির হয়; আর কি রকমে দেশ জুড়িয়া আছে, তাহা দেখিয়া আকৃতির নিরূপণ হয়। হাতী যেরূপে দেশ জুড়িয়া আছেন, তাঁহার বাচ্চাও সেই রকমে সেই ধরণে দেশ জুড়িয়া থাকেন; উভয়ের আকৃতি প্রায় সমান। কিন্তু ভেড়া বা ঘোড়ার দেশব্যাপ্তির ধরণটা অন্যরূপ; উহাদের আকৃতিও অন্যরূপ।

পরিমাণ-সমস্যা

দ্রব্যমাত্রই কতকটা দেশ জুড়িয়া থাকে, এই বাক্যে আমরা একটা ঘোর সমস্যায় উপস্থিত হইলাম। কোন্ দ্রব্য কতটা দেশ ব্যাপিয়া আছে, ইহা স্থির করিয়াই কোন্টা ছোট কোন্টা বড় স্থির হয়; কে কত ছোট, কে কত বড় স্থির হয়। দুইটা পদার্থের বৃহত্ত্বের বা আয়তনের তুলনা হয়। কে কত ছোট, কে কত বড়, এইরূপ তুলনার নাম **পরিমাণ**। এই পরিমাণ-কর্ম্মটাই বৈজ্ঞানিক বিচারের প্রাণ। বৈজ্ঞানিক বিচারের প্রারম্ভেই কত বড় ও কত ছোট, এই তুলনাসূচক সমস্যার কথা উঠে। আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি মোটামুটি বলিয়া দেয়, কোন্টা বড়, কোন্টা ছোট; কিন্তু কত বড়, কত ছোট, তাহা বলে না; বলিলেও তাহাতে অনেক সময় ভুলভ্রান্তি থাকে। এই জন্য আমরা সবিশেষ চেষ্টা করিয়া পরিমাণ করি,—মাপিয়া স্থির করি—কোন্টা কত ছোট, কোন্টা কত বড়। কোন-কিছুর আয়তন কত, তাহা ঠিক করিবার পূর্ব্বে এই পরিমাণ-সমস্যার মীমাংসা আবশ্যক।

আমরা যে দেশে অবস্থিত, সেই দেশ ত্রিধা-বিস্তৃত; পশ্চাৎ হইতে সম্মুখে, দক্ষিণ হইতে বামে ও নিম্ন হইতে উর্দ্ধে, এই তিন মুখে বিস্তৃত। যাহা কেবল একধা বিস্তৃত, তাহা রেখা; যাহা দ্বিধা বিস্তৃত, তাহা তল বা পৃষ্ঠ বা ক্ষেত্র। এই রেখা ও তল উভয়ই কাল্পনিক সংজ্ঞামাত্র;

উহা আমরা কল্পনায় অনুভব করি মাত্র ; উহা বুদ্ধিবৃত্তির গোচর, উহা আমাদের ইন্দ্রিয়ের গোচর নহে। ইন্দ্রিয়গোচর জড়দ্রব্য যে দেশে ব্যাপ্ত, সেই দেশ কিন্তু ত্রিধা-বিস্তৃত। কাজেই একটা বাক্সের মত বা একখানা কেতাবের মত কোন দ্রব্য কতটা দেশ ব্যাপিয়া আছে, ঠিক করিতে হইলে, উহা তিন মুখের কোন্ মুখে কতটা বিস্তৃত আছে, ঠিক করিতে হয়। উহার দৈর্ঘ্য, বিস্তার ও বেধ, এই তিনের নির্ণয় করিতে হয়। কোন্ মুখে কতটা বিস্তৃত, তাহা স্থির করিবার জন্য একটা মাপকাঠি তৈয়ার করিতে হয়। এই মাপকাঠিটাও জড়পদার্থ; উহার বেধ ও বিস্তার আমরা নজরে আনি না, অথবা মনেও আনি না ; কেবল দৈর্ঘ্যের হিসাব রাখি। তার পর উহার দৈর্ঘ্যের সহিত যে জিনিসের আয়তন মাপিতে হইবে, তাহার দৈর্ঘ্যের বিস্তারের ও বেধের তুলনা করি। মাপকাঠির দৈর্ঘ্য যতই হউক, তাহাতে কিছু যায় আসে না ; তাহাকে বলি এক কাঠি। যে বাক্সটার দৈর্ঘ্য বিস্তার বেধ তিনই এক কাঠির দৈর্ঘ্যের সমান, সেই বাক্সটা যে জায়গা ব্যাপিয়া থাকে, তাহার নাম দেওয়া যায় এক ঘনকাঠি। যাহার দৈর্ঘ্য বিস্তার বেধ প্রত্যেকেই দুই কাঠির দৈর্ঘ্যের সমান হয়, তাহা যে দেশ জুড়িয়া থাকে, তাহা হয় আট ঘন-কাঠি। কেননা, ইহা অক্লেশে দেখান যাইতে পারে, এই বৃহত্তর দেশটাকে আটটি ছোট ছোট টুকরা দেশে বিভক্ত করা চলে ও সেই প্রত্যেক টুকরা ঠিক এক ঘনকাঠি দেশ জুড়িয়া থাকে।

যে মাপকাঠিটাকে আমরা এক কাঠি বলি, সে কাঠিটার দৈর্ঘ্য কত হইবে, তাহা আমার ইচ্ছাধীন। কাজের সুবিধা অনুসারে তাহা স্থির করিতে হয়। হাবড়া হইতে দিল্লী পর্য্যন্ত লোহার রেল পাতিতে হইবে ; কত দীর্ঘ রেল চাই, তাহা মাপিবার জন্য লম্বা মাপকাঠি

লইলেই সুবিধা ; ঐ লম্বা মাপকাঠির নাম মাইল। কিন্তু দোকানে কাপড় কিনিবার সময় অত বড় কাঠিতে সুবিধা হয় না, তখন ছোট কাঠি লইতে হয়। তাহার নাম—হাত, অথবা গজ। আরও ছোট মাপের জন্য আরও ছোট কাঠি হইলে সুবিধা হয়। ভিন্ন ভিন্ন দেশের লোক ভিন্ন ভিন্ন কাজের জন্য ভিন্ন ভিন্ন কাঠি ব্যবহার করিয়া থাকে ; তাহাতে উপস্থিত কাজে সুবিধা হয় ; কিন্তু পরস্পর কারবারে অসুবিধা ঘটে। ইংরেজের মাপকাঠি গজ, আর বাঙ্গালীর মাপকাঠি হাত ; এখানে দশ গজ আর উনিশ হাত, ইহার মধ্যে কোন্‌টা বড়, কোন্‌টা ছোট, অকস্মাৎ বলা চলে না ; একটা গজ একটা হাতের কয় হাতের সমান, তাহা না জানিলে বলা চলেই না। আবার ইংরেজের বড় মাপকাঠি মাইল ছোট মাপকাঠি ইঞ্চির কয় ইঞ্চির সমান, তাহা না জানিলে, দশ মাইল বড়, না বিশ হাজার ইঞ্চি বড়, তাহা শীঘ্র বলা চলে না। নানা মাপকাঠি চলিত থাকিলে কারবারের কত অসুবিধা, তাহা

ত্রই জানেন। এ দেশে জমি-জরিপের সময় বাদশাহী আমলের কাঠা ও হালের কাঠা লইয়া জমিদারে প্রজায় কত গণ্ডগোলের সৃষ্টি হইয়া থাকে। পাকি মাপ ও কাঁচি মাপের অসুবিধা কাহারও অজানা নাই। এই অসুবিধা দূর করিবার জন্য, সভ্য দেশে যাঁহাদের উপর রাষ্ট্র-পরিচালনার ভার থাকে, তাঁহারা আইন দ্বারা মাপকাঠি বাঁধিয়া দেন। প্রজাদিগকে সেই মাপকাঠি বাধ্য হইয়া ব্যবহার করিতে হয়। বিলাতে পার্লেমেণ্ট-সভা ঐরূপ মাপকাঠি বাঁধিয়া দিয়াছেন। একটা দৃঢ় ধাতুদণ্ড পার্লেমেণ্টের নির্দ্দিষ্ট মাপকাঠি ; উহা রাজমন্ত্রীদের জিম্মায় রক্ষিত থাকে ; উহার ছাপ দেওয়া নকল প্রজাদের নিকট বিলি করা হয়। উহার নাম বৃটিশ গজ। গরম পাইলে ধাতুদণ্ডের দৈর্ঘ্য একটু বাড়িয়া যায় ; এই জন্য কতটা গরম থাকিতে উহার দৈর্ঘ্য এক

গজ বলিয়া গৃহীত হইবে, তাহাও আইন দ্বারা নির্দ্দিষ্ট আছে। সূক্ষ্ম মাপে এই বৃদ্ধিটুকু অগ্রাহ্য করা চলে না।

এই গজের ১৭৬০ গজের নাম মাইল; ছোট মাপের জন্য গজের তৃতীয়াংশের নাম ফুট্; আর ফুটের দ্বাদশাংশের নাম ইঞ্চি। ইঞ্চির ভগ্নাংশের পৃথক্ নাম নাই। আমরা এ দেশে প্রচলিত হাত-কাঠিকে আঠার ইঞ্চির সমান ধরিয়া লই।

ছোট জিনিস মাপিতে ছোট কাঠির দরকার হয়; ইঞ্চির চেয়ে ছোট দৈর্ঘ্য মাপিতে ইঞ্চির ভগ্নাংশের দরকার; ইঞ্চির দ্বাদশাংশ লওয়া যাইতে পারে; তার চেয়ে ছোট মাপে আরও ছোট ভগ্নাংশের দরকার হয়। কিন্তু দৈর্ঘ্য যে কত ছোট হইতে পারে, তাহার কোন ইয়ত্তা নাই; যত ছোট ভগ্নাংশকেই মাপকাঠি কর না কেন, তার চেয়ে ছোট দৈর্ঘ্য মাপিবার সময় আরও ছোট কাঠির দরকার হইবে; কিন্তু মানুষের ইন্দ্রিয় মোটা; মানুষের ইন্দ্রিয়কে এক জায়গায় গিয়া থামিতে হয়; তার চেয়ে ছোট কাঠি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের অগোচর ও কর্ম্মেন্দ্রিয়ের অব্যবহার্য্য হইয়া পড়ে। কাজেই বাধ্য হইয়া মানুষকে সেইখানে থামিতে হয়; তার চেয়ে সূক্ষ্ম মাপ চলে না। এইখানে পরিমাণ-সমস্যার আর মীমাংসা চলে না; যত সূক্ষ্ম পরিমাণ করি না কেন, সূক্ষ্মতার একটা সীমা আছে, সেখানে পরিমাণ-কর্ম্ম মানুষের অসাধ্য।

বৈজ্ঞানিক এইখানে আসিয়া হারি মানেন। ইন্দ্রিয়ই জ্ঞানের দ্বার; ইন্দ্রিয় যেখানে পরাস্ত হয়, জ্ঞানও সেখানে অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়।

ইন্দ্রিয়ের ক্ষমতার একটা সীমা আছে; তবে মানুষে বুদ্ধি খাটাইয়া সেই সীমাটাকে ঠেলিয়া লইয়া যাইতে পারে। কৌশলক্রমে সীমাটাকে

ক্রমশঃ ঠেলিয়া লওয়া চলে। চোখ আলোকের সাহায্যে দেখে; আলোক যেখানে পাওয়া যায় না, মানুষ সেখানে কৌশলক্রমে আলোক আনিয়া পুঞ্জীভূত করে, চোখ তখন দেখিতে পায়। এই সকল কৌশলের জন্য দূরবীক্ষণ অণুবীক্ষণ প্রভৃতি যন্ত্রের সৃষ্টি হইয়াছে। এই কৌশল-উদ্ভাবনে মানুষের শক্তির সীমা কোথায়, তাহা কেহ বলিতে পারে না; কাজেই মানুষ যন্ত্রদ্বারা ইন্দ্রিয়কে ক্রমেই স্বকার্য্যসাধনে সমর্থ করিয়া তুলিতেছে; শেষ পর্য্যন্ত ইন্দ্রিয়-শক্তি একটা সীমায় পৌঁছে বটে, কিন্তু সেই সীমা যে আবার কোথায় গিয়া সীমা পাইবে, তাহা বলিতে পারি না। কাজেই বিজ্ঞান অসম্পূর্ণ; কিন্তু ইহার গতি সম্পূর্ণতার অভিমুখে; সম্পূর্ণ কখনও হইবে না; তবে সম্পূর্ণতার অভিমুখে ক্রমশঃ চলিতেছে এবং আশা করা যায় যে চলিবে।

যে সকল কঠিন পদার্থের আকৃতি বাক্সের মত বা কেতাবের মত বা চতুষ্কোণ কৌটার মত, তাহাদের দৈর্ঘ্য বিস্তার বেধ মাপিলে আয়তন মাপা চলে, তাহা উপরে বলিয়াছি। তরল পদার্থের আয়তন ঐরূপ ফাঁপা কৌটায় পুরিয়া কয় কৌটা হইল, তাহাও সহজে মাপা চলে। কিন্তু কঠিন পদার্থের আকৃতি ভাঁটার মত, বা থালার মত, বা থামের মত হইলে, অত সহজে মাপা চলে না। এইরূপ হইলে মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি মানুষকে সাহায্য করে। জ্যামিতি-শাস্ত্র আসিয়া বলিয়া দেয়, একটা ভাঁটার ব্যাসের দৈর্ঘ্য জানিলে কিরূপে তাহার আয়তন স্থির হইবে; ব্যাসের দৈর্ঘ্য হয় যদি পাঁচকাঠি, ভাঁটার আয়তন হইবে কত ঘন কাঠি, ইত্যাদি প্রশ্নের মীমাংসা জ্যামিতি-শাস্ত্রের উপর। তবে জ্যামিতি-শাস্ত্র যে-কোনও প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে না। অষ্টাবক্র ঋষির মত আকৃতি হইলে, জ্যামিতি-শাস্ত্রও হারি মানে। তখন মানুষের বুদ্ধিকে পরাস্ত হইতে হয়। তখন কৌশলের আশ্রয় লইতে হয়। একটা বড় গামলা

কাণায় কাণায় জলে পূরিয়া সেই জলে অষ্টাবক্রকে ডুবাইতে হয়। খানিকটা জল উছলিয়া পড়ে; সেই জলটা আবার সেই কৌটার কত কৌটা হইল দেখিয়া তাহার আয়তন কত, স্থির করা চলে। অষ্টাবক্রের যে আয়তন এই উচ্ছলিত জলের আয়তন তাহার সমান।

স্থিতিস্থাপকতা

কঠিন পদার্থমাত্রেরই একটা আয়তন আছে, এবং একটা আকৃতি আছে। জোরে চাপ দিয়া আয়তন একটু কমান যায়। ইহার নাম **সঙ্কোচন**। চাপ তুলিয়া লইলে পূর্ব্ব আয়তন ফিরিয়া আসে, চাপের অভাবে স্বভাবপ্রাপ্তি ঘটে। এই ধর্ম্ম স্থিতিস্থাপকতা; ইহা **আয়তনগত স্থিতিস্থাপকতা**। আবার কঠিন পদার্থের আয়তন না কমাইয়া আকৃতি বদলান চলে; মোচড় দিলে উহা বক্র হয়; ইহার নাম **আকুঞ্চন**। মোচড় ছাড়িয়া দিলে বক্রতা দূর হয়; তখন স্বভাবে ফিরিয়া আসে। ইহাও স্থিতিস্থাপকতা; তবে ইহা **আকৃতিগত স্থিতিস্থাপকতা**। কঠিন পদার্থের দুই রকমেরই স্থিতিস্থাপকতা আছে;—আয়তনগত ও আকৃতিগত। চাপে সঙ্কোচন, আর মোচড়ে আকুঞ্চন, দুইটাই আয়াসসাধ্য। এই আয়াসের মাত্রা দেখিয়া স্থিতিস্থাপকতার পরিমাণ নিরূপিত হয়। যেখানে আয়াস অধিক, সেখানে স্থিতিস্থাপকতাও অধিক। যেখানে আয়াস অল্প, সেখানে স্থিতিস্থাপকতাও অল্প। ইস্পাত কাচ পাথর কাঠ, এই সকল জিনিসেরই আয়তন বদলান বা আকৃতি বদলান অতি আয়াসসাধ্য। ইহারা অত্যন্ত স্থিতিস্থাপক।

একটা গোল ভাঁটা বা বর্ত্তুলকে জোরে এক দিকে চাপিলে উহা চেপটা হইয়া যায়; উহার বর্ত্তুলত্ব থাকে না; উহার আকৃতির বদল

হয়। একটা মার্বেলের বা কাচের ভাঁটাকে চেপ্‌টা করা বড়ই শক্ত; একটা রবারের বলকে চেপ্‌টা করা তার চেয়ে অনেক সহজ। অতএব মার্বেল বা কাচের আকৃতিগত স্থিতিস্থাপকতা রবারের চেয়ে অধিক। কেননা, যেখানে আয়াস অধিক, সেখানে স্থিতিস্থাপকতাও অধিক।

কথাটা নূতন বলিয়া মনে হয়। চলিত ভাষায় রবারের স্থিতি-স্থাপকতা প্রসিদ্ধ। রবারের চেয়ে কাচের স্থিতিস্থাপকতা অধিক, ইহা কেমন কেমন শুনায়। কিন্তু ইহাতে বিস্মিত হইবার কারণ নাই। বিজ্ঞানের ভাষা ঠিক্ চলিত ভাষা নহে। চলিত ভাষায় যে শব্দ যে অর্থে প্রযুক্ত হয়, বিজ্ঞানের ভাষায় সে শব্দ ঠিক্ সে অর্থে প্রযুক্ত হয় না। বৈজ্ঞানিক বিচারে খুব সাবধান হইয়া ভাষা ব্যবহার না করিলে পদে পদে ঠকিতে হয়। চলিত কথাবার্ত্তায় অতটা বাঁধা-বাঁধি চলে না। কাজেই বৈজ্ঞানিকের ভাষা একটু স্বতন্ত্র। বৈজ্ঞানিক বিচারে প্রবৃত্ত হইবার আগেই শব্দগুলির নির্দ্দিষ্ট বাঁধাবাঁধি অর্থ দিয়া লইতে হয়; চলিত ভাষায় যেমন এলোমেলো নানা অর্থ থাকে, সেরূপ থাকিলে চলে না; এই নির্দ্দিষ্ট সঙ্কীর্ণ অর্থের নাম পারিভাষিক অর্থ। সরকারি আইন-কানুনের গোড়াতেই যেমন কতকগুলি শব্দের পারি-ভাষিক অর্থ দেওয়া হয়, সেইরূপ আরম্ভে পরিভাষা নির্ণয় করিয়া বিজ্ঞানশাস্ত্রও ফাঁদিতে হয়।

এ বিষয়ে কাচে আর রবারে পার্থক্য কি? বিজ্ঞানের ভাষায় কাচের স্থিতিস্থাপকতার **মাত্রা** অধিক; কিন্তু উহার **দৌড়** অল্প। আগে একবার বলিয়াছি, একটা ধাতুদণ্ডের মাঝখানে একটা ওজন ঝুলাইলে উহা বাঁকিয়া যায়, ভার নামাইলে আবার বক্রতা নষ্ট হয়। অর্থাৎ ধাতুর আকৃতিগত স্থিতিস্থাপকতা আছে। কিন্তু ভারের

মাত্রা অধিক হইলে এতটা বাঁকিয়া যায় যে, তখন আর স্বভাবে ফেরে না; একটা স্থায়ী বক্রতা আসিয়া পড়ে। বুঝিতে হইবে যে, তখন স্থিতিস্থাপকতা আর নাই; ঐ ধাতু পূর্ব্বে ছিল স্থিতিস্থাপক, এখন হইয়াছে নমনীয়। ঐ ধাতুর স্থিতিস্থাপকতার যে নির্দ্দিষ্ট সীমামধ্যে দৌড় ছিল, উহা সেই সীমা ছাড়াইয়া গিয়াছে। দৌড়ের সীমা ছাড়াইলে আর উহা স্থিতিস্থাপক থাকে না; নমনীয় হইয়া পড়ে।

কাচের ছড়িতেও ভার ঝুলাইলে উহা বাঁকে; গুরুভার ঝুলাইলে উহা ভাঙ্গিয়া যায়। এখানেও বুঝিতে হইবে, স্থিতিস্থাপকতার দৌড়ের সীমা ছাড়াইয়া ভার ঝুলান হইয়াছে। সীমার ভিতরে কাচ ছিল স্থিতিস্থাপক; সীমা ছাড়াইয়া হইয়াছে ভঙ্গুর।

রবারের স্থিতিস্থাপকতার মাত্রা অল্প বটে, কিন্তু দৌড় খুব বেশী; চাপ দিয়া অনেকটা চেপ্‌টা করা চলে। রবারের সূতাকে টানিয়া অনেকটা লম্বা করা চলে। আবার টান ছাড়িলে পূর্ব্বের অবস্থা ফিরিয়া পায়। অল্প আয়াসে আকৃতির অনেকটা বদল হয়। কাজেই স্থিতিস্থাপকতার মাত্রা অল্প, কিন্তু দৌড় অধিক। কিন্তু এখানেও দৌড়ের একটা সীমা আছে; অধিক টানে রবারের সূতাও ছিঁড়িয়া যায়। তখন যে রবার ছিল স্থিতিস্থাপক, তাহা হইয়া পড়ে ভঙ্গুর।

তরল পদার্থ

তরল পদার্থের হাতের কাছে উদাহরণ জল। কঠিনের সঙ্গে ইহার প্রভেদ কি? প্রভেদ অনেক। জল গড়াইয়া যায়, জলে স্রোত হয়; জল ফোঁটা ফোঁটা পড়ে; জলে অক্লেশে হাত ডুবাও, জল সেখান হইতে সরিয়া যাইবে, আবার হাত তোল, জল দ্বিধা না করিয়া স্বস্থানে

আসিয়া স্থানপূরণ করিবে। মাটিতে বা পাথরে এমন করিয়া হাত ডোবান চলে কি? পাথরে ছুরির আঁচড় দাও; স্থায়ী চিহ্ন থাকিবে; জলে ছুরির আঁচড় স্থায়ী হয় কি? জল যে এইরূপ অবাধে সরিয়া নড়িয়া বহিয়া যায়, ইহাই জলের তারল্য।

আবার ঘটির জল দেখ; কেমন ঘটির গায়ে গায়ে লাগিয়া আছে। ঘটির ভিতরটার যে আকার, জল ঠিক্ সেই আকার গ্রহণ করিয়াছে। ঘটির জল থালায় ঢাল, জল বিনা আপত্তিতে থালায় ছড়াইয়া বিছাইয়া পড়িল; কোনও বাক্যব্যয় নাই, থালার আকার গ্রহণ করিল। জল যেন সুশীল সুবোধ গোপালের মত বালক; যা পায় তাই খায়; যা পায়, তাই পরে।

জলের আকৃতির কোন বাঁধাবাঁধি নাই। কাচ বা কাঠ বা পাথর যেমন গড়ন্ত আকৃতি লইয়া জমাট হইয়া বসিয়া থাকে, জলের সে অহমিকা নাই। কাচের পুঁতুল হয়; জলের পুঁতুল গড়া চলে না। কাঠের আকৃতি বদলান, কাঠকে নোয়ান, মচকান, মোচড়ান, কত আয়াসসাধ্য; জল কিন্তু নুইয়াই আছে, কোনও আয়াসের অপেক্ষা করে না। জল ভাঙ্গেও না, মচকায়ও না; কেননা, উহা ভাঙ্গিয়াই আছে, মচকাইয়াই আছে। মাটির ঢিপি থাকে, পাথরের পাহাড় থাকে, বালির স্তূপ থাকে; জলকে স্তূপাকৃতি করিয়া ঢিপি বাঁধা চলে কি? জলের আকৃতি বদলাইতে কোনও আয়াস আবশ্যক হয় না। উপরে বলিয়াছি, যাহার আকৃতি বদলাইতে যত আয়াস দরকার হয়, তাহার আকৃতিগত স্থিতিস্থাপকতা তত অধিক। জলের আকার পরিবর্ত্তনে যখন কিছুই আয়াস লাগে না, তখন বলিতে হইবে, জলের আকৃতিগত স্থিতিস্থাপকতা একবারেই নাই। এই হইল ইহার তারল্য; কঠিনের সঙ্গে তরলের প্রভেদ এইখানে।

জলের আকৃতিগত স্থিতিস্থাপকতা নাই বটে, কিন্তু আয়তনগত স্থিতিস্থাপকতা বড় অল্প নহে। জলের আকুঞ্চনে কোন ক্লেশ নাই, কিন্তু সঙ্কোচন প্রচুর আয়াসসাধ্য। একটা চোঙায় জল পূরিয়া তাহাতে প্রচুর চাপ দিলে তবে যৎকিঞ্চিৎ আয়তন কমে; আবার সেই চাপ তুলিয়া দিলে পূর্ব্বের আয়তন ফিরিয়া পায়। কিন্তু এত অল্প কমে, যে বুঝা দায়, কাজেই জলের আয়তনগত স্থিতিস্থাপকতার মাত্রা কঠিনের সহিতই তুলনীয়।

জল অতি সুবোধ বালক; কিন্তু জলেরও একটা জেদ আছে। জল ঘটিতেই রাখ, আর চোঙাতেই রাখ, আর থালাতেই রাখ অথবা একটা পুষ্করিণীতেই রাখ, উহার পৃষ্ঠদেশ সমতল ও সমোচ্চ হইবেই। কোথাও উচু নীচু ঢিপি থাকিবে না। কঠিনা পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশ কত বন্ধুর; কোথাও পাহাড়, কোথাও ডাঙা, কোথাও বিল, কোথাও খাল। আর জলের পিঠ একটানা সমান। জলের একধার উচু, একধার নীচু হয় না। অতি নির্ব্বোধেও পুকুরের জল এধারে উচু, ওধারে নীচু বলিতে চাহিবে না; কোন ব্যক্তিকে জল-উচুর দলস্থ বলিলে গালি দেওয়া হয়। হাওয়া দিলে পুষ্করিণীর জলের পিঠে হিল্লোল দেয়, উহা তরঙ্গায়িত হয়, কিন্তু সে হাওয়ার জোরে; হাওয়া না থাকিলে যে সমতল সেই সমতল।

জলের এই বিষয়ে জেদ দেখা যায়; যেমন করিয়া হউক, পিঠটা সমতল রাখিবেই; উহাতে ঢিপি বাঁধাও চলিবে না, আঁচড় কাটাও চলিবে না। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উহা জেদ নহে, বরং উহা জেদের অভাব। জলের অসীম নমনীয়তাই উহার ঐরূপ আচরণের হেতু। খাড়া হইয়া থাকিতে, বাঁকিয়া থাকিতে, মাথা তুলিয়া থাকিতেই জেদের দরকার; ঢলিয়া পড়িতে জেদের দরকার নাই।

জলের এই তারল্য, এই টলটলে ঢলঢলে ভাব, এই ঢলিয়া পড়ার—এই প্রবাহ জন্মানর—প্রবৃত্তি তেলে আছে, ঘিয়ে আছে, ঘোলে আছে, আবার গুড়েও আছে। এ সকলই তরল পদার্থ। গুড়ও তরল পদার্থ; তবে জলে আর গুড়ে একটু প্রভেদ স্পষ্ট দেখা যায়; গুড়ও ঢলেন ও বহেন, কিন্তু একটু বিলম্বে। জলে যত তাড়াতাড়ি দ্রুত স্রোত জন্মে, গুড়ে তত দ্রুত স্রোত জন্মে না। গুড়ে হাত ডুবাইলে গুড় সরিয়া যায়, হাত সরাইলে আবার স্থানপূরণার্থ সরিয়া আসে, কিন্তু একটু বিলম্বে আসে; যেন গুড়ের গায়ে গায়ে ঘষাঘষি আটকা-আটকির ভাব আছে। সেই ঘর্ষণের ফলে একটু বিলম্ব ঘটে, একটু সময় লাগে। গুড় তরল; কিন্তু **গাঢ়**; উহার তারল্যে **গাঢ়তা** আছে। জলে সেই গাঢ়তা অল্প,—একেবারে নাই, এমন নহে,—তবে গুড়ের চেয়ে অনেক কম। তরলপদার্থমাত্রেই এই গাঢ়তার তারতম্য আছে।

গালার বাতি আপাততঃ কঠিন পদার্থ বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু দেখা যায়, উহাও কালক্রমে ঢলিয়া নুইয়া বাঁকিয়া যায়; আপনা হইতেই যায়, নিজের ভারে নিজে বাঁকিয়া যায়। বাক্সের ভিতরে শীলমোহরের ছাপের জন্য রক্ষিত গালার বাতি আপনা হইতে কালক্রমে বাঁকিয়া যায়, অনেকেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। ফলে উহাও তরল পদার্থ, কিন্তু উহার গাঢ়তা খুব বেশী; এত বেশী যে, অল্প সময়ে উহার নমনীয়তা, উহার তরলতা, আমরা বুঝিতেই পারি না। বহু বিলম্বে উহা প্রত্যক্ষ করি।

ফলে দাঁড়াইল এই যে, কালসহকারে নোয়াইবার এই প্রবৃত্তিটাই তারল্যের লক্ষণ। জলের মত জিনিস খুব শীঘ্র নুইয়া পড়ে, গুড়ে একটু বিলম্ব হয়; গালায় বহু বিলম্ব ঘটে।

তামার মত, লোহার মত, কঠিন ধাতুদ্রব্যেরও যে এই নমনীয়তা একেবারে নাই, তাহা নহে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তামার বা লোহার

কঙে গুরুভার ঝুলাইলে উহা স্থায়িভাবে নুইয়া পড়ে, তার তুলিলেও আর স্বভাবে ফিরে না। এমন কি, বড় বড় কড়িকাঠ, লোহার বীম, নিজের ভারে নিজে স্থায়ী বক্রতা প্রাপ্ত হয়, এবং যত দিন যায়, ততই সেই বক্রতা বাড়ে। আকৃতিগত স্থিতিস্থাপকতার দৌড়ের যে সীমা আছে, সেই সীমা ছাড়াইলেই এই দশা ঘটে, তখন কাঠিন্য গিয়া তারল্য আসে। সেই সীমার ভিতরে উহা স্থিতিস্থাপক ও কঠিন, সীমার বাহিরে উহা *নমনীয় ও তরল। সোণা-রূপা, তামা-লোহা, উহারা কিছু দূর পর্য্যন্ত* কঠিন, তার পর তরল; খুব গাঢ় ভাবে তরল। উহাদের গাঢ়তা এত অধিক যে, অল্প সময়ে তারল্য টের পাওয়া যায় না। তবে খুব জোরে যদি আঘাত করা যায়, জোরে হাতুড়ির ঘা দেওয়া যায়, তাহা হইলে অল্প সময়ের মধ্যেই স্থিতিস্থাপকতার সীমা ছাড়াইয়া যায়, তখন উহাদের নমনীয়তা বা তারল্য ধরা পড়ে। এই তারল্যটুকু আছে বলিয়াই জোরে আঘাতে সোণা-রূপার পাত হয়, জোরে টান দিলে তার হয়। সম্পূর্ণভাবে তারল্যহীন হইলে পাত হইত না, বা তার হইত না। কঠিন পদার্থের ঘাতসহতা একটু তারল্যেরই লক্ষণ।

দেখা গেল, কাঠিন্যের বা তারল্যের নিরূপণ খুব সহজ নহে। একই পদার্থে কাঠিন্যের সঙ্গে সঙ্গে কিঞ্চিৎ তারল্য থাকিতে পারে। বলা যাইতে পারে, যাহাদের আকৃতিগত স্থিতিস্থাপকতা আছে, যাহারা ভাঙ্গিবে, কিন্তু মচকাইবে না, তাহারাই মোটের উপর কঠিন। আর যাহাদের আকৃতিগত স্থিতিস্থাপকতা নাই, যাহারা ক্রমশঃ মচকাইয়াই যায়, নোয়াইয়াই যায়, তাহারা তরল। যাহা কাঠিন্যের সীমার ভিতর কঠিন, তাহাও সীমার পারে তরল হইতে পারে; তবে গাঢ়তার জন্য তাহার তারল্য শীঘ্র প্রকাশ না পাইতে পারে। এরূপ স্থলে তারল্যের প্রকাশ সময়-সাপেক্ষ।

তরল পদার্থের চাপ

এইবার তরল পদার্থের আর একটা বিশেষ গুণের কথা পাড়িব। একটা চোঙায় বালি পূরিয়া তার তলে ছিদ্র করিলে ছিদ্র দিয়া ঝুর্ ঝুর্ করিয়া বালি বাহির হইবে, কিন্তু চোঙার গায়ে পাশে ছিদ্র করিলে সে পথে বালি বাহির হইবে না। কিন্তু চোঙায় জল পূরিয়া তলায় বা পাশে *যেখানে ছিদ্র কর না কেন, সেই পথে জলের প্রবাহ ছুটিবে।* বালি কেবল চোঙার তলের উপর চাপ দেয়, আর জল তলেও চাপ দেয়, পাশেও চাপ দেয়। শুধু পাশে কেন, জল ঊর্দ্ধমুখেও চাপ দিতে পারে। গাড়ুতে কাণায় কাণায় জল পূরিলে দেখা যায়—উহার নলের মুখ হইতে ঊর্দ্ধমুখে জলের ফোয়ারা ছুটিয়াছে। নলের মুখটা গাড়ুর কাণার নীচে থাকিলে এরূপ ঘটে। কাণায় কাণায় জলে ভরা কলসীর গলার নীচে—অর্থাৎ যেখানটাকে কলসীর কাঁধ বলা চলিতে পারে সেই কাঁধে—একটা ফুটা করিলে নীচের জল ঊর্দ্ধমুখে বাহির হয়। সে যাক্, ঊর্দ্ধমুখে চাপ পড়ে বলিয়াই ভিতরের জল বাহিরে ঊর্দ্ধমুখে ছুটিয়া থাকে। জলেরই ফোয়ারা হয়; বালির এরূপ ফোয়ারা হয় না। জল নিম্নমুখে, পার্শ্বমুখে, ঊর্দ্ধমুখে, সকল মুখেই চাপ দেয়। তরল পদার্থেরই এই স্বভাব, উহার **চাপ** সর্ব্বতোমুখ। কঠিন পদার্থের চাপ কেবল নিম্নমুখ। জলের চাপ সর্ব্বতোমুখ বটে তবে সর্ব্বত্র পরিমাণে সমান নহে। জলের পিঠ সর্ব্বদা সমতল থাকে, আগে বলিয়াছি; সেই পিঠের যত নীচে যাওয়া যায়, অর্থাৎ যত গভীর জলে নামা যায়, চাপের মাত্রা ততই বাড়িয়া যায়। ইহাও ঐ চোঙা হইতেই পরীক্ষা করিলে বুঝা যাইবে। চোঙার পাশে দুইটা ছিদ্র কর; একটা উচ্চে, একটা নিম্নে। দুই ছিদ্র দিয়াই জল বাহির হইবে, কিন্তু উপরের ছিদ্রপথে যে জল বাহির হইবে, তাহার

বেগ অল্প, নীচের ছিদ্রের জলের বেগ অধিক। কেননা, যে জল নীচের ছিদ্র দিয়া বাহির হইতেছে, সে গভীর জল; উপরের ছিদ্রের জল তত গভীর জল নহে। জলের গভীরতা যেখানে এক হাত, সেখানে যে চাপ, গভীরতা যেখানে দশ হাত, সেখানে চাপ ঠিক্ তাহার দশ গুণ,—পোনের গুণও নহে, নয় গুণও নহে,—ঠিক দশগুণ।

ঠিক্ দশগুণ কিরূপে জানিলে? পাঠক হয় ত উত্তর দিবেন, কেন, এ ত সহজ হিসাব, ত্রৈরাশিকের আঁক। এক হাত নিম্নে চাপ যদি হয় একগুণ, দশ হাত নিম্নে চাপ হইবে দশগুণ। এক টাকায় এক মণ চাউল হইলে দশ টাকায় দশ মণ চাউল পাওয়া যাইবে, সেইরূপ। কিন্তু আমাকে বাধ্য হইয়া বলিতে হইতেছে যে, চাপের এই হিসাবে উত্তরটা যদিও ঠিক হইল, কিন্তু হিসাবের প্রণালীটা ঠিক হইল না।

প্রাকৃতিক নিয়ম

কেন ঐ হিসাব ঠিক হইল না বলিবার পূর্ব্বে একটা পাল্টা প্রশ্ন করিব। এক হাত নিম্নে যে চাপ, দশ হাত নিম্নে চাপ তাহার দশগুণ না হইয়া যদি বিশগুণ হইত, তাহা হইলে তুমি কি করিতে? যদি বিধির বিধান সেইরূপ হইত, তাহা হইলে তুমি কি করিতে? তুমি হাজার কান্নাকাটা করিলেও, মাথা খুঁড়িলেও বিধির বিধান উল্টাইত না। তখন ত্রৈরাশিকের হিসাব খাটিত না। বিধাতার ব্যবস্থার উপর তোমার কি হাত আছে? বিধাতার ব্যবস্থা বলিতে যদি আপত্তি থাকে, বল, প্রকৃতির খেয়াল বা প্রাকৃতিক নিয়ম। নামে কিছু যায় আসে না। খেয়ালই বল, আর নিয়মই বল, আর বিধানই বল, ঐরূপ হইলে তোমার ত্রৈরাশিকের হিসাব কোথায় থাকিত? বাধ্য হইয়া

তাহাই মানিয়া লইতে হইত। যদি পরিমাণ করিয়া বস্তুতই দেখা যাইত, এক হাত নীচে যে চাপ, দশ হাত নীচে চাপ তাহার বিশগুণ, তখন তাহাই মানিতে হইত। কাহার সহিত এখানে ঝগড়া চলিবে?

যদি বল, বিধাতার বিধান বা প্রকৃতির খেয়াল এমন অসঙ্গত কেন হইবে? তাহার উত্তরে আমি বলিব, কেন হইবে না? তাহার উপর তোমার কি জোর? অথবা যখন প্রত্যক্ষ দেখিতেছি এইরূপ বিচার, চাপ বিশগুণই বটে, দশগুণ নহে, তখন আর কি কথা? যাহা প্রত্যক্ষ দেখিতেছি, তাহাই মানিয়া লইতে হইবে। ঘাড় পাতিয়া মানিতে হইবে।

বস্তুতঃ সর্ব্বত্র ত্রৈরাশিকের নিয়ম খাটে না। এক বৎসরের গরুর দাম দশ টাকা হইলে, দুই বৎসরের গরুর দাম বিশ টাকা হইবে কি? না, এখানে ত্রৈরাশিকের নিয়ম খাটিবে না। ওজনে চাউল কিনিবার সময় খাটে, কিন্তু বয়স ধরিয়া গরু কিনিবার সময় খাটে না। চাউল কিনিবার সময়ই কি সর্ব্বদা খাটে? তাহাও নহে। এক টাকায় এক মণ চাউল পাওয়া যায়, কিন্তু দশ টাকার চাউল লইলে অনেক সময় একটু সস্তা দরে পাওয়া যায়, দশ মণের কিছু অধিক পাওয়া যায়। অল্প জিনিস যে দরে বিক্রয় হয়, অধিক জিনিস তার চেয়ে সস্তা দরে বিক্রয় হয়। দরটা জানিলে তবে হিসাব চলে। যেখানে সমান দর, সেই-খানেই ত্রৈরাশিক চলে, নতুবা চলে না। দর সমান কি না, তাহা বাজারে গিয়া না জানিলে চলিবে না; ঘরে বসিয়া ত্রৈরাশিক কষার কর্ম্ম নহে। যেখানে ত্রৈরাশিক খাটে, সেইখানেই ত্রৈরাশিক খাটিবে। যদি বাজারে গিয়া বুঝ, ত্রৈরাশিক চলিবে না, তখন ত্রৈরাশিক খাটাইলে চলিবে না। ফলে, বাজারের দরের উপর তোমার যেমন হাত নাই,

সেখানে বিক্রেতার খেয়াল অথবা বাজারের নিয়ম মানিয়া চলিতে হয়, সেইরূপ বৈজ্ঞানিক হিসাবেও বিধাতার খেয়াল বা প্রকৃতির নিয়ম মানিয়া চলিতে হইবে। বাজারে গিয়া যেমন জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে হয়, কোন্ ওজনে কত দর, এখানেও সেইরূপ প্রকৃতির বাজারে জিজ্ঞাসা করিয়া যাচাই করিয়া জানিতে হইবে, হিসাবের প্রণালীটা কিরূপ; ত্রৈরাশিক খাটিবে কি না? যদি যাচাই করিয়া জানিতে পার, ত্রৈরাশিক চলিবে, উত্তম; হিসাব সহজ হইল; যদি দেখ, চলিবে না, তাহা হইলে হিসাব জটিল হইয়া পড়িল। যাহা দেখিবে তাহাই ঘাড় পাতিয়া মানিয়া লইতে হইবে।

জলের চাপের হিসাবে ত্রৈরাশিকের অঙ্কই খাটে; এক হাত নীচে যে চাপ, দশ হাত নীচে তাহার দশগুণ দেখা যায়, এগার গুণও দেখা যায় না, নয় গুণও দেখা যায় না। উত্তম কথা, যখন বিধাতার বিধান বা প্রকৃতির খেয়াল এইরূপ, তথাস্তু। যদি অত সহজ হিসাব না হইত, যদি বিধান বা খেয়াল অন্যরূপ হইত, তাহাই মানিতে হইত।

অবেক্ষণ ও পরীক্ষণ

ফলে, ঘরে বসিয়া কাগজে-কলমে আঁক কষিলে কোন কালে কোন জিনিসের মূল্যনির্ণয় চলে না। বাজার যাচাই করা চাই। প্রকৃতির বাজারও যাচাই করা আবশ্যক। এই কর্ম্মের নাম পর্য্যবেক্ষণ। আরও ছোট কথায় **অবেক্ষণ**। যদ্দ্বারা অবেক্ষণ হয়, তাহার নাম ইন্দ্রিয়—দর্শন, শ্রবণ, ইত্যাদি। এইগুলি বাহিরের ইন্দ্রিয়; ইহা ছাড়া একটা ভিতরের ইন্দ্রিয় আছে—তাহার নাম মন। দেখিয়া শুনিয়া স্থির করিতে হইবে, কোথায় কিরূপ বিধান বা কোথায় কিরূপ খেয়াল। বুদ্ধিবৃত্তির চেষ্টায় ইহার নিরূপণ হইবে না। বাহিরের ইন্দ্রিয়গুলি এই

সকল বিধান অনুসন্ধান করিয়া মনের দুয়ারে হাজির করিবে; মন বা অন্তরের ইন্দ্রিয় তাহা বুদ্ধির নিকট পৌঁছাইয়া দিবে। বুদ্ধি তখন বাজারের বিধানের সংবাদ পাইয়া তদনুসারে আঁক কষিতে বসিবেন। আঁক যে সর্ব্বত্রই ত্রৈরাশিকের নিয়মে হইবে তাহা নয়।

বাস্তবিকই ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে কোথায় কি বিধান, তাহা ঠিক করিয়া লইতে হয়। পরিমাণ-নিরূপণের জন্য মাপকাঠি ব্যবহার করিতে হয়, করিবে। ইন্দ্রিয় যদি অপটু হয়, তাহাকে সাহায্য করিবার জন্য কৌশল-উদ্ভাবন, যন্ত্রের উদ্ভাবন করিবে। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত ইন্দ্রিয় দ্বারা প্রত্যক্ষ করা ভিন্ন গত্যন্তর নাই। দূরদৃষ্টির জন্য চোখে চশমা লাগাইতে হয় লাগাও, দূরবীণ লাগাইতে হয় লাগাও;—এ-সকল কৌশলময় যন্ত্র ইন্দ্রিয়কে সাহায্য করিবে। কিন্তু চোখটা চাই। চোখ না থাকিলে চশমায় চলিবে না, দূরবীণও কাণা হইবেন।

জলের চাপ কত হাত নীচে কত, তাহা মাপিয়া দেখিতে হইবে; অবেক্ষণ দ্বারা ঠিক করিতে হইবে। জলে ডুবিয়া চাপের পরিমাণ-মাপা সহজ নহে; তবে চোঙাতে জল পূরিয়া, চোঙার গায়ে উপরে, নীচে, নানা স্থানে ফুটা করিয়া, কোন্ ছিদ্র হইতে কত বেগে জল বাহির হইতেছে দেখিয়া, কত হাত নীচে কত চাপ, তাহা মাপা চলিতে পারে। চোঙা গড়িয়া, তাহাতে জল পূরিয়া, গায়ে ছিদ্র করিয়া, নীচে কত চাপ মাপিতে হইবে। এইরূপ বন্দোবস্তপূর্ব্বক যে অবেক্ষণ, তাহার নাম **পরীক্ষণ**। যে ঘটনা আপনা হইতে ঘটে না, তাহা কৌশল-পূর্ব্বক ঘটাইয়া অবেক্ষণের নাম পরীক্ষণ। অবেক্ষণ ও পরীক্ষণ এই দুই উপায়ে আমরা প্রকৃতির বিধান বা বিধাতার খেয়াল কোথায় কিরূপ, জানিয়া লই। অন্য উপায় নাই। ইহাই বৈজ্ঞানিকের পন্থা। নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।

প্রাকৃতিক নিয়ম আবিষ্কারের একমাত্র উপায় অবেক্ষণ, বা পরীক্ষণ-সহকৃত অবেক্ষণ। বহুস্থলে প্রকৃতির আচরণের উপর হস্তক্ষেপ করিবার আমরা অবসর পাই না ; সে ক্ষেত্রে পরীক্ষণের উপায় থাকে না ; অবেক্ষণেই সন্তুষ্ট থাকিতে হয়। জ্যোতিষ্কগণের গতিবিধি, মেঘ-বৃষ্টি, জল-ঝড়, ভূমিকম্প, জোয়ার-ভাটা প্রভৃতির উপর আমাদের কিছুমাত্র প্রভুত্ব নাই ; আমরা কেবল বসিয়া বসিয়া ঐ সকল ঘটনা অবেক্ষণ করি মাত্র ; এবং যদি ঐ সকল ঘটনার পারম্পর্য্যে বা সাহচর্য্যে প্রকৃতির কোন বিশেষরূপ খেয়াল বা বিধান দেখিতে পাই, তাহা টুকিয়া যাই। তবে অবেক্ষণ ব্যাপারে ইন্দ্রিয়ের সাহায্যার্থ যন্ত্রের আশ্রয় লইয়া থাকি ও মাপের জন্য, সূক্ষ্ম পরিমাণের জন্য, নানা কৌশল উদ্ভাবন করি। কিন্তু কঠিন তরল অনিল বিবিধ পদার্থের তত্ত্বানুসন্ধানের সময়, উত্তাপের আলোকের তাড়িতের ক্রিয়াপ্রণালী বুঝিবার সময়, আমরা ইচ্ছা করিয়া, চেষ্টা করিয়া, প্রাকৃতিক ঘটনায় ঐ সকল ক্রিয়ার আনুষঙ্গিক যে সকল জটিলতা আছে তাহা যথাসাধ্য বর্জ্জন করিয়া, ঐ সকল আনুষঙ্গিক ফলাফলকে আয়ত্ত রাখিয়া, উহা আলোচনা করি, পর্য্যবেক্ষণ করি ; এইরূপ পর্য্যবেক্ষণের নাম পরীক্ষা। এই পরীক্ষা-পদ্ধতি আশ্রয় করিয়াই বিজ্ঞানশাস্ত্র এত অল্পদিনের মধ্যে এত অদ্ভুত ফললাভে সমর্থ হইয়াছে। প্রকৃতিতে যে সকল ঘটনা ঘটে, তাহা বড়ই জটিল ; একটা কারণে নানা কার্য্য ঘটে ; নানা কারণ একত্র উপস্থিত হইয়া একটা কার্য্যকে নিয়ন্ত্রিত করে ; কোন্ কারণের ফলে কোন্ কার্য্য, তাহা কেবল অবেক্ষণ দ্বারা নির্ণয় করা কঠিন হয়। এই জন্য যত দিন মানুষ কেবল অবেক্ষণের উপর নির্ভর করিয়া সন্তুষ্ট ছিল, তত দিন জ্ঞানের উন্নতি মন্থরগতিতে ঘটিয়াছিল। যে দিন হইতে বুদ্ধিমানেরা

প্রকৃতির জটিলতা বুদ্ধিপূর্ব্বক পরিহার করিয়া, নানা কারণের মধ্যে একটি কারণকে সম্মুখে রাখিয়া, অন্য কারণগুলিকে কৌশলক্রমে ও চেষ্টাক্রমে অপসৃত করিয়া, সেই একটি কারণের ফলে কি কার্য্য হয়, পরীক্ষা করিয়া দেখিতে আরম্ভ করিলেন, তখনই জ্ঞানের উন্নতি দ্রুতগতিতে আরম্ভ হইল। এই জন্যই কথায় কথায় বলা হয়, এ কালের বিজ্ঞানশাস্ত্র মুখ্যতঃ পরীক্ষাপ্রণালীর উপর প্রতিষ্ঠিত।

ফলে, বিজ্ঞানশাস্ত্রের অবলম্বিত এই পদ্ধতি কোন একজন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি একদিন সহসা আবিষ্কার করিলেন, তার পর দিন হইতেই বিজ্ঞানশাস্ত্রের উন্নতির আরম্ভ হইল, এরূপ মনে করা ভুল। যে দিন হইতে কার্য্যসাধনার্থ মনুষ্য বুদ্ধিপূর্ব্বক চেষ্টা প্রয়োগ করিতে পারিয়াছে,—সে কোন্ দিনের কথা, তাহা ইতিহাসে লেখে না—সেই দিন হইতেই এই পদ্ধতি আবিষ্কৃত হইয়াছে। মানুষের এমন অবস্থা ছিল, যখন মানুষ নিজে অগ্নি উৎপাদন করিতে জানিত না; কিন্তু তখনও অগ্নির অস্তিত্ব জানিত না, এমন নহে। অগ্নিগিরি হইতে অগ্নিশিখা বাহির হয়, বজ্রপাতে গাছ জ্বলিয়া উঠে, ভূগর্ভ হইতে অগ্নিশিখা নির্গত হয়, এই সকল নৈসর্গিক ঘটনা আরণ্য মানুষেরও গোচর ছিল। কিন্তু যে দিন কাঠে কাঠ ঘষিয়া বা পাথরে পাথর ঠুকিয়া মানুষ অগ্নির উৎপাদনে সমর্থ হইল, যে দিন অগ্নির উৎপাদনে মানুষ অবেক্ষণ ছাড়িয়া পরীক্ষণ ধরিল, সেইদিন বুঝিল যে, এই কাজের এই ফল, এই কারণের এই কার্য্য। সেদিন মানুষের জ্ঞানার্জ্জনের ক্ষমতা সহসা বিস্তার লাভ করিল; মানুষের মনুষ্যত্বের মাত্রা সেদিন হঠাৎ বাড়িয়া গেল; প্রকৃতির একাংশের উপর তাহার আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইল। মনুষ্যকর্ত্তৃক সেই প্রথম অগ্নি উৎপাদনের দিন একটা প্রকাণ্ড বৈজ্ঞানিক তথ্যের আবিষ্ক্রিয়া ঘটিল, বোধ হয় তত বড়

আবিষ্ক্রিয়া মানুষের জ্ঞানের ইতিহাসে পরবর্ত্তী কালে আর ঘটে নাই। চাষা যখন ভাবী ফলের প্রত্যাশায় যথাসময়ে ভূমি চষিয়া বীজ বপন করে, তখন সে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বন করে; তাহার কোন বিস্মৃত-নামা পূর্ব্বপুরুষ বা পূর্ব্বপুরুষগণ পরীক্ষা দ্বারা যে নূতন তথ্য আবিষ্কার করিয়াছিল, সে তাহাই এখন নিজের কাজে লাগায়। ফলে, মানুষমাত্রই এক এক জন ছোটখাট বৈজ্ঞানিক।

ফলে, মনুষ্যে ও পশুতে এইখানে প্রভেদ; পশু পর্য্যবেক্ষণ করিতে জানে, কিন্তু বুদ্ধিপূর্ব্বক পরীক্ষা করিতে অসমর্থ; মানুষ পর্য্যবেক্ষণও করে, পরীক্ষাও করে। জ্ঞানবৃদ্ধির জন্য মানুষের অবলম্বিত উপায়ই এই। জ্ঞান আর বিজ্ঞান উভয়ই সমার্থক; বিজ্ঞান অর্থে বিশিষ্ট জ্ঞান; বুদ্ধি-পরিচালিত চেষ্টায় উপার্জ্জিত বিশিষ্ট জ্ঞান। পশুরও জ্ঞান আছে; প্রাকৃতিক ক্রিয়ানিচয়ের অবেক্ষণলব্ধ জ্ঞান আছে; সেই জ্ঞানকে বিজ্ঞান বলিতে না চাও, ক্ষতি নাই। কিন্তু মানুষ বহুকাল হইতে বৈজ্ঞানিক; কবে হইতে বৈজ্ঞানিক, তাহা ইতিহাসে লেখে না। সে পর্য্যবেক্ষণও করে, পরীক্ষাও করে, সেইজন্য তাহার জ্ঞানকে বিজ্ঞান বলা যায়। যে দিন হইতে মানুষ পশুভাব ছাড়িয়া মানুষভাব পাইয়াছে, সেইদিন হইতেই সে বৈজ্ঞানিক।

একালে যিনি মুখ খুলিতে বা কলম ধরিতে জানেন, তিনিই বিজ্ঞানের অপূর্ণতার প্রতি লক্ষ্য করিয়া দুটা বিদ্রূপ করিতে ছাড়েন না। বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তের পুনঃপুনঃ পরিবর্ত্তন দেখিয়া বলা হয়, বিজ্ঞানের পদ্ধতি দুষ্ট; উহার বিচারে আস্থাস্থাপন অযুক্ত; বৈজ্ঞানিকের কথায় নির্ভর করা অনুচিত। ফলে, এই সকল বিদ্রূপোক্তি উপেক্ষণীয়; কেন না, বিজ্ঞানের পদ্ধতিই মনুষ্য মাত্রের অবলম্বিত ও অবলম্বনীয় একমাত্র পদ্ধতি। যিনি উপহাস করিতেছেন তিনিও অন্য

কোন পদ্ধতি জানেন না; তিনিও নিজের জীবনে ঐ একমাত্র পদ্ধতি অজ্ঞাতসারে অবলম্বন করিয়া চলিতেছেন। তাঁহারও ইন্দ্রিয়বৃত্তি, মনোবৃত্তি, বুদ্ধিবৃত্তি তাঁহাকে প্রকৃতির ক্রিয়ানিচয়ের পারম্পর্য্য ও সাহচর্য্যের অবেক্ষণে নিযুক্ত রাখিয়াছে; তিনি তাঁহার সাধ্যমত কৌশল উদ্ভাবনা দ্বারা ইন্দ্রিয়বৃত্তিকে পরীক্ষণ ব্যাপারে সমর্থ করিতে সঙ্কোচ করেন না। তিনিও তাঁহার ও তাঁহার পূর্ব্বগামীদিগের পরীক্ষালব্ধ জ্ঞানকে নিজ জীবনযাত্রার পরিচালনায় নিযুক্ত রাখিয়াছেন। তিনি যাহা করেন, যাঁহাদিগকে বিশিষ্টভাবে বৈজ্ঞানিক খ্যাতি দেওয়া হয়, সেই বৈজ্ঞানিকেরাও তাহাই করেন; তাঁহার জ্ঞানও অপূর্ণ, বৈজ্ঞানিকের বিজ্ঞানও অপূর্ণ। এই অপূর্ণতার কারণে তাঁহার সকল চেষ্টা ফলপ্রদ হয় না, বৈজ্ঞানিকের সকল চেষ্টাও ফলপ্রসূ হয় না। তাঁহাকেও অপূর্ণ জ্ঞানের উপর নির্ভর করিয়া যেমন মাঝে মাঝে জীবনযাত্রায় ঠকিতে হয়, বৈজ্ঞানিককেও অপূর্ণ বিজ্ঞানের উপর নির্ভর করিয়া তেমনি মাঝে মাঝে ঠকিতে হয়। অপূর্ণতা উভয়েরই আছে,—তবে মাত্রার ইতর-বিশেষ; আর উভয়ের মধ্যে প্রভেদ এই যে, তিনি হয়ত বৈজ্ঞানিককে উপহাস করেন, আর বৈজ্ঞানিক তাহাতে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া তাঁহাকে ও তাঁহার স্বজনকে মনুষ্যত্বের সোপানে ক্রমশঃ তুলিয়া দেন।

তরল পদার্থের চাপে ফিরিয়া আসা যাক্। তরল পদার্থের চাপ সর্ব্বতোমুখ; তবে তাহার পরিমাণ সর্ব্বত্র সমান নহে। যেখানে গভীরতা যত, সেখানে চাপ তত অধিক। কত অধিক, তাহা ত্রৈরাশিকের আঁক কষিয়া বাহির করা চলে, কেন না, এ ক্ষেত্রে প্রকৃতির তাহাই বিধান।

কতকগুলা চোঙায় বা পাত্রে জল ঢালিয়া যদি পরস্পর কোনরূপে যোগ করিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে সবগুলিতেই জলের পিঠ ঠিক্

সমান উচুতে থাকে; একটায় উচ্চতা কম, অন্যটায় বেশী হয় না। গড়গড়ার নলের দুই প্রান্ত দুই হাতে ধরিয়া ঝুলাইয়া তাহার একমুখে জল ঢালিলে দেখা যাইবে, দুই ধারের নলে জলের পিঠ ঠিক্ সমান উচ্চে আছে। একটা প্রান্ত উচুতে, অন্য প্রান্ত নীচে, ধরিয়া নলকে জলপূর্ণ করিলে দেখা যাইবে, নিম্নস্থ মুখ দিয়া ঊর্দ্ধমুখে জলের ফোয়ারা বাহির হইতেছে; জল ঊর্দ্ধমুখে উঠিয়া অন্যমুখের জলতলের সমোচ্চ হইবার চেষ্টা করিতেছে। যেখানে যত ফোয়ারা আছে—নৈসর্গিক বা কৃত্রিম—সকলেরই মূল এইখানে। নিকটা-নিকটি কতকগুলি পুষ্করিণী বা ইঁদারা থাকিলে, সকলগুলিরই জলের পিঠ সমান উচ্চ থাকে; গরমিকালে একটার জল যেমন নামে, অন্যগুলিতেও জল তেমনি নামিয়া যায়। এখানে বুঝিতে হইবে, সচ্ছিদ্র মৃত্তিকামধ্য দিয়া জলের সঞ্চরণ ঘটিতেছে; পুকুরে পুকুরে ও কূপে কূপে মাটির নীচে যোগ রহিয়াছে। বড় সহরের নিকট পাহাড় থাকিলে পাহাড়ের উপরে জল ধরিয়া সেই জল নলযোগে সহরের লোকের বাড়ী বাড়ী সরবরাহ করা হয়।

কোন ভারী জিনিস জলে ডুবাইলে তাহা লঘু বলিয়া বোধ হয়;—যেন তাহার ওজন কমিয়া যায়। তাহার অর্থ কি? সেই জিনিসের উপর চারিদিক্;—চারিদিক্ কেন দশদিক্—হইতে জলের চাপ পড়ে; আশ হইতে পাশ হইতে, নীচ হইতে উপর হইতে, চাপ পড়ে। আশপাশের জলের গভীরতা সমান, চাপও সমান; চাপে চাপে কাটাকাটি হইয়া যায়। কিন্তু উপরের জল জিনিসটাকে নীচে চাপে, নীচের জল উহাকে উপরে ঠেলে। উপরের জলে গভীরতা কম; চাপটাও কম, নীচে গভীরতা বেশী, ঠেলাটাও বেশী; মোটের উপর উপরের চাপ অপেক্ষা নীচের ঠেলা অধিক হওয়ায় নীচের ঠেলারই

প্রাবল্য ঘটে ; দশদিকের জল চক্রান্ত করিয়া জিনিসটাকে মোটের উপর উপর মুখেই ঠেলা দেয়। তার জন্য উহার ভার অর্থাৎ নিম্নে যাইবার প্রবৃত্তি যেন কমিয়া যায়। সকল জিনিসেরই নিজের একটা ভার বা ওজন আছে ; ইহার কথা পরে হইবে। এই ভারের দরুণ সকল জিনিসই নীচে নামিতে চায়। জল কিন্তু চায় ঠেলিয়া তুলিতে। ভার বেশী, ঠেলা কম হইলে জিনিস ডুবে ; ভার কম, ঠেলা বেশী হইলে জিনিস ভাসিয়া উঠে।

এক টুকরা শোলা হইতে একখানা প্রকাণ্ড জাহাজ পর্য্যন্ত জলে ভাসে। জলে ভাসিবার সময় জিনিসটার কিয়দংশ জলে ডুবিয়া থাকে, কিয়দংশ জলের উপর থাকে। নিমগ্ন অংশের পৃষ্ঠে আশপাশের জলের ও নীচের জলের চাপ পড়িতেছে। আশপাশের চাপ কাটাকাটি হইয়া যায়। নীচের জলের চাপ জিনিসটাকে উর্দ্ধমুখে ঠেলিয়া ধরিয়া থাকে। জিনিসটার ভার বা ওজন উহাকে নীচে নামাইবার চেষ্টা করিতেছে ; জলের উর্দ্ধমুখ চাপ উহাকে উপরে তুলিবার চেষ্টা করিতেছে ; এ ক্ষেত্রে যখন জিনিসটা স্থির আছে, নামিতেছে না, উঠিতেছেও না, তখন বুঝিতে হইবে, উহার ভারের পরিমাণ যত, জলের ঠেলার পরিমাণও ঠিক্ তত।

জিনিসটা ভাসিয়া আছে, উহার কিয়দংশ তখন জলে মগ্ন। খানিকটা জলকে স্বস্থান হইতে সরাইয়া জিনিসটার মগ্ন অংশ যেন সেই জলশূন্য জায়গাটুকু অধিকার করিয়া রহিয়াছে। এই মগ্ন অংশের আয়তন যত, যে জলটুকু অপসারিত হইয়াছে, স্থানচ্যুত হইয়াছে, তাহারও আয়তন তত। সেই জলটুকু যখন স্বস্থানে ছিল, তখন স্বস্থানে স্থির হইয়াই ছিল, উহার নিজের ভারে নিজে নিম্নগামী হইতে চাহিতেছিল, কিন্তু উহার নীচের জলের ঠেলা উহাকে নিম্নগামী হইতে

দিতেছিল না ; কাজেই উহা স্বস্থানেই স্থির ছিল। এখন সেই জল স্বস্থান হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছে। অন্য জিনিসের কিয়দংশ আসিয়া সেই জায়গাটুকু অধিকার করিয়াছে ও নীচের জলের ঠেলা পাইয়া সেই স্থানে স্থির আছে। জলে আগে জলকে ধরিয়া রাখিয়াছিল, এখন জলে সেই ভাসন্ত দ্রব্যটাকে ধরিয়া রাখিয়াছে। উভয়ত্র ঠেল সমান, অতএব উভয়ত্র ভারও সমান। যে জলটুকু স্থানচ্যুত হইয়াছে, তাহারও যে ভার যে ওজন, এখন যে জিনিস আসিয়া সেই জলের স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে, তাহারও সেই ভার সেই ওজন। নতুবা একের স্থান অন্যে পূরণ করিয়া এমনি স্থিরভাবে থাকিতে পারিত না।

এটুকু বিচারে পাওয়া যায়। জলের চাপ যে সর্ব্বতোমুখ, এই সিদ্ধান্তটুকু অবেক্ষণলব্ধ ও পরীক্ষণলব্ধ,—ইহা তর্কে বা বিচারে পাওয়া যায় না। জলের বেলায় প্রকৃতি ঠাকুরাণীর খেয়াল কেন এরূপ হইল, কেন অন্যরূপ হইল না, এ প্রশ্ন নিষ্ফল। প্রকৃতির যে বিধান প্রত্যক্ষ দেখা যাইতেছে, তাহাই ঘাড় পাতিয়া মানিয়া লইতে হইবে। কিন্তু এইটুকু মানিয়া লইলেই ভাসন্ত দ্রব্যের ওজন আর তৎকর্ত্তৃক অপসারিত জলটুকুর ওজন যে ঠিক্ সমান হইবে, ইহা বিচার দ্বারা আসিয়া পড়ে। আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি জোরের সহিত বলিবে, চারিদিক্ হইতে ঐরূপে চাপিয়া বা ঠেলিয়া ধরা যদি জলের স্বভাব হয়, তাহা হইলে ভাসন্ত দ্রব্যের ওজন স্থানচ্যুত জলের ওজনের সমান হইবেই হইবে। ইহা হওয়া উচিত ; ইহার অন্যথা হইলে মনুষ্যের বুদ্ধিবৃত্তির চালনা অসম্ভব হইত। বিচারের ফলে যে এই নূতন তথ্যটুকু পাওয়া যায়, ইহার যাথার্থ্যে যদি সংশয় উপস্থিত হয়, তবে আবার পরীক্ষা করিয়া, ভাসন্ত জিনিসটাকে নিক্তিতে ওজন করিয়া, আর অপসারিত জলটুকুকে নিক্তিতে ওজন করিয়া দেখিতে পার, উভয় ওজন ঠিক্ সমান কি না।

দেখিতে পাইবে, ঠিক্ সমান হইবে। যদি দেখ সমান নহে, তবে বুঝিতে হইবে, আমাদের বিচারপ্রণালীতে দোষ নাই, গোড়াতে যে পরীক্ষা-লব্ধ সত্যের উপর আমরা নির্ভর করিয়াছিলাম, জলের চাপ যে সর্ব্বতো-মুখ ভাবিয়াছিলাম,—গভীরতা বৃদ্ধিতে চাপের বৃদ্ধি হয়, এই যে তথ্য-নির্ণয় করিয়াছিলাম, সেই তথ্য-নির্ণয়ে ভুল আছে। অবেক্ষণেই ভুল ছিল, তাহাতেই বিচার-ফলেও এমন ভুল ঘটিল। গোড়ায় গলদ না থাকিলে এমন ভুল হইত না।

পরীক্ষালব্ধ তথ্যের উপর যুক্তি খাটাইয়া দেখা যায়, ভারী জিনিসকে জলে একবার ডুবাইয়া দিলে তাহার দশদিকের জলে চক্রান্ত করিয়া তাহাকে ঊর্দ্ধমুখে ঠেলিয়া ধরে, এই ঠেলাটাও ঠিক্ স্থানচ্যুত জলের ওজনের সমান হয়। জলমগ্ন দ্রব্যের ভারের যে লাঘব দেখা যায়, সেই লাঘবের পরিমাণও এইটুকু। অপসারিত জলের যে ওজন, মগ্ন দ্রব্যের ভার ঠিক্ ততটুকুই কমিয়া যায়। যে দ্রব্যের ওজন ছিল পাঁচ সেরের ওজন, মনে কর জলে ডুবাইলে তাহার ওজন তিন সের পরিমাণে কমিয়া গেল; জলে ডুবিবার পূর্ব্বে ছিল পাঁচ সের; জলে ডুবিয়া হইয়াছে দুই সের মাত্র। জলে ডুবিলে জিনিস এইরূপ হাল্‌কা হয়। গ্রীক-বৈজ্ঞানিক আর্কিমিদীস এই তথ্যের আবিষ্কার করিয়াছিলেন। গল্প আছে, এই তথ্য আবিষ্কার করিয়া তিনি আনন্দে নাচিয়া উঠিয়াছিলেন। শাস্ত্রেও বলে, বিজ্ঞানই আনন্দ।

অনিল

এখন অনিলে আসা যাক। অনিলের সর্ব্বজন-পরিচিত উদাহরণ বায়ু—যে বায়ুর সাগরে আমরা ডুবিয়া আছি। তরলে যে নমনীয়তা দেখিয়াছি, তাহা অনিলেও বর্ত্তমান; অনিলের নমনীয়তার সীমা

নাই বলিলেও চলে। বায়ুর কোনও নির্দ্দিষ্ট আকার নাই। বায়ুতে ছুরির দাগ লাগে না, বায়ুতে বেঞ্চি টেবিল তৈয়ার হয় না, বায়ুতে পুতুল গড়া চলে না। জলে যে তারল্য আছে, বায়ুতেও সেই তারল্য পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান। বায়ু যে পাত্রে রাখ, বায়ু সেই পাত্রের মধ্যে সেই আকারই গ্রহণ করিবে। কাজেই, বায়ুরও আকৃতিগত স্থিতি-স্থাপকতার একবারে অভাব। পরন্তু জলকে মুখখোলা পাত্রে রাখা চলে; বায়ুকে সেরূপেও রাখা চলে না। খোলা মুখ দিয়া বায়ু বাহির হইয়া আসে। জল তেমন বাহির হয় না। বোতলের অর্দ্ধেকটা জলে পূরিয়া বাকি অর্দ্ধেক জলহীন রাখিতে পারি; কিন্তু বোতলের অর্দ্ধেকে বায়ু পূরিয়া বাকি অর্দ্ধেক বায়ুহীন রাখা চলে না। বায়ু আপনাকে প্রসারিত করিয়া সমস্ত বোতলটাই আধিকার করিবে। এমন কি, উহাকে ছিপি দিয়া আটকাইয়া রাখিতে হইবে; নতুবা মুখ খোলা থাকিলে সেই মুখ দিয়া বাহির হইয়া আসিবে। সোডা-ওয়াটারের বোতলে ছিপি আঁটিয়া বায়বীয় পদার্থ আটকান থাকে; জলও আটকান থাকে। ছিপি খুলিবামাত্র সেই বায়বীয় পদার্থ বেগে বাহির হয়; কিন্তু জল বাহির হয় না। আমোনিয়ার শিশির ছিপি খুলিবামাত্র আমোনিয়ার তীব্র গন্ধে ঘর ভরিয়া যায়; আমোনিয়া নামক অনিল তখন বোতলে আটকান থাকে না।

দেখা গেল, তরলে আর অনিলে মিল আছে, আকৃতিগত স্থিতিস্থাপকতার অভাবে। আবার ভেদও আছে, কেন না, অনিল স্বতঃপ্রসরণশীল; তরল সেরূপ নহে। আয়তনগত স্থিতিস্থাপকতা তরলের আছে, প্রচুর মাত্রায় আছে; অনিলের আছে, কি নাই? ফাঁপা রবারের গদিতে বায়ু পূরিয়া তাহাকে চাপ দিয়া সঙ্কুচিত করা চলে; অল্প চাপেই অনেকটা সঙ্কোচ ঘটে; আবার চাপ তুলিয়া লইলে

পূর্ব্ব-আয়তন ফিরিয়া পায়। গাড়ির চাকার বেড়ে বায়ুর গদি আঁটিবার তাৎপর্য্য ইহাই। অতএব আয়তনগত স্থিতিস্থাপকতা আছে বৈ কি। তবে জলের মত অধিক নাই। কেন না, জলের যৎকিঞ্চিৎ সঙ্কোচনে প্রচুর আয়াস লাগে; বায়ুর অল্প আয়াসেই প্রচুর সঙ্কোচ ঘটে। অতএব আয়তনগত স্থিতিস্থাপকতা অনিলের আছে বৈ কি; তবে কঠিনের তুলনায় বা তরলের তুলনায় অনেক অল্প।

তরলে ও অনিলে এইরূপ মিল আছে দেখিয়া—উভয়ের মধ্যে এই সমানতা দেখিয়া—উহাদের একটা সাধারণ নাম দেওয়া যায়। ইংরেজিতে উভয়কেই বলে fluid। এই নাম উহাদের চাপল্যজ্ঞাপক। আমরা বাঙ্গালায় অনুবাদে চপল শব্দ ব্যবহার করি। তরল ও অনিল উভয়েরই চাপল্য আছে—উহারা **চপল**। তরলও চপল, অনিলও চপল। চাপল্য কাঠিন্যের উল্‌টা।

অনিলের চাপ

দেখা গেল, তরলে অনিলে কতকটা ভেদ, অনেকটা মিল। আরও একটা মিল আছে। বায়ুরও চাপ আছে। যে জিনিস বায়ুতে নিমগ্ন থাকে, তাহার আশে পাশে উপরে নীচে বায়ুর চাপ পড়ে। একটা বাক্সে বা বোতলে বায়ু পূরিলে সেই বাক্সের বা বোতলের গায়ে চাপ পড়ে; যেখানেই ফুটা কর না, বায়ু বাহির হইয়া আসিবে। বায়ুর চাপও জলের চাপের মত সর্ব্বতোমুখ; কাজেই জলে কোন জিনিস মগ্ন করিলে তাহা যেমন লঘু বা হাল্‌কা বোধ হয়, বায়ুতে নিমগ্ন দ্রব্যও তেমনি কতকটা হাল্‌কা হওয়া উচিত। বাস্তবিকও তাই; বায়ুশূন্য প্রদেশে ওজন করিয়া দেখা গিয়াছে, জিনিসের ওজন যেন একটু বেশী হয়। যে বায়ুটুকু অপসৃত হয় বা স্থানচ্যুত হয়, তাহার ওজন যতটুকু,

বায়ুমগ্ন দ্রব্যের ওজন ঠিক্ ততটুকুই কমিয়া যায়। হঠাৎ আমরা তাহা বুঝিতে পারি না, কেন না বায়ু নিজেই অতি হাল্কা। তবে তদ্রূপ হাল্কা জিনিস বায়ুমধ্যে উপস্থিত হইলে তখন বায়ুর চাপের ফল ধরা পড়ে। বায়ুমগ্ন দ্রব্যের ওজন স্থানচ্যুত বায়ুর ওজনের চেয়ে কম হইলে বায়ুর ঠেলে উহা উর্দ্ধগামী হয়। যেমন বেলুন বা ব্যোমযান। উহাতে একটা বৃহৎ ব্যাগের ভিতর এক রকম অতি হাল্কা অনিল পোরা থাকে; ঐ অনিলের ওজন এত কম যে, ব্যাগের ওজন সমেত উহার ওজন স্থানচ্যুত বায়ুর ওজনের চেয়েও কম হয়। কাজেই উহা বায়ুর ঠেলে উপরে উঠিতে চেষ্টা করে।

জলের চাপ জলের গভীরতাসাপেক্ষ। সমুদ্রের জল স্থানে স্থানে চারি পাঁচ মাইল গভীর। সমুদ্রের তলের উপর সেই চারি পাঁচ মাইল খাড়াই জলের চাপ পড়ে। ভূপৃষ্ঠের উপর বায়ুর সাগর আছে; কতদূর উর্দ্ধ পর্য্যন্ত আছে, বলা কঠিন। অন্ততঃ ৫০।৬০ মাইল পর্য্যন্ত ত আছেই। বায়ু খুব লঘু হইলেও, এতটা গভীর বায়ুসাগরে যখন আমরা ডুবিয়া আছি, তখন সেই ভার টের পাই না কেন? টের পাই না বলিয়া চাপ যে নাই, এমন হইতে পারে না। আশে পাশে, উপরে নীচে, ভিতরে বাহিরে, চাপ পড়ায় চাপের অধিকাংশ কাটা-কাটিতেই যায়। স্নানের সময় গভীর জলে ডুবিলেও আমরা জলের চাপ বুঝিতে পারি না; বরং মনে হয়, জল উপর মুখে ঠেলিয়া তুলিয়া ভাসাইবার চেষ্টাই করিতেছে। এক পাশ হইতে বা একদিক্ হইতে বায়ু সরাইতে পারিলে, তখন অন্য দিকের বায়ুর চাপ বেশ বোঝা যায়। একটা গেলাসের বা বাটির মুখ নিজের মুখের উপর লাগাইয়া উহার ভিতরের বায়ু চুষিয়া লইলেই চাপের পরিচয় পাওয়া যাইবে। বাহিরের বায়ুর চাপে গেলাসটা বাটিটা গালে আঁকড়াইয়া ধরিবে। তখন ছাড়াইতে

জোর লাগিবে। চামড়ার বা রবারের ফাঁপা গোলার ভিতরে বায়ু এরূপে বাহির করিয়া লইলে বাহিরের বায়ুর চাপে ঐ খোলা চুপসিয়া যায়। একটা পিচকারির মুখ জলে ডুবাইয়া উহার কাঠিটা যখন টানিয়া তোলা যায়, তখন পিচকারির ভিতরে জল উঠে। পিচকারি এইরূপ জল টানিবার জন্যই ব্যবহৃত হয়। জল ঐরূপে আপনার পিঠের সীমা ছাড়াইয়া উপরে উঠে কেন? বাহিরের জলের পিঠের উপর বায়ুসাগরের চাপ পড়িতেছে। পিচকারির ভিতরে বায়ু থাকিলে, সেই বায়ুরও চাপ থাকিবে; জল উঠিবে না; ভিতরে যদি বায়ু না থাকে, কাঠিটা—পিচকারির অর্গলটা—টানিয়া তুলিলে ভিতরটা একেবারে খালি পড়িয়া যায়—সেখানে বায়ু থাকে না;—তখন বাহিরের বায়ুর চাপে জল পিচকারির ভিতর উঠিতে থাকে। ফোয়ারাতে যে কারণে জল উঠে, কতকটা সেইরূপ। সেখানে একদিকের জলের চাপে অন্যদিকে জল উঠে; এখানে বাহিরের বায়ুর চাপে ভিতরে জল উঠে। জল কতদূর উঠে? প্রচলিত বাঁশের বা টিনের পিচকারি,—যাহা লইয়া ছেলেরা হোলির উৎসবে খেলা করে—তাহা এক হাত দেড় হাত লম্বা হয়; উহার সমস্তটাই জল তুলিয়া জলপূর্ণ করা যায়। যদি পিচকারি বিশ হাত কি ত্রিশ হাত লম্বা করা যায়, তাহা হইলেও কি সমস্তটা জলপূর্ণ হইবে? এইরূপ বৃহৎ পিচকারি তৈয়ার করিয়া পরীক্ষা হইয়াছে। কূপের ভিতর হইতে, খনির ভিতর হইতে, জল তুলিবার জন্য ঐরূপ বৃহৎ পিচকারির—খেলার জন্য নয়, কাজের জন্য—ব্যবহার আছে। এইরূপ বড় পিচকারির নাম বোমা-কল—ইংরেজিতে বলে পম্প। দেখা গিয়াছে, ঐরূপ বৃহৎ পিচকারির দ্বারা বাইশ হাত উচ্চ পর্য্যন্ত জল তুলিতে পারা যায়, তাহার ঊর্দ্ধে কিছুতেই জল উঠে না। পিচকারিতে জল উঠে, বাহিরের বায়ুর

চাপে ; সেই চাপে যতটুকু উঠা উচিত, ঠিক ততটুকু উঠিবে ; তাহার অধিক উঠিবে না। পিচকারির ভিতরে প্রত্যেক বর্গ ইঞ্চির উপর বায়ুর যতটুকু চাপ, পিচকারির ভিতরে প্রত্যেক বর্গ ইঞ্চির উপর ঠিক্ ততটুকু ওজনের জল ঠেলিয়া তুলে। বাইশ হাত পর্য্যন্ত জল উঠিলে ঐ জলের চাপ ঠিক্ বাহিরের বায়ুর চাপের সমান হয়। তাই জল বাইশ হাত পর্য্যন্ত উঠে আর উঠে না। বাইশ হাত উচু জলের ওজন কত? একবর্গ ইঞ্চি ফুকর, আর বাইশ হাত লম্বা নল জলপূর্ণ করিয়া সেই জলের ওজন করিলে ওজন প্রায় সাড়ে সাত সের হয়। অতএব প্রত্যেক বর্গ ইঞ্চি জমির উপর সাড়ে সাত সের ওজনের বায়ু চাপ দিতেছে।

মিথ্যা নহে। প্রতি বর্গ ইঞ্চি জমির উপর, এমন কি, আমাদের দেহের প্রতি বর্গ ইঞ্চির উপর বায়ুর চাপ সাড়ে সাত সের ওজনের সমান। পিচকারি দিয়া জলের বদলে পারা টানিয়া দেখা যায়, জল উঠে বাইশ হাত, কিন্তু পারা উঠে ত্রিশ ইঞ্চি মাত্র ; অর্থাৎ দেড় হাতের কিছু বেশী। পারা জলের চেয়ে সাড়ে তের গুণ গুরুভার। কাজেই যে চাপে বাইশ হাত অর্থাৎ তেত্রিশ ফুট জলকে ঠেলিয়া তুলে, তাহাতে পারাকে ত্রিশ ইঞ্চির অধিক ঠেলিয়া তুলিতে পারে না।

উচু পাহাড়ের উপর চড়িয়া দেখা গিয়াছে, সেখানে পারা ত্রিশ ইঞ্চিও উঠে না। তাহার তাৎপর্য্য এই, সেখানে বায়ুর চাপ কিছু কম। তা হইবেই ত! চাপ গভীরতাসাপেক্ষ। ভূপৃষ্ঠে বায়ুসাগরের যে গভীরতা, উচু পর্ব্বতে গভীরতা তার চেয়ে অল্প।

একটা কাচের এক-মুখ-খোলা নল,—ধর, চল্লিশ ইঞ্চি লম্বা নল—পারায় পূর্ণ করিয়া তার মুখ পারার পাত্রে ডুবাইয়া নলটাকে খাড়া করিয়া ধরিলে নলের খানিকটা পারা বাহির হইয়া আসে, সবটা

ভিতরে থাকে না। যেটুকু নলের ভিতরে থাকে, তাহার খাড়াই হয় ত্রিশ ইঞ্চি; তার উপরে দশ ইঞ্চি ফাঁক থাকে; উহা প্রায় শূন্য থাকে; সেখানে বায়ুও থাকে না; পারাও থাকে না, অন্ততঃ তরল পারদ থাকে না। ঐ নলকে পাহাড়ের উপরে বা বেলুনে লইয়া আরও ঊর্দ্ধে গেলে দেখিবে যে, পারা ত্রিশ ইঞ্চিও দাঁড়াইল না; আর একটু নামিয়া আসিল। ঐরূপ নলের ভিতর পারার খাড়াই দেখিয়া বায়ুর চাপ কোথায় কত, তাহা নির্ণয় হয়। উহাকে **বায়ুমান** যন্ত্র বলা যায়, ইংরেজি নাম বারোমিটার। ঘরের ভিতরে বায়ু আছে, খোলা উঠানেও বায়ু আছে। উঠানের বায়ুর যে চাপ, ঘরের ভিতরের বায়ুরও সেই চাপ। ছাদের ব্যবধান আছে বলিয়া মনে করিও না যে, ঘরের মেজের উপর যখন বায়ুসাগর নাই, তখন বায়ুর চাপ অল্প। তরল আর অনিলের ধর্ম্মই এই যে, যেখানে চাপ অধিক, সেখান হইতে, যেখানে চাপ অল্প, সেখানে উহা সঞ্চরণ করে; ইহাতেই স্রোত জন্মে, প্রবাহ জন্মে। অবশ্য সঞ্চরণের পথ থাকা চাই। পথ থাকিলে চাপের একটু ন্যূনাধিক্যই যথেষ্ট; তরল আর অনিল উভয়ই প্রবাহিত হইয়া, যেখানে অধিক চাপ, সেখান হইতে, যেখানে অল্প চাপ, সেখানে প্রবাহিত হইয়া, দুই জায়গার চাপ সমান করিয়া লয়। উহাদের নমনীয়তা, উহাদের চাপল্যই, ইহার কারণ। উঠানের বায়ুর সঙ্গে যখন ঘরের বায়ুর যোগ আছে, তখন উভয়ত্রই বায়ুর চাপ সমান। উঠানে চাপ অধিক হইলে উঠানের বায়ু ঘরে ঢুকিয়া চাপ সমান করিয়া লয়। ঘরে অধিক হইলে ঘরের বায়ু উঠানে চলিয়া চাপ সমান করিয়া লয়। কাজেই ঘরে বাহিরে শেষ পর্য্যন্ত চাপ সমানই হয়।

চাপের এইরূপ ইতরবিশেষেই বায়ুমধ্যে প্রবাহ জন্মে। কখনও কোন কারণে কোনও দেশের বায়ুর চাপ কমিয়া গেলে অন্য দেশের

বায়ু তৎক্ষণাৎ সেই দেশে বেগে চলিয়া আসে। তখন হাওয়া বহে। চাপের মাত্রাভেদ অধিক হইলে হাওয়ার বেগও অধিক হয়,—হাওয়া তখন ঝড়ে দাঁড়ায়। বায়ুর চাপ নানাকারণে কমে, কখন কতটুকু কমে, তাহা পূর্ব্বোক্ত বায়ুমান যন্ত্রে জানা যায়। চাপ অধিক কমিলে ঝড়ের পূর্ব্ব লক্ষণ বুঝিতে হইবে।

দেখা গেল ঘরের ভিতরে বায়ুরও চাপ আছে; বাহিরেও যত, ভিতরেও তত। ঘরের জানালা দরজা নিফাঁক করিয়া বন্ধ করিয়া দিলেও যে বায়ু ঘরের মধ্যে বদ্ধ থাকিল, তার সেই চাপই বজায় থাকে। পথ রুদ্ধ হইবামাত্র চাপ বাড়ে না বা কমে না।

একটা বোতল যেন একটা ছোট ঘর। উহার ভিতরে যে বায়ু আছে, তাহারও চাপ বাহিরের চাপের সমান। ঐ বোতল যদি ছিপি দিয়া বন্ধ করি, তাহা হইলেও ভিতরে যে বায়ু আটকান থাকিল, তাহার চাপ সেই বাহিরের বায়ুর সমান থাকিল। নতুবা বোতল খুলিলেই হুস করিয়া খানিকটা হাওয়া চলাচল করিবে। তাহা ত হয় না। বাক্সের ভিতরে, দোয়াতের ভিতরে, যেখানে যত রন্ধ্র আছে, সকল রন্ধ্রেই বায়ু আছে; যেখানেই থাকুক, উহার চাপ সেই বাহিরের বায়ুর সমান, প্রতি বর্গ ইঞ্চির উপর সাড়ে সাত সেরের ওজন।

পিচকারির কাঠি অর্থাৎ অর্গল টানিলে পিচকারির ছিদ্র দিয়া বায়ু প্রবেশ করিবে। যে বায়ু প্রবেশ করিল, তাহার চাপও সেই বাহিরের চাপের সমান। ছিদ্র আঙ্গুল দিয়া বন্ধ কর, তখনও ভিতরে বদ্ধ বায়ুটুকুর সেই চাপ থাকিয়া গেল।

তখনও সেই চাপ থাকিল বটে, কিন্তু ছিদ্র রুদ্ধ রাখিয়া যদি অর্গলটি নাড়া যায়, তখন আর সে চাপ থাকিবে না। এখন অর্গলটি

ঠেলিলে ভিতরের বায়ু সঙ্কুচিত হইবে। সঙ্কোচনে প্রয়াস লাগিবে; কেন না, বায়ুর আয়তনগত স্থিতিস্থাপকতা আছে। যতই ঠেলিবে, ততই সঙ্কোচন ঘটিবে; অর্থাৎ বদ্ধ বায়ুর আয়তন কমিয়া যাইবে। আয়তন যত কমিবে, উহার চাপও তত বাড়িবে। পিচকারিকে ধরিয়া টানিতে যে জোর দিতে হইতেছে, তাহাতেই কতকটা বুঝিবে যে, ভিতরে বায়ুর সঙ্কোচনের সহিত চাপের মাত্রা বাড়িতেছে। এখন যদি ছিদ্র হইতে আঙ্গুল সরাইয়া লই, অমনি ভিতরের বদ্ধ বায়ু—যার চাপ এখন বাহিরের বায়ুর চেয়ে বেশী হইয়াছে, ঐ বদ্ধ বায়ু—খানিকটা হুস্ করিয়া বাহিরে আসিবে। ক্ষণেকের জন্য একটা হাওয়ার সৃষ্টি হইবে; একটু পরেই ভিতরে বাহিরে চাপ আবার সমান হইবে।

ছিদ্র বন্ধ করিয়া অর্গল ঠেলিলে বদ্ধ বায়ুর সঙ্কোচ ঘটে এবং চাপ বাড়ে, আর অর্গল টানিলে আয়তন বাড়িয়া প্রসারণ ঘটে, তখন চাপ কমে। চাপ যখন কমিয়াছে, তখন ছিদ্র খুলিয়া দিলে বাহিরের বায়ু ভিতরে প্রবেশ করিয়া চাপ সমান করিয়া লইবে।

আয়তন-বৃদ্ধিতে চাপের হ্রাস, আয়তন-হ্রাসে চাপের বৃদ্ধি। কতটা বৃদ্ধিতে কতটা হ্রাস? বিনা পরীক্ষায় বলা চলে না। তর্কে চলিবে না। প্রকৃতির বাজার যাচাই করা চাই। মাপিয়া দেখিতে হইবে, কতটা সঙ্কোচে চাপের কতটা হ্রাস ঘটে। রবার্ট বয়েল মাপিয়াছিলেন। তিনি দেখিয়াছিলেন, প্রকৃতির খেয়াল অদ্ভুত; হিসাব খুব সহজ। আয়তন অর্দ্ধেক কমিলে চাপ হয় দ্বিগুণ; আয়তন তিন ভাগ হইলে চাপ হয় তিন গুণ। আয়তন যে হারে কমে, চাপও ঠিক্ সেই হারে বাড়ে। রবার্ট বয়েল ইংরেজ; তিনি প্রায় আড়াই শত বৎসর আগে বর্ত্তমান ছিলেন।

বায়ুর এই ধর্ম্ম প্রায় অনিলমাত্রেই বর্ত্তমান। কিন্তু এই ধর্ম্ম তরলে নাই। চাপের বৃদ্ধিতে জলের আয়তনেও সঙ্কোচ ঘটে, কিন্তু যৎসামান্য। জলের আয়তন কমাইয়া অর্দ্ধেক করিতে হইলে, এক বোতল জলকে চাপিয়া আধ বোতল করিতে হইলে, ভীষণ চাপ দিতে হইবে; তত চাপ দেওয়া এখন মানুষের সাধ্য নহে। আয়তন-গত স্থিতিস্থাপকতা অনিলেরও আছে; তবে জলের তুলনায় নিতান্ত অল্প, কেননা জলের সঙ্কোচনে যে প্রয়াস আবশ্যক, বায়ুর সঙ্কোচনে তাহার তুলনায় যৎসামান্য প্রয়াস লাগে।

জড়পদার্থের তিন অবস্থা—কঠিন, তরল, অনিল। তিন অবস্থার কি কি লক্ষণ, দেখা গেল। আর একবার আওড়ান ভাল।

কঠিনের নির্দ্দিষ্ট আয়তন ও নির্দ্দিষ্ট আকৃতি থাকে। চাপিলে আয়তন কমে, আর মোচড়াইলে আকৃতি বদলায়। কিন্তু উভয়ই আয়াসসাধ্য। স্বভাবের বিকার ঘটে, তবে বিকারের হেতু অপসৃত হইলে স্বভাবে ফিরিয়া আইসে। ইহাই স্থিতিস্থাপকতা। কঠিনের আয়তনগত ও আকৃতিগত উভয়বিধ স্থিতিস্থাপকতা প্রচুর। আকৃতিগত স্থিতিস্থাপকতার দৌড় সকল জিনিসের সমান নহে। রবারের দৌড় খুব বেশী; কাঠ পাথরের কম। রবারের দৌড় বেশী; কিন্তু মাত্রা কম; কেননা রবার সহজেই চেপ্‌টা হয়, টানা যায়। কাঠ পাথর ধাতুর দৌড় কম; সীমার মধ্যে আকৃতি বদলাইলে স্বভাবে ফিরিয়া আসিতে পারে। কিন্তু সীমা ছাড়িয়া গেলে ফিরে না। তখন কাচ বা পাথর ভাঙ্গিয়া যায়; উহারা ভঙ্গপ্রবণ। কিন্তু ধাতু নোয়াইয়া যায়। যত সময় যায় ততই নোয়ায় বেশী। নোয়ায় বলিয়াই ধাতু ঘাতসহ, কাচের মত ভঙ্গপ্রবণ নহে। কিন্তু ধাতুর এই নমনীয়তা উহার কাঠিন্যের লক্ষণ নহে। কঠিন পদার্থেও

কিঞ্চিৎ তারল্য একাধারে বর্ত্তমান থাকিতে পারে, ইহা তাহারই লক্ষণ।

তরলের ও অনিলের নির্দ্দিষ্ট একটা আয়তন আছে বটে; কিন্তু আকৃতির বাঁধাবাঁধি নাই। আকৃতি বদলাইয়াই আছে। বিনা আয়াসেই বদলায়। কাজেই আকৃতিগত স্থিতিস্থাপকতা দুয়েরই নাই। এই জন্যই এত সহজে জলে আর বায়ুতে স্রোত বহে, প্রবাহ জন্মে। এইজন্য উভয়কেই চপল বলা যাইতে পারে। আয়তনগত স্থিতিস্থাপকতা দুয়েরই আছে; তরলের অনেক বেশী, কঠিনের সহিত তুলনীয়; অনিলের অনেক কম। বোতলের ভিতর খানিকটা অংশ জলে পূর্ণ করা চলে; কিন্তু খানিকটা অংশ বায়ুতে পোরা চলে না। অনিল প্রসারিত হইয়া সমস্ত বোতলে ব্যাপ্ত হইয়া যায়।

তরল ও অনিল উভয়েই চাপ দেয়; সেই চাপ আবার সর্ব্বতোমুখ। চাপের পরিমাণ গভীরতাসাপেক্ষ; উভয়েরই ভার আছে বলিয়া গভীরতাসাপেক্ষ। দুই স্থানে চাপের সামান্য ইতরবিশেষ হইলেই প্রবাহ ছুটিয়া চাপ সমান করিয়া লয়। কোনও দ্রব্য তরলে বা অনিলে ডুবাইলে উপর নীচের ও চারিপাশের চাপে উহাকে ঠেলিয়া তুলিবার চেষ্টা করে; উহার ভার একটু কমাইয়া দেয়। মগ্ন দ্রব্যের নিজের ভার তৎকর্ত্তৃক অপসারিত তরলের বা অনিলের ভারের চেয়ে কম হইলে সকল দিক হইতে ঠেলা পাইয়া সেই মগ্ন দ্রব্য উপরে ভাসিয়া উঠিতে চায়। তরলের চাপ বাড়াইলে সঙ্কোচন ঘটে, কিন্তু অল্প সঙ্কোচনে প্রচুর চাপ লাগে। কিন্তু অনিলের চাপ দ্বিগুণ করিলেই আয়তন একবারে অর্দ্ধেক হইয়া যায়; চাপ দশগুণ করিলে আয়তন একবারে কমিয়া দশভাগের একভাগ হয়। চাপ যে হারে বাড়ে, আয়তনও সেই হারে কমিয়া যায়। ইহা পরীক্ষিত সত্য।

ভার

ভার বা ওজন শব্দটা পুনঃপুনঃ ব্যবহার করিয়াছি। উহার অর্থ-বিচার আবশ্যক। কঠিন, তরল, অনিল, ত্রিবিধ জড়েরই ভার আছে। অনিলের ভারও বায়ুশূন্য স্থানে নিকৃতিতে ধরা পড়ে। এই ভার ব্যাপারটা কি?

পাঁচসের বাটখারা হাতে ধরিয়া রাখিতে ক্লেশ হয়; আমরা বলি, উহা খুব ভারী; ছাড়িয়া দিলেই ইহা ভূপতিত হয়; পতন-নিবারণের জন্য উহা ধরিয়া রাখিতে হয়; তাহাতে মাংসপেশী পিষ্ট ও পীড়িত হয়, রক্তসঞ্চালনে ব্যাঘাত ঘটে, স্নায়ুযন্ত্র আহত হইয়া ক্লেশের অনুভূতি হয়। ঐ ক্লেশের মাত্রা দেখিয়া আমরা মোটামুটি ভারের পরিমাণ করি। কিন্তু ঐ ক্লেশের অনুভূতির উপর নির্ভর করা চলে না; ক্লেশ মানসিক বেদনামাত্র; উহার মাত্রাপরিমাণের কোন উপায় নাই; কাজেই কেবল হাতে ধরিয়া কোন্ জিনিসের ভার কত, আন্দাজ প্রায়ই ঠিক হয় না। ভার মাপিবার অন্য সূক্ষ্ম উপায় বাহির করিতে হইবে।

ভারী দ্রব্যমাত্রই ছাড়িয়া দিলে ভূপতিত হয়, ভূ-পতন নিবারণের জন্যই পূর্ব্বোক্ত ক্লেশ। সকল দ্রব্যই মাটিতে পড়ে। তূলার মত, কাগজের মত, ধূলার মত দ্রব্যের ভূপতনে বিলম্ব ঘটে; বায়ু ভূপতনে বাধা দেয় বলিয়া বিলম্ব ঘটে। বায়ুর ঠেলে বেলুনের মত হাল্‌কা দ্রব্য নিম্নগামী না হইয়া ঊর্দ্ধগামী হয়। কিন্তু বায়ুশূন্য স্থানে পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে, এমন দ্রব্য নাই, যাহা ভূপতিত হয় না।

উচু ছাদ হইতে পাথর ফেলিলে দেখা যায়, পাথরখানা ভূমিতে পড়ে। কত সময়ে কতটা পড়ে, মাপিয়া না দেখিলে বিজ্ঞান সন্তুষ্ট হয় না। মাটিতে পড়ে, এই জ্ঞান ত সকলেরই আছে,—ইহা সাধারণ

জ্ঞান; কত সময়ে কতটা পড়ে, এই বিশিষ্ট জ্ঞানই বিজ্ঞান। ঘড়ি ধরিয়া মাপকাঠি লইয়া মাপিয়া দেখিতে হইবে। এই প্রশ্নের উত্তর বুদ্ধিবলে বাহির হইবে না। এখানে প্রকৃতির খেয়াল কিরূপ, তাহা পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা জানিতে হইবে। ঘড়ি ধরিয়া মাপকাঠি লইয়া মাপিয়া দেখা হইয়াছে, প্রথম সেকেণ্ডে পড়ে প্রায় ১৬ ফুট, দ্বিতীয় সেকেণ্ডে ৪৮ ফুট, তৃতীয় সেকেণ্ডে ৮০ ফুট, চতুর্থ সেকেণ্ডে ১১২ ফুট। প্রকৃতির কি অদ্ভুত খেয়াল! বরাবর সমান বেগে নামে না; প্রথমটা ধীরে নামে; ক্রমশঃ দ্রুত নামে; বেগ ক্রমে বাড়িয়া যায়। কত সময়ে কতটা পথ চলে, তাহা দেখিয়া আমরা বেগের নিরূপণ করি। যে ঘণ্টায় এক মাইল হাঁটে, তাহার বেগ কম; যে ঘণ্টায় দুই মাইল হাঁটে, তাহার বেগ দ্বিগুণ। পতন্ত দ্রব্যের বেগ কত বাড়ে? পতন্ত দ্রব্য প্রথম সেকেণ্ডে পড়ে ১৬ ফুট, দ্বিতীয় সেকেণ্ডে ৪৮ ফুট, তৃতীয় সেকেণ্ডে ৮০ ফুট বেগ। বাড়িল কি হিসাবে? ১৬+৩২=৪৮, ৪৮+৩২=৮০, ৮০+৩২=১১২! কি অদ্ভুত ব্যাপার; বেগের বৃদ্ধি প্রতি সেকেণ্ডেই সমান, এক এক সেকেণ্ডে ৩২ ফুট করিয়া।

প্রকৃতির খেয়াল এইরূপ কেন হইল? ইহার কোনও উত্তর নাই। বেগ কেন বাড়ে? উত্তর নাই। কেন সেকেণ্ডে ৩২ ফুট হিসাবে বাড়ে, ৪০ ফুট বা ২৫ ফুট হিসাবে বাড়ে না? উত্তর নাই। প্রকৃতির খেয়ালই ঐরূপ। দেখিতেছি যে বাড়ে এবং ঐ হিসাবে বাড়ে। যাহা প্রত্যক্ষ দেখিতেছি, তাহাই মানিয়া লইতে হইবে। প্রকৃতির যাহা খেয়াল, যাহা বিধির বিধান, তাহাই মানিতে হইবে। যদি না বাড়িত, তাহাই মানিতে হইত। যদি সেকেণ্ডে ৩২ ফুট হিসাবে না বাড়িয়া সেকেণ্ডে ৩২০০ ফুট হিসাবে বাড়িত, তাহাই মানিতে হইত। প্রকৃতির খেয়ালের উপর আমাদের কোনও প্রভুত্ব নাই।

প্রকৃতির খেয়ালই বল, আর বিধির বিধানই বল, উহার উপর আমাদের কোন হাত নাই। কেন এমন হইল, এই প্রশ্ন নিরর্থক। এই বিধান উচিত হইয়াছে বা উচিত হয় নাই, এইরূপ তর্কেরও কোন অবসর নাই। এইরূপ না হইয়া অন্যরূপ হওয়া উচিত ছিল, এরূপ আক্ষেপও নিষ্ফল। যাহা বিধান, তাহা প্রত্যক্ষ-গোচর, অবেক্ষণ ও পরীক্ষণ দ্বারা তাহা সাবধানে আবিষ্কার করিয়া লইতে হইবে। ঘড়ি ধরিয়া সাবধানে মাপিয়া অবেক্ষণ দ্বারা আমরা জানিয়াছি যে, এ ক্ষেত্রে এইরূপ বিধান। যতদিন লোক ঘড়ি ধরিয়া মাপিবার চেষ্টা করে নাই, ততদিন লোকে জানিত না যে, এইরূপ অদ্ভুত একটা বিধান আছে। আম জাম নারিকেল সকল দ্রব্যই বোঁটা ছিঁড়িলে ভূপতিত হয়, সকলেই চিরকাল তাহা দেখিতেছে, কিন্তু উহার পতনের বেগ যে ঐ হিসাবে বাড়িয়া যায়, তাহা কেহ জানিত না। এখনও কয়জন লোকে জানে? বায়ুশূন্য স্থানে সকল দ্রব্যই—সোণার গিনি হইতে হাল্‌কা তূলা পর্য্যন্ত সকল দ্রব্যই—ঠিক ঐরূপে ঐ হিসাবে বেগ বাড়িতে বাড়িতে ভূপতিত হয়, তাহাও এককালে কেহ জানিত না। এখনও কয়জনে জানে?

প্রাকৃতিক নিয়ম

এখন আমরা জানিয়াছি, সকল দ্রব্যই ঠিক ঐরূপ বর্দ্ধমান বেগে নিম্নগামী হয়, অর্থাৎ ঊর্দ্ধ হইতে নিম্নে নামে। যে পথে যে রেখা ধরিয়া নামে, ঐ রেখাকে বাড়াইলে পৃথিবীর কেন্দ্র স্পর্শ করিবে। বর্ত্তুলাকার পৃথিবীর মাঝে যে কেন্দ্র আছে, সেই কেন্দ্র স্পর্শ করিবে। অতএব বলা যাইতে পারে, আম জাম নারিকেল গাছ হইতে পড়িবার সময় পৃথিবীর কেন্দ্র অভিমুখে পতিত হয়। উহাদের গতি ভূকেন্দ্রের অভিমুখ। উহারা—উহারা কেন,—যাবতীয় জড়দ্রব্য ভূকেন্দ্রের

অভিমুখে পতিত হয় এবং পড়িবার সময় সকল দ্রব্যেরই বেগ সেকেণ্ডে ৩২ ফুট হিসাবে বাড়িয়া যায়। ইহাই বিজ্ঞান। এইরূপ অবেক্ষণলব্ধ তথ্যকে বলা হয় **প্রাকৃতিক নিয়ম**। যেন প্রকৃতি ঠাকুরাণী একটা নিয়ম বাঁধিয়া আইন গড়িয়া দিয়াছেন, সকল দ্রব্যকেই ঐরূপে ভূকেন্দ্রাভিমুখে নামিতে হইবে। কাজেই, উহারা ঐরূপ বিধানমতে বা নিয়মমতে নামিতে বাধ্য। অবশ্য, তিনি ঐরূপ আইন কেন করিলেন, কেন অন্যরূপ করিলেন না, এ প্রশ্নের উত্তর নাই; অথবা এ প্রশ্নের একমাত্র উত্তর—ইহা তাঁহার খেয়াল।

ইহা বেশ কাব্য। এক জন প্রকৃতি দেবী বা বিশ্বদেবতা কল্পনা করিয়া, তিনি নিজের খেয়ালমতে আইন গড়িতেছেন ও নিয়ম পাকাই-তেছেন ও আমকে জামকে নারিকেলকে সেই নিয়মে বাধ্য করিতেছেন ইহা বেশ কবিকল্পনা। এইরূপ কাব্যে অনেকের তৃপ্তি ঘটিতে পারে ও ঘটিয়াও থাকে; কিন্তু ইহাতে জ্ঞানের বৃদ্ধি কিছুই হয় না। কেন না ইহার স্বপক্ষে বা বিপক্ষে বলিবার কিছুই নাই। আম জাম নারিকেল আপনারাই পরামর্শ করিয়া ঐরূপ নিয়মে পড়িতেছে, বা অন্য কাহারও প্ররোচনায় অন্যের স্থাপিত নিয়মে বাধ্য হইয়া ঐ হিসাবে ভূকেন্দ্রমুখে পড়িতেছে, তাহা আমরা জানি না। অতএব এই প্রত্যক্ষগোচর অবেক্ষণলব্ধ বা পরীক্ষণলব্ধ প্রাকৃতিক নিয়মগুলিকে প্রকৃতির খেয়ালই বল, আর বিধির বিধানই বল, তাহাতে বিশেষ কিছু জ্ঞান বৃদ্ধি হয় না। আমরা যাহা দেখিতেছি যাহারই বিধান হউক, ঘাড় পাতিয়া তাহাই মানিব। যদি অন্যরূপ দেখিতে পাইতাম, তাহাই মানিতাম।

বৈজ্ঞানিকেরা পর্য্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণ দ্বারা এইরূপ নানাবিধ প্রাকৃতিক নিয়মের আবিষ্কার করিয়াছেন। তরলের ও অনিলের চাপ

সর্ব্বতোমুখ, ইহা প্রাকৃতিক নিয়ম—তরল ও অনিল পদার্থমাত্রের পক্ষে ইহা দেখা যায়। অনিলের চাপ যে হারে বাড়ানো যায়, অনিলের আয়তন সেই হারে কমে, ইহাও প্রাকৃতিক নিয়ম—অনিলমাত্রই এই নিয়মে সঙ্কুচিত হয়। এ সমস্তই প্রাকৃতিক নিয়ম—সমস্তই অবেক্ষণলব্ধ সত্য। যদি অবেক্ষণে অন্য নিয়ম দেখা যাইত, তাহাই প্রাকৃতিক নিয়ম হইত। যদি কোনও একটা অনিল ঐরূপ নিয়মে সঙ্কুচিত না হইয়া অন্যরূপে সঙ্কুচিত হইত, তাহা হইলে তাহার পক্ষে তাহাই প্রাকৃতিক নিয়ম হইত।

দেখা যায়, অনিলমাত্রেরই সঙ্কোচনে এক নিয়ম; বায়ুই বল, আর সোডাওয়াটারের অনিলই বল, আর আমোনিয়া অনিলই বল, সকল অনিলের সঙ্কোচনে একই নিয়ম। কিন্তু তরল পদার্থের বা কঠিন পদার্থের সঙ্কোচনে এক নিয়ম নহে। জলের যে হারে সঙ্কোচ ঘটে, তেলের সে হারে ঘটে না। লোহার যে হারে ঘটে, সোণার সে হারে ঘটে না। সমুদয় অনিল এক নিয়ম মানে; কিন্তু তরল বা কঠিন প্রত্যেকের পক্ষে নিয়ম আলাহিদা। কি করা যাইবে! যাহা দেখা যায়, তাহাই মানিতে হইবে।

এক শ্রেণীর কবি আছেন, তাঁহারা প্রাকৃতিক নিয়মের অস্তিত্ব দেখিয়া আত্মহারা হন, এবং কেহ বা নিয়মবদ্ধ বিশ্বজগতের, কেহ বা নিয়মকর্ত্তা বিশ্ববিধাতার, মাহাত্ম্য গান করিয়া আত্মপ্রসাদ অনুভব করেন। ইঁহাদের কাব্য এইরূপ—আহা প্রকৃতির কি বিচিত্র লীলা! প্রকৃতিতে সর্ব্বত্রই নিয়মের রাজ্য! কোথাও তাহার অণুমাত্র ব্যতিক্রম নাই! নিয়মের রাজ্যে কোথাও অনিয়ম নাই! সকলকেই বাঁধা নিয়মে চলিতে হইতেছে। কি আশ্চর্য্য! কি আশ্চর্য্য!

প্রাকৃতিক নিয়মের অস্তিত্ব যতই অদ্ভুত হউক, এই বিস্ময় তদপেক্ষা অদ্ভুত। যে দ্রব্য যে ভাবে চলিতেছে, তাহার পক্ষে তাহাই যখন প্রাকৃতিক নিয়ম, তখন অনিয়মের সম্ভাবনা কোথায়? কোনও বস্তু যদি কোনও নিয়ম না মানিত, তাহার পক্ষে সেই না-মানাটাই প্রাকৃতিক নিয়ম হইত। সমস্ত অনিলে একই সঙ্কোচন-নিয়ম মানে, ভাল কথা। যদি কোন অনিল নিয়ম না মানিত, একবারে এলোথেলো উচ্ছৃঙ্খলভাবে চলিত, সেই উচ্ছৃঙ্খলতাই তাহার পক্ষে প্রাকৃতিক নিয়ম হইত। বস্তুতই এমন অনিল দুই দশটা আছে, উল্লিখিত সাধারণ নিয়ম তাহারা সম্যক্‌রূপে মানে না। তাহাদের পক্ষে তাহাই নিয়ম। এইরূপ যখন ব্যবস্থা, তখন প্রকৃতির রাজ্যে সর্ব্বত্র নিয়মের অস্তিত্ব দেখিয়া বিস্মিত হইবার অবসর কোথায়?

ফলে, জগতে নানা ঘটনা ঘটিতেছে; যাহাই ঘটুক না, একটা না একটা পদ্ধতিতে ঘটিতেই হইবে। যে চলে, তাহাকে একটা না একটা পথে চলিতেই হইবে। কেহ সোজা পথে, কেহ বাঁকা পথে চলিবে। যে সোজা চলে, সোজা চলাই তাহার নিয়ম; যে বাঁকা চলে, বাঁকা চলাই তাহার নিয়ম। যে যেরূপে চলে, তাহাই যদি তাহার পক্ষে নিয়ম হয়, তাহা হইলে অনিয়মের সম্ভাবনা বা কল্পনা কিরূপে হয়? ইহাতে বিস্ময়ের হেতুই বা কি হয়?

জগতে নিয়মের রাজত্ব সম্বন্ধে যে সকল ভাবুকতাপূর্ণ বাক্য শুনা যায়, সমস্তই কাব্য। কাব্য ছাড়িয়া আমরা বিজ্ঞানের আসরে নামিব। বিজ্ঞানে প্রাকৃতিক নিয়ম কি অর্থে প্রযুক্ত হয়, তাহা বুঝিবার চেষ্টা করিব। পর্য্যবেক্ষণে দেখা যায়, জাগতিক ঘটনাগুলি একবারে পরস্পর সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র নহে। সকলেই আপন আপন পথে চলে বটে, কিন্তু পথে পথে মিল আছে। কেহবা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ধারায় চলে, কতকগুলি বা

জোট বাঁধিয়া এক ধারায় চলে। প্রত্যেক দ্রব্যই যেখানে আপন ধারায় চলে, কাহারও সহিত কাহারও মিল থাকে না, তখন উহাই তাহার পক্ষে প্রাকৃতিক নিয়ম হইলেও, আমরা উহাকে নিয়ম বলিতে চাই না; উহাকে নিয়ম না বলিয়া অনিয়ম বলিলেই ভাল হয়। যেখানে অনেকগুলি জিনিসের একটা বিষয়ে মিল আছে, অনেকগুলিতে একজোট হইয়া একধারায় চলে, সেইখানেই আমরা নিয়ম আছে বলিয়া থাকি। জগতে অনৈক্যের অভাব নাই; কিন্তু বহুতর অনৈক্যের মধ্যে বহু ঐক্যেরও সন্ধান পাওয়া যায়। অনৈক্যের মধ্যে ঐক্যের সন্ধানই বিজ্ঞানের একটা প্রধান কার্য্য। অবেক্ষণ ও পরীক্ষণ এই ঐক্য সন্ধান কার্য্যের প্রধান সহায়। দেখিয়া খুঁজিয়া বাহির করিতে হয় যে কোথায় ঐক্য আছে; এবং যেখানে ঐক্য দেখি, সেইখানে বলি যে এখানে ইহাই প্রাকৃতিক নিয়ম। এইরূপ প্রাকৃতিক নিয়মের অস্তিত্ব সাবধানে অবেক্ষণ ও পরীক্ষণ দ্বারাই আবিষ্কৃত হয়।

বস্তুতঃ এখানেও বিজ্ঞানে ও সহজ জ্ঞানে কোনও প্রভেদ নাই। যদি প্রত্যেক ঘটনাই আপন আপন ধারায় ঘটিত, কোনও ঘটনার সহিত কোনও ঘটনার মিল দেখা না যাইত, তাহা হইলে মনুষ্যের জীবনযাত্রাই অসাধ্য হইত। মনুষ্যের কেন, পশুরও জীবনযাত্রা চলিত না। পশুরাও জানে,—কেবল যে সংস্কারবশে জানে, তাহা নয়,—অবেক্ষণ দ্বারা লব্ধ জ্ঞানবলে জানে, কোথায় গেলে কিরূপ আহার-প্রাপ্তির সম্ভাবনা আছে। কুকুর মনিবকে ভালবাসে, অন্য লোককে কামড়াইতে যায়; বিড়াল যথাসময়ে গৃহ-স্বামীর ভোজনের ভাগ লইতে আসে। এ সকল তাহাদের অবেক্ষণলব্ধ জ্ঞান। তাহারাও বহুদিনের পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা নিয়মের আবিষ্কার করিয়া লইয়াছে। মনিবের ব্যবহারে যদি কোনরূপ ঐক্য বা সঙ্গতি না থাকিত, গৃহস্বামীর

ভোজনকাল যদি স্থির না থাকিত, তাহা হইলে কুকুর বা বিড়াল ঐরূপ নির্ভর করিতে পারিত না।

আমরাও যে রাত্রিশেষে যথাসময়ে সূর্য্যোদয় হইবে জানিয়া কালিকার আহারের ব্যবস্থা আজ করি, শীতকালে ফল পাকিবে জানিয়া বর্ষারম্ভে ধান বুনি, ইহার তাৎপর্য্য এই যে, আমরা বহুদিনের পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা নানাবিধ প্রাকৃতিক ঘটনামধ্যে ঐক্যের সন্ধান পাইয়াছি, কতিপয় প্রাকৃতিক নিয়মের আবিষ্কার করিয়াছি। ঐরূপ কতকগুলি নিয়ম জানা আছে বলিয়াই জীবনযাত্রা চালান সম্ভবপর হয়। নতুবা আমরা ইচ্ছাপূর্ব্বক বা চেষ্টাপূর্ব্বক জীবনযাত্রা চালাইতে পারিতাম না। কেবল সহজাত সংস্কারের বশে অন্ধভাবে যতটুকু চলা সম্ভব হইত, ততটুকুই চলিত। কালসহকারে আমাদের ভূয়োদর্শন ঘটে; নূতন নূতন ঘটনা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া—সাবধানে বুদ্ধিসহকারে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া—আমরা যতই ঐক্য আবিষ্কার করি, ততই আমাদের বিষয়-জ্ঞানের বৃদ্ধি হয়, ততই আমরা সেই জ্ঞানকে নানা কর্ম্মে নিযুক্ত করি, ততই প্রকৃতির উপর আমাদের আধিপত্য বাড়ে।

বল

যাক্, ভূমিতে পড়িবার সময় সকল দ্রব্যের বেগ বাড়ে; প্রতি সেকেণ্ডে কত বাড়ে? পর্য্যবেক্ষণে জানিয়াছি, সেকেণ্ডে ৩২ ফুট হিসাবে বাড়ে। যাহারা পর্য্যবেক্ষণ করে নাই, তাহারা ইহা জানে না; কেবল বুদ্ধিবলে ইহা আবিষ্কারের কোন সম্ভাবনা নাই। এইরূপে বেগ বাড়ে কেন? তাহাও আমরা জানি; তবে এরূপ স্থলে আমরা বলিয়া থাকি যে, যেখানে বেগ বাড়ে, সেখানে **বল** আছে; পতন্ত দ্রব্যের উপর 'বল' প্রযুক্ত হয়, পৃথিবীর কেন্দ্র অভিমুখে বল প্রযুক্ত হয়। পৃথিবীর

আকর্ষণবলে পতন্ত দ্রব্যের বেগ বাড়ে। এই 'বল' শব্দটির পারিভাষিক অর্থ আছে। প্রচলিত ভাষায় উহার অর্থ যাহাই হউক, বিজ্ঞানের ভাষায় উহার কাটাছাঁটা অর্থ আছে। যেখানে দেখা যায়, বেগ বাড়িতেছে, সেইখানে বলা যায় যে গতি যে মুখে, সেই মুখে বল আছে; যেখানে বেগ কমিতেছে, সেইখানে বলা যায়, গতির বিপরীত মুখে বল আছে। যেখানে বেগের হ্রাস-বৃদ্ধি নাই, সেখানে বলা যায়, বলও নাই।

পতন্ত দ্রব্যের বেগ বাড়ে দেখিয়া আমরা বলি, পৃথিবীর অভিমুখে উহার যখন গতি, তখন পৃথিবীর অভিমুখে একটা বল প্রযুক্ত হইতেছে। বেগ বাড়িতেছে বলিলেও যে ফল, বল আছে বলিলেও সেই ফল; কেবল ভাষাটা একটু পণ্ডিতি-ধরণের করা হয়, এইমাত্র; কেন বেগ বাড়িতেছে, উহার কোন কারণ নির্দ্দেশ করা হয় না।

অনেকের ধারণা যে, ভাষাটা একটু ঘুরাইয়া বলিলেই যেন জ্ঞানের সীমা বর্দ্ধিত হইল। বলের ইংরেজি নাম ফোর্স (force); এই force শব্দ লইয়া কত লোকে কত কাব্য রচনা করিয়াছেন। বেগ-বৃদ্ধির কারণ ঐ force; force আছে বলিয়াই বেগের বৃদ্ধি ঘটে। উহা যেন একটা কি নিরাকার দেবতাবিশেষ, উহার কাজই হইতেছে বেগ বাড়ান। বিধাতা যেন কতকগুলা ফোর্স সৃষ্টি করিয়া বিশ্বজগতে পাঠাইয়া দিয়াছেন, তাহারা পতন্ত দ্রব্যের বেগ-বর্দ্ধনে বা বেগনাশ কর্ম্মে নিযুক্ত আছে। উহার মধ্যে একটা ফোর্স আম জাম নারিকেলকে ভূকেন্দ্রের অভিমুখে বর্দ্ধমান বেগে প্রেরণ করিতেছে। যেন ভূকেন্দ্রে অবস্থিত এই অশরীরী দেবতা তাহার নিরাকার করপ্রসারণে সকল দ্রব্যকে ভূকেন্দ্রমুখে টানিতেছে। এই সকল ফোর্স আছে বলিয়াই জগতের মধ্যে যেন এই কাণ্ডকারখানা, হুড়াহুড়ি, ছুটাছুটি, দৌড়াদৌড়ি

ব্যাপার চলিতেছে। অতএব গাও ফোর্সের জয়গান। দুঃখের বিষয় অনেক বড় বড় বৈজ্ঞানিক এইরূপ কল্পনার প্রশ্রয় দিয়া থাকেন। বিজ্ঞান-শাস্ত্রের পক্ষে এইরূপ কবি-কল্পনার প্রশ্রয় দেওয়া উচিত হয় না। ইহার দোষ এই যে, যেখানে আমরা কিছুই জানি না, সেখানেও একটা জ্ঞানের ভাণ আসে। বস্তুতঃ force বা 'বল' বলিয়া কোন অস্তিত্ব-যুক্ত ভাবপদার্থ কোথাও কিছু নাই। ইহা একটা কল্পিত নামমাত্র। এই নাম লইয়া একটা দেবতা-গড়া বিজ্ঞান-বিরুদ্ধ। বিজ্ঞানের পক্ষে ইহা পৌত্তলিকতা। পতন্ত দ্রব্যের বেগের বৃদ্ধি হয়, ইহাই একটা তথ্য,—অবেক্ষণলব্ধ তথ্য; ইহা একটা প্রত্যক্ষগোচর ঘটনা—উহাই সত্য। বলের অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ হয় না; উহা একটা ভাষার খেলামাত্র। 'মরিয়াছেন' পরিবর্ত্তে 'মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন' বলিলে যেমন নূতন কিছুই বলা হয় না, 'পতন্ত দ্রব্যের বেগ বাড়ে' এই বাক্যের পরিবর্ত্তে 'পতন্ত দ্রব্যের উপর একটা বল (force) প্রযুক্ত হইতেছে' বলিলেও তাহার অধিক কিছু বলা হয় না। সর্ব্বজনবোধ্য চলিত ভাষার পরিবর্ত্তে পণ্ডিতজনবোধ্য পারিভাষিকের ব্যবহার করা হয় মাত্র।

মাধ্যাকর্ষণ

বেগ যেখানেই বাড়ে, বা যেখানেই কমে, সেইখানেই আমরা বলিয়া থাকি, গতির অভিমুখে বা বি-মুখে একটা বল আছে; এবং সেই বলের এক একটা বিশেষ নাম দিয়া থাকি। আম জাম নারিকেলের পতনকালে বেগ বাড়ে দেখিয়া আমরা বলি, নিম্নমুখে বা পৃথিবীর কেন্দ্র-মুখে একটা বল আছে এবং সেই বলের নাম দিই **মাধ্যাকর্ষণ**। একটা মানুষকে দড়ি দিয়া টানিলে বা আকর্ষণ করিলে সে যেমন কাছে আসে, পতন্ত দ্রব্যও কতকটা সেইরূপ ভূকেন্দ্রের অর্থাৎ ভূমধ্যের দিকে

ক্রমশঃ অগ্রসর হয়। মাধ্যাকর্ষণ নামের এই সার্থকতা। কিন্তু ইহাতে কেহ যেন মনে না ভাবেন যে, পৃথিবী এইরূপে আম জামকে টানিতেছেন। পৃথিবী আকর্ষণশক্তিবলে সকল দ্রব্যকেই নিজের দিকে টানেন, ইহা বিজ্ঞানের ভাষা নহে; ইহা কাব্যের ভাষা।

নারিকেল বর্দ্ধমান বেগে মাটিতে পড়ে কেন? এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়—পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ-বলে ঐরূপ হয়। এই উত্তর অবৈজ্ঞানিক। পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ-বল কোনরূপ প্রত্যক্ষগোচর পদার্থ নহে। পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ আছে বলিতেছি কেন? পতন্ত নারিকেলের বেগ বাড়ে এই জন্য বলিতেছি যে, পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ আছে, এই উত্তর বরং বিজ্ঞানসঙ্গত। এই জন্তুটা গরু, অতএব ইহা শিং নাড়ে ও হাম্বা করে, ইহা অযুক্তি। শিং নাড়ে ও হাম্বা ডাকে, অতএব ইহার নাম দিয়াছি গরু, ইহাই যুক্তিযুক্ত।

পৃথিবী ও নারিকেলের মধ্যে ইন্দ্রিয়ের অগোচর কোনরূপ দড়া-দড়ি আছে কি না, সে স্বতন্ত্র কথা ও বিচার্য্য কথা। থাকিতেও পারে, না থাকিতেও পারে। এখনও বিজ্ঞানবিদ্যা সেরূপ কোন সংযোগরজ্জুর অস্তিত্ব প্রতিপন্ন করিতে পারে নাই, অথচ একটা কিছু সংযোগ না থাকিলেও একটা অপরটার দিকে চলে কিরূপে, তাহাও ঠিক বুঝাইতে পারে না। হয় ত কোনরূপ বন্ধন আছে, তাহা ভবিষ্যতে আবিষ্কৃত হইতে পারে।

বলের কোনরূপ অস্তিত্ব নাই বটে, কিন্তু বৈজ্ঞানিক এই কাল্পনিক পদার্থকে মাপিতে ছাড়েন না! বেগের বৃদ্ধিতেই বল; বেগের যেখানে খুব বৃদ্ধি, সেখানেই খুব বল; যেখানে অল্প বৃদ্ধি, সেখানে অল্প বল। সেকেণ্ডে ৩২ ফুট হিসাবে যেখানে বৃদ্ধি, সেখানে যে বল, সেকেণ্ডে ৬৪ ফুট হিসাবে যেখানে বৃদ্ধি, সেখানে বল তাহার দ্বিগুণ, এইরূপ হিসাব

করিয়া বল মাপা যায়। পতন্ত দ্রব্যের বেগের বৃদ্ধি ঘড়ি ধরিয়া মাপিয়া দেখা গিয়াছে, পৃথিবীর সর্ব্বত্র উহা ঠিক্ সমান নয়। প্রায় সমান, কিন্তু ঠিক সমান নয়। কলিকাতায় যাহা, লণ্ডনে তার চেয়ে একটু অধিক। নিরক্ষবৃত্তের নিকটে যত যাই, বল ততই একটু কমে। মেরু প্রদেশের নিকটে যত যাই, ততই একটু বাড়ে। আবার যত উচ্চে যাওয়া যায়, ততই একটু কমে। সমুদ্রপৃষ্ঠে যতটুকু, হিমালয়ের পৃষ্ঠে তার চেয়ে একটু কম।

ভূগোল বিদ্যায় বলে, পৃথিবী ঠিক্ বর্ত্তুলাকার নহে; নিরক্ষবৃত্তের নিকট একটু ফাঁপা, আর মেরুপ্রদেশে একটু চাপা। লণ্ডন সহর ভূকেন্দ্র হইতে যত দূরে, কলিকাতা তার চেয়ে একটু অধিক দূরে। আবার সমুদ্রপৃষ্ঠ ভূকেন্দ্র হইতে যত দূরে, হিমালয়ের পৃষ্ঠ তার চেয়ে একটু অধিক দূরে। কাজেই দেখা যাইতেছে, ভূকেন্দ্র হইতে দূরে গেলে পতন্ত দ্রব্যের বেগ-বৃদ্ধির মাত্রাটা একটু কমই হয়।

বেগবৃদ্ধির মাত্রা ধরিয়া বলের মাত্রা পরিমিত হয়; অতএব পতন্ত দ্রব্যের উপর বল—যাহার নাম দেওয়া হয় মাধ্যাকর্ষণ—সেই বলও সর্ব্বত্র সমান নহে। ভূকেন্দ্র হইতে যত দূরে যাওয়া যায়, মাধ্যাকর্ষণের মাত্রা ততই একটু করিয়া কমিয়া থাকে। যে দ্রব্য যত বেগে পড়িতে যায়, তাহার পতন নিবারণে, তাহাকে ধরিয়া স্থির রাখিতে, ততই ক্লেশ হয়। সে দ্রব্য ততই ভারী লাগে। অতএব এই বর্দ্ধমান বেগে পতনপ্রবৃত্তিই সকল দ্রব্যের ভারের হেতু। যেখানে পতনপ্রবৃত্তি যত অধিক, মাধ্যাকর্ষণ বল যত অধিক, সেখানে দ্রব্যের ভারও ততই অধিক।

কলিকাতার চেয়ে লণ্ডনে একটা টাকার ভার একটু অধিক; এক ভরি রূপার ভার একটু অধিক; এক সের চাউলের ভার একটু

অধিক। এ আবার কি কথা? ইহা সত্য কথা—ইহা পরীক্ষিত সত্য। কিরূপে পরীক্ষা করিবে? ভারের পরিমাণ ও পরীক্ষা আমরা কিরূপে করিয়া থাকি? ভারপরীক্ষার যন্ত্রের নাম তুলাদণ্ড—তুলদাঁড়ি ও নিকৃতি। তুলদাঁড়িতে আমরা ওজন করি কিরূপে? দাঁড়ির এক পাল্লায় চাউল রাখি, অন্য পাল্লায় বাটখারা রাখি; দাঁড়ি যখন ঠিক্ ভূপৃষ্ঠের সঙ্গে সমান্তরাল হইয়া দাঁড়ায়, তখন বলি, চাউলের ভার বাটখারার ভারের সমান। এইরূপে ভারপরিমাণ করাকে ওজন করা বলে। কলিকাতা হইতে লণ্ডনে গেলে চাউলের ভার যতটুকু বাড়ে, বাটখারার ভারও ঠিক্ ততটুকু বাড়ে। কলিকাতাতেও এক সের চাউলের ভার যে বাটখারার ভারের সমান, লণ্ডনেও এক সের চাউলের ভার ঠিক্ সেই বাটখারার ভারের সমান হয়। দুয়েরই ভার সমানভাবে বাড়িয়া যাওয়ায় ওজনে ভারের বৃদ্ধি ধরা পড়ে না। কিন্তু অন্য উপায়ে এই বৃদ্ধি ধরিতে পারি। রবারের সূতাতে কোন দ্রব্য ঝুলাইলে উহা একটু লম্বা হইয়া ঝুলিয়া পড়ে; উহার দৈর্ঘ্য একটু বাড়ে। অর্থাৎ, ভার যে হারে বাড়িয়াছে, সূতার দৈর্ঘ্যের বৃদ্ধিও ঠিক্ সেই হারে ঘটে। এক সের দ্রব্য কলিকাতায় রবারের সূতায় ঝুলাইলে সূতা যেটুকু বাড়িতে দেখা যায়, লণ্ডনে তার চেয়ে একটু অধিক বাড়িতে দেখা যায়। ভারের বৃদ্ধি ধরিবার ইহা স্থূল উপায়। কিন্তু আর একটা সূক্ষ্ম উপায়ে ভারের বৃদ্ধি ধরা পড়ে। একগাছা সূতার একপ্রান্তে একটা ভারী দ্রব্য বাঁধিয়া অন্য প্রান্ত স্থির রাখিয়া দুলাইয়া দিলে দ্রব্যটা দুলিতে থাকে; ঘড়ির পেণ্ডুলমের মত দুলিতে থাকে—পেণ্ডুলমের মত বলি কেন, উহাই পেণ্ডুলম। এই পেণ্ডুলম ঘণ্টায় কতবার দোলে, তাহা দেখিয়া ভারের হ্রাসবৃদ্ধি সূক্ষ্মভাবে নিরূপণ করা চলে। দেখা যায়, কলিকাতায় যে পেণ্ডুলম ঘণ্টায় যতবার দোলে, লণ্ডনে সেই

পেণ্ডুলম ঘণ্টায় তার চেয়ে কয়েকবার অধিক দোলে। ভারের সঙ্গে এই দোলন-সংখ্যার সম্পর্ক আছে। লণ্ডনে ভার একটু অধিক হয়; অধিকবার দোলনেই তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। নিরক্ষবৃত্ত হইতে লণ্ডনে লইয়া গেলে জিনিসের ভার হাজার-করা প্রায় তিন বাড়িয়া যায়।

উচু পর্ব্বতে উঠিলে ভার কমে, উহাও পেণ্ডুলম দোলাইলে দেখা যায়। পৃথিবীর কেন্দ্র ছাড়িয়া যত দূরে যাওয়া যায়, ততই ভার কমে। পৃথিবী ছাড়িয়া দশ বিশ হাজার মাইল দূরে যাওয়া সম্ভব হইলে ভার আরও কমিত, ইহা সহজেই মনে হয়। দশ বিশ লক্ষ মাইল দূরে যাইলে ভার অত্যন্ত হাল্‌কা হওয়ার সম্ভব, ইহাও অনুমানসিদ্ধ। অবশ্য অত দূরে যাইবার উপায় নাই কাজেই প্রত্যক্ষ ভাবে পরীক্ষা চলে না।

দেখা গেল যে, চাউলের ভার সর্ব্বত্র সমান থাকে না, ইহা অস্বীকারের উপায় নাই, কেননা ইহা অবেক্ষণলব্ধ তথ্য। কিন্তু ভার কমিলেও চাউল ত কমে না। কোন গুরুভার দ্রব্য জলে ডুবাইলে উহা হাল্‌কা হয়, জলের ঠেলে উহার ভার যেন অনেকটা কমিয়া যায়; কিন্তু সেই জিনিসটাই ত থাকে; এ ক্ষেত্রেও কতকটা সেইরূপ। এক সের চাউলের ভার যতই কমুক বা বাড়ুক, উহাতে পেট ভরিবে সমানই। চাউলের ভার বাড়ে কমে, কিন্তু চাউল বাড়ে কমে না। তবে চাউলটা কি? চাউলের চাউলত্ব কিসে?

এক মণ চাউল মাথায় করিয়া দোকান হইতে বহিয়া আনিতে কি ক্লেশ! যে বোঝা বহে, সে প্রার্থনা করে, যদি ইহার ভার আরও কম হইত! ভার একেবারে না থাকিলে মুটে-ভাড়া আদৌ লাগিত না। মুটে-ভাড়া লাগিত না, অথচ উদর পূরণের পক্ষেও কোন ব্যাঘাত ঘটিত না।

অতএব চাউলের যাহা ভার, তাহা চাউলের চাউলত্ব নহে। ভার কোথাও বেশী, কোথাও কম; কলিকাতায় যে ভার, দার্জ্জিলিঙে তার চেয়ে কিঞ্চিৎ কম; ভূমণ্ডলে যাহা, চন্দ্রমণ্ডলে তাহার চেয়ে অনেক কম; কিন্তু তাই বলিয়া উহার ক্ষুধানিবারণের শক্তি বেশী-কম হয় না। তেমনি সোণার ওজন যদি একেবারে না থাকিত, উহার সুবর্ণত্ব যাইত না; উহাতে ঠিক সেই পরিমাণের গহনা গড়ান চলিত, পরন্তু অলঙ্কার-ধারিণীকে অলঙ্কার-বহনের ক্লেশটা পাইতে হইত না!

বস্তু

অতএব চাউলের যাহা চাউলত্ব ও সোণার যাহা সুবর্ণত্ব, তাহা ভার নহে; তাহার একটা নাম দেওয়া প্রয়োজন। ইংরাজিতে একটা নাম আছে—mass; বাঙ্গলায় বাঁধা নাম নাই। বিজ্ঞানের পুস্তকে যাঁহার যাহা ইচ্ছা হয়, তিনি সেই নাম দেন। কোন নামটাই এখনও চলে নাই বা সর্ব্বজনসম্মত হয় নাই। একটা নূতন বাঙ্গলা নাম দিবার এখনও অবকাশ আছে। আমার বিবেচনায় উহাই যখন চাউলের চাউলত্ব ও সোণার সুবর্ণত্ব ও জড়দ্রব্যমাত্রের জড়ত্ব, তখন উহার জড়ত্ব নাম দেওয়া চলিতে পারে। ইংরেজিতে আর একটি নাম আছে inertia; বিজ্ঞানের পুস্তকে এই inertia শব্দটি লইয়া নানা বাগ্‌জালের অবতারণা হয়; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে mass ও inertia ঠিক্ সমানার্থক; inertia বলিতে যে ভাব আসে, জড়ত্ব বলিতেও ঠিক সেই ভাব আসে; inertia জড়ের জড়ত্ব, ইহাই mass। কাজেই mass অর্থে 'জড়ত্ব' শব্দের প্রয়োগে আমি আপত্তি দেখি না। তবে ইংরেজিতে যেমন দুইটি শব্দ আছে, সেইরূপ বাঙ্গলাতে যাঁহারা দুইটি পারিভাষিক শব্দ দেখিতে চান, তাঁহাদের জন্য জড়ত্ব বুঝাইতে

আর একটি শব্দ উপহার দিব। পূর্ব্বে আমি এই অর্থে জিনিস শব্দ ব্যবহার করিতাম ; কেহ কেহ উহাতে আপত্তি করিয়াছিলেন, শব্দটা বস্তুতই কর্কশ। জিনিস না বলিয়া আমি এখন বস্তু বলিব। এই দ্রব্যটায় বস্তু কত, অর্থ—ইহার mass কত ? এই দ্রব্যে অনেকটা বস্তু আছে ; ইহা অত্যন্ত massive। বস্তু শব্দ massএর বদলে চলিতে পারে। তাহাই এই পুস্তকে পারিভাষিক অর্থে প্রয়োগ করিব।

বাঙ্গলাভাষায় পদার্থ, বস্তু, দ্রব্য, জিনিস, এই কয়টি শব্দ একই অর্থে ব্যবহৃত হয়। জিনিস শব্দটি বিদেশ হইতে আসিয়াছে ; উহার তাৎপর্য্য ঠিক্ কি, তাহা জানি না। পদার্থ, বস্তু ও দ্রব্য এই তিনটি সংস্কৃতভাষা হইতে পাইয়াছি। সংস্কৃত ভাষায়, বিশেষতঃ সংস্কৃত দর্শনের পারিভাষিক ভাষায়, উহাদের বিশেষ সংজ্ঞা আছে। কিন্তু বাঙ্গলায় সেই সকল সংজ্ঞার প্রচলনের বোধ করি আর উপায় নাই। বাঙ্গলাতে আসিয়া শব্দগুলির অর্থ বিকৃত হইয়া গিয়াছে। তথাপি তিনটি শব্দ যখন আছে, তখন বাঙ্গলায় বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় উহাদিগকে নির্দ্দিষ্ট সঙ্কীর্ণ অর্থে প্রয়োগ করা এখনও চলিতে পারে। বস্তু শব্দ জড়ত্ব বুঝাইবার জন্য রাখিয়া দ্রব্য শব্দটি নির্দ্দিষ্ট আকারের ও আয়তনের জিনিস, ইংরেজিতে যাহাকে বলে, সেই অর্থে প্রয়োগ করা যাইতে পারে। কঠিন তরল অনিল body ইত্যাদি অবস্থা বুঝাইবার জন্য পদার্থ শব্দটি রাখিয়া দিতে পারি। এই গ্রন্থে যথাসাধ্য এই পরিভাষা আশ্রয় করিব।

এখন বলা যাইবে, এক সের চাউলকে কলিকাতা হইতে বিলাতে লইয়া গেলে উহার ভার বাড়ে, কিন্তু উহার বস্তু বাড়ে না—সেই এক সেরই থাকে। এক ভরি সোণা বিলাতে গেলে উহার ভার বাড়ে, কিন্তু বস্তু সমান থাকে। অতএব গৃহিণীদিগের বিলাত যাওয়ায় লাভ

নাই। পুরুষেরা বিলাতে যান—মহিলারা যাইবেন না; সেখানে গহনার ভার বাড়িবে মাত্র।

দেখা গেল যে, ভারবহনে ক্লেশ আছে, বস্তুবহনে কোন ক্লেশের সম্ভাবনা না থাকিতেও পারে। ভার ও বস্তু স্বতন্ত্র ধর্ম্ম। এখন এই বস্তু পরিমাণের উপায় কি?

আমরা সেরে মণে ছটাকে যাহা নির্দ্দেশ করি, তাহা ভার নহে, তাহা বস্তু। আমার কুটুম্ব স্বর্গগত ফকির চৌধুরী পূর্ণ আহারের পর একদিন এক সের ঘৃত, আর একদিন ছিয়ানব্বইটা আম উদরসাৎ করিয়াছিলেন। এস্থলে সেই ঘৃতের বা আম্ররসের ভার বহনের জন্য তাঁহাকে কেহ বাহাদুরি দেয় নাই; এতটা বস্তু যে তিনি হজম করিয়াছিলেন, ইহাই তাঁহার মাহাত্ম্য। এখন এই বস্তু মাপিব কিরূপে? দৈর্ঘ্য মাপিতে মাপকাঠি দরকার; একটা নির্দ্দিষ্ট দৈর্ঘ্যের কাঠি ঠিক্ করিয়া লইয়া তাহাকে এক ধরিয়া তাহার সহিত তুলনায় দুই কাঠি তিন তিন কাঠি দশ কাঠি স্থির করি। সেই রূপ বস্তু মাপের জন্য খানিকটা নির্দ্দিষ্ট বস্তুকে এক ধরিয়া তাহার সহিত তুলনায় বস্তুর পরিমাণ চলিতে পারে। বিলাতে এই জন্য পাউণ্ড নির্দ্দিষ্ট আছে। এদেশে উহা চলিত নাই। এদেশে প্রচলিত এক সের। উহা এক পাউণ্ডের প্রায় দ্বিগুণ। এক সেরের চল্লিশ গুণে এক মণ, এক সেরের ষোল ভাগে এক ছটাক, এক সেরের আশী ভাগে এক তোলা বা এক ভরি। চলিত কথায়—আমরা বলি এটার ভার এক সের, ওটার ভার পাঁচ সের; কিন্তু বলা উচিত, এটার বস্তু একসের, ওটার বস্তু পাঁচ সের অথবা এটার ভার এক সের বস্তুর ভারের সমান, ওটার ভার পাঁচ সের বস্তুর ভারের সমান।

ভার আর বস্তু যদি পৃথক হইল, তবে প্রশ্ন উঠিতে পারে, এক সের সোণার ভার এক সের রূপার ভারের সমান কি না? এক সের

চাউলের ভার এক সের লোহার বাটখারার ভারের সমান কি না? দুই দ্রব্যের বস্তু সমান হইলে ভারও সমান হইবে কি না? প্রশ্নটা আর একটু স্পষ্ট করা আবশ্যক। নিকৃত্তিতে বা দাঁড়িতে আমরা দুইটা দ্রব্যের ভার সমান কি না, তাহাই দেখি। এক পাল্লায় থাকিল চাউল, অন্য পাল্লায় থাকিল লোহার বাটখারা। দাঁড়ি সোজা হইলে বুঝিব, দুই পাল্লায় সমান টান পড়িয়াছে, দুই পাল্লাই সমান বেগে ভূমিমুখে বা পৃথিবীর কেন্দ্রাভিমুখে নামিতে চাহিতেছে; দাঁড়ির ঠিক মাঝখানটা আটকান থাকাতে কোনটাই নামিতে পারিতেছে না। ইহাতে প্রতিপন্ন হয়, যে, দুই পাল্লাতেই ভার সমান হইয়াছে; বস্তু সমান হইয়াছে কি না, প্রতিপন্ন হয় না। কেন না, ভূকেন্দ্রাভিমুখে পতন-চেষ্টাতেই দ্রব্যের ভার হয়। সেই পতন নিবারণ করিতে গিয়াই ভারবহনের ক্লেশ। বস্তুর সহিত এই পতন প্রবৃত্তির কোন সম্পর্ক নাই। চাউলের ও বাটখারার ভার সমান হইল, কেননা দুই পাল্লার পতন প্রবৃত্তি সমান হওয়াতে কোন পাল্লাই নামিতে পারিল না; কিন্তু উভয়ের বস্তু সমান, কে বলিল? উভয়েরই বস্তু এক সের, তাহা কিরূপে জানিব? বস্তু আর ভার যদি একই ধর্ম্ম হইত, তাহা হইলে কোন কথা ছিল না; কিন্তু যখন দেখিতেছি, ভার স্থানভেদে ভিন্ন হয়, বস্তু ভিন্ন হয় না, তখন ভার সমান হইলেই যে বস্তু সমান হইবে, কে বলিল?

ফলে, ভার যখন সমান, বস্তু তখন সমান হইবে, উহা হঠাৎ বলা চলে না। বস্তু সমান কি না, তাহা পরীক্ষার স্বতন্ত্র উপায় থাকা উচিত।

বস্তুর আর একটা নাম দিয়াছি 'জড়ত্ব'। এই জড়ত্ব কি, কোন্ ধর্ম্মকে জড়ত্ব বলিতেছি, তাহা এখনও স্পষ্ট বুঝি নাই। উহা পারিভাষিক সংজ্ঞা—স্পষ্ট অর্থ না দিলে বস্তু মাপিবার উপায় পাওয়া যাইবে না।

প্রথমে মানিয়া লইতে হইবে, ভারের সহিত উহার কোন সম্পর্কই নাই। নব্বই মণ লোহা কলিকাতা হইতে বিলাতে লইয়া গেলে উহার ভার একটু বাড়ে, দার্জ্জিলিঙে লইয়া গেলে উহার ভার একটু কমে; চাঁদ যত দূরে, তত দূর লইয়া গেলে উহার ভার কমিয়া এক সের লোহার ভারের তুল্য হয়; পৃথিবীর কেন্দ্রে লইয়া যাইতে পারিলে ভার একবারে কিছুই থাকে না। কাজেই এই ভারটা একটা আগন্তুক ধর্ম্ম। লোহার লৌহত্বের সহিত ইহার কোন সম্পর্ক নাই। লোহার ভার এইরূপ অল্পাধিক হয় বটে, কিন্তু এমন কিছু ঐ লোহাতে আছে, যাহা কমেও না, বাড়েও না; উহাই লোহার বস্তু। লোহার ভার যদি একেবারে না-ই থাকিত, ভূপৃষ্ঠের মুখে উহার পতন-প্রবৃত্তি যদি না-ই থাকিত, তাহা হইলেও উহাতে সেই বস্তুর কোন তারতম্য হইত না। সেই বস্তুই ঐ দ্রব্যের জড়ত্ব; এই জড়ত্বের কখনও হ্রাস-বৃদ্ধি হয় না। এক সের চাউল দোকান হইতে কিনিয়া আনিলাম; ভূপৃষ্ঠে সুড়ঙ্গ খুঁড়িয়া ভূকেন্দ্রে লইয়া যাওয়া সম্ভব হইলে উহার ভার কিছুই থাকিবে না। কিন্তু উহার ক্ষুধানিবারণের শক্তি কিছুই কমিবে না। উহার বস্তু—উহার জড়ত্ব—সমান থাকিবে। কাজেই, ওজন করিয়া অর্থাৎ তুলদাঁড়ির দুই পাল্লার পতন-প্রবৃত্তির তুলনা করিয়া বস্তুর পরিমাণ ঠিক্ হয় না।

বস্তুর পরিমাণ

এখন প্রশ্ন এই—এই যে বস্তু, ইহার পরিমাণ করিব কিসে? কোন্ দ্রব্যে কতটা বস্তু আছে, নির্ণয় করিব কিরূপে? দুইটা দ্রব্যের মধ্যে কোন্‌টার বস্তু অধিক, কোন্‌টার অল্প, তাহা নির্ণয় করিব কিরূপে?

বস্তু পরিমাপের একটা উপায় ধাক্কা। মনে কর, একটা খালি ঘড়া, আর একটা জলপূর্ণ ঘড়া। উভয়ের সমান আকার—সমান আয়তন; একটার ভিতরে বায়ু, অন্যটার ভিতরে জল; অথচ ধাক্কা দিলেই বুঝা যাইবে, কোন্‌টায় বস্তু আছে অধিক। একটা ধাক্কা দিলে খালি ঘড়াটা হুটমট করিয়া দূরে গিয়া পড়িবে, পূর্ণ কুম্ভটা হয় ত স্বস্থান হইতে ঈষৎ বিচলিত হইবে মাত্র। এইরূপ ধাক্কা দিয়া কোন্‌টা কত নড়িয়া যায়, তাহাই দেখিয়া আমরা মোটামুটি বস্তুর পরিমাণ নিরূপণ করি। দুইটা দ্রব্যের উপর ধাক্কা সমান হওয়া চাই, নতুবা তুলনা চলিবে না। ঠিক সমান ধাক্কা খাইয়া যেটা অল্প বিচলিত হয়, তাহার বস্তু অধিক, এবং যেটা অধিক বিচলিত হয়—সেটার বস্তু অল্প, বুঝা যাইতে পারে; কিন্তু দুই ধাক্কা ঠিক্‌ সমান হইল কি না, বলা খুব সহজ নহে। স্প্রিং কিংবা রবারের দড়ির টান দিয়া বরং এই ধাক্কার পরিমাণ চলিতে পারে। দুইটা স্প্রিং-এ যদি সমান টান পড়ে, তাহা হইলে ধাক্কাও সমান হইবে মনে করা যাইতে পারে।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, বলের একমাত্র কাজ বেগ উৎপাদন। ধাক্কা বলেরই প্রকারভেদ; সমান বল পাইয়াও যে দ্রব্যে অল্প বেগ জন্মে, তাহার বস্তু অধিক। বস্তু অর্থে ইহাই বুঝিব।

অন্যরূপে বুঝিবার চেষ্টা করিব। মনে কর, দুই জন আরোহী দুইখানা ডিঙ্গিতে চড়িয়া জলে ভাসিতেছে। এক জন যদি দড়ি দিয়া বা আকর্ষী দিয়া অন্য জনকে টানে, তাহা হইলে কি হইবে? দেখা যাইবে, দুইখানা ডিঙ্গিই পরস্পর নিকটে আসিতেছে। তা যে ব্যক্তিই টানুক না কেন। রামের ডিঙ্গি শ্যামের দিকে চলিতেছে, শ্যামের ডিঙ্গিও রামের দিকে চলিতেছে। যদি দেখা যায়, দুই ডিঙ্গিই ঠিক্‌ সমান বেগে পরস্পরের অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে, তাহা হইলে বুঝিব,

দুইটারই বস্তু সমান। রাম-সমেত রামের ডিঙ্গি, আর শ্যাম-সমেত শ্যামের ডিঙ্গি, উভয়েতেই সমান বস্তু আছে। আর যদি দেখি, একের বেগ অধিক, অন্যের বেগ অল্প, তাহা হইলে বুঝিব, যাহার বেগ অধিক, তাহার বস্তু অল্প, যাহার বেগ অল্প, তাহার বস্তু অধিক।

এইরূপ পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা বস্তুর সমানতা অথবা অল্পাধিক্য পরিমাণ করা যাইতে পারে। যে বিচলিত হয় যত সহজে, তাহাতে বস্তু তত অল্প, জড়ত্ব তত অল্প; যে বিচলিত হয় যত প্রয়াসে, তাহাতে বস্তু তত অধিক, জড়ত্ব তত অধিক। বস্তু বা জড়ত্বের পারিভাষিক অর্থ ইহাই। অন্য অর্থ দিব না।

এইরূপে ওজনের কাছ দিয়া না গিয়াও বস্তু মাপা চলিতে পারে। এইরূপে যেন স্থির হইল, এই লৌহপিণ্ডের বস্তু ঐ স্বর্ণপিণ্ডের বস্তুর সমান। এখন দাঁড়িপাল্লায় চড়াইয়া উভয়ের ভার সমান কি না, ওজন করিয়া পরীক্ষা কর। বস্তু সমান বলিয়া ভারও যে সমান হইবে, এমন কোন কথা নাই। অথচ আশ্চর্য্য এই যে, বস্তুগত্যা দেখা যায়, দুটি দ্রব্যের বস্তু সমান হইলে ভারও সমান হয়—তা সোণা রূপা, কাঠ পাথর, জল, বাতাস, যে জিনিসই হউক না। ইহা প্রাকৃতিক নিয়ম—প্রকৃতির খেয়াল বলিতে হইত। যদি এরূপ না হইত, তাহাতেও বিস্মিত হইবার কারণ থাকিত না। বস্তু সমান হইলেই যে ভার সমান হইতেই হইবে, প্রকৃতির উপর এমন জোর হুকুম কেহ দিতে পারে না। বস্তু সমান হইয়াও ভার সমান না হইতেও পারিত। কিন্তু প্রকৃতির এমনই খেয়াল হইয়াছে যে, যে যে দ্রব্যের বস্তু সমান, সেই সেই দ্রব্যের ভারও সমান হইয়াছে। হইয়াছে, ভালই হইয়াছে। সন্ধান করিয়া আমরা অনৈক্যের মধ্যে এই যে ঐক্য আবিষ্কার করিয়াছি, ইহাতে সুবিধাই হইয়াছে। ভার সমান দেখিয়াই আমরা বস্তু সমান বুঝিয়া লই।

নিক্তিতে ওজন করিয়া যখন দেখি, দুই পাল্লায় ভার সমান, তখন জানিতে পারি দুই দিকে বস্তুও সমান। এইরূপে খুব সহজেই বস্তুর সমানতা দেখিয়া লই। যদি প্রাকৃতিক নিয়ম ঐরূপ না হইয়া অন্যরূপ হইত, ভার সমান হইলেও বস্তু সমান না হইত, তাহা হইলে তুলদাঁড়িতে ওজন করিয়া বস্তু-সামান্য পরীক্ষা করা চলিত না।

দোকানে যখন আমি চাউল কিনিতে যাই, তখন আমি কি চাই? ভার চাই, না বস্তু চাই? উত্তরে বলিব, আমি খানিকটা বস্তুই চাই—যে বস্তুতে আমার উদর পূর্ত্তি হইবে, ক্ষুন্নিবৃত্তি হইবে সেই বস্তু চাই। একমণ চাউল কিনিলে একশ লোকের খোরাক হইবে, এই আশাতেই আমি চাউল কিনিয়া থাকি। ঐ একমণ চাউলের ভার লইয়া আমার কিছুমাত্র প্রয়োজন সাধিত হয় না। তাহার ভার যদি কিছুমাত্র না থাকিত, তাহা হইলে সুবিধা বই অসুবিধা হইত না। এক মণ বস্তুর জন্য আমি সমুচিত মূল্য দিয়া থাকি, ভার না থাকিলে সেই মূল্য লাগিত, কিন্তু ভারবহনের মুটে ভাড়াটা লাগিত না। এই ভারটায় আমার কোন উপকার নাই। আমি চাই খানিকটা বস্তু; উপরন্তু ঐ বস্তুর অনাবশ্যক ভারের জন্য আমাকে কিছু ক্ষতি স্বীকারই করিতে হয়। ঐ ভার আমি চাই না, তাহাতে পেট ভরে না, কেবল বোঝা চাপে মাত্র। যাক্, চাই আমি এক মণ বস্তু, কিন্তু দোকানদার আমাকে কিরূপে ঐ বস্তু মাপিয়া দেয়? দোকানদার ত বস্তু মাপে না, সে ভার মাপে। সে তুলদাঁড়িতে চাউল ওজন করিয়া দেয়; কিন্তু তুলদাঁড়ি বস্তু মাপিবার যন্ত্র নহে, উহা ভার মাপিবার যন্ত্র। তুলদাঁড়ির এক পাল্লায় চাউল অন্য পাল্লায় লোহার বাটখারা চাপাইয়া যখন দোকানদার বলে, এই লও এক মণ চাউল, তখন এ-পাল্লার চাউলের ভার ও-পাল্লার বাটখারার ভারের সমান হইয়াছে, বুঝিতে হয়; দুই

পাল্লাই সমান ভাবে ভূপতনের চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু দাঁড়ির মাঝখানাটা আটকান থাকায় কোন পাল্লাই নামিতে পারিতেছে না, ইহাই বুঝিতে হয়। তবেই দেখ, আমি চাইলাম খানিকটা বস্তু, দোকানদার দিল আমাকে খানিকটা ভার। লোহার বাটখারায় যে বস্তু আছে আমি সেই পরিমাণে চাউলের বস্তু চাই। কিন্তু দোকানী সে দিক্ দিয়া না গিয়া বাটখারার যে ভার আছে, সেই পরিমাণ ভারের চাউল দিয়া আমাকে বিদায় করিতে চাহে। আমি চাই খানিকটা বস্তু—যাহা উদর-পূর্ত্তির জন্য আবশ্যক, সে দিল খানিকটা ভার—যাহাতে উদরপূরণের আরামের চেয়ে বোঝা-বহার বিপত্তি অধিক। অথচ আমি বিনা আপত্তিতে মূল্য দিয়া সেই চাউল খরিদ করিতেছি ও তাহার বোঝা ঘাড়ে করিয়া বাড়ী আসিতেছি। আমি চাইলাম এক, পাইলাম আর এক, কিন্তু এ সংশয় আমার মনে কখনও উপস্থিত হয় না।

উপস্থিত হয় না কেন? বস্তু সমান হইলে ভার সমান হয়, ভার সমান হইলে বস্তু সমান হয়, ইহাই এই প্রশ্নের উত্তর। ইহা প্রাকৃতিক নিয়ম। বৈজ্ঞানিকেরা এই উত্তর দিবেন। অবৈজ্ঞানিক মানুষ এই উত্তর দিতে জানে না। অথচ যেদিন হইতে চাউলের দোকান ধরাধামে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সেই দিন হইতে এই প্রাকৃতিক নিয়মের অস্তিত্ব, আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে মানিয়া আসিতেছে।

এই যে প্রাকৃতিক নিয়ম, ইহার মত ব্যাপক নিয়ম আর নাই। কঠিন, তরল, অনিল, যাবতীয় পদার্থ এই নিয়ম মানিয়া চলে; এমন জিনিস এ পর্য্যন্ত গোচরে আসে নাই, যাহা এই নিয়ম মানে না। কিন্তু তাই বলিয়া কালি যদি এমন কোন নূতন জিনিস আবিষ্কৃত হয়, যাহার বস্তু এক সের, কিন্তু যাহার ভার এক সের সোনার ভারের

সমান নহে, তাহা হইলে তাহাই মানিয়া লইতে হইবে। উহা যে একবারে অসম্ভব, ঐরূপ যে হইতেই পারে না, তাহা বলিবার অধিকার আমাদের নাই। জগতে অসম্ভব কিছুই নাই।

এক সেরের যে ভার, অন্য এক সেরেরও যখন প্রকৃতির বিধানে ঠিক্ সেই ভার, তখন দুই সেরের ভার এক সেরের ভারের দ্বিগুণ, তিন সেরের ভার তিন গুণ হইবে। তা যে জিনিসই লও না কেন। বস্তুর সহিত ভারের এই যে গূঢ় সম্পর্ক, অনৈক্য মধ্যে এই যে ঐক্য, তাহা নিউটনের পূর্ব্বে কেহ স্পষ্ট জানিতেন না। গ্যালিলিও অনেকটা পথ দেখাইয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু নিউটনই নানাবিধ দ্রব্য লইয়া পরীক্ষা করিয়া দেখেন, বস্তু সমান হইলে ভারও সমান হয়। ভার সোণালোহা ভেদ জানে না। এক সের লোহা ও এক সের তূলার বস্তুও সমান, ভারও সমান, তাহা নিউটনের পূর্ব্বে জোর করিয়া বলিবার উপায় ছিল না, অথচ মানুষ নিউটনের কতকাল পূর্ব্ব হইতে অজ্ঞাতসারে ওজন দ্বারা ভার মাপিয়া বস্তু খরিদ করিয়া আসিতেছে।

দেখা গেল, ভূকেন্দ্রাভিমুখে পতন-প্রবৃত্তি হইতে দ্রব্যমাত্রের ভার উৎপন্ন হয়। এই পতন-প্রবৃত্তির নামান্তরই ভার। কিন্তু এই পতন-প্রবৃত্তি সর্ব্বত্র সমান বলবতী নহে, কাজেই স্থানভেদে একই দ্রব্যের ভারের তারতম্য বা ইতরবিশেষ হইয়া থাকে। পতন-প্রবৃত্তি না থাকিলে ভার থাকিত না। ভূকেন্দ্রে অবস্থিত কোন দ্রব্যের ভার থাকিতে পারে না—সে দ্রব্যের পতন-প্রবৃত্তিই থাকিবে না; যাহা ভূকেন্দ্রেই অবস্থিত তাহা আর পড়িবে কোথায়? যাইবে কোথায়? কাজেই, এই ভার একটা আগন্তুক ধর্ম্ম। কিন্তু যাহাকে বস্তু বলা গেল, তাহা আগন্তুক ধর্ম্ম নহে—তাহা স্থায়ী ধর্ম্ম। স্থানভেদে বস্তুভেদ হয় না; কোন দ্রব্যকে যেখানেই লইয়া যাই, তাহার বস্তুর কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন

হইবে না। কাজেই, বস্তুর সহিত ভারের কোন সম্পর্ক নাই। সম্পর্ক এইটুকু যে, কোন স্থানে দুই দ্রব্যের বস্তু সমান হইলে সেখানে ভারও সমান হয়। যাহাতে বস্তু যত অধিক, তাহার ভারও তত অধিক। সম্পর্ক এই পর্য্যন্ত। কোন দ্রব্যের ভারের পরিমাণ মাপিতে হইলে তাহার পতন-প্রবৃত্তি মাপিতে হয়। পতনকালে তাহা কোথায় কত ফুট হিসাবে পড়ে, তাহাই মাপিতে হয়। কিন্তু কোন দ্রব্যের বস্তু মাপিবার সময় পতন-প্রবৃত্তি দেখিবার প্রয়োজন হয় না, সমান জোরে ধাক্কা দিলে কোন্‌টা কত বেগ অর্জ্জন করে, তাহাই দেখিয়া বস্তু নিরূপিত হয়। যে যত অধিক বেগ অর্জ্জন করে, তাহার বস্তু তত অল্প। পূর্ণ কুম্ভের চেয়ে শূন্য কুম্ভের বস্তু অল্প। এক ঘটি দুধের চেয়ে এক ঘটি জলের বস্তু অল্প; এক ঘটি তেলের বস্তু আরও অল্প। ভার ও বস্তু যখন স্বতন্ত্র ধর্ম্ম, তখন উহাদের মাপিবার প্রণালীও স্বতন্ত্র হইবে, তাহাতে বিস্ময় কি? তবে বস্তু সমান হইলে ভারও সমান হয়, বস্তু দ্বিগুণ হইলে ভারও দ্বিগুণ হয়, এই প্রাকৃতিক নিয়মটুকু আবিষ্কৃত হওয়ায় আমাদের এই সুবিধা হইয়াছে, যে দুইটা দ্রব্যের ভার সমান দেখিতে পাইলে তাহাদের বস্তু সমান, ইহা সিদ্ধান্ত করিয়া লই। তুলাদাঁড়ি ও নিকৃতি ভার মাপিবার যন্ত্র, বস্তু মাপিবার যন্ত্র নহে। তুলদাঁড়ি বলিয়া দেয়, এই দুই দ্রব্যের ভার সমান। বস্তু সমান কি না তাহা জানিবার ক্ষমতা তুলদাঁড়ির নাই, অথচ আমরা সিদ্ধান্ত করিয়া লই, উভয় পাল্লার বস্তু সমান। কেননা, প্রকৃতির খেয়ালে ভার সমান হইলে বস্তুও সমান হয়। বস্তুর সম্বন্ধে আরও কথা বলিতে হইবে। ভারের কথাও এখনও শেষ হয় নাই। যে ভূপতন-প্রবৃত্তি হইতে ভার, সেই ভূপতন-প্রবৃত্তি—যাহাকে গুরুগম্ভীর ভাষায় মাধ্যাকর্ষণ বলা হয়—তৎসম্বন্ধে আরও বলিবার আছে।

মাধ্যাকর্ষণ

গল্পে আছে, নিউটন একদিন আপেল ফল গাছ হইতে ভূপতিত হইতে দেখিয়া চিন্তাকুল হইলেন ও ভাবিতে ভাবিতে স্থির করিলেন যে, ফল পড়ে, কেন না, পৃথিবী উহাকে টানে। পৃথিবীর এই টানিবার শক্তির নাম দেওয়া হইল **মাধ্যাকর্ষণ**। এইরূপে ভূপতনের কারণ আবিষ্কার করিয়াছেন বলিয়াই না কি নিউটনের মহত্ত্ব!

এটা কোন কাজের কথাই নহে। আগে বলিয়াছি, পৃথিবী ফলকে টানে বলাও যা, ফল পৃথিবীর দিকে চলে বলাও তা; উভয়ই আলঙ্কারিক ভাষা; বিজ্ঞানের নিকট উভয়েরই এক অর্থ। আপেল ফল যে ঊর্দ্ধমুখে না চলিয়া পৃথিবীর দিকে চলে, তাহা নিউটনের পূর্ব্বেও সকলেই জানিত, মহামূর্খেও জানিত, পশুতেও জানিত। কাজেই, আপেল পৃথিবীমুখে চলে বা পৃথিবী আপেলকে আপনার কাছে টানে, ইহা বলায় কাহারও কোন মহিমা বাড়ে না। আমাদের ভাস্করাচার্য্যও না কি বলিয়াছেন, মহীর আকর্ষণ-শক্তি আছে, তজ্জন্য আকাশের দ্রব্য ভূপতিত হয়। ভাস্করাচার্য্যও মহাপুরুষ ছিলেন, কিন্তু তাঁহার মহত্ত্ব এই কারণে প্রতিষ্ঠিত নহে। পৃথিবী ফলকে টানে বা আকর্ষণ করে, তাহা মূর্খেও যেমন জানিত, নিউটনও তেমনই জানিতেন। কেন এবং কিরূপে টানে তাহা তখনও কেহ জানিত না, এখনও কেহ জানে না; নিউটনও তাহার কারণ বাহির করিতে পারেন নাই। তবে নিউটনের মহত্ত্ব কিসে? নিউটন করিয়াছেন কি?

নিউটনের একটা কাজ আগেই বলিয়াছি। পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ, যাহার নামান্তর ভার, প্রাকৃতিক নিয়মে বা প্রকৃতির খেয়ালে তাহা

কেবল বস্তুর অপেক্ষা করে,—সেই বস্তু সোনা কি লোহা, জল না বায়ু, তাহা দেখে না,—তাহা নিউটনই স্পষ্টরূপে নানাবিধ দ্রব্য লইয়া পরীক্ষা করিয়া প্রতিপন্ন করেন।

মাধ্যাকর্ষণের জগদ্ব্যাপ্তিতা

আর করেন কি? নিউটন প্রতিপন্ন করেন যে, মাধ্যাকর্ষণ যে পৃথিবীর নিকটেই আবদ্ধ আছে, তাহা নহে; উহা বহুদূরব্যাপী; এমন কি, চন্দ্রের নিকটও পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের পরিচয় পাওয়া যায়। পৃথিবীর কেন্দ্র হইতে পৃথিবীর পিঠ ৪০০০ মাইল দূরে; আর চন্দ্র তাহার ষাটি গুণ দূরে অর্থাৎ ২, ৪০, ০০০ মাইল দূরে; এত দূরেও পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ রহিয়াছে।

কিসে জানিলে? মাধ্যাকর্ষণের কাজ কি? উহার কাজ বেগ বাড়ান,—পৃথিবীর কেন্দ্র-অভিমুখে সকল দ্রব্যের পতনবেগ বাড়ান। বেগ বাড়ে দেখিয়াই আমরা বলি মাধ্যাকর্ষণ বল আছে। বেগ না বাড়িলে মাধ্যাকর্ষণের নামও করিতাম না। নিউটন দেখাইলেন যে, চাঁদমামা পৃথিবীর কেন্দ্রাভিমুখে চলিবার জন্য অবিরাম চেষ্টা করিতেছেন। সেই চেষ্টা করিতেছেন বলিয়াই তিনি সাতাইশ দিনে পৃথিবীর চারিদিকে ভ্রমণ করিতে বাধ্য আছেন, নতুবা এতদিন পৃথিবী ছাড়িয়া তিনি কোথায় চলিয়া যাইতেন, তাহার স্থিরতা নাই। চন্দ্র ক্রমাগত পৃথিবীর দিকে চলিতেছেন,—চলিতেছেন বলিয়াই তাঁহার বক্ররেখায় বৃত্তাকার পথে পরিভ্রমণ; নতুবা ঋজুরেখায় তিনি কোথায় যাইতেন কে জানে!

প্রশ্ন উঠিতে পারে, নারিকেল ত বোঁটা খসিলেই সোজা ভূপতিত হয়। চাঁদকে ত কখনও আকাশ হইতে খসিয়া কাহারও মাথায়

পড়িতে দেখি না ; তবে চাঁদের পতন-প্রবৃত্তি আছে, কিরূপে মানিব ? মোটামুটি এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যাইতে পারে।

একখানা ইট হস্তচ্যুত হইলে নীচে পড়ে, কিন্তু তাহাকে বেগে সম্মুখে ছুড়িয়া ফেলিলে ঠিক্ নীচে পড়ে না, সম্মুখে কিছুদূর চলিয়া অবশেষে কিছুদূরে ভূপতিত হয়। পতন-প্রবৃত্তি এড়াইতে পারে না বলিয়াই ভূপতিত হয় ; তবে যত বেগে সম্মুখে ছুড়িবে, তত অধিক দূরে যাইয়া ভূমি স্পর্শ করিবে। ছাদের জল পয়োনালী দিয়া পড়িবার সময় উহার পথ যেমন বাঁকা হয়, গাড়ুর মুখ হইতে জল যেরূপ বক্রপথে বাহির হইয়া ভূপতিত হয়, সম্মুখে প্রক্ষিপ্ত লোষ্ট্রখণ্ডের পথও কতকটা সেইরূপ বাঁকা। পিস্তলের গুলি বেগে চলিয়া অনেক দূরে পড়ে, বন্দুকের গুলি আরও বেগে চলিয়া আরও দূরে পড়ে ; কামানের গোলা প্রচণ্ড বেগে চলিয়া বহুদূরে কয়েক মাইল দূরে পড়ে—শেষ পর্য্যন্ত পড়িতেই হয়। তেমন কামান এখনও তৈয়ার হয় নাই, কিন্তু ইহা মনে করা অসম্ভব নহে যে, কলিকাতায় কামান ছুড়িয়া দিল্লীর কেল্লা ভাঙ্গিয়া দিলাম। ফলে, ইহা বেশ কল্পনা চলিতে পারে যে, বাঙ্গালায় বসিয়া কামান ছুড়িলাম, সেই গোলা প্রচণ্ড বেগে ছুটিয়া দিল্লীতে পড়িল ; আরও বেগে ছুড়িলাম, দিল্লী ছাড়িয়া মক্কায় অথবা মক্কা ছাড়িয়া আফ্রিকার সাহারা মরুভূমিতে পড়িল। এখানেই বা থামিবে কেন ? সমুচিত বেগে ছুড়িতে পারিলে আফ্রিকা পার হইয়া আটলাণ্টিক সমুদ্রে, অথবা আটলাণ্টিক ডিঙ্গাইয়া প্রশান্ত মহাসাগরের কোন দ্বীপে গিয়া পড়িল। আরও কিছু বেগে ছুড়িতে পারিলে কামানের গোলা প্রশান্ত মহাসাগর পার হইয়া মগের মুলুক অতিক্রম করিয়া পুনরায় বাঙ্গালা দেশে স্বস্থানে আসিয়া পড়িতে পারে। এইরূপে সেই গোলা পৃথিবীটাকে একচক্র ঘুরিয়া আসিতে পারে। আরও কিছু বেগ দিতে পারিলে গোলাটা

বাঙ্গালাদেশে আসিয়াও মাটি ছুইবার অবকাশ পাইবে না, আবার দিল্লীমুখে বা মক্কামুখে ছুটিয়া আর একচক্র ঘুরিবে অথবা পুনঃপুনঃ চক্র দিতে থাকিবে। পৃথিবীতে পড়িবেই না, কেবল ঘুরিয়া মরিবে মাত্র। বস্তুতই কত বেগে গোলা ছুড়িলে উহা আর ভূপৃষ্ঠ স্পর্শ করিবার অবকাশ পাইবে না, কেবল পৃথিবীকে চক্র দিয়া ঘুরিয়া বেড়াইবে, তাহা হিসাব করিয়া বলা কঠিন নহে। পৃথিবী কত বড় তাহা যখন জানা আছে, উহার ব্যাস যখন ৮০০০ মাইল মাত্র, তখন এই বেগ যে অপরিমেয়, তাহা মনে করিবার দরকার নাই। গোলাটা ঘুরিয়া বেড়ায়, কিন্তু পৃথিবী ছাড়িয়া একেবারে পলাইতে পারে না; কবির ভাষায় বলিতে গেলে গোলাটা যেন ঘানিগাছের বলদের মত পৃথিবীর আকর্ষণে বদ্ধ থাকিয়া পৃথিবীর চারিদিকে ঘুড়িয়া বেড়ায়। চাঁদও ঐরূপে পৃথিবীর আকর্ষণে বদ্ধ হইয়া ঘুরিতেছেন।

চন্দ্র ভূকেন্দ্রাভিমুখে চলিতেছেন, বেগে চলিতেছেন, বেগ অর্জ্জন করিতে করিতে চলিতেছেন, ইহা আপাততঃ বোধ হয় না; কিন্তু নিউটনের হিসাবে চন্দ্রের এই বেগার্জ্জন ব্যাপার ধরা পড়িয়াছিল। চন্দ্রের ভূকেন্দ্রাভিমুখ বেগ সেকেণ্ডে কতটুকু বাড়িতেছে, তাহা নিউটন হিসাব করিয়া দেখিলেন। দেখিলেন, যে প্রতি সেকেণ্ডে চন্দ্রের বেগবৃদ্ধি অতি অল্প; ভূপৃষ্ঠে সকল দ্রব্যের বেগবৃদ্ধি সেকেণ্ডে ৩২ ফুট্; চন্দ্রের পৃথিবীমুখে বেগবৃদ্ধি সেকেণ্ডে উহার ৩৬০০ ভাগের একভাগ।

ভূকেন্দ্র হইতে চন্দ্রের দূরত্ব ভূপৃষ্ঠের দূরত্বের ৬০ গুণ, আর চন্দ্রের বেগবৃদ্ধির হার ৩৬০০ ভাগের এক ভাগ। ৩৬০০ = ৬০ × ৬০; কি বিচিত্র ব্যাপার! দূরত্ব যত অধিক, বেগবৃদ্ধির হার তাহার বর্গের অনুপাতে তত অল্প!

দ্রব্যের ভূপতন-চেষ্টার ফলে ভার জন্মে; মাধ্যাকর্ষণের নামান্তরই ভার। চন্দ্রের ভূপতন-চেষ্টা আছে, তখন চন্দ্রে অবস্থিত সকল দ্রব্যে এবং চন্দ্রের নিকটবর্ত্তী সকল দ্রব্যেও ভূপতন-চেষ্টার ফলে কিছু না কিছু ভার থাকিবে। তবে সেই ভার—সেই পৃথিবীমুখে পতন-প্রবৃত্তি—ভূপৃষ্ঠস্থিত দ্রব্যের তুলনায় নিতান্ত অল্প হইবে। ভূপৃষ্ঠে এক সের বস্তুর যে ভার, চন্দ্রমণ্ডলে অবস্থিত এক সের বস্তুর পৃথিবীর অভিমুখে পতন-প্রবৃত্তি অর্থাৎ ভার তার ৩৬০০ ভাগের এক ভাগ হইবে। অথবা ভূপৃষ্ঠে এক সেরের যে ভার, চন্দ্রে ৩৬০০ সেরের বা ৯০ মণের সেই ভার। পৃথিবীর অভিমুখে ভার বলিলাম; কেন না, চন্দ্রের অভিমুখেও আবার চন্দ্রস্থ দ্রব্যের ভার আছে, তাঁহার পরিমাণ স্বতন্ত্র। ৯০ মণ লোহার বস্তুপরিমাণ চন্দ্রেও ৯০ মণ, পৃথিবীতেও ৯০ মণ; কিন্তু পৃথিবীতে এক সেরের যে ভার, চন্দ্রের ৯০ মণের ভার ততটুকু মাত্র। নিউটন এই অজ্ঞাতপূর্ব্ব তথ্যের আবিষ্কর্ত্তা। নিউটন আর কি আবিষ্কার করেন? চন্দ্র যেমন পৃথিবীর চারিদিকে বৃত্তাকার পথে ভ্রমণ করে, পৃথিবীও সেইরূপ সূর্য্যের চারিদিকে বৃত্তাকার পথে ভ্রমণ করে; চন্দ্র যেমন পৃথিবীর মুখে পতনশীল, পৃথিবীও তেমনি সূর্য্যের মুখে পতনশীল। কেবল পৃথিবী কেন, বুধ শুক্র মঙ্গল বৃহস্পতি ও শনি গ্রহও ঠিক্ সেইরূপে সূর্য্যের চারিদিকে বৃত্তাকার পথে ভ্রমণ করে। নিউটন দেখিলেন, প্রত্যেক গ্রহই সূর্য্যের অভিমুখে পতনশীল, বর্দ্ধমান বেগে পতনশীল। সূর্য্য হইতে উহাদের দূরত্ব নিউটনের জানা ছিল; নিউটন হিসাব করিয়া দেখিলেন, বেগের বৃদ্ধি সর্ব্বত্রই দূরত্বের বর্গের অনুপাতে অল্প। যাহার দূরত্ব তিন গুণ অধিক, তাহার বেগবৃদ্ধি নয় ভাগের এক ভাগ, এইরূপ হিসাব। অর্থাৎ, মাধ্যাকর্ষণের ক্রিয়া সর্ব্বত্র একই নিয়মের অধীন। জাগতিক ঘটনার বহু অনৈক্যের মধ্যে নিউটন এই

ঐক্য খুঁজিয়া বাহির করিলেন। নিউটনের পূর্ব্বে কেহ এ সন্ধান পান নাই।

প্রকৃতির ইহা আর একটা খেয়াল; কেন এই খেয়াল, তাহা নিউটনও জানিতেন না, তার পরেও এ পর্য্যন্ত কেহ বুঝাইতে পারেন নাই; কিন্তু এই সৌরজগদ্ব্যাপী প্রাকৃতিক খেয়ালের আবিষ্কর্ত্তা নিউটন।

কেবল যে পৃথিবীর অভিমুখে চন্দ্রের, আর সূর্য্যের অভিমুখে গ্রহগণের এই পতন-প্রবৃত্তি, এই বর্দ্ধমান বেগে পতন-প্রবৃত্তি, তাহা নহে; নিউটন দেখিলেন, গ্রহগণের পরস্পরের মধ্যেও এই ভাবে একই নিয়মে একই বিধানে পরস্পরের অভিমুখে চলিবার প্রবৃত্তি আছে।

সূর্য্য হইতে মঙ্গল নিকটে, বৃহস্পতি দূরে; উভয়ই সূর্য্যকে কেন্দ্রস্থল করিয়া ঘানিগাছের বলদের মত ঘুরিতেছে। মঙ্গলের ভ্রমণপথ ভিতরে, বৃহস্পতির ভ্রমণপথ বাহিরে। মঙ্গল সূর্য্যের মাধ্যাকর্ষণে সূর্য্যের চারিদিকে বৃত্তাকার পথে ভ্রমণ করে; কিন্তু বাহিরে বৃহস্পতি থাকায় তাহারও দিকে মঙ্গলের টান আছে; তাই মঙ্গল ঠিক্ সেই বৃত্তাকার পথে চলিতে পারে না; একটু বৃহস্পতির দিকে হেলিয়া চলে। এখানেও বেগবৃদ্ধির সহিত দূরত্বের সেই অনুপাত। কিঞ্চিৎমাত্র হেলিয়া চলে, কেন না সূর্য্যের বস্তুর কাছে বৃহস্পতির বস্তুপরিমাণ অতি অল্প।

নিউটন দেখাইলেন, সৌরজগতের সর্ব্বত্রই এই একই নিয়মের রাজত্ব;—একবার কবির ভাষার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না। প্রত্যেক দ্রব্য অপর দ্রব্যের অভিমুখে চলিতে চাহিতেছে, ঐ নিয়মে। নিউটন সৌরজগদ্ব্যাপী এই প্রাকৃতিক নিয়মের আবিষ্কর্ত্তা। এই জন্য নিউটনের মহত্ত্ব। এই মহত্ত্বের স্পর্দ্ধা পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় ব্যক্তি করিতে পারেন না।

মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম

নিউটন কি আবিষ্কার করিয়াছিলেন? প্রথম, মাধ্যাকর্ষণ বস্তু-ধর্ম্মের অপেক্ষা করে। যে দ্রব্যের বস্তু যত অধিক, সেই দ্রব্যের মাধ্যাকর্ষণ তত অধিক। এক সের সোনার যে ভার, দুই সের সোনার ভার তাহার দ্বিগুণ, দুই সের লোহার বা তুলারও ভার সেই দ্বিগুণ। পার্থিব দ্রব্যমাত্রই এই নিয়মে ভূকেন্দ্রমুখে পতনশীল। দ্বিতীয়, চন্দ্র এবং তৎসন্নিহিত দ্রব্য এত অধিক দূরে থাকিয়াও ভূকেন্দ্রপ্রতি পতনশীল, তবে সেখানে দূরত্ব অধিক বলিয়া মাধ্যাকর্ষণ অল্প। দূরত্ব যত অধিক, মাধ্যাকর্ষণ তাহার বর্গানুসারে অল্প। তৃতীয়, নারিকেল যেমন ভূমি-মুখে পতনশীল, চন্দ্র যেমন ভূমি-মুখে পতনশীল, পৃথিবীও সেইরূপ সূর্য্য-মুখে পতনশীল। পৃথিবী কেন, বুধ শুক্র হইতে শনি পর্য্যন্ত সমুদয় গ্রহ সূর্য্যের মুখে সেইরূপ পতনশীল; পতনশীল বলিয়াই তাহারা সূর্য্যের চারিদিকে ঘুরিতেছে; নতুবা সূর্য্যকে ত্যাগ করিয়া কোথায় চলিয়া যাইত কে জানে! আবার গ্রহগুলি যে যত দূরে আছে, তাহার পতন-প্রবৃত্তি দূরত্বের বর্গানুসারে তত অল্প; যে দ্বিগুণ দূরে, তাহার পতন-শীলতা চতুর্থাংশ; যে দশগুণ দূরে তাহার পতনশীলতা শতাংশ। এই-রূপ নিয়ম। চতুর্থ, গ্রহগুলি যেমন সূর্য্যের অভিমুখে পতনশীল, তাহারা পরস্পরের অভিমুখেও তেমনি পতনশীল। মঙ্গল গ্রহ সূর্য্যে পড়িতে চায়, বৃহস্পতি সূর্য্যে পড়িতে চায়; আবার মঙ্গল বৃহস্পতির দিকেও পড়িতে চায়; ফলে মঙ্গল সূর্য্য প্রদক্ষিণ করে বটে, তবে বৃহস্পতির দিকে একটু হেলিয়া একটু ঝুঁকিয়া চলে। সূর্য্যের দিকে ঝোঁকটাই প্রবল, বৃহস্পতির দিকে ঝোঁক যৎসামান্য—কেন না এই পতন-প্রবৃত্তি—যাহাকে বলি মাধ্যাকর্ষণ—সেই পতন-প্রবৃত্তি বস্তুসাপেক্ষ।

সূর্য্য প্রকাণ্ড বস্তু, বৃহস্পতি তাহার নিকট ক্ষুদ্র; পৃথিবীর সহিত তুলনায় দেখা যায়, সূর্য্যের বস্তু পৃথিবীর তিনলক্ষগুণ; বৃহস্পতির বস্তু পৃথিবীর তিনশত গুণ মাত্র। কাজেই, মঙ্গলের ঝোঁক সূর্য্যের দিকেই অধিক, বৃহস্পতির দিকে অতি অল্প—অল্প বটে, কিন্তু একেবারে নগণ্য নহে। একটামাত্র দৃষ্টান্ত দেওয়া গেল। সকল গ্রহের পক্ষেই এইরূপ; সকলেরই পরস্পরের দিকে একআধটু ঝোঁক আছে, সেই ঝোঁক বা পতন-প্রবৃত্তি বা মাধ্যাকর্ষণ সর্ব্বত্রই প্রথমতঃ বস্তুসাপেক্ষ অর্থাৎ যাহার বস্তু যত অধিক, তৎপ্রতি পতন-প্রবৃত্তিও তত অধিক; এবং দ্বিতীয়তঃ, দূরত্বসাপেক্ষ অর্থাৎ যাহার দূরত্ব যত অধিক, তাহার পতন-প্রবৃত্তি দূরত্বের বর্গানুসারে তত অল্প। নিউটন এতগুলি নিয়ম আবিষ্কার করিলেন, এবং দেখিলেন, এই বিশাল সৌরজগতের মধ্যে আম জাম নারিকেল হইতে গ্রহ উপগ্রহ চন্দ্র সূর্য্য ক্ষুদ্রবৃহৎ সকল দ্রব্যের পরস্পর এই পতনোন্মুখতা রহিয়াছে, এই পতনশীলতা প্রত্যেক দ্রব্যের বস্তু অনুসারে বৃদ্ধি পায়, আর দূরত্বের বর্গ অনুসারে হ্রাস পায়। ইহাই প্রাকৃতিক নিয়ম। সৌরজগৎ ব্যাপিয়া এই নিয়ম বিদ্যমান; চিরদিন ধরিয়াই এই নিয়ম আছে; কেন আছে কি উদ্দেশ্যে আছে, নিউটন তাহা জানিতেন না, নিউটনের পরেও কেহ জানেন নাই। কিন্তু এত বড় জগৎ ব্যাপিয়া এই যে একটা নিয়ম—এই যে একটা শৃঙ্খলা—এত অনৈক্যের মধ্যে এই ঐক্য—ইহা যে রহিয়াছে, তাহা নিউটনের পূর্ব্বে কেহ জানিত না। নিউটন দিব্যনেত্রে তাহা দেখিয়াছিলেন এবং অন্যকে দেখাইয়াছিলেন। এই নিয়ম হয়ত অনাদি—অর্থাৎ কতকাল হইতে ইহা বিদ্যমান, তাহা কেহ জানে না। কিন্তু অন্যের চোখে ইহা পড়ে নাই। নিউটনের দৃষ্টিতে পড়িয়াছিল। নিউটন ইহার দ্রষ্টা—নিউটন ইহার ঋষি।

আগে বলিয়াছি, যাহা পর্য্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা দ্বারা প্রত্যক্ষগোচর হয়, তাহাই প্রাকৃতিক নিয়ম। আড়াইশত বৎসরও এখনও হয় নাই, নিউটন পরীক্ষা দ্বারা স্থির করেন, মাধ্যাকর্ষণের সহিত কেবল বস্তুর সম্পর্ক; অন্য ধর্ম্মের সম্পর্ক নাই। যাহার বস্তু যত অধিক, তাহার ভার তত অধিক, তৎপ্রতি প্রযুক্ত মাধ্যাকর্ষণ তত অধিক। নিউটন সৌর-জগতে গ্রহ-উপগ্রহের গতিবিধি অন্বেষণ করিয়া পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা মাধ্যাকর্ষণের সহিত দূরত্বের সম্পর্ক বাহির করেন। এখানে পরীক্ষা চলে না; কেন না, গ্রহ-উপগ্রহের গতিবিধি ইচ্ছামত নিয়মিত করা যায় না।

কিন্তু এইরূপ প্রাকৃতিক নিয়মের আবিষ্কার নূতন জ্ঞান অর্জ্জনে সাহায্য করে; ইহাতে পথ দেখাইয়া দেয়; কোন্ দিকে চলিলে নূতন তথ্যের সংবাদ জানিব, সেই পথ দেখায়। কেবল অন্ধের মত হাত্‌ড়াইতে থাকিলে দৈবক্রমে জ্ঞান অর্জ্জিত হইতে পারে, কিন্তু বৈজ্ঞানিকেরা প্রকৃতির নিয়ম আবিষ্কার দ্বারা দীপশিখা জ্বালিয়া নূতন জ্ঞান লাভের পন্থা দেখাইয়া দেন। মানুষ তখন জ্ঞানের সোপানে আরোহণ করিতে সমর্থ হয়।

একটা উৎকৃষ্ট উদাহরণ আছে। নিউটনের শত বর্ষ পরে ইংলণ্ডে হর্শেল নামে জ্যোতির্ব্বিৎ ছিলেন। তিনি স্বহস্তনির্ম্মিত বৃহৎ দূরবীণ দ্বারা একটি নূতন গ্রহ আবিষ্কার করেন; উহার ভ্রমণপথ শনিরও বাহিরে। উহার ইংরাজি নাম উরেনস্। আমরা বলিব বরুণগ্রহ। আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা যে দেবতাকে বরুণ বলিতেন, গ্রীকেরা না কি এককালে সেই দেবতাকেই উরেনস্ বলিতেন; এই জন্যই বরুণ নাম সঙ্গত হইবে। উহার গতিবিধি আলোচনা করিয়া দেখা গেল, সূর্য্য ও অন্যান্য গ্রহের সমীপে যে-পথে চলা উচিত ছিল, সে-পথে না চলিয়া

ঐ গ্রহ একটু বাহির ঘেঁষিয়া চলিতেছে। নিউটনের আবিষ্কৃত নিয়মে এইরূপে বাহির ঘেঁষিয়া চলার কারণ অনুমিত হয়। অনুমান হয় যে, বরুণেরও বাহিরে আর একটি গ্রহ আছে, যাহার টানে—যাহার দিকে পতন-প্রবৃত্তির ফলে—বরুণের পথ ঐ দিকে হেলিয়াছে। কোথায় কত দূরে একটা গ্রহ থাকিলে ভ্রমণপথের ঠিক্ সেই ব্যতিক্রমটুকু ঘটিবে, তাহার হিসাব করিতে পাকা গণিতজ্ঞ আবশ্যক। কিছুদিন পরে আডাম্‌স্ নামক ইংরেজ গণিতবিৎ হিসাব করিয়া বলিলেন, আকাশের অমুক স্থানে সেই গ্রহ থাকা উচিত। আডম্‌স্ তাঁহার কাগজপত্র রাজকীয় মানমন্দিরের অধ্যক্ষ জ্যোতির্ব্বিৎ এয়ারির নিকট পাঠাইলেন। এয়ারি তাহা বাক্সতে ফেলিয়া রাখিলেন। এ দিকে ফরাসী জ্যোতিষী লেবেরিয়ে হিসাব করিয়া ঠিক্ সেই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া তাঁহার সিদ্ধান্ত প্রচার করিয়া ফেলিলেন। এক জন জর্ম্মাণ জ্যোতিষী লেবেরিয়ের নির্দ্দিষ্ট নভঃস্থলের অভিমুখে দূরবীণ ধরিয়া নূতন গ্রহটি আবিষ্কার করিয়া ফেলিলেন। আডাম্‌সের কাগজপত্র তখনও এয়ারি সাহেবের বাক্সে। এই নবাবিষ্কৃত গ্রহের ইংরেজি নাম দেওয়া হইল নেপ্‌চুন। আমরা কি নাম দিব? একজন বড় দেবতার নাম দিতে হইবে। বরুণের সহচর ছিলেন মিত্র। 'মিত্রাবরুণৌ' এই যুগল দেবতা প্রসিদ্ধ। আমরা নেপচুনের নাম দিলাম মিত্র।

নেপ্‌চুনের বাহিরে আর কোন নূতন গ্রহ এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। নেপ্‌চুনের ভ্রমণপথই এখন সৌরজগতের সীমা বলিয়া গৃহীত হয়। উহার বাহিরে তারাজগৎ; কত কোটি তারকা বিশ্বজগতে ছড়াইয়া আছে; এক একটা তারকা এক একটা সূর্য্য; অনেকে সূর্য্যের চেয়েও বৃহৎ ও জ্যোতিষ্মান্; হয়ত তাহাদেরও গ্রহ-উপগ্রহ আছে। প্রশ্ন উঠে, এই সকল তারকা-সমূহের মধ্যেও

মাধ্যাকর্ষণের নিয়মানুযায়ী পরস্পরের অভিমুখে গতিবিধির প্রমাণ আছে কি না?

উত্তর দেওয়া কিছু কঠিন। উহাদের পরস্পরের দূরত্ব এত অধিক যে, তাহাদের পরস্পরের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া আমাদের গোচরই হয় না। অধিকাংশ তারার দূরত্ব আমরা জানি না। গোটা কয়েকের মোটামুটি জানা গিয়াছে; তাহার মধ্যে যেটা সব চেয়ে নিকটে আছে বলিয়া জানা গিয়াছে, আমরা তাহার আলো পাইতে সাড়ে চারি বৎসর অতীত হয়। আলো সেকেণ্ডে প্রায় লক্ষক্রোশ বেগে চলে। সূর্য্য পৃথিবী হইতে প্রায় সাড়ে চারি কোটি ক্রোশ দূরে থাকে; উহার আলো পৃথিবীতে আসিতে আট মিনিট মাত্র লাগে। যাহার আলো আসিতে সাড়ে চারি বৎসর লাগে, তাহার দূরত্ব কি ভীষণ! সেই তারার গতিবিধির সহিত সূর্য্যের কোনও সম্পর্ক থাকিলেও সে সম্পর্ক এত ক্ষীণ, যে তাহা সম্প্রতি যন্ত্রযোগে মাপিয়া ধরিবার আশা নাই। এইরূপ তারায় তারায় সম্পর্ক।

তবে গোটাকতক উদাহরণ আছে; গোটাকতক জোড়া তারকার সন্ধান পাওয়া গিয়াছে; জোড়ার মধ্যে একটা অন্যটার গতি নিয়ন্ত্রিত করিতেছে, পরস্পরের গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত করিতেছে। উহাদের ভ্রমণপথ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখা যায় যে, নিউটনের আবিষ্কৃত মাধ্যাকর্ষণের নিয়মের সহিত উহাদের গতিবিধির সামঞ্জস্য আছে। ইহাই দেখিয়া বলিতে সাহস হয়, সৌরজগতের বাহিরেও মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম বর্ত্তমান।

বৈজ্ঞানিক গ্রন্থে প্রায় দেখা যায়,—মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম বিশ্বব্যাপী। এত বড় কথাটা বলিবার পূর্ব্বে একটু থামা উচিত; প্রথমেই ভাবা উচিত, বিশ্বজগৎ কি?

সহজ চোখে নির্ম্মল আকাশে হাজার পাঁচ ছয় তারা দেখা যায়। উৎকৃষ্ট দূরবীণের সাহায্যে চক্ষুর অগোচর বহু লক্ষ তারকা দেখা যায়; অধিক দূরের তারা হইতে আলো আসিতে হয় ত কত সহস্র বা কত লক্ষ বৎসর অতিক্রান্ত হয়। আরও দূরে হয়ত আরও তারা রহিয়াছে, তাহারা এখনও দূরবীণেও ধরা পড়ে নাই। এই তারকা-জগতের সীমা কোথায়, তাহা আমরা ঠিক্ জানি না; সীমা আছে কি নাই, তাহাও নিশ্চিত বলিতে পারি না।

বিশ্বজগতের যে অংশের সহিত আমাদের যৎকিঞ্চিৎ পরিচয়, তাহার মধ্যে সৌরজগতে ও সৌরজগতের বহিঃস্থিত গোটাকতক তারকার মধ্যে মাধ্যাকর্ষণের ক্রিয়া দেখিতে পাই; ইহা লইয়া মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম বিশ্বব্যাপী, এত বড় কথা এক নিশ্বাসে বলিবার পূর্ব্বে একটু থামা উচিত। হয় ত মাধ্যাকর্ষণ বিশ্বব্যাপী, হয় ত নহে। বিজ্ঞানের পক্ষে এই প্রশ্নের উত্তর এই পর্য্যন্ত।

পৃথিবীর মত একটা বৃহৎ জড়পিণ্ডের সমীপে আম জাম আকৃষ্ট হয় বা অতিদূরবর্ত্তী চন্দ্রপর্য্যন্ত আকৃষ্ট হয়। আবার অতি বৃহৎ জড়পিণ্ড যে সূর্য্য, যাহার আয়তন বার লক্ষ পৃথিবীর সমান ও যাহার বস্তু তিন লক্ষ পৃথিবীর বস্তুর সমান, সেই প্রকাণ্ড সূর্য্যের অভিমুখে অতি দূরবর্ত্তী মিত্রগ্রহ পর্য্যন্ত আকৃষ্ট হয়, ইহাও দেখা গেল। কিন্তু একটা নারিকেল ফল আর একটা নারিকেল ফলকে আকৃষ্ট করে কি না? নিউটন বলিয়াছিলেন, যাহার বস্তুপরিমাণ যত, তাহার আকর্ষণ তত। সূর্য্য নক্ষত্র গ্রহ উপগ্রহের তুলনায় নারিকেল ফলের বস্তু এত অল্প যে, একটা নারিকেলের অতি নিকটেও আর একটা নারিকেল রাখিয়া উভয়ের মধ্যে আকর্ষণ আমাদের ইন্দ্রিয়গোচর করা সাধ্য বলিয়া মনে না হইতে পারে। কিন্তু এক সময়ে যাহা অসাধ্য থাকে, অন্য সময়ে

তাহা সাধ্য হয়। নিউটনের বহুদিন পরে ক্যাবেণ্ডিশ সূক্ষ্ম কৌশল উদ্ভাবন করিয়া দেখাইলেন, একটা সীসার গোলা আর একটা সীসার গোলার দিকে আকৃষ্ট হইয়া থাকে।

দুইটা গোলার মধ্যে কোন্‌টা আকৃষ্ট হয়? এটা ওটার দিকে, ওটা এটার দিকে আকৃষ্ট হয়। উপরে যুগল তারার কথা বলিয়াছি; এও কতকটা সেইরূপ। দুইটা তারার মধ্যে এটা ওটার দিকে আকৃষ্ট হয়। আকর্ষণটা পরস্পর। তবে দুইটার মধ্যে একটা তারা সেকেণ্ডে যে বেগ অর্জ্জন করে, অন্যটা সেকেণ্ডে ঠিক্ সেই বেগ অর্জ্জন না করিতে পারে। কোন্ তারার কতটা বস্তু, এই বেগ-বৃদ্ধির মাত্রা দেখিয়া তাহা সহজেই নির্দ্ধারিত হয়। বস্তু শব্দের আমরা যে পারিভাষিক অর্থ গ্রহণ করিয়াছি, তদনুসারে সমান ধাক্কায় যাহার বেগ-বৃদ্ধি অধিক, তাহার বস্তু অল্প,—যত অধিক, তত অল্প। মনে কর, ১নং তারা সেকেণ্ডে যে বেগ অর্জ্জন করে, ২নং তারা সেকেণ্ডে তাহার দশ গুণ বেগ অর্জ্জন করিতেছে। ঘড়ি ধরিয়া দূরত্ব মাপিয়া হিসাব করিয়া ইহাই দেখা গেল। এখন পূর্ব্বদত্ত পারিভাষিক অর্থ অনুসারে ২নং তারার বস্তু অল্প, ১নং তারার বস্তু অধিক। কত অধিক? দশগুণ অধিক। ২নং তারার বস্তু যদি এক সের হয়, ১নং তারার বস্তু দশ সের। ২নং তারার বস্তু যদি হয় কোটি মণ, ১নং তারার বস্তু দশ কোটি মণ।

ইহার ফলে এই দাঁড়ায় যে, ১নং তারার বেগ-বৃদ্ধির পরিমাণকে উহার বস্তুর পরিমাণ দিয়া গুণ করিলে যে গুণফল পাওয়া যায়, ২নং তারার বেগ বৃদ্ধির পরিমাণকে উহার বস্তু-পরিমাণ দিয়া গুণ করিলেও সেই গুণফল পাওয়া যাইবে। প্রথমের গুণফলের নাম দাও ক্রিয়া, উহা দ্বিতীয়ের অভিমুখে; দ্বিতীয়ের গুণফলের নাম দাও প্রতিক্রিয়া,

উহা প্রথমের অভিমুখে। ফল হইল, ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া উভয়ই সমান ও পরস্পর বিপরীতমুখ।

ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া

ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার পূর্ব্বোক্ত সমানতা নিউটনের প্রণীত অন্যতম গতির নিয়ম নামে পরিচিত। নিউটন বলিয়াছেন,—যেখানে ক্রিয়া, সেই খানেই তাহার বিপরীতমুখে প্রতিক্রিয়া এবং ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া উভয়ের মাত্রা সমান।

এই নিয়মটিকে প্রাকৃতিক নিয়ম বলিব কি না? না, ইহা প্রাকৃতিক নিয়ম নহে। দুইটা বস্তুর পরস্পরের প্রতি গতিবিধি দেখিয়া কোন্‌টা কত বেগ অর্জ্জন করিল, কোন্‌টার বেগ কত বাড়িল, স্থির করি এবং যাহার বেগবৃদ্ধি যত অধিক, তাহার বস্তু তত অল্প, ইহাই স্থির করি। বস্তু শব্দের তাৎপর্য্যই ইহাই; বস্তু শব্দকে আমরা এই নির্দ্দিষ্ট পারিভাষিক অর্থ ইচ্ছাপূর্ব্বক দিয়াছি। যাহার বেগ যত অধিক তাহার বস্তু যদি তত অল্প বলা যায়, তাহা হইলে অর্জ্জিত বেগ ও বস্তুর পরিমাণ এই উভয়ের গুণফল ত সমান থাকিবেই। ছেলেদের ডাকিয়া যার যত বয়স অধিক, তাহার হাতে যদি তত অল্প সন্দেশ দিই, তাহা হইলে প্রত্যেকের বয়সের বৎসরের সংখ্যাকে তাহার সন্দেশের সংখ্যা দিয়া গুণ করিলে গুণফল ত সমান হইবেই। ইহাতে প্রকৃতির খেয়াল চলিবে না। ইহা বরং আমার খেয়াল। ইহাকে প্রাকৃতিক নিয়ম বলা চলিবে না। ইহা আবিষ্কারের জন্য পর্য্যবেক্ষণ বা পরীক্ষা আবশ্যক হইবে না। ঘরে বসিয়া চোখ বুজিয়া আমি ইহা বলিতে পারিব। বস্তু শব্দের যখন পারিভাষিক সংজ্ঞাই এই, তখন বস্তু শব্দটি ঐ অর্থে প্রয়োগ না

করিয়া অন্ত অর্থে প্রয়োগ করা সচ্ছন্দে চলিত। তাহা হইলে ক্রিয়ার মাত্রা প্রতিক্রিয়ার মাত্রার সমান হইত না। কাজেই, এই যে নিয়ম, ইহা প্রাকৃতিক নিয়ম নহে; উহা একটা পারিভাষিক সূত্রমাত্র।

কিন্তু এইখানে আর একটি কঠিন প্রশ্ন আসে। মনে কর, যুগল নক্ষত্রের বদলে ক্যাবেণ্ডিশের গোলাই লইলাম। দুইটি গোলার বদলে তিনটি গোলা লইলাম। একটি সীসার, একটি রূপার, একটি সোনার। সীসার গোলাটি এক সের। সীসার গোলার নিকট রূপার গোলা রাখিয়া দেখিলাম, রূপার বেগ-বৃদ্ধির পরিমাণ সীসার সমান। অতএব বলা গেল, রূপার গোলাটির বস্তুও এক সের। আবার সীসার গোলার নিকট সোনার গোলা রাখিয়া দেখিলাম, সোনার বেগবৃদ্ধির পরিমাণ সীসার সমান; অতএব সোনার গোলাটিরও বস্তু এক সের।

এখন প্রশ্ন এই যে, রূপার গোলার কাছে সোনার গোলা রাখিলে উহার আচরণ, উহার গতিবিধি, উহার বেগবৃদ্ধি, কিরূপ হইবে? সোনার বস্তু সীসার সমান; রূপার বস্তু সীসার সমান; সোনার বস্তু রূপার সমান বটে কি না?

সীসার নিকট রূপার গতিবিধি দেখিয়া বলিয়াছি যে, উভয়ের বস্তু সমান; সীসার নিকট সোণার গতিবিধি দেখিয়া বলিয়াছি যে, উভয়ের বস্তু সমান; তাহার উপর ভর করিয়া কি বলা যায়, রূপার নিকট সোনার গতিবিধি কিরূপ হইবে? কখনই না।

রামের সহিত শ্যামের বিবাদ ও রামের সহিত যদুর বিবাদ দেখিয়া কি বলা যায়, শ্যামের সহিত যদুর বিবাদ, না সদ্ভাব? বলিতে পার, রাম শ্যাম স্বাধীন ইচ্ছাসম্পন্ন ব্যক্তি, কিন্তু সোণা-রূপা জড়-দ্রব্য; কাজেই দুই ক্ষেত্রে তুলনা হইবে না। আচ্ছা, কয়লা বাতাসে পোড়ে; গন্ধক বাতাসে পোড়ে; গন্ধক কয়লাতে পুড়িবে কি না? উত্তর

দেওয়া চলিবে না। পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে যে, গন্ধক কয়লায় পোড়ে কি না। পোড়ে, তথাস্তু; না পোড়ে, তথাস্তু।

সেইরূপ এখানেও বিনা পরীক্ষায় বলা যাইবে না, যে রূপার নিকট সোনার আচরণ কিরূপ হইবে। সীসার নিকট উভয়ের আচরণ দেখিয়া বলিয়াছি, রূপা এক সের আর সোনাও এক সের; কিন্তু সোনা রূপার প্রতি কিরূপ আচরণ করিবে, তাহা প্রকৃতির বিধান, আমি বিনা-পরীক্ষায় কিরূপে জানিব?

প্রকৃতির বিধান বিচিত্র। পরীক্ষা করিলে বস্তুতই দেখা যাইবে যে, সেই সোনার গোলাটি রূপার গোলার নিকটে রাখিলে উভয়েই পরস্পরের অভিমুখে সমান বেগ অর্জ্জন করে। অতএব সোনার বস্তু রূপার সমান।

সীসার প্রতি উভয়ের আচরণ পৃথক্‌ভাবে দেখিয়া ঠিক্ করিয়াছিলাম, রূপার বস্তু সীসার সমান, সোনার বস্তুও সীসার সমান। রূপা সোনা পরস্পরের আচরণ দেখিয়া ঠিক্ হইল সোনার বস্তু রূপার সমান হইতেছে। দুই বস্তু প্রত্যেকে কোন তৃতীয় বস্তুর সমান হইলে তাহারা পরস্পর সমান হয়, ইহা স্বতঃসিদ্ধ সত্য না হইলেও প্রকৃতির বিধানে ফলতঃ সত্য হইয়াছে। প্রকৃতির বিধানই এইরূপ।

প্রকৃতির বিধান যদি অন্যরূপ হইত অর্থাৎ সোনার বস্তু ও রূপার বস্তু প্রত্যেকে সীসার সমান হইয়াও যদি সোনার বস্তু রূপার বস্তুর সমান না হইত, তাহা হইলে কোন দ্রব্যের বস্তু পরিমাণ স্থির ভাবে নির্দ্দেশ করা চলিত না। একই দ্রব্যের বস্তু বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন হইত।

ফলে, প্রকৃতি এখানে করুণাময়ী। অর্থাৎ রূপার বস্তু সীসার সমান ও সোনার বস্তু সেই সীসার সমান হইলে, রূপার বস্তুও সোনার বস্তুর সমান হয়। ইহা স্বতঃসিদ্ধ সত্য নহে; পরীক্ষালব্ধ সত্য। সীসার

নিকট সোনা এক সের, রূপার নিকটও তাহা এক সের। অন্ত দ্রব্যের নিকটও এক সের। ফল হইয়াছে এই যে, এক ক্ষেত্রে যে দ্রব্যের যে বস্তু, তাহা ঠিক্ করিয়া লইলে অন্ত ক্ষেত্রেও সেই দ্রব্যের সেই বস্তুই থাকে। যে দ্রব্যের বস্তু এক সের, তাহা সর্ব্বত্র এক সেরই থাকে; যাহা দশ সের, তাহা দশ সেরই থাকে। ইহা তর্কে পাইবে না; ইহা পরীক্ষিত অবেক্ষণ-লব্ধ সত্য। ইহা সত্য বলিয়াই বস্তুর পরিমাণ সাধ্য হইয়াছে ও বস্তু মাপিয়া ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার সমানতা-নির্দ্ধারণও সম্ভবপর হইয়াছে।

বিজ্ঞানবিদ্যার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া পদে পদে সাবধান হইয়া চলা উচিত। অর্জ্জিত জ্ঞানের কোন্‌টুকু বিচারলব্ধ, আর কোন্‌টুকু পর্য্যবেক্ষণে বা পরীক্ষায় লব্ধ, তাহা পদে পদে সাবধানে নির্ণয় করিয়া যাওয়া উচিত। নচেৎ বিজ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হইবে না।

মিশ্র পদার্থ

কঠিন তরল অনিল এই ত্রিবিধ পদার্থ লইয়া আমরা এতক্ষণ বহু আলোচনা করিলাম। দেখিলাম, তাহাদের মধ্যে কোন্ কোন্ বিষয়ে সাদৃশ্য আর কোন্ কোন্ বিষয়ে পার্থক্য আছে। এখন অন্য কথার আলোচনা করা যাউক।

প্রশ্ন চলিতে পারে, কঠিনে কঠিনে, কঠিনে তরলে, বা তরলে অনিলে একত্র মিশিয়া কিরূপ জিনিস হয়? উহারা পরস্পর মিশ্রিত হয় কি না? **মিশ্রণ** ক্রিয়ার তাৎপর্য্য কি?

কঠিনে কঠিনে মিশ্রিত হয়; তাহার বিস্তর দৃষ্টান্ত। সোনায় রূপায় তামা মিশাইয়া গহনা তৈয়ার হয়; তামায় দস্তায় পিতল হয়। এইরূপে ভিন্ন ভিন্ন ধাতু মিশাইয়া নানাবিধ উপধাতু তৈয়ার হয়।

লোহাতে কয়লা মিশাইলে ঢালাই লোহা হয়, উহা লোহা অপেক্ষা ভঙ্গুর। আবার তরলে তরলে মেশার দৃষ্টান্ত গোয়ালার দুধ। গাই-দুধে যত ইচ্ছা জল মিশাইলেই তাহার আনন্দ। অনিলে অনিলে মেশার সর্ব্বোৎকৃষ্ট উদাহরণ—বায়ু; ইহা দুইটা অনিলের মিশ্রণে উৎপন্ন,—একটা এক ভাগ এবং অন্যটা প্রায় চারি ভাগ। উহার সঙ্গে আরও কয়েকটি অনিল অল্পবিস্তর মিশিয়া থাকে। বায়ুতে বিদ্যমান ঐ দুইটি অনিলের বাঙ্গালায় নামকরণ হইয়াছে, অম্লজান ও যবক্ষারজান। নাম দুইটা এমনই কর্কশ যে, উহার প্রয়োগে আমার আদৌ প্রবৃত্তি নাই। উহা এখনও কেতাবেই আছে; চলিত ভাষাতে যখন এতদিনে চলিল না, তখন আর চলিবে না। আমি এরূপ ক্ষেত্রে ইংরেজি নাম আবশ্যক মত মোলায়েম করিয়া লইব। অম্লজানকে বলিব অক্সিজন; আর যবক্ষারজানকে বলিব নাইট্রোজন। অন্ততঃ এই পুঁথিতে ঐ ইংরেজি নামই চলিবে।

তরলে অনিলে মিশ্রণের উদাহরণ সোড়া-ওয়াটার; উহাতে একটা অনিল—কয়লা পোড়াইয়া যে অনিল পাওয়া যায়; সেই অনিল—জলের সহিত মিশ্রিত থাকে। কঠিন পদার্থেও অনিল মিশ্রিত দেখা যায়; গরম করিলে বা গলাইলে ঐ অনিল বাহির হইয়া যায়।

সকল জিনিসেই যে সকল জিনিস মেশে, এমন নহে। জলের সহিত আলকহল (সুরাসার) মেশে; কিন্তু জলে তেলে মেশে না। ইথার নামে তরল পদার্থ আছে, তাহা জলের সঙ্গে কতকটা মেশে, কতকটা মেশে না। অধিক মেশাইবার চেষ্টা করিলে অতিরিক্ত অংশটা জলের উপর ভাসিতে থাকে, যেমন জলের উপর তেল ভাসে। কেন না, ইথার জলের চেয়ে হাল্কা। কেবল অনিলে অনিলে মেশায় এরূপ কোনও বাধা ঘটে না। যে কোনও অনিল অপর যে কোন

অনিলের সঙ্গে মিশিয়া যাইবে, তা যতটাই লও না কেন। একটা চোঙার ভিতর যে কোন অনিলে পূর্ণ কর; তার পর অন্য একটা অনিল যতটুকু ইচ্ছা সেই চোঙায় প্রবেশ করাও; সেই দ্বিতীয় অনিলও চোঙার সমস্ত ভিতরটায় ব্যাপ্ত হইবে। উভয়ে মিশিয়া চোঙার সমুদায় অভ্যন্তর দেশ অধিকার করিয়া থাকিবে। একটা দিক্ এর ভাগে পড়িল, অন্য দিক্ ওর ভাগে পড়িল, এরূপ ঘটিবে না।

দ্রবণ

তরলে কঠিনে মিশ্রণের রীতিটা একটু বিচিত্র। জল তরল পদার্থ—উহাতে অনেক কঠিন জিনিস মেশে, যেমন নুন, চিনি, তুতে, হীরাকষ; আবার অনেক জিনিস মেশে না, যেমন বালি, কয়লা, সোনা, রূপা। যাহা জলে মেশে, তাহা গলিয়া দ্রব হয়; তাই তাহা দ্রাব্য। এই ক্রিয়ার নাম **দ্রবণ**। সেরখানেক জলে একটু একটু চিনি মেশাও; দেখিবে, চিনি মিশিতেছে, জলটা মিষ্ট হইতেছে। আরও মেশাও, আরও মেশাও; এমন সময় আসিবে, তখন আর একটু চিনি দিলে সেটুকু আর মিশিবে না, বা গলিবে না। মানুষের ক্ষুধার যেমন একটা সীমা আছে, জলেরও ক্ষুধার তেমনই একটা সীমা আছে; উহার পেট ভরিলে আর চিনি খাইতে বা লইতে চায় না। তাহার উপর যেটুকু দেওয়া যাইবে, সেইটুকু দ্রবীভূত না হইয়া কঠিন অবস্থায় নীচে পড়িয়া থাকিবে।

ঐ চিনি-মেশান জলটাকে রোদে শুকাইতে দাও; জলের খানিকটা বাষ্পাকারে বাহির হইয়া যাইবে। জলের পরিমাণ ক্রমে কমিয়া যাইবে। মনে কর, এক সের জল ক্রমে আধ সেরে দাঁড়াইল। এক সের জলে যতটা চিনি ধরিয়া রাখিতে পারে আধ সেরে তাহা

পারে না। অতিরিক্ত চিনিটা, যাহা জলে এতক্ষণ মিশ্রিত ছিল, এখন তাহা কঠিন অবস্থা পাইয়া জলের নীচে জমিতে থাকিবে। এই সময়ে যদি অন্য কোনও কঠিন পদার্থের আশ্রয় পায়, একগাছি সূতার বা একটুকরা মিছরির আশ্রয় পায়, তাহাকেই আশ্রয় করিয়া তাহার গায়ে জমিতে থাকিবে।

অর্ক

জল যত কমে, চিনিও তত জলের সঙ্গ ত্যাগ করিয়া জমে। জমিবার সময় চিনিতে দানা বাঁধে। চিনির বড় বড় দানার নামই মিছরি। এই দানাগুলির আকার বেশ সুন্দর। উহার পিঠ সমতল মসৃণ। মিছরি ভাঙ্গিলে যে নূতন পিঠ বাহির হয়, তাহাও সমতল মসৃণ। দানার কিনারায় কোণগুলি মাপিলে দেখা যায়, বেশ একটা হিসাব আছে। অনেক জিনিসের এইরূপ দানা বাঁধিবার ক্ষমতা আছে; অনেক জিনিসের নাই। নুন ফট্‌কিরি তুতে হীরাকষ প্রভৃতির দানা সর্ব্বজন-পরিচিত। আর মাটি কাঠ ইহাদের দানা হয় না।

জল হইতে বাহির হইয়া জমিবার সময়ই যে দানা বাঁধে, এমন নহে। অনেক জিনিস, যাহা উত্তাপে তরল হয়, তাহা শৈত্য-যোগে কাঠিন্যপ্রাপ্তির সময় দানা বাঁধিয়া ফেলে। গন্ধক উত্তাপ দিয়া গলান যায়; আবার ঠাণ্ডা করিলে উহার দানা বাঁধে। আমি যাহাকে দানা বলিতেছি, তাহার ইংরেজি নাম crystal; ভাল কথায় স্ফটিক বলা চলে, কিন্তু শব্দটা দাঁতভাঙ্গা। স্ফটিকের নামান্তর—অর্ক; অমর-কোষে আছে, অর্কঃ স্ফটিক-সূর্য্যয়োঃ। আমি **অর্ক** নামই এই অর্থে গ্রহণ করিলাম।

কয়লাও দুই রূপে দানা বাঁধে; এক রকম দানাতে পেন্‌সিল তৈয়ার হয়; উহার নাম গ্রাফাইট বা কাল সীসা। সাদা কাগজের উপর

উহার কাল দাগ পড়ে। আর এক রকম দানার নাম হীরা; যে হীরা মণির মধ্যে এত মহার্ঘ।

এই সকল অর্কের শ্রেণী-বিভাগ করা চলে। অর্কের আকৃতি দেখিয়া শ্রেণীবিভাগ করা হয়। কোনও জিনিসের অর্ক ছোটই হউক, বড়ই হউক, তাহার আকৃতি এক রূপই থাকে। অনেক সময় অর্কের আকার দেখিয়া জিনিসটা কি, তাহা বুঝিতে পারা যায়।

রাস্তায় ইটের স্তূপ পড়িয়া থাকিলে লোকে তাহাতে ভ্রূক্ষেপ করে না; কিন্তু সেই স্তূপের ইটগুলি সাজাইয়া একখানির উপর একখানি করিয়া রাখিয়া যখন অট্টালিকা তৈয়ার হয়, তখন তাহাতে লোকের নজর পড়ে। ইটগুলি আপনা হইতে সজ্জীকৃত হইয়া অট্টালিকায় পরিণত হয় না। মিস্ত্রী উহাকে বুদ্ধিপূর্ব্বক সাজায়। তুতে বা ফটকিরি সুন্দর অর্ক বাঁধে। ঐ অর্কগুলির সুন্দর আকৃতি দেখিলে উহাতে নজর পড়ে; এবং স্বতই মনে প্রশ্ন আসে যে, এখানে কি কোনও কারিকর উহার অংশগুলি থাকে থাকে বিন্যাস করিয়া ঐরূপ সৌন্দর্য্য দিয়াছে? আমাদের দেশে তুষার পড়ে না; হিমালয় অঞ্চলে বা হিমপ্রধান দেশে তুষার পড়ে। ঐ সকল তুষারকণায় কত বিচিত্র, কত সুন্দর দানা দেখা যায়; কত বৈচিত্র্য, অথচ এত বৈচিত্র্যের মধ্যেও একটা কারিকরি; দেখা যায় যে, একটি ষড়্‌ভুজ ষট্‌কোণ ক্ষেত্র, যাহার ভুজগুলি ও কোণগুলি সব সমান, যেন এইরূপ ক্ষেত্রের প্ল্যানটি বজায় রাখিয়া তাহার উপর নানারূপ নক্‌সা টানা হইয়াছে। একজন কারিকরের কারিকরি নহিলে জড় পদার্থের এমন কি ক্ষমতা আছে যে এমন সুন্দর নক্‌সা আঁকে?

এই রূপ প্রশ্ন আমাদের মনে স্বতই উপস্থিত হয় এবং মনে নানারূপ চিন্তা আনয়ন করে। এখানে কেবল কথাটা ছুইয়া

রাখিলাম। জগত্তত্ত্বের আলোচনায় এরূপ প্রশ্নের উত্তর দিবার সর্ব্বদাই প্রয়োজন হয়। এ প্রশ্নটা এত গুরুতর যে, বড় বড় পণ্ডিতের মধ্যে এখনও ঐকমত্য নাই; বিজ্ঞানের ইতিহাসের আদিযুগ হইতে আজি পর্য্যন্ত ইহার চূড়ান্ত মীমাংসায় কেহ উপস্থিত হইতে পারেন নাই।

শ্রেণী-বিভাগ

ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জড়জগৎ বিচিত্র জগৎ; কোনও দুইটা জিনিসে সম্পূর্ণ ঐক্য নাই। দুইটা জিনিসে সম্পূর্ণ ঐক্য থাকিলে উহারা এক জিনিসই হইত। অন্তঃকরণ তাহাদিগকে দুইটা বলিয়া গ্রহণই করিত না। আবার কোন দুই জিনিসে সম্পূর্ণ অনৈক্যও নাই। সম্পূর্ণ অনৈক্য থাকিলে সেই জ্ঞান নিষ্ফল হইত। উহা দ্বারা জীবনযাত্রাই চলিত না। জীবনযাত্রা চলিবে কি, জীবন বলিয়া কোনও পদার্থই হয়ত থাকিত না; কেন না, জীবনের অস্তিত্বও বহুর মধ্যে ঐক্যে প্রতিষ্ঠিত।

এই অনৈক্যের মধ্যে ঐক্যের আবিষ্কার বিজ্ঞানের কাজ। প্রথমে যে ঐক্যের উপলব্ধি হয় না, ইন্দ্রিয়গণ আপনা হইতে যে ঐক্য মনের সমীপে উপস্থিত করে না, মন বুদ্ধি কর্ত্তৃক চালিত হইয়া ক্রমশঃ বহুর মধ্যে সেই ঐক্যের আবিষ্কার করে ও সেই ঐক্য দেখিয়া বহুকে কতকগুলি কোঠার মধ্যে সাজায়। এইরূপে পদার্থসমূহকে কতিপয় শ্রেণীতে বা জাতিতে বিভক্ত করা হয়। এই শ্রেণী-বিভাগকার্য্য বিজ্ঞানের সৌধে আরোহণের প্রথম সোপান; অথবা প্রত্যেক সোপানে উঠিতেই এই শ্রেণী-বিভাগের প্রয়োজন।

আমরা যাবতীয় জড়পদার্থকে কঠিন তরল ও অনিল এই তিন শ্রেণীতে ফেলিয়াছি, বহু দ্রব্যের মধ্যে কতকগুলি বিষয়ে সাদৃশ্য বা ঐক্য দেখিয়া। কিন্তু অন্যরূপ সাদৃশ্য বা ঐক্য দেখিয়া অন্যরূপ শ্রেণী-বিভাগও চলিতে পারে। এখন তাহাই দেখিব।

মূল ও যৌগিক পদার্থ

নূতন রকমে জড়ের শ্রেণীবিভাগে প্রবৃত্ত হইব। কোন কোন জিনিস হইতে আমরা দুই তিন রকমের ভিন্ন ভিন্ন জিনিস বাহির করিতে পারি। সিঁদুর হইতে পারা ও গন্ধক পৃথক্ করা চলে। জল হইতে দুইটা অনিল বাহির করা চলে। এই গুলিকে **যৌগিক পদার্থ** বলিব; কতিপয় দ্রব্যের সংযোগে ইহারা উৎপন্ন। আবার পারা হইতে পারাই পাওয়া যায়; কয়লা হইতে কয়লাই পাওয়া যায়; গন্ধক হইতে গন্ধক ভিন্ন আর কিছুই মিলে না। বহু চেষ্টাতেও এই সকল জিনিস হইতে অন্য জিনিস বাহির হয় নাই। এই সকল পদার্থকে **মূল পদার্থ** বলিব।

একটা জিনিস বিশ্লেষণ করিয়া তাহা হইতে অন্যান্য জিনিস বাহির করিবার নানা উপায় আছে। তুতে জলে দ্রব করিয়া তাহাতে লোহার ছুরি ধরিলে ছুরির গায়ে তামা জমিতে থাকে। ঐ তামা তুতের মধ্যে প্রচ্ছন্ন ছিল। জলকে ঈষৎ অম্লাক্ত করিয়া উহার ভিতর তাড়িতস্রোত চালাইলে উহা হইতে দুই রকমের দুইটা অনিল বাহির হয়। মেটে সিঁদুরে কয়লার গুঁড়া মিশাইয়া বাঁকনলে ফুঁ দিয়া দীপশিখা দ্বারা তপ্ত করিলে তাহা হইতে সীসা বাহির হয়। অত্যধিক উত্তাপ-যোগে বহু দ্রব্য বিশ্লিষ্ট হইয়া দুই বা ততোধিক দ্রব্য বাহির হইয়া পড়ে। এইরূপে দেখা গিয়াছে যে, পৃথিবীর যাবতীয় পদার্থ, কঠিন, তরল, অনিল, অধিকাংশই যৌগিক; কেবল গোটাকতক জিনিস মূল পদার্থ; এই মূল পদার্থ কয়টিকে বিশ্লেষণ করিয়া অন্য পদার্থ অদ্যাপি বাহির করিতে পারা যায় নাই। এই মূল পদার্থগুলির সংখ্যা প্রায় আশীটা।

মূল পদার্থগুলির মধ্যে যেগুলি সকলেরই পরিচিত, তাহার কতক গুলির নাম করিতেছি,—কয়লা, গন্ধক, দস্তা, পারা, সীসা, টিন, লোহা, সোনা, রূপা। ইহাদের মধ্য হইতে অন্য পদার্থ অদ্যাপি বাহির হয় নাই।

যে সকল জিনিসকে আমরা আজিকালি মূল পদার্থ বলিয়া জানি, তাহারা যে চিরকাল মূল পদার্থ বলিয়াই গৃহীত হইবে, তাহা মনে করা অনুচিত। এখন আমরা সোনা হইতে অন্য কোনও জিনিস বাহির করিতে পারি না, বা অন্যান্য জিনিসের একত্র সংযোগে সোনা তৈয়ার করিতে পারি না; তাই বলিয়া কোন কালেও যে কেহ পারিবে না, তাহা জোর করিয়া বলা চলে না। শতখানেক বৎসর পূর্ব্বে চূণ মূল পদার্থ বলিয়া গৃহীত হইত; এখন চূণ হইতে একটা ধাতু পদার্থ বাহির করিতে পারা যায়; সেই ধাতু পোড়াইয়া আবার চূণ তৈয়ার হয়।

আমাদের প্রাচীন দার্শনিকেরা "ক্ষিত্যপ্‌তেজোমরুদ্ব্যোম" এই পঞ্চ মহাভূতের উল্লেখ করিতেন। কিন্তু আমাদের প্রাচীন কালের মহাভূত আর এ কালের বিজ্ঞানের মূল পদার্থ, এ দুইয়ের এক অর্থ নহে। অতএব এ ক্ষেত্রে সেকালের বুড়া দার্শনিকদিগকে পরিহাস না করাই ভাল।

এই মূল পদার্থগুলির অধিকাংশ অল্পদিনমাত্র পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত হইয়াছে; কাজেই ইহাদের বাঙ্গালা নাম নাই। বিদেশী নামগুলি বাঙ্গালা হরপে লিখিয়া চালান যাইবে, কি প্রত্যেকের জন্য নূতন নামের সৃষ্টি করা হইবে, ইহা বাঙ্গালা ভাষায় একটা বিষম সমস্যা হইয়া আছে। যাঁহারা বিজ্ঞানের চর্চ্চা করেন, তাঁহারা সকলেই ইংরেজিতে কৃতবিদ্য; আবার স্বদেশী বিদেশী দুই প্রস্থ নাম ব্যবহার করায় নানা অসুবিধা। কাজেই, বিদেশী নামগুলি বাঙ্গালা হরপে চালানই মোটের উপর সুবিধা। বাঙ্গালীর বাগিন্দ্রিয়ের খাতিরে এক

আধটু উচ্চারণ বদলাইলে শ্রুতিকটুতাদোষও দূর হইতে পারে, অথচ বুঝিবার গোল হইবে না।

এইরূপে সীলীনম তেলুরম স্বচ্ছন্দে বাঙ্গালায় চলিতে পারে। ক্লোরিন ব্রোমিন ফ্লুরিণও বেশ চলিতে পারে। টিন প্লাটিনম আলুমিনম এই কয়টি বাঙ্গালা কথাবার্ত্তায় চলিয়া গিয়াছে। কিন্তু সর্ব্বদা ব্যবহার্য্য অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, হাইড্রোজেন, এই নামগুলি বাঙ্গালায় চালান একটু কঠিন; বাঙ্গালা ভাষার একটা ধা'ত আছে; সেই ধা'তের সঙ্গে না মিলিলে ভাষাটাই কদর্য্য হইয়া পড়িবে ও লোকে বরং ইংরেজি পড়িবে, কিন্তু সেই কদর্য্য বাঙ্গালা পড়িবে না। অম্লজান যবক্ষারজান উদজান এই যে নামগুলি বাঙ্গালা কেতাবে দেওয়া হইয়াছে, তাঁহারও নানা দোষ; প্রধান দোষ উহাদের দীর্ঘতা। লেখা কেতাবে চলিতে পারে, কিন্তু মুখের কথায় চালান দুষ্কর। সেই জন্য কথিত ভাষায় উহা এত কালেও চলে নাই। এই নাম কয়টি এত পুনঃপুনঃ ব্যবহার করিতে হয় যে, উচ্চারণে যাহাতে না ঠেকে, এই রূপ নাম হওয়া উচিত। যত দিন আপত্তির মীমাংসা না হয়, তত দিন ইংরেজি নামই ব্যবহার করা ভাল, ইহা এই বয়সে বুঝিতেছি। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, আমি অক্সিজেনের ও নাইট্রোজেনের ইংরেজি নামই ব্যবহার করিব। অনেকে অনেক আপত্তি তুলিবেন, কিন্তু এ আপত্তির অন্ত নাই। হাইড্রোজেন বড় কর্কশ, কিন্তু উদজানও কেহ বলিতে চাহিবে বোধ হয় না। ডাক্তারদের কল্যাণে আজ কাল অক্সিজেন পাড়া গাঁয়েও চলিয়াছে, অতএব ইংরেজিই আপাততঃ চলুক।

মূল পদার্থগুলির মধ্যে গোটাকতক অনিলাবস্থ:—অক্সিজন, নাইট্রোজন, হাইড্রোজন, ফ্লুরিণ ও ক্লোরিণ। আমাদের বায়ুসাগরের

মধ্যে সম্প্রতি গোটাকতক অনিলের নূতন আবিষ্কার হইয়াছে; উহাদের পরিমাণ কিন্তু যৎসামান্য এবং আচরণও অনেকটা খাপছাড়া —উহাদের ইংরেজি নাম—আর্গন, নিয়ন, ক্রুপটন, জেনন।

মৌলিক তরল পদার্থ কেবল দুইটি, ব্রোমিন আর পারদ। অনিল ও তরল অবস্থাপন্ন এই পদার্থ কয়টি বাদ দিলে অবশিষ্ট সমুদয় মূল পদার্থই কঠিন।

বলা বাহুল্য, কঠিন পদার্থ তাপযোগে তরল ও অনিল অবস্থা পায়; শৈত্যপ্রয়োগে অনিল তরল হয়; প্রায় সকল অনিলই তরল অবস্থায়, এমন কি কঠিনাবস্থায় আনীত হইয়াছে।

কতিপয় মূল পদার্থের একাধিক রূপ। অক্সিজনের রূপান্তর ওজোন। উহাও অনিলাবস্থ; তাড়িততরঙ্গ-প্রয়োগে অক্সিজনের কিয়দংশ ওজোন হইয়া যায়। কয়লার রূপান্তর গ্রাফাইট (কাল সীসা, যাহাতে পেন্সিল হয়) ও হীরা। গন্ধকের কয়েকটা রূপ। গন্ধককে গলাইয়া ঠাণ্ডা করিলে দানা বাঁধে; আবার তরল ফুটন্ত গন্ধককে জলে ফেলিলে আমড়ার আটার মত চিটেল গন্ধক হয়। ফস্ফরস দুই রকমের; এক রকম ফস্ফরস দিয়াশলাইয়ের লালকাঠির মুখে থাকে, আর এক রকম ফস্ফরস কালকাঠির বাক্সের পিঠে মাখান থাকে।

গুপ্ত-কবি বিস্মিত হইয়া লিখিয়াছিলেন,—

এই ভূমণ্ডল দেখ কি সুখের স্থান;
সকল প্রকার সুখ করিতেছে দান।
জীবনধারণ কিংবা আরামকারণ
যে যে বস্তু আমাদের হয় প্রয়োজন,
সকলই সুলভ এতে, অভাব ত নাই।

জীবনধারণের জন্য আবশ্যক জিনিস নিতান্ত দুর্লভ হইলে কাহারও জীবন টিকিত না। জীবনধারণের জিনিস নাই, অথচ জীবনযাত্রা চলিতেছে, ইহাই বরং আমাদের পক্ষে অধিকতর বিস্ময়ের হেতু হইত। আর আবশ্যক জিনিস সকলই যে সুলভ, তাহাও বলা যায় না। আমাদের কলেরার দেশে বিশুদ্ধ পানীয় জল একটু সুলভ হইলে মন্দ হইত না। অন্ততঃ জীবনধারণের জন্য অত্যন্ত আবশ্যক অন্ন জিনিসটা সর্ব্বদা সুলভ হইলে এক একটা দুর্ভিক্ষে লক্ষ লক্ষ মানুষের ধ্বংস হইত না।

সে যাহা হউক, সকল মূলপদার্থ সমান পরিমাণে পৃথিবীতে বিদ্যমান নাই এবং আমাদের জীবনধারণে বা আরামকারণে যাহা যত আবশ্যক, তাহা তত সুলভ নহে। তবে গোটাকতক জিনিস, যাহা না হইলে জীবনযাত্রা একেবারে অচল হইত, তাহা কতকটা সুলভ বটে; অথবা ঘুরাইয়া বলিলেই ঠিক হয়,—তাহারা সুলভ বলিয়াই জীবনযাত্রা সম্ভবপর হইয়াছে।

ধাতুভস্ম

আমাদের দেশের কবিরাজেরা ধাতুভস্ম করিয়া থাকেন। সীসা গরম করিলে তরল হয়; এই তরল ধাতু ক্রমাগত বাতাসে নাড়িতে থাকিলে ঐ তরল চকচকে ধাতুর উপরে যেন একখানা ময়লা শর পড়ে; এই শর ধাতুর উপরে ভাসিতে থাকে। ঐ ধাতু যে দ্রব্যে পরিণত হয়, তাহাতে ধাতুর চাকচিক্য থাকে না; উহা ধাতু অপেক্ষা হাল্‌কা হয়। ধাতুকে বাতাসে গরম করা আবশ্যক; বায়ুর অভাবে চলিবে না। এইরূপে প্রস্তুত জিনিসের নাম ধাতুভস্ম। সীসা হইতে সীসাভস্ম হয়। ঐরূপে বায়ু মধ্যে পারা গরম করিয়া পারাভস্ম তৈয়ার হইতে পারে।

বাতাসে লোহা পোড়াইলে লোহাভস্ম হয়। আপাততঃ লঘু বলিয়া বোধ হইলেও ওজন করিলে দেখা যাইবে ধাতুর চেয়ে তজ্জাত ধাতুভস্মের ভার অধিক। দেখা যাইবে যে, ধাতুটাই ধাতুভস্মে পরিণত হইয়াছে, ধাতুটাই যেন বিকৃত হইয়া ভস্মে পরিণত হইয়াছে; কিন্তু ঐ ধাতুর ভার চেয়ে তজ্জাত ভস্মের ভার কিছু অধিক। অর্থাৎ ধাতুতে একটা কিছু যোগ হইয়া ধাতুভস্ম হইয়াছে। নিকৃতিরূপী চির-পরিচিত যন্ত্রটির সাহায্যে ওজন না করিলে এই তথ্যটি বাহির হইত না। সে কালের লোকে—এদেশের ও পশ্চিমদেশের সে কালের লোকে—ধাতুভস্ম করিতে জানিতেন; কিন্তু ভস্ম হইয়া ধাতুটা যে ওজনে বাড়ে এবং অন্য কোন জিনিসের সঙ্গে যুক্ত হওয়াতেই যে উহার ওজন বাড়ে, এই সহজ কথাটা স্পষ্ট ধরিতে পারেন নাই। লাবোয়াশিয়া নামক ফরাসী পণ্ডিত এই তথ্যটুকু স্পষ্ট ধরেন। তিনি নিকৃতির মাহাত্ম্যটা খুব ভালই বুঝিতেন। তিনি নিকৃতিতে ওজন করিয়া ভারবৃদ্ধি দেখিয়া ধরিয়া ফেলিলেন যে, বায়ু মধ্যে তপ্ত না করিলে যখন ধাতু ভস্মে পরিণত হয় না, তখন বায়ুরই কিয়দংশ ধাতুর সহিত যুক্ত হওয়ায় ধাতুর ওজন বাড়িয়া যায় এবং ধাতুভস্মের উৎপত্তি হয়।

সে আজ প্রায় দেড়শত বৎসরের কথা। সেই সময়ে প্রীষ্টলী নামে একজন ইংরেজ ছিলেন। তিনি সীসাভস্মকে গরম করিয়া দেখিলেন যে, তাহা হইতে একটা অনিল বাহির হইতেছে। এই অনিলটা কিছু নূতন ধরণের; এই অনিলে বাতি জ্বলে। বাতি বায়ুতেও জ্বলে; কিন্তু এই অনিলে আরও উজ্জ্বল হইয়া জ্বলে। বাতি কেন, কাঠ কয়লা গন্ধক প্রভৃতি জিনিসও এই অনিলে জ্বলিয়া উঠে ও পোড়ে; বায়ুতে যেমন জ্বলে ও পোড়ে, তার চেয়ে খুব উজ্জ্বল হইয়াই পোড়ে।

প্রীষ্টলী এই অনিলটা আবিষ্কার করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু দহনক্রিয়ার তাৎপর্য্য তাঁহার মাথায় আসে নাই। লাবোয়াশিয়া দেখিলেন যে, ধাতুকে বায়ুমধ্যে উত্তপ্ত করিলে উহার ভার বাড়ে, উহা বায়ুর একটা অংশ টানিয়া লইয়া সেই অংশের সহিত যুক্ত হয়; ধাতুটা ভস্মে পরিণত হয়; আবার ঐ ভস্মকে গরম করিলে উহা হইতে একটা অনিল বাহির হইয়া আসে; উহার ধর্ম্ম বায়ুরই মত; তবে বায়ুর অপেক্ষাও উহা যেন তেজস্বী। অমনি লাবোয়াশিয়া সিদ্ধান্ত করিলেন যে, এই নূতন অনিলটা বায়ুর মধ্যেই বিদ্যমান ছিল। ধাতুটা বায়ুর অন্তর্গত ঐ অনিলটাকেই টানিয়া লইয়া উহার সহিত যুক্ত হইয়া ধাতুভস্মে পরিণত হইয়াছিল; সেই জন্য ধাতুর ভার চেয়ে ধাতুভস্মের ভার অধিক হইয়াছিল; আবার ধাতুভস্মকে তপ্ত করায় সেই অনিল বাহির হইয়া আসিল; বায়ুর অন্তর্গত অনিল বায়ুতে ফিরিয়া আসিল; ধাতুভস্মও ধাতুতে পরিণত হইল। লাবোয়াশিয়া এই বায়ুমধ্যস্থ অনিলের নাম দিলেন অক্সিজন; উহাই বাঙ্গালা বহির অম্লজান। উহাই প্রীষ্টলীর আবিষ্কৃত অনিল হইতে অভিন্ন। প্রীষ্টলী সীসাভস্ম তপ্ত করিয়া উহাই বাহির করিয়াছিলেন।

এই নবাবিষ্কৃত অনিলের ধর্ম্মই দাহ্যদ্রব্যকে পোড়ান; বায়ুতে উহা সর্ব্বদা বিদ্যমান আছে বলিয়াই বায়ুরও ধর্ম্ম দাহ্যদ্রব্যকে পোড়ান; তবে বায়ুতে উহা অবিশুদ্ধ অবস্থায় আছে; অন্য অনিলের সহিত মিশিয়া আছে। এই জন্য কয়লা কাঠ বাতি বায়ুতে তত তেজে পোড়ে না, যত তেজে পোড়ে এই অনিলে।

স্থির হইল যে, ধাতুদ্রব্য বায়ুমধ্যে বিদ্যমান এই অক্সিজন অনিলের সহিত সম্মিলিত হইয়া ধাতুভস্মে পরিণত হয়। এই অক্সিজন অনিলই দাহ্যদ্রব্যকে পোড়ায় এবং অদাহ্য ধাতুকে ভস্ম করে। দাহ্য বস্তু কি?

যাহা বায়ুতে পোড়ে—যেমন কয়লা, গন্ধক, তেল, বাতি, কাঠ। এই সকল জিনিস বায়ুতে পোড়ে—বায়ুশূন্য স্থানে যে পোড়ে না তাহা বলাই বাহুল্য—এবং পুড়িবার সময় আগুন উৎপাদন করে, অর্থাৎ উত্তাপের এবং আলোকের সৃষ্টি করে। ঐ সকল জিনিসই আবার ঐ বিশুদ্ধ অক্সিজন অনিলেও পোড়ে, বরং আরও উজ্জ্বলতর অগ্নিশিখা উৎপাদন করিয়া পোড়ে।

দহনক্রিয়া

এই **দহন**-ব্যাপারটা কি? লাবোয়াশিয়া কয়লা লইয়া বায়ুতে পোড়াইলেন, আবার অক্সিজনেও পোড়াইলেন; তাহার ফলে যাহা উৎপন্ন হইল, তাহাকে ধরিয়া আবার নিক্তিতে ওজন করিলেন। কয়লা পুড়িয়া অদৃশ্য হইল। উহা কোথায় গেল? কয়লা পুড়িয়া একটা অনিলের উৎপত্তি হইল; যে অনিলটা জন্মিল, তাহা ওজন করিয়া লাবোয়াশিয়া দেখিলেন, যে উহার ভার কয়লার ভার চেয়ে অধিক।

কি আশ্চর্য্য, কয়লাটা অদৃশ্য হইল, মনে হইল যেন উহা লুপ্ত হইয়াছে; কিন্তু তাহার স্থানে যে নূতন অনিল উৎপন্ন হইল, তাহার ভার কয়লার চেয়ে অধিক।

লাবোয়াশিয়া সিদ্ধান্ত করিলেন, কয়লা ঐ অক্সিজনের সহিত সম্মিলিত হইয়া এই নূতন অনিলের উৎপাদন করিয়াছে। কয়লার ভার আর অক্সিজনের ভার একযোগে নূতন অনিলের ভারের সমান, তাহাও দেখা গেল।

স্থির হইল যে, দহনব্যাপারটা আর কিছুই নহে, উহা অক্সিজনের সহিত দাহ্য দ্রব্যের সম্মিলনের ফল।

কয়লা গন্ধক প্রভৃতি দাহ্য দ্রব্য অক্সিজনের সহিত সম্মিলিত হইয়া নূতন জিনিসের সৃষ্টি করে; ফলে খানিকটা উত্তাপ জন্মে, খানিকটা আলোক জন্মে। আলোক আর উত্তাপ সেই সম্মিলনের আনুষঙ্গিক ঘটনামাত্র; উহাই দহনকালে অগ্নি-উৎপাদনের রহস্য।

রাঙ্ সীসা তামা প্রভৃতি ধাতুকেও বায়ুমধ্যে তপ্ত করিলে উহা অক্সিজনের সহিত যুক্ত হয়; কিন্তু এবার কোন অনিল জন্মে না; ধাতুটা অক্সিজনযোগে ধাতুভস্মে পরিণত হয়; এ ক্ষেত্রে অধিক উত্তাপ জন্মে না বা আলোক জন্মে না, তাই আগুন হয় না। অক্সিজনের সহিত সংযোগের আনুষঙ্গিক ফল উত্তাপ; উত্তাপ অল্প হইলে আগুন হয় না।

লাবোয়াশিয়া প্রকৃতপক্ষে বিজ্ঞানবিদ্যায় যুগান্তর উপস্থিত করিলেন। যখন তিনি দহনক্রিয়ার স্বরূপ নির্ণয় করিলেন, তখন হইতেই রসায়নবিদ্যা নূতন ভিত্তির উপর স্থাপিত হইল। আধুনিক রসায়নবিজ্ঞান এই দিনে জন্ম গ্রহণ করিল। একজন লোকের প্রতিভা মানুষকে কতটা ঊর্দ্ধে তুলিতে পারে, তাহার এই একটা দৃষ্টান্ত। প্রীষ্টলী অক্সিজনের আবিষ্কর্ত্তা; কিন্তু এই অনিলের সহিত দহনক্রিয়ার কি সম্পর্ক, তাহা তিনি ধরিতে পারেন নাই। লাবোয়াশিয়ার যে প্রতিভা ছিল, প্রীষ্টলী সে প্রতিভায় বঞ্চিত ছিলেন।

চোখ থাকিলেই যে দেখা যায়, এমন নহে। চোখ সকলেরই আছে, কিন্তু সকলে সমান দেখিতে পায় না; অনেকেই চোখ থাকিতে কাণা। চোখের উপর আরও কিছু চাই; সেটা যাহার প্রচুর পরিমাণে আছে, সে-ই প্রতিভাশালী।

দস্তায় গন্ধক দ্রাবক (সলফুরিক আসিড) ঢালিলে যে অনিল বাহির হয়, তাহার নাম হাইড্রোজন; প্রীষ্টলী এই অনিলে পাত্র পূর্ণ

করিয়া তন্মধ্যে ধাতুভস্ম গরম করিয়াছিলেন। দেখিয়াছিলেন যে, হাইড্রোজনের পরিমাণ ক্রমেই কমিতেছে, আর ধাতুভস্মটা ক্রমে খাঁটি ধাতুতে পরিণত হইতেছে। ধাতুতে গন্ধকদ্রাবক ঢালিলে হাইড্রোজন বাহির হইয়াছিল; ধাতুভস্ম যেন সেই হাইড্রোজন গ্রহণ করিয়া ধাতুতে পরিণত হইল। প্রীষ্টলী সিদ্ধান্ত করিলেন, ধাতুভস্মই মূল পদার্থ, এবং উহাতে এই হাইড্রোজনের যোগ হইলে উহা ধাতু হয়; অর্থাৎ ধাতুভস্ম + হাইড্রোজন = ধাতু; অতএব ধাতুটাই যৌগিক পদার্থ। পাত্রস্থিত হাইড্রোজনের লোপাপত্তির সঙ্গে সঙ্গে পাত্রের গায়ে আর একটা জিনিস দেখা দিয়াছিল, বিন্দু বিন্দু জল দেখা দিয়াছিল; তাহা প্রীষ্টলী দেখিলেন না, দেখিয়াও দেখিলেন না। দেখিলে তিনি হয়ত বুঝিতেন যে তাঁহার সিদ্ধান্ত ঠিক্ হয় নাই।

আর একজন তাৎকালিক বৈজ্ঞানিক ক্যাবেণ্ডিশ; ইনি যে-সে লোক ছিলেন না। বিজ্ঞানের ইতিহাসে ইঁহার স্থান অতি উচ্চে। ক্যাবেণ্ডিশ হাইড্রোজন ও অক্সিজন মিশাইয়া তাড়িতস্ফুলিঙ্গযোগে জ্বালাইয়া অনেকটা জল তৈয়ার করিলেন। অথচ হাইড্রোজন হইতে এই জলোৎপত্তির তাৎপর্য্য তিনিও সম্পূর্ণ গ্রহণ করিতে পারিলেন না।

ইহার তাৎপর্য্য বুঝিলেন লাবোয়াশিয়া। তিনি স্পষ্ট দেখিলেন ও অন্যকে দেখাইলেন, হাইড্রোজন ও অক্সিজনের সম্মিলনফল জল। কয়লা যেমন পুড়িয়া যায় এবং অক্সিজনের সহিত সম্মিলিত হইয়া একটা নূতন অনিলের উৎপাদন করে, হাইড্রোজনও তেমনি দাহ্য পদার্থ; উহাও অক্সিজনে পোড়ে এবং পুড়িবার সময় অক্সিজনে সম্মিলিত হইয়া জলের উৎপাদন করে। অতএব জল যৌগিক পদার্থ।

প্রীষ্টলীর আবিষ্কারের সহিত এই সিদ্ধান্ত মিলিল। হাইড্রোজনের সহিত ধাতুভস্ম তপ্ত করিলে হাইড্রোজন ঐ ধাতুভস্ম হইতে অক্সিজনকে

টানিয়া লয়, আর তাহার সহিত সম্মিলিত হইয়া জলের উৎপাদন করে ; পাত্রের গায়ে জল-বিন্দু দেখা দেয়। সিদ্ধান্ত হইল, জল অক্সিজন ও হাইড্রোজনের সম্মিলন-ফল। জল যৌগিক পদার্থ। ধাতুভস্মও যৌগিক পদার্থ; জল যেমন হাইড্রোজন ও অক্সিজনযোগে উৎপন্ন, ধাতুভস্মও তেমনি ধাতু ও অক্সিজনযোগে উৎপন্ন।

এই আবিষ্কারের কিছু দিন পরে ফরাসীদেশে রাষ্ট্রবিপ্লব ঘটিল ; প্রজারা ক্ষিপ্ত হইয়া রাষ্ট্রতন্ত্র উল্‌টাইয়া দিল। সমাজের আচারব্যবহার বিপর্য্যস্ত করিল, প্রচলিত ধর্ম্ম পর্য্যন্ত উঠাইয়া দিল। রাজা-রাণীকে বধ করিয়া প্রজাগণ পরস্পরের মুণ্ডচ্ছেদ করিতে লাগিল এবং একদিন লাবোয়াশিয়ার ছিন্নমুণ্ড ভূলুণ্ঠিত হইল। লাবোয়াশিয়া যেদিন জন্মিয়াছিলেন, সেদিন মানবজাতির ইতিহাসে একদিন। আর যেদিন তিনি গিলোটিন আঘাতে মুণ্ড দিলেন, সেদিন মানবের নিয়তি মানবের ইতিহাসের দিকে চাহিয়া অট্টহাস্য করিল।

জড়ের নিত্যতা

পূর্ব্বে বলিয়াছি লাবোয়াশিয়া নিকৃতির মাহাত্ম্য খুব বুঝিতেন। নিকৃতি যন্ত্রটা দেখিতে যেন অধিক কিছুই নয় ; কিন্তু রাসায়নিকদের সমস্ত বিদ্যা ইহার উপরে প্রতিষ্ঠিত। বায়ুপূর্ণ বোতলের মুখ বন্ধ করিয়া তাহাতে বাতি পোড়াইলে বাতিটা ক্রমে অদৃশ্য হয়। কিন্তু বাতিসমেত বায়ুপূর্ণ পাত্রের যে ভার ছিল, এখন বাতিহীন বায়ুপূর্ণ পাত্রেরও ঠিক সেই ভারই থাকে। ইহার অর্থ এই যে, বাতিটা অদৃশ্য হইয়াছে বটে ; উহার উপাদানমধ্যে ছিল কয়লা আর হাইড্রোজন আর বায়ুমধ্যে ছিল অক্সিজন ; কয়লা অক্সিজনে সম্মিলিত হইয়া সেই নূতন অনিলটা জন্মাইয়াছে। হাইড্রোজন ও অক্সিজনযোগে জল হইয়াছে ; কিন্তু মোটের উপর ভার কমে নাই বা বাড়ে নাই।

নিউটন সপ্রমাণ করিয়া গিয়াছেন, ভার বস্তুর সমানানুপাতিক, বস্তু বাড়িলেই ভার বাড়ে। এখানে ভার যখন বাড়ে নাই বা কমে নাই, তখন বস্তুর পরিমাণেরও তারতম্য হয় নাই।

স্থির হইল যে, রাসায়নিক সম্মিলনে পদার্থের রূপান্তর ঘটে, কিন্তু বস্তুর তারতম্য হয় না। বস্তুর হ্রাসও নাই, বৃদ্ধিও নাই।

বস্তুর আর একটি নাম দেওয়া গিয়াছে জড়ত্ব, কেন না ইহা জড়মাত্রের সাধারণ ধর্ম্ম। দেখা গেল যে, রাসায়নিক সম্মিলনে বস্তুর তারতম্য হয় না, জড়ের জড়ত্ব পূর্ণ মাত্রায় থাকে। বস্তু আমরা বাড়াইতে বা কমাইতে পারি না। নিকৃতিযন্ত্রের সাহায্য-লব্ধ এই তত্ত্বটিকে ঘুরাইয়া বলা হয়, জড় পদার্থের ধ্বংসও নাই, সৃষ্টিও নাই। অতএব জড় অনাদি ও অবিনাশী নিত্য পদার্থ।

এই ভাষাটা বিজ্ঞানের ভাষা, না কবিতার ভাষা? এক শ্রেণীর দার্শনিক আছেন, তাঁহারা বলেন, অসৎ হইতে সৎ জন্মে না ও সতের পরিণতিতেও অসৎ হয় না। "নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ" প্রভৃতি বাক্য আমাদের দেশেই প্রচলিত আছে। ইহার অর্থ—যাহা ছিল না, তাহা আপনা হইতে উৎপন্ন হইতে পারে না। এবং যাহা আছে, তাহা একবারে নাস্তিতে পরিণত হইতে পারে না। আধুনিক পাশ্চাত্য দার্শনিকগণের মধ্যে একজন খ্যাতনামা পণ্ডিত হর্বার্ট স্পেন্সার, তিনিও বলিয়াছেন, সতের অসতে পরিণতি বা অসৎ হইতে সতের উৎপত্তি আমরা কল্পনা করিতেও পারি না, এবং যাহা কল্পনা করিতে পারি না, তাহা অসত্য।

বৈজ্ঞানিকের নিকট এই কথাগুলি একটু গায়ের জোর বলিয়া বোধ হয়। কে কি কল্পনা করিতে পারে বা না পারে, বলা কঠিন। আমি নিজে এটা কল্পনা করিতে পারি না, ইহা জোর করিয়া বলিতে

পারি ; কিন্তু ঐরূপ কল্পনা অপরের অসাধ্য কি না, তাহা বলিবার আমার কি অধিকার আছে? হর্বার্ট স্পেন্সার অসৎ হইতে সতের উৎপত্তি কল্পনায় আনিতে পারেন নাই ; কিন্তু অধিকাংশ খৃষ্টানই অসৎ হইতে সতের উৎপত্তি অনায়াসে কল্পনা করেন ; বলা বাহুল্য, তাঁহাদের মধ্যে অনেক ধীমান্ ব্যক্তি আছেন। খৃষ্টানদের মত এই যে, এক সময়ে জগৎ ছিল না ; একজন ইচ্ছা করিলেন, জগৎ হউক, আর জগৎ হইল ; অর্থাৎ অসৎ হইতে সৎ জন্মিল। সেই এক জনের শক্তিমত্তাকে কোনরূপে সীমাবদ্ধ করিতে খৃষ্টানেরা চাহেন না ; তাঁহার অসাধ্য কিছুই নাই ; তিনি অসৎ হইতে সতের উৎপাদনে সমর্থ ; তাঁহার সামর্থ্যের সীমা কল্পনা ইঁহাদেরই নিকট অসাধ্য। বড় বড় পণ্ডিতদের ঐরূপ বিসংবাদ দেখিয়া বৈজ্ঞানিক আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া কোন একটা দার্শনিক তথ্যের দোহাই দিতে একটু কুণ্ঠিত হইতে হয়।

দার্শনিক তত্ত্বটা ঠিক হউক আর না হউক, উহার উপরে নির্ভর করিয়া কোন বৈজ্ঞানিক তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠা করা চলে না। জড়ের ধ্বংস আছে কি না অর্থাৎ রাসায়নিক পরিবর্ত্তনে বা অন্যরূপ পরিবর্ত্তনে বস্তুর তারতম্য ঘটে কি না, ইহা সপ্রমাণ করিবার জন্য উক্ত দার্শনিক তত্ত্বের দোহাই দিলে বৈজ্ঞানিকের চলিবে না ; তাঁহাকে নিকৃতিযন্ত্রের সাহায্য লইতে হইবে। লাবোয়াশিয়ার পূর্ব্বে কোন ব্যক্তি নিকৃতি হাতে ওজন করিয়া দেখাইতে বসেন নাই, যে ঐরূপ তারতম্য প্রকৃতপক্ষে ঘটে কি না। কাজেই লাবোয়াশিয়ার পূর্ব্বে যদি কেহ বলিতেন, বস্তুর ধ্বংস হয় না, তাহা মানিয়া লইতে কেহ বাধ্য হইত না। লাবোয়াশিয়া যখন নিকৃতির ওজনে দেখাইলেন, যে বাতি পুড়িয়া যখন অদৃশ্য হয়, উহা তখন রূপান্তরিত হয় মাত্র, কিন্তু উহার

বস্তুর তারতম্য ঘটে না, তখনই আমরা মানিতে বাধ্য হইলাম যে, কথাটা সত্য, উহা প্রকৃতির বিধান, উহার উপর আমাদের হাত নাই।

ফলে জড় পদার্থ নিত্য বা অনাদি ও অনশ্বর, এই বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব কেবল মাথা ঘামাইয়া আবিষ্কৃত হয় নাই; যত বড় পণ্ডিতই হউন, ঐরূপ কথা বলিলে আমরা মানিয়া লইতে বাধ্য হইব না। *তবে যখন প্রত্যক্ষ পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা* নিকৃতির ওজনে দেখা যাইতেছে, জড়ের বস্তু-পরিমাণ সর্ব্ববিধ বিকার সত্ত্বেও সমান থাকে, তখন উহা স্বীকার করিতেই হইবে। কেন না, পদার্থবিদ্যায় প্রত্যক্ষের উপর আর প্রমাণ নাই; বিজ্ঞানবিদ্যা উহার অপেক্ষা বলবত্তর প্রমাণ জানে না।

পূর্ব্বে আমরা দেখাইয়াছি, মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম—যাহা নিউটন আবিষ্কার করেন—তাহা বিশ্বব্যাপক, এই কথাটায় একটু বাড়াবাড়ি আছে। উহা সৌর-জগতে ব্যাপক; যুগলতারকার গতিবিধি দেখিয়া ঐ নিয়ম সৌর-জগতের বাহিরেও প্রত্যক্ষ হয়; কিন্তু উহা অসীম বিশ্ব ব্যাপিয়া বিদ্যমান, ইহা বলা দুঃসাহসের কাজ। কেন না সমস্ত বিশ্ব-জগৎ এখনও প্রত্যক্ষগোচর হয় নাই; ব্রহ্মাণ্ডের কোথায় কি আছে, আমরা তাহা জানি না। হয়ত এমন স্থান রহিয়াছে, সেখানে মাধ্যাকর্ষণ অবিদ্যমান। যাহা প্রত্যক্ষ সীমার বাহিরে, সেখানে বিজ্ঞানের জোর করিয়া কথা কহা নিষিদ্ধ।

নিকৃতির ওজনের উপর নির্ভর করিয়া জড়পদার্থ অবিনাশী, এত বড় কথাটা বলা চলে কি? একালের রাসায়নিক পণ্ডিতেরা যে নিকৃতি ব্যবহার করেন, তাহাতে অতি সূক্ষ্ম ওজন হয়; এক ধানের ওজনের সহস্রাংশও হয়ত ধরা পড়ে; কিন্তু তাহার সূক্ষ্মতার একটা ত সীমা আছে। সহস্রাংশ না হয় ধরা পড়িল, কিন্তু লক্ষাংশের

বেলায় বা কোটি অংশের বেলা নিকৃতি নিরুত্তর। অতটুকু তার বাড়িলে বা কমিলে নিকৃতি তাহা ধরিতে পারিবে না। এখন যদি কেহ বলিয়া বসেন, বাতি পুড়িলে বস্তুর একটু ধ্বংস হয়, এত অল্পাংশের ধ্বংস হয় যে, কোন নিকৃতিতে তাহা ধরিতে পারা যায় না, তাহা হইলে তাহার প্রতিবাদ অসাধ্য হয়।

বস্তুতই একালের পণ্ডিতেরা জড় পদার্থ অবিনাশী, এই তত্ত্বের উপর গা ঢালা দিয়া একেবারে নিশ্চিন্ত থাকিতে সাহস করেন না। সৎ কখনও অসৎ হয় না, অতএব বস্তুর নাশ নাই, বলিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে সাহস ত করেনই না; এমন কি ঘটনাক্রমে বস্তুর উৎপত্তি বা ধ্বংস হইতে পারে কি না, তাহা প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধ করিবার জন্য বৈজ্ঞানিক সমাজে চেষ্টা এখনও চলিতেছে। হয়ত কোন দিন প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যাইবে, অমুক ক্ষেত্রে অমুক বস্তুর এতটুকু লোপ হইয়া থাকে।

যদি সেইরূপই ঘটে, যদি কখনও প্রমাণ উপস্থিত হয় যে, ঘটনাক্রমে বস্তুর পরিমাণে তারতম্য ঘটে, দার্শনিক পণ্ডিতেরা তৎক্ষণাৎ বলিয়া বসিবেন, তাহা হইলই বা? আমরা ত বলিয়াছি, যে সৎ হইতে অসৎ হয় না; অভাব হইতে ভাব হয় না, আবার ভাব হইতেও অভাব হয় না; তোমাদের (অর্থাৎ বৈজ্ঞানিকদের) নূতন আবিষ্কারে এই পর্য্যন্ত বুঝিলাম, তোমরা যাহাকে বস্তুসংজ্ঞা দাও, জড়ের যে ধর্ম্মকে তোমরা জড়ত্ব আখ্যা বা বস্তু আখ্যা দাও, সেই বস্তু কোন সৎ পদার্থ নহে, উহা কোন ভাবপদার্থ নহে; অতএব উহা নিত্যও নহে; উহা কোন আগন্তুক আনুষঙ্গিক ধর্ম্মমাত্র; উহার উৎপত্তিতে বা লোপে আমাদের বিচলিত হইবার হেতু নাই; যাহা সৎ পদার্থ, তাহা অসৎ হইবে না, ইহা কিন্তু স্থির।

ঠিক্ কথা, আমরা যাহাকে বস্তু বলিতেছি, তাহা সৎ পদার্থ না হইতে পারে; উহাকে সৎ পদার্থ মনে করাই ভুল হইয়াছিল। দার্শনিক নিজের পথে ঠিক আছেন, কিন্তু বৈজ্ঞানিক তুমি সাবধানে তাঁহার পথে চলিবে। নিউটন স্বয়ং বলিয়া গিয়াছেন, Physics, *Beware of Metaphysics,—বৈজ্ঞানিক, দার্শনিকের পথ তোমার* পথ নহে।

ঘটনাক্রমে অথবা অতি সূক্ষ্ম ওজনে বস্তুর তারতম্য ঘটে কি না, তাহা বর্ত্তমানকালে জোর করিয়া বলা চলে না; তবে মোটামুটি আমরা উহা সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকি ও সেই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়াই আমরা জীবনযাত্রা চালাই। বাজার হইতে একমণ চাউল বাড়ীতে আনিয়া যদি দেখিতাম, তাহার বস্তুপরিমাণ অকস্মাৎ সেরখানেক কমিয়া গিয়াছে, তাহা হইলে জীবনযাত্রা কঠিন হইত। বিধির বিধানে তাহা ঘটে না, তাই রক্ষা। তেমনি চাউলের গোলায় আগুন লাগিয়া যদি চাউল অন্তর্হিত হয়, তাহা হইলে মনে করিতে হইবে, উহা লুপ্ত হয় নাই, রূপান্তরিত হইয়া অদৃশ্য অনিলাবস্থায় বায়ুসাগরে লীন হইয়াছে মাত্র। যদি এই সকল বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব নির্ব্বিবাদে স্বীকৃত না হইত, তাহা হইলে মনুষ্যের জীবনযাত্রার প্রণালী সমস্ত সমাজতন্ত্র, কিরূপ বিশৃঙ্খল ও বিপর্য্যস্ত হইত, তাহা মনে করিলে গায়ে কাঁটা দেয়।

কয়লা-পোড়া অনিল

কয়েকটা অনিলের সহিত আমাদের এতক্ষণ পরিচয় ঘটিয়াছে। প্রথম অক্সিজন, ইনি দহনক্রিয়ার মূলে এবং ভস্মীকরণের মূলে। কয়লা বা গন্ধক দহনকালে অক্সিজন সহিত সম্মিলিত হয়; সঙ্গে সঙ্গে উত্তাপ ও আলোক দেখা দেয়; অর্থাৎ আগুন উঠে। সীসা অথবা

পারা বায়ুতে তপ্ত করিলে অক্সিজেন সহিত ধীরে ধীরে সম্মিলিত হইয়া ভস্মে পরিণত হয়; এবার আগুন উঠে না। অক্সিজন বায়ুসাগরে বিদ্যমান; তাই দাহ্যদ্রব্য বায়ুতে পোড়ে; তাই উনানে হাওয়া দিলে কয়লা শীঘ্র জ্বলে; হাপরে হাওয়া দিয়া স্বর্ণকার বা কর্ম্মকার কয়লা পোড়ায়। এই অক্সিজন বড় মিশুক স্বভাবের জিনিস; প্রায় সমুদায় মূল পদার্থের সহিত ইনি সম্মিলিত হইয়া বিবিধ যৌগিক পদার্থের উৎপাদন করেন। বায়ুর প্রায় পঞ্চমাংশ এই অক্সিজন, বাকিটা নাইট্রোজন। এই নাইট্রোজনের স্বভাব বিপরীত; ইনি অক্সিজনের সঙ্গে মিশিয়া আছেন, কিন্তু মিলেন নাই। তবে বায়ুতে ইনি আছেন, তাই রক্ষা; তাহা না হইলে অক্সিজনের প্রতাপে এতদিন আমাদের টেকা কঠিন হইত। তৃতীয় অনিল হাইড্রোজন; ইহাকে অমিলিত অবস্থায় বড় দেখা যায় না; তবে ইনি অক্সিজনের সহিত মিলিত হইয়া জল প্রস্তুত করিয়াছেন। সেই জল সর্ব্বত্র বর্ত্তমান। অক্সিজন দাহ্য পদার্থ; অক্সিজন পোড়াইলেই জল হয়। জলে তাড়িতস্রোত চালাইলে অক্সিজন ও হাইড্রোজন পৃথক্ হইয়া যায়। নয় ছটাক ওজনের জলে এক ছটাক হাইড্রোজন পাওয়া যায়, আর আট ছটাক অক্সিজন পাওয়া যায়। গরম বাষ্পকে তপ্ত লোহার নলে চালাইলে তপ্ত লোহা অক্সিজনকে টানিয়া লইয়া ভস্ম হয়, আর হাইড্রোজন বাহির হইয়া যায়। হাইড্রোজন তৈয়ার করিবার সব চেয়ে সহজ উপায়, লোহা কিংবা দস্তার মত ধাতুতে গন্ধকদ্রাবক ঢালা। গন্ধকদ্রাবকে হাইড্রোজন লুকাইয়া মিলিত আছে। ধাতু পদার্থ সেই হাইড্রোজনকে তাড়াইয়া দিয়া তাহার স্থান গ্রহণ করে।

হাইড্রোজন পুড়িলে জল হয়, আর কয়লা পুড়িলে কি হয়? কয়লার সহিত অক্সিজনের বেশ সদ্ভাব; ঠাণ্ডা কয়লা অক্সিজনে

মিলিতে চাহে না; তবে উহাকে গরম করিয়া, উত্তাপে রাঙা করিয়া, বায়ুমধ্যে রাখিলেই উহা দ্রুত পুড়িতে থাকে, আর অদৃশ্য হইতে থাকে। কয়লা জীবদেহে বিদ্যমান, আর জীবদেহ হইতে, অর্থাৎ প্রাণিদেহ বা উদ্ভিদ্দেহ হইতে, উৎপন্ন প্রায় সকল পদার্থেই বিদ্যমান। কাঠে পাতায় খড়ে তেলে বাতিতে সর্ব্বত্র কয়লা বিদ্যমান। অধিক উত্তাপ দিলে এই সকল পদার্থ পোড়ে, অর্থাৎ উহাদের কয়লা বায়ুর অন্তর্গত অক্সিজনে সম্মিলিত হইতে থাকে। *সম্মিলিত হইয়া কি হয়?* একটা অনিল হয়। উহা বায়ুর মতই বর্ণহীন ও অদৃশ্য। এই অনিলটার একটি বাঙ্গালা নাম চাই; কেহ নাম দেন অঙ্গারাম্ল; কেহ বলেন দ্ব্যম্লাঙ্গার বায়ু। উভয় নামই উৎকট; ভাষাবিৎ পণ্ডিতেরা একটা ভাল নাম রাখিবেন। আমরা উহাকে কয়লা-পোড়া অনিল বলিব।

ব্ল্যাক নামে একজন ইংরেজ বৈজ্ঞানিক—সে প্রীষ্টলীরও আগে —এই অনিলকে প্রথম প্রকাশ করেন। সেকালে যাঁহারা রসায়ন আলোচনা করিতেন, তাঁহারা কতকগুলি জিনিসের নাম দিতেন তীক্ষ্ণক্ষার ও কতকগুলি জিনিসের নাম দিতেন মৃদুক্ষার। চূণ জিনিষটা তীক্ষ্ণক্ষার; কিন্তু কাঠ পাতা পোড়াইলে যে ছাই অবশিষ্ট থাকে, তাহা মৃদুক্ষার। এই মৃদুক্ষার ধোবার কাজে আজিও ব্যবহৃত হয়। বাজারে যে সোডা পাওয়া যায়, তাহাও মৃদুক্ষার। এমন কি চাখড়িকেও আমরা মৃদুক্ষার বলিতে পারি; উহার দোষ এই যে, উহা জলে গলে না। এই সকল মৃদুক্ষারে কোন অম্লরস প্রয়োগ করিবামাত্র উহা ফোঁস ফোঁস করিয়া গর্জ্জাইতে থাকে; উহাতে ফেনা উঠে ও বুদ্বুদ উঠে। উহা হইতে সবেগে একটা অনিল বাহির হয়। ব্ল্যাক সাহেব এই অনিলের আলোচনা করেন।

মৃত্তক্ষারের মধ্যে ইহা বদ্ধ ছিল, অম্লযোগে তাহা বাহির হইল, ইহা দেখিয়া তাহার নাম দিয়াছিলেন বদ্ধ অনিল। অম্বলের রোগী ডাক্তারখানা হইতে সোডা আনিয়া তাহাতে অম্লরস—'আসিড'—মিশাইয়া উদরস্থ করেন; আর ফোঁস ফোঁস শব্দে যে অনিল নির্গত হয়, উহাই এই বদ্ধ অনিল, কয়লা-পোড়া অনিল। সোডা ও লেমনেড জলেও এই অনিল থাকে; ছিপি খুলিবামাত্র উহা সবেগে বাহির হয়। এই কয়লা-পোড়া অনিল কাঠ পাতা তেল বাতি প্রভৃতির দহনেও উৎপন্ন হয়; কেন না, ঐ সকল পদার্থেও কয়লা আছে ও সেই কয়লাই পোড়ে। এই কয়লা-পোড়া অনিলের কয়েকটা গুণ আছে, তাই দেখিয়া অনিলটা চেনা যায়।

প্রথম, উহা আগুন নিবাইতে পারে। অক্সিজনের ক্ষমতা আগুন জ্বালা; কিন্তু কয়লা অক্সিজনে সম্মিলিত হইয়া যে অনিল হয়, তাহার ক্ষমতা আগুন নিবান। দ্বিতীয়, উহা চূণের জলকে ঘোলাটে করে। চূণের জলে যে চূণ দ্রব অবস্থায় থাকে, ঐ চূণ কয়লা-পোড়া অনিলে সম্মিলিত হইয়া শাদা চাখড়িতে পরিণত হয়; সেই চাখড়ি চূণের জলকে ঘোলাটে করে।

মানুষের নিশ্বাসের বায়ু নলদ্বারা চূণের জলে প্রবেশ করিলে চূণের জল ঘোলাটে হয়। নিশ্বাসে পরিত্যক্ত বায়ুতেও কয়লা-পোড়া অনিল থাকে, তাই এরূপ হয়। এই অনিল মনুষ্যদেহে কিরূপে আসিল? মনুষ্যদেহেব একটা প্রধান উপাদান, এক হিসাবে সর্ব্বপ্রধান উপাদান, কয়লা। মনুষ্যদেহের রক্তে মাংসে, হাড়ে পর্য্যন্ত, প্রত্যেক অংশে, কয়লা বিদ্যমান। আমরা যে বায়ু টানিয়া লই, তাহাতে অক্সিজন আছে। সেই অক্সিজন ফুসফুসে প্রবেশ করে, সেখানে গিয়া শোণিতস্থিত কয়লার সহিত সম্মিলিত হয় ও কয়লাকে ধীরে পোড়াইয়া কয়লা-পোড়া অনিলে

পরিণত করে ; সেই অনিলটা আবার শ্বাস ত্যাগ করিবার সময় বাহির হইয়া আসে। শোণিত ধীরে পোড়ে; এত ধীরে পোড়ে, যে আগুন হয় না, তবে উত্তাপ হয়। মনুষ্যদেহ সর্ব্বদাই একটু উত্তপ্ত ; বাহিরের জিনিসের তুলনায় একটু উত্তপ্ত। থার্ম্মোমিটার বগলে দিলে উহা জানা যায়। ইহাতে বুঝিতে হইবে যে, মনুষ্যদেহে বিদ্যমান কয়লা দিবারাত্রি পুড়িতেছে ও প্রশ্বাসকালে বাহির হইয়া যাইতেছে। দেহ যেন একটা গরম উনান ; গরম বটে তবে জ্বলন্ত নহে ; উহাতে কয়লা অবিরাম ধীরে ধীরে পুড়িতেছে। কয়লা যত পুড়িতেছে, বাহির হইতে ততই নূতন কয়লা যোগাইতে হইতেছে। নতুবা এই অবিরাম দহনে শরীরের ক্ষয় অবশ্যম্ভাবী। সেই জন্য আমাদিগকে খাইতে হয়। প্রত্যেক গ্রাস অন্নের সহিত, ভাত রুটি মাছ মাংস ডাল তরকারি দুগ্ধ মিষ্টান্নের সহিত, আমরা কতকটা কয়লা উদরসাৎ করি; কেননা, কয়লা ঐ সকল খাদ্যদ্রব্যে প্রচুর পরিমাণে বর্ত্তমান। এইরূপে প্রতিদিন দুই চারি বার ভোজন করিয়া আমরা দেহের ক্ষয় পূরণ করি। জীবদেহ নিত্য নূতন কয়লায় গঠিত হয়। ফুসফুস্‌ও ক্রমাগত অক্সিজন আনিয়া পুরাণ কয়লাকে পোড়াইয়া বাহির করিয়া দিতেছে, আর অন্নের সহিত আমরা নূতন কয়লা যোগাইয়া ক্ষয় পূরণ করিতেছি। মনুষ্যদেহেও যে কাজ, অন্যান্য জন্তুর দেহেও সেই কাজ।

উদ্ভিদের দেহে কিন্তু উল্‌টা ব্যবস্থা। জন্তুর দেহ পোড়াইয়া যে কয়লা-পোড়া অনিল জন্মে, তাহা যায় কোথায়? তাহা বায়ুসাগরে মেশে। বায়ুতে অক্সিজন ও নাইট্রোজন প্রচুর বিদ্যমান; অল্প পরিমাণ কয়লা-পোড়া অনিলও বায়ুতে আছে। দশহাজারভাগ আয়তনের বায়ুমধ্যে চারিভাগেরও কম কয়লা-পোড়া অনিল আছে। উদ্ভিদের উহাই আহার। উদ্ভিদ্ এই অনিল হইতে কয়লা সংগ্রহ করে; নিজের

ক্ষমতায় পারে না ; সূর্য্যরশ্মির সাহায্যে কয়লা-পোড়া অনিলকে বিশ্লিষ্ট করিয়া কয়লাটুকু পাতার গায়ে সঞ্চিত করে ; পাতা হইতে উহা অন্যত্র চালিত হয়। গাছগুলি তাহাদের শত শত সবুজরঙের চেপ্টা পাতা বায়ুসাগরের মধ্যে বিছাইয়া রহিয়াছে। ঐ পাতার গায়ে কয়লা জমে ও তাহাতেই উদ্ভিদের দেহ নির্ম্মিত হয় ; ঐ পাতাগুলিই যেন গাছের পেট। উদ্ভিদের খাদ্য বায়ুসাগরে অনিলরূপে বিদ্যমান ; উদ্ভিদ্ সেই খাদ্য অনিল হইতে টানিয়া লইয়া আত্মসাৎ করে। উদ্ভিদের দেহের প্রধান উপাদান ঐ কয়লা। আবার উদ্ভিজ্জ দ্রব্যই জন্তুর খাদ্য। ছাগলে ঘাসপাতা খায় ; মানুষে ঘাসপাতা ফলমূল ছাগল পর্য্যন্ত খায়। আর বাঘে মানুষও খায়, ছাগলও খায়। যেন তেন কয়লা উদরস্থ করা চাই।

কয়লা থাকে বায়ুসাগরে ; সেখান হইতে গেল উদ্ভিদে, উদ্ভিদ্‌দেহ হইতে গেল জন্তুদেহে। জন্তুদেহ দিবারাত্রি দগ্ধ হইতেছে ; বায়ুর কয়লা বায়ুতে ফিরিয়া আসিতেছে।

কাঠপাতা যখন পোড়ান যায় তখন বায়ুর কয়লা বায়ুতে ফিরিয়া আসে। মনুষ্যদেহ যখন চিতানলে দগ্ধ হয়, তখনও বায়ুর কয়লা বায়ুতে ফিরে।

বায়ুসাগরে যে যৎকিঞ্চিৎ কয়লা-পোড়া বায়ু আছে, তাহাতেই সমস্ত জীবের দেহরক্ষা চলিতেছে।

মূলপদার্থ

যে কয়টা মূলপদার্থ প্রচুর পরিমাণে পৃথিবীতে পাওয়া যায়, অথবা যেগুলি আমাদের অধিক পরিচিত, তাহাদের নাম জানা উচিত।

হাইড্রোজন (অনিল)	পটাশিয়ম
অক্সিজন (অনিল)	সোডিয়ম
নাইট্রোজন (অনিল)	মগ্নীশম
ক্লোরিন (অনিল)	দস্তা
ব্রোমিন (তরল)	আলুমীন্‌ম
আয়োডিন	লোহা
কয়লা	পারা (তরল)
গন্ধক	তামা
সিলিকন	টিন
বোরন	সীসা
ফস্ফরস	রূপা
আর্সেনিকম	সোনা

যেগুলিকে অনিল বা তরল বলিয়া চিহ্নিত করা গেল, তদ্ব্যতীত অন্য মূল পদার্থগুলি কঠিন অবস্থাতেই দেখা যায়।

ধাতু ও অপ-ধাতু

উল্লিখিত মূলপদার্থগুলিকে দুইটা থাকে সাজাইয়াছি, উহার একটু তাৎপর্য্য আছে। দ্বিতীয় থাকের পদার্থগুলির একটু বৈশিষ্ট্য আছে। স্বাভাবিক অবস্থায় উহারা ঝক্ ঝক্ চক্ চক্ করে। সোডিয়ম ও পটাশিয়ম ছাড়া অন্যগুলি দমে ভারী ও জলে ডুবে। উহারা হাতুড়ির ঘা সহে ও টান সহে। কেবল পারদ তরল পদার্থ, উহা ঘাও সহে না, টানও সহে না। আর উহাদের একটা দিক্ গরম করিলে অন্যদিক্‌টা খুব শীঘ্র গরম হইয়া উঠে, অর্থাৎ উহারা উত্তাপের

পরিচালক। এইরূপ লক্ষণ দেখিয়া উহাদের ধাতু নাম দেওয়া হইয়াছে। কয়লা গন্ধক প্রভৃতিতে ঐ সকল লক্ষণ না থাকায় উহাদিগকে ধাতু বলা যায় না। প্রথম থাকের পদার্থগুলিকে **অপ-ধাতু** ও দ্বিতীয় থাকের পদার্থগুলিকে **ধাতু** বলা যাইতে পারে। বস্তুতঃ ধাতু ও অপ-ধাতুর মধ্যে যে একটা স্পষ্ট ভেদ আছে, তাহা নহে। কতিপয় মূলপদার্থ আছে, ঐ তালিকায় তাহার নাম দেওয়া হয় নাই; তাহাদের ধাতুর লক্ষণ কিছু কিছু আছে, সমস্ত নাই।

অপ-ধাতুর মধ্যে হাইড্রোজন, গন্ধক অক্সিজন ও নাইট্রোজন এবং কয়লার সম্বন্ধে আলোচনা কিছু কিছু করিয়াছি। আগ্নেয়গিরির উৎপাতে ভূগর্ভ হইতে গন্ধক বাহির হয়; যে সকল দেশে আগ্নেয়গিরি বর্ত্তমান, সেই সকল দেশে গন্ধক পাওয়া যায়। গন্ধক ধাতুর সহিত যুক্ত হইয়া খনিমধ্যে থাকে। ফস্ফরস্ মৌলিক অবস্থায় পাওয়া যায় না। জীব-জন্তুর হাড়ে উহা যৌগিক অবস্থায় থাকে, হাড় পোড়াইয়া তাহার ছাই হইতে উহা নিষ্কাশিত করা হয়। ধাতুর মধ্যে সোনা মৌলিক অবস্থায় পাওয়া যায়। রূপা সীসা এবং পারা মুখ্যতঃ অন্য পদার্থে যুক্ত হইয়া খনিতে থাকে। অন্যান্য ধাতু ও অপ-ধাতু পৃথিবীতে মৌলিক অবস্থায় পাওয়া যায় না।

প্রথম থাকের জিনিসগুলির মধ্যে অক্সিজন গন্ধক এবং ক্লোরিন এই তিনটার বড় মিশুক স্বভাব; উহারা ধাতুপদার্থের সহিত মিলিত হইবার জন্য যেন ব্যগ্র। হাইড্রোজন অক্সিজনে মিলিত হইয়া জলে পরিণত হইয়া রহিয়াছে। কয়লাও অক্সিজনে মিলিত হইয়া বায়ুর মধ্যে বিদ্যমান আছে। নদীর ও সমুদ্রের ধারে যত বালি আছে, ঐ বালির মধ্যে সিলিকন আছে; সিলিকন অক্সিজনে যুক্ত হইয়া বালুকা প্রস্তুত করিয়াছে। গন্ধক ও অক্সিজন মিলিত হইয়া গন্ধক-পোড়া

অনিল হয়; গন্ধক পোড়াইলে নাকে যে তীব্র গন্ধ লাগে, তাহা এই অনিলের।

ধাতুর মধ্যে সোনা আর রূপা অক্সিজনে মিলিতে পারে না। অন্যান্য ধাতু অক্সিজনে মিলিয়া ভস্ম হইয়া যায়; অক্সিজনে মিলিত হওয়ার পর উহারা আবার কয়লা-পোড়া বা গন্ধক-পোড়া অনিলে মিলিত হইয়া নানাবিধ যৌগিক দ্রব্যের প্রস্তুত করে। ঐ সকল যৌগিক দ্রব্য নানা আকরিকের মধ্যে পাওয়া যায়। ঐসকল ধাতুভস্ম আবার বালুকাতে মিলিত হইয়া বিবিধ পাষাণের উৎপত্তি করিয়াছে। ধাতুভস্মের মধ্যে আলুমীনমের ভস্মটাই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য; আলুমীনম ভস্ম বালুকাযোগে যে পাষাণের উৎপাদন করে, তাহারই পরিমাণ সব চেয়ে অধিক; এইরূপে যে আকরিক উৎপন্ন হইয়াছে, উহাই কালসহকারে চূর্ণ হইয়া মৃত্তিকায় পরিণত হইয়াছে।

রূপা তামা টিন লোহা পারা প্রভৃতি যাবতীয় ধাতুর সহিত গন্ধক সহজে মিলিত হয়। খনিতে মূল ধাতু প্রায় পাওয়া যায় না। গন্ধক বা অন্য পদার্থের সহিত মিলিত অবস্থায় পাওয়া যায়। অনেক চেষ্টায় সেই গন্ধকাদিকে অপসৃত করিয়া মূল ধাতু বাহির করিতে হয়।

ক্লোরিন নামক অনিলটা কোথাও মৌলিক অবস্থায় পাওয়া যায় না। যে লবণ আমরা খাই, সাগরের জলে যাহা বিদ্যমান, সেই নুনের মধ্যে ক্লোরিন বর্ত্তমান। নুনের ভিতর হইতে বাহির করিলে দেখা যায়, ক্লোরিনের বর্ণ হরিদাভ, ঘ্রাণ তীব্র। ক্লোরিন এত তেজে ধাতুপদার্থে সম্মিলিত হয় যে, উহাতে উত্তাপ জন্মে, এমন কি আলোকও জন্মে। অক্সিজনে যেমন নানা দ্রব্য দগ্ধ হয়, ক্লোরিনেও সেইরূপ নানা দ্রব্য দগ্ধ হয়। সোডিয়ম নামক ধাতু ক্লোরিনে সম্মিলিত অর্থাৎ ক্লোরিনে দগ্ধ হইয়াই নুনের উৎপাদন করিয়াছে; সেই লবণে

সমুদ্রজল এমন লোণা হইয়া গিয়াছে। একমণ সমুদ্রের জলে সের তিনেক নুন পাওয়া যায়। ব্রোমিন ও আয়োডিন এই দুই পদার্থও অনেকাংশে ক্লোরিনের সমানধর্ম্মী। উহারাও লাবণিক পদার্থের উৎপাদন করে।

আমরা পৃথিবীবাসী, ভূপৃষ্ঠে যে সকল দ্রব্য লইয়া সর্ব্বদা কারবার করি, জীবনযাত্রা চালাই, তাহার মোটামুটি একটা বিবরণ দিলাম। দেখা গেল, গোটাকতক মূলপদার্থের—গোটাকতক ধাতু আর অপ-ধাতুর—নানাভাগ মিলনে ও মিশ্রণে প্রায় যাবতীয় পদার্থ উৎপন্ন হইয়াছে। অক্সিজন ও নাইট্রোজন এই দুই অনিল মিশিয়া সমস্ত বায়ু হইয়াছে। হাইড্রোজন পুড়িয়া অর্থাৎ অক্সিজনে মিলিয়া সমস্ত জল প্রস্তুত হইয়াছে। এই জলের অধিকাংশই সমুদ্রে সঞ্চিত; কিঞ্চিৎ বাষ্পীয় অবস্থায় বায়ুতে মিশিয়া আছে। সমুদায় জীবদেহে—জন্তুর ও উদ্ভিদের দেহে—কয়লা বিদ্যমান। কয়লা নহিলে জীবজন্তুর দেহের কাঠামটাই হইত না। কয়লা নিজে কঠিন; কিন্তু উহা অক্সিজনে পুড়িলে অনিল হয়; ঐ অনিলের যৎকিঞ্চিৎ বায়ুতে মিশিয়া আছে। বায়ুর পক্ষে উহা যৎকিঞ্চিৎ; কিন্তু উহা হইতেই সমুদায় জীবজন্তুর দেহ নির্ম্মিত হইয়াছে। চা'ল ডা'ল ঘি চিনি ইত্যাদি সমুদায় জৈবপদার্থে কয়লা বিদ্যমান। যে মাটিতে ভূপৃষ্ঠ ঢাকিয়া আছে, যে মাটিতে ফসল জন্মে, উহা পাষাণ ভাঙিয়া উৎপন্ন; আলুমীনম ধাতুর ভস্মে অধিকাংশ পাষাণ গঠিত। আলুমীনম ভস্মে বালুকাযোগে পাষাণ গঠিত হইয়াছে। বালুকা আবার সিলিকন হইতে উৎপন্ন। কোন্ কালে সিলিকন পুড়িয়া অর্থাৎ অক্সিজনে যুক্ত হইয়া বালুকাবৎ হইয়াছিল; তাহাই আবার আলুমীনম ভস্মে যুক্ত হইয়া নানা পাষাণ— পর্ব্বত-কলেবর—গঠন করিয়াছে। পৃথিবীর পাষাণ-কলেবরে স্থানে স্থানে অন্যান্য ধাতু-পদার্থ পাওয়া যায়।

পৃথিবীর পৃষ্ঠে আমরা বাস করি; ভূ-পৃষ্ঠের নানা দ্রব্য লইয়া আমরা জীবন চালাই। অধিকাংশই যৌগিক দ্রব্য এবং কতিপয় ধাতু ও অপ-ধাতুর মিলনে জাত। প্রধান প্রধান ধাতু ও অপ-ধাতুগুলির কিঞ্চিৎ বিবরণ দিলাম। কিন্তু গোটা পৃথিবীটাই বা কিরূপ দ্রব্য?

পৃথিবী যে গোলাকার এ-বিষয়ে সন্দেহ নাই। এদেশের প্রাচীন জ্যোতিষীদের এ-বিষয়ে কোন সন্দেহ ছিল না; এমন কি পৃথিবী কত বড়, তাহারও একটা মোটামুটি মাপ তাঁহাদের জানা ছিল। একালের মাপ তার চেয়ে সূক্ষ্ম। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে, গোলাকার পৃথিবীর কেন্দ্র হইতে পৃষ্ঠ পর্য্যন্ত দূরত্ব প্রায় ৪০০০ মাইল। অর্থাৎ ভূপৃষ্ঠের ৪০০০ মাইল নিম্নে পৃথিবীর কেন্দ্র বর্ত্তমান; পৃথিবীর পরিধি প্রায় ২৫০০০ মাইল অর্থাৎ রেলওয়ে গাড়ী ঘণ্টায় ২৫ মাইল বেগে একটানা চলিতে পারিলে ১০০০ ঘণ্টায় অর্থাৎ প্রায় ৪২ অহোরাত্র কাল অবিরাম চলিলে পৃথিবী ঘুরিয়া আসিতে পারিবে।

পৃথিবীর মত বৃহৎ বর্ত্তুলটার বস্তু-পরিমাণ আপাততঃ বাতুলের প্রলাপ মনে হইতে পারে। তুলদাঁড়িতে বা নিক্তিতে ওজন করিয়া আমরা সকল দ্রব্যের বস্তুর পরিমাণ করি। কোন্ নিক্তিতে পৃথিবী ওজন করিব? ক্যাবেণ্ডিশের নাম পূর্ব্বে করিয়াছি,—তিনি পৃথিবী ওজনের উপায় বাহির করেন। একটা সীসার গোলার মাধ্যাকর্ষণের সহিত পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের তুলনা করিয়া পৃথিবীর বস্তু সীসার গোলকের বস্তুর কতগুণ অধিক, তাহা তিনি স্থির করেন। নিউটন মাধ্যাকর্ষণের যে নিয়ম বাহির করিয়াছিলেন, তাহার জোরেই এই তুলনা সাধ্য হইয়াছিল। কোন দ্রব্যকে একদিক্ হইতে পৃথিবী

টানিতেছেন ; অন্তদিক্ হইতে সীসার গোলক টানিতেছেন ; উভয়ের অভিমুখে ঐ দ্রব্যের গতিবিধি দেখিয়া এই তুলনা হইয়াছিল। স্থির হইয়াছিল, সীসার গোলায় কতগুণ বস্তু পৃথিবীতে আছে। এই পরিমাপ-কার্য্য ক্যাবেণ্ডিশের পরেও কয়েক জনে আরও সূক্ষ্ম যন্ত্র সাহায্যে সম্পাদন করিয়াছেন। দেখা গিয়াছে, পৃথিবীর আপেক্ষিক গুরুত্ব জলের গুরুত্বের প্রায় ৫॥০ গুণ।

পৃথিবীর ব্যাস ৮০০০ মাইল, ব্যাসার্দ্ধ ৪০০০ মাইল ও পরিধি প্রায় ২৫০০০ মাইল। ব্যাসার্দ্ধের বর্গ ১, ৬০, ০০,০০০কে পরিধির পরিমাণ ২৫০০০ দিয়া গুণ করিয়া তাহার দুই-তৃতীয়াংশ লইলে পৃথিবী কত বড়, পৃথিবীর ঘনফল কত ঘন মাইল, তাহা পাওয়া যায়। পৃথিবীর বস্তু বাহির করা ত্রৈরাশিকের আঁক। এক ঘন ফুট জলের বস্তু ওজনে ত্রিশ সের মাত্র, এত ঘন মাইল পৃথিবীর ওজন কত হইবে, পাঠশালার ছেলেতে আঁক কষিয়া বলিয়া দিবে। মনে রাখিতে হইবে, জলের তুলনায় পৃথিবী ৫॥০ গুণ গুরু।

যাহা হউক এত বড় পৃথিবীটা মোটের উপর কোন্ জিনিসে গঠিত, তাহা জানিবার কোন উপায় নাই। পৃথিবীর অভ্যন্তর যে কঠিন অবস্থায় আছে, তাহাই অনেকে অনুমান করেন। আমরা মাটি খুঁড়িয়া ভূগর্ভে অতি অল্প দূরে নামিতে পারি। পৃথিবীর যাহা ব্যাস, তাহার তুলনায় সেটা কিছুই নহে। উহাতে পৃথিবীর পিঠের চামড়াটার যৎকিঞ্চিৎ খবর পাওয়া যায় মাত্র। মাটি খুঁড়িয়া গর্ত্ত করিয়া বা খনির মধ্যে প্রবেশ করিয়া সেই চামড়াটারও কয়েক ফুটের অধিক দেখা যায় না। তবে পৃথিবীর পিঠের চামড়াটা জায়গায় জায়গায় উঁচু হইয়া উঠিয়াছে, কোথাও বা নামিয়া গিয়া গভীর গর্ত্তের সৃষ্টি করিয়াছে। পৃথিবীর পিঠ যেখানে উঠিয়া আছে, তাহাকে বলি

মহাদেশ, আর যেখানে নামিয়া গিয়া গর্ত্ত হইয়াছে, তাহাকে বলি মহাসাগর। ঐ গর্ত্ত লোণা জলে পূর্ণ। মহাদেশের পিঠে পাহাড়-পর্ব্বতগুলি কয়েক মাইল পর্য্যন্ত স্থানে স্থানে ঠেলিয়া উঠিয়াছে। আমাদের হিমালয়ের এক একটা শৃঙ্গ নিম্নস্থিত ভূ-পৃষ্ঠে ভারতবর্ষের জমি ছাড়িয়া পাঁচ মাইলের উপর উঠিয়াছে। চামড়াটা ঐরূপ উঁচু হইয়া উঠিয়াছে, এবং স্থানে স্থানে আবার ফাটিয়া গিয়া বা ক্ষয় হইয়া উহার অভ্যন্তর প্রকাশ করিতেছে, কাজেই সেই চামড়াটার অবস্থা কতক বুঝা যায়।

এই চামড়াটা বস্তুতই পাষাণ-নির্ম্মিত। পৃথিবীর অভ্যন্তরে যাহাই থাকুক, পৃথিবীর পিঠ যে চামড়ায় ঢাকা আছে, তাহা পাষাণের চামড়া। সেই পাষাণই স্থানে স্থানে পাহাড়-পর্ব্বত নামে অভিহিত। নানাবিধ ধাতু, বিশেষতঃ আলুমীনম ধাতু, কি জানি কোন্ কালে অক্সিজনে দগ্ধ হইয়া ভস্ম হইয়াছিল, এবং পরে সেই আলুমীনম্ ভস্ম বালুকার সহিত মিলিত হইয়া এই পাষাণের উৎপত্তি করিয়াছে। যুগ ব্যাপিয়া, কত লক্ষ বৎসর ধরিয়া, জলে বাতাসে নীহারে, সেই পাষাণ ভগ্ন চূর্ণ শিথিল হইয়া মৃত্তিকায় পরিণত হইয়াছে এবং সেই মৃত্তিকা উচ্চ ভূমি হইতে জলস্রোতে নিম্ন ভূমিতে আনীত হইয়া সমতল দেশের গঠন করিয়া উহাকে শস্যশালী ও জীব-জন্তুর আবাস-যোগ্য করিয়াছে। কিন্তু ভূপৃষ্ঠ কোমল মৃত্তিকায় নির্ম্মিত এরূপ মনে করা ভুল; উহা কঠিন পাষাণে নির্ম্মিত। বসুন্ধরার পিঠ পাষাণের পিঠ; ঐ পাষাণের পিঠের উপর স্থানে স্থানে মৃত্তিকার একটু প্রলেপ আছে মাত্র। যেখানে মৃত্তিকা দেখিবে, তাহার নীচে পাষাণ আছে বুঝিতে হইবে। ছোটনাগপুর অঞ্চলে মাটির অল্প নীচেই পাষাণ পাওয়া যায়; এমন কি বহু স্থলে মাটি ছাড়িয়া পাষাণ বাহির হইয়া রহিয়াছে; তাহাই পাহাড়। ঐ পাষাণও ক্রমে মাটিতে পরিণত হইতেছে; কিন্তু

সেই মাটি অত উঁচুতে দাঁড়াইতে পারে না, জলস্রোতে, নদীস্রোতে নিম্নতর ক্ষেত্রে নামিয়া আসে। বাঙ্গলা দেশের মাটির নীচেও পাষাণ আছে; তাহা এত নীচে পড়িয়া আছে যে, এ পর্য্যন্ত মাটি খুঁড়িয়া পাষাণটা কেহ বাহির করিতে পারেন নাই।

মোটামুটি এখন বলিতে পারি, পৃথিবীর ভিতর কেমন জানি না, কিন্তু ভূপৃষ্ঠের বাহিরটা পাষাণময়। সেই পাষাণ পিঠের বার আনা ভাগ লোণা জলে আবৃত। সমুদ্রের এই জলটা কোন কালে হাইড্রোজন দহনে উৎপন্ন হইয়াছে। আর উহার নুনটা সোডিয়ম ধাতুর সহিত ক্লোরিনের মিলনে উৎপন্ন হইয়াছে। নুনটা জলে গলিয়া গিয়া জল লোণা হইয়াছে। এইরূপে জলাবৃত ভূপৃষ্ঠের উপরে আবার অনিলের আবরণ। তাহাই বায়ুসমুদ্র। উহার চারিভাগ নাইট্রোজন, একভাগ অক্সিজন আর যৎকিঞ্চিৎ কয়লা-পোড়া অনিল ও জলীয় বাষ্প।

হয়ত এককালে বায়ুসমুদ্রে অক্সিজনের ভাগ আরও ছিল। হাইড্রোজন অনিল ও নানা ধাতুপদার্থ কালে।সেই অক্সিজনে যুক্ত হইয়া মহাসমুদ্র ও ভূপৃষ্ঠ প্রস্তুত করিয়াছে। সেই দহনঘটনার পরে যে অক্সিজনটুকু অবশিষ্ট আছে, তাহাই এখন বায়ুসাগরে বর্ত্তমান। যদি সমস্ত অক্সিজনটাই দহনক্রিয়ায় ফুরাইয়া যাইত, তাহা হইলে আমাদের নিশ্বাস ফেলিবার জন্য বায়ু থাকিত না; তাহা হইলে পৃথিবীতে জীবের উৎপত্তি ও উপদ্রব সম্ভবপর হইত না।

রাসায়নিক সম্মিলন

মেলা আর মেশা এই দুটি শব্দ পুনঃপুনঃ ব্যবহার করিয়াছি। দুইটা জিনিস যেখানে যে কোন ভাগে মিশ্রিত হয়, সেখানে বলা যায়

মেশা; আর ভাগের একটা বাঁধাবাঁধি নিয়ম থাকিলে বলা যায় মেলা বা রাসায়নিক সম্মিলন। এক সের হাইড্রোজন আট সের অক্সিজনে মিলিত হইয়া নয় সের জল হয়; বার সের কয়লা বত্রিশ সের অক্সিজনে মিলিত হইয়া চুয়াল্লিশ সের কয়লা-পোড়া অনিল হয়। অক্সিজনের ভাগ অধিক থাকিলে, অতিরিক্ত ভাগটা পড়িয়া থাকে, কাজে লাগে না; মিশ্রিত হয় না। হাইড্রোজন বা কয়লার ভাগ অধিক থাকিলে উহারও অতিরিক্ত অংশ অবশেষ থাকে।

দুধে জল যত ইচ্ছা তত মিশিতে পারে, ঘিয়ে চর্ব্বি যত ইচ্ছা তত মেশান যায়। ভেজাল মেশানর জ্বালায় গৃহস্থ অস্থির। সেইরূপ অক্সিজনে হাইড্রোজন যত ইচ্ছা মেশান যাইতে পারে; কিন্তু মেলান যায় না। এক ভাগ হাইড্রোজনে দশ ভাগ অক্সিজন মেশাইয়া রাখ; যতকাল ইচ্ছা রাখিতে পার—উহারা মিলিয়া জলে পরিণত হইবে না। কিন্তু অগ্নিস্পর্শমাত্র হাইড্রোজন জ্বলিয়া উঠিবে; হাইড্রোজনে অক্সিজন সম্মিলিত হইবে; হাইড্রোজন পুড়িয়া জল হইবে। দেখ সমস্ত অক্সিজন খরচ হয় নাই; দশ ভাগের মধ্যে আট ভাগ মাত্র লুপ্ত হইয়াছে; দুই ভাগ অক্সিজন অবশিষ্ট আছে। ইহারই নাম মেলা। কাজেই মেলা আর মেশা পৃথক্ অর্থে প্রয়োগ করিতে হয়। মেলার ভাল কথা সম্মিলন—আমরা বলি যে হাইড্রোজন অক্সিজনে যুক্ত হইয়া, মিলিত হইয়া, জলের উৎপত্তি হইয়াছে—উহা সম্মিলন। উহা মিশ্রণ নহে। আর দুধে জল মেশান বা ঘিয়ে চর্ব্বি মেশান,—এমন কি জলে চিনি মেশান বা নুন মেশান, উহা মিশ্রণমাত্র; যত ইচ্ছা তত মিশাইতে পারা যায়। তেমন ধরাবাঁধা নিয়ম নাই। রসায়ন বিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয় ঐ সম্মিলন ঘটনা। কাজেই এই সম্মিলন ঘটনাকে ঘোরাল নাম দেওয়া হয়

সম্মিলন?

যেখানে দেখিব যে দুইটা পদার্থ মিলিয়া ভিন্নরূপ তৃতীয় পদার্থ হইয়াছে, অথচ কোন্‌টা কত ভাগ লইতে হইয়াছে, তাহার একটা ধরাবাঁধা নিয়ম আছে, সেখানেই বলিব ঘটনাটা রাসায়নিক সম্মিলন। বিবিধ মূলপদার্থ রাসায়নিক সম্মিলনে মিলিত হইয়া বিবিধ যৌগিক পদার্থ উৎপাদন করে; কিন্তু সর্ব্বত্রই ভাগের একটা বাঁধাবাঁধি নিয়ম আছে।

তামা গন্ধকে মিলিত হয়। ভাগের বাঁধাবাঁধি নিয়ম আছে। ৬৩ ভাগ তামা ৩২ ভাগ গন্ধকে মিলিত হয়, তাহার কম বেশী হয় না। তামা ৬৫ ভাগ হইলে ২ ভাগ পড়িয়া থাকিবে—কাজে লাগিবে না। গন্ধক ৩৩ ভাগ হইলে ১ ভাগ পড়িয়া থাকিবে—কাজে লাগিবে না। ঠিক্ ৬৩ ভাগ তামা ও ৩২ ভাগ গন্ধক হওয়া চাই। অধিক লওয়া অনাবশ্যক। ইহার মানে কি?

রও, আর একটু কথা আছে। তামা গন্ধকে মিলিত হইয়া দুই রকমের যৌগিক পদার্থের উৎপাদন করে। প্রথম পদার্থে ভাগের নিয়ম, ৬৩ ভাগ তামা ৩২ ভাগ গন্ধক; দ্বিতীয় পদার্থে ভাগের নিয়ম, ৬৩ ভাগ তামা ১৬ ভাগ গন্ধক। প্রথমটায় গন্ধকের ভাগ ৩২; দ্বিতীয়টায় ১৬। ধারাপাতের নামতা মনে আছে? ১৬ দু-গুণে ৩২।

কয়লা হাইড্রোজনে যুক্ত হইয়া নানাবিধ অনিল প্রস্তুত হয়; নানাবিধ—অর্থাৎ সংখ্যা করা কঠিন। যে গ্যাসের আলোতে সহরের রাস্তায় আলো দেওয়া হয়, সেই গ্যাসের মধ্যে এই সকল অনিল আছে। কয়লা দাহ্য পদার্থ; হাইড্রোজন দাহ্য পদার্থ; আর উভয়ের মিলনে উৎপন্ন এই অনিলগুলাও দাহ্য পদার্থ; সেই জন্যই এই গ্যাস জ্বালাইয়া সহরের পথে আলো দেওয়ার বন্দোবস্ত হয়। এই সকল অনিলের ইংরেজি নাম আছে, একটার নাম মার্শ গ্যাস; উহা পচা পাঁকে জন্মে।

একটার নাম ইথিলীন—উহার আলো উজ্জ্বল; একটার নাম আসিটিলীন—ইহার আলো এত উজ্জ্বল যে, আজ কাল রোশনাই জন্ত আসিটিলীনের ছড়াছড়ি; উহা না হইলে বিবাহের বরযাত্রা হয় না। আর নাম করিব না। এই তিনটা অনিলেই কয়লা আর হাইড্রোজন বিদ্যমান। ভাগের নিয়ম কিরূপ দেখা যাউক। মার্শগ্যাসে হাইড্রোজন ১ ভাগ, কয়লা ৩ ভাগ; ইথিলীনে হাইড্রোজন ১ ভাগ, কয়লা ৬ ভাগ; আর আসিটিলীনে হাইড্রোজন ১ ভাগ, কয়লা ১২ ভাগ। আবার নামতা আওড়াও—তিন একে তিন; তিন দু-গুণে ছয়; তিন চারি বার। এ কি ব্যাপার?

তামার সহিত রাসায়নিক সম্মিলনে গন্ধকের ভাগ হয় ১৬, না হয় ৩২; ১৭ নয়, ১৮ নয়, ২০ নয়, ৩১ নয়, ৩৩ নয়, ৩২ মাত্র; ঠিক্ ১৬র দ্বিগুণ। হাইড্রোজনের সহিত রাসায়নিক সম্মিলনে কয়লার ভাগ ৩ অথবা ৬ অথবা ১২; ৩এর দ্বিগুণ ৬; আবার ৩এর চারিগুণ ১২; ৫ নয়, ৭ নয়, ১১ নয়, ১৩ নয়, ৩ অথবা তাহারই কোন গুণফল। ইহার মানে কি?

গন্ধকের সহিত ১৬ র সম্পর্ক কি? কয়লার সঙ্গে ৩এর সম্পর্ক কি?

সর্ব্বত্র এইরূপ। অক্সিজনের সহিত রাসায়নিক সম্মিলনে মিলিত না হয়, এমন মূল পদার্থ পাওয়া কঠিন। পূর্ব্বে বলিয়াছি, সোনা আর রূপা ছাড়া প্রায় যাবতীয় পদার্থই অক্সিজনে মিলিত হইয়া নানা সংখ্যাতীত যৌগিক পদার্থের উৎপাদন করে। কিন্তু এই সমুদায় যৌগিক পদার্থ বিশ্লেষণ করিয়া দেখা গিয়াছে, অক্সিজনের ভাগ ৮ অথবা ৮এর কোন গুণফল,—১৬, ২৪, ৩২, ৪০ ইত্যাদি। ৭, ৯, ১১, ১৩, ইত্যাদি ভাগ হয় না। এমন কি ৮এর দেড়গুণ ১২ কিংবা ৮এর আড়াইগুণ ২০, এরূপ ভাগও পাওয়া যায় না। ৮এর সঙ্গে

অক্সিজনের সম্পর্ক কি? এই এক সমস্যা। এই সমস্যার পূরণ আবশ্যক। বুদ্ধিবলে ইহা পূরণ করিতে হইবে—বুদ্ধির্যস্য বলং তস্য।

সমস্যা কি? হাইড্রোজনের ভাগ সর্ব্বত্র ১ ধরা বিধি। তাহার তুলনায় অন্যান্য মূল পদার্থের ভাগ নিরূপণ করিতে হয়। ১ ভাগ হাইড্রোজনে কত ভাগ অক্সিজন মিলিত হয়, দেখিয়া অক্সিজনের ভাগ স্থির হয়। আবার ১ ভাগ হাইড্রোজনে কয় ভাগ কয়লা মিলিত হয়, এই দেখিয়া কয়লার ভাগ স্থির হয়; আবার ১ ভাগ হাইড্রোজনে কয়ভাগ গন্ধক মিলিত হয়, তাহা দেখিয়া গন্ধকের ভাগ স্থির হয়। অথবা ১ ভাগ হাইড্রোজনে ৮ ভাগ অক্সিজন মিলিত হয়, ইহা আগে দেখিয়া লও; পরে ৮ ভাগ অক্সিজনে কয়ভাগ কয়লা, কয়ভাগ গন্ধক, কয় ভাগ নাইট্রোজন, কয়ভাগ তামা, কয়ভাগ দস্তা, কয়ভাগ লোহা মিলিত হয়, তাহা দেখিয়া ঐ ঐ মূল পদার্থের ভাগ নিরূপিত হইতে পারে। দেখা যাইবে যে, রাসায়নিক সম্মিলন ঘটনায় সর্ব্বত্র ভাগের ঐরূপ বাঁধাবাঁধি নিয়ম আছে; আর দেখিবে যে, কোন দুই মূল পদার্থ মিলিয়া একাধিক যৌগিক পদার্থ যখন উৎপাদন করে, তখনই ঐরূপ নামতা আওড়াইতে হইবে। কয়লার ভাগ ৩ অথবা ৬, অথবা ১২ বা ৩এর কোন একটা গুণফল; ৩এর কোন ভগ্নাংশ নহে। গন্ধকের ভাগ ১৬ অথবা ৩২ অথবা ৪৮; ১৬র কোন ভগ্নাংশ নহে। নাইট্রোজনের ভাগ ১৪ অথবা ২৮ অথবা ৪২; ১৪র কোন ভগ্নাংশ নহে। ইহার তাৎপর্য্য কি? ইহার মানে কি?

মনে কর, আমি দান করিতে বসিয়াছি; আমার বাক্সের ভিতর রৌপ্যখণ্ড বোঝাই করা আছে, এবং যে আসিতেছে, তাহাকেই কিছু না কিছু দিতেছি। কাহাকেও অল্প, কাহাকেও অধিক দিতেছি। বাক্সে যদি কেবল টাকা থাকে, আধুলি সিকি দুয়ানি বা পয়সা না

থাকে, তাহা হইলে দান করিতে হইলে আমাকে অন্যূন একটা টাকা দিতে হইবে; তাহার অল্প দান অসাধ্য হইবে। দুই টাকা পাঁচ টাকা দশ টাকা—গোটা গোটা টাকা—দিতে পারিব, কিন্তু দেড় টাকা, আড়াই টাকা, সওয়া তিন টাকা দান আমার পক্ষে অসাধ্য হইবে; কেন না, থাকার ভগ্নাংশ আমার কাছে নাই। একটা টাকাকে কাটিয়া বা ভাঙ্গিয়া রূপার টুকরা করিয়া লইতে পারি, কিন্তু তাহা টাকা থাকিবে না, তাহা রূপার দরে বিক্রয় হইবে; বাজারে তাহা মুদ্রা বলিয়া চলিবে না। সেইরূপ বাক্সে যদি সিকি বোঝাই থাকে, দুয়ানি আধুলি বা টাকা পয়সা না থাকে, তাহা হইলে আমাকে ন্যূন পক্ষে এক সিকি বা চারি আনা দান করিতে হইবে; এবং চারি আনার গুণফল আট আনা, বার আনা, ষোল আনা, বিশ আনা, বত্রিশ আনা দান করা চলিবে, কিন্তু পাঁচ আনা, ছয় আনা, নয় আনা, দশ আনা, বাইশ আনা বা চৌত্রিশ আনা কিছুতেই দেওয়া চলিবে না। কেন না, সিকিকে কাটিয়া দেওয়া চলিবে না; কাটিলে উহা সিকি থাকিবে না।

এখন ভিক্ষুকেরা দাতার নিকটে হাত পাতিয়া যদি দেখিতে পায় যে, তিনি চারি আনা, আট আনা, বার আনা, ষোল আনা এইরূপই দান করিতেছেন, পাঁচ আনা, ছয় আনা দিতেছেন না, ইচ্ছা থাকিলেও দিতে পারিতেছেন না, চাহিলেও দিতে পারিতেছেন না, তখন ভিক্ষুকেরা কি অনুমান করিবে? তাহারা বুঝিয়া লইবে যে, দাতার ভাণ্ডারে সিকি ভিন্ন অন্য কোন মুদ্রা নাই; সিকির ভগ্নাংশ দুয়ানি—একআনি বা পয়সা তাঁহার তহবিলে নাই—থাকিলে অনায়াসে দিতে পারিতেন। তাঁহার সমস্ত তহবিল কেবল সিকিতে গঠিত। এই সিকি অবিভাজ্য; উহার ভগ্নাংশ হয় না। কাজেই, উনি সিকি অর্থাৎ চারি আনা এবং সিকির অর্থাৎ চারি আনার

দুইগুণ তিনগুণ চারিগুণ ইত্যাদি দান করিতে বাধ্য হইতেছেন। তাহার দেড়গুণ, আড়াইগুণ, পৌনে তিনগুণ দিতে পারিতেছেন না। ন্যূন পক্ষে তাঁহাকে চারি আনা দিতে হইতেছে; চারি আনার কম দিবার তাঁহার ক্ষমতাই নাই।

ঐরূপ যদি দেখা যাইত যে, তিনি দুই আনা অথবা দুই আনার গুণফল চারি আনা, ছয় আনা, আট আনা, দশ আনা দান করিতেছেন, এক আনা, তিন আনা, পাঁচ আনা, সাত আনা দিতে পারিতেছেন না; তখন বুঝিতে হইবে যে, তাঁহার তহবিল কতিপয় দুয়ানির সমষ্টিমাত্র; দুয়ানির ছোট কোন রৌপ্যখণ্ড তাঁহার তহবিলে নাই। বাক্সের ভিতরে কি আছে, চোখে দেখিতে পাইলে কোন সংশয়ই থাকিত না; কিন্তু দেখিতে না পাইলেও আমরা স্বচ্ছন্দে এরূপ অনুমান করিয়া লইতে পারিতাম; এবং বলা বাহুল্য যে, ঐরূপ অনুমান অনুচিত হইত না।

হাইড্রোজনের ভাগকে আমরা একভাগ ধরিয়া লইয়া দেখিতে পাই যে, অক্সিজন কোন দ্রব্যে মিলিত হইলে ৮, ১৬, ২৪, ৩২ ইত্যাদি ভাগে মিলিত হয়, নাইট্রোজন কিন্তু ১৪ অথবা ১৪ র গুণফল ২৮, ৪২, ইত্যাদি ভাগে মিলিত হয়; কয়লার ভাগ হয় ৩, অথবা ৩ এর গুণফল ৬, ৯, ১২ ইত্যাদি; গন্ধকের বেলায় দেখি ১৬ অথবা ৩২। এখানেও আমরা ঐরূপ অনুমান করিয়া লই। মনে করিতে হয়, উল্লিখিত দাতার তহবিল যেমন রৌপ্যখণ্ডে গঠিত, সেই রৌপ্যখণ্ডগুলির ভগ্নাংশ হয় না, সেইরূপ অক্সিজন কতিপয় অক্সিজন-খণ্ডের সমষ্টি, কয়লা কতিপয় কয়লাখণ্ডের সমষ্টি, গন্ধক কতিপয় গন্ধক-খণ্ডের সমষ্টি; সেই ক্ষুদ্র খণ্ডগুলির ভগ্নাংশ হয় না; সেই খণ্ডগুলিকে কাটিয়া ভাঙ্গিয়া গুঁড়া করিয়া কোনরূপে ক্ষুদ্রতর ভগ্নাংশে পরিণত করা চলে না। সিকিকে কাটিয়া টুকরা করিলে উহা যেমন সিকি থাকে না, সেইরূপ

কয়লার সেই ক্ষুদ্রতম খণ্ডকে যদিই বা কোনরূপে ভাগ করা যায়, তাহা আর কয়লা থাকিবে না। অক্সিজনের সেই ক্ষুদ্রতম খণ্ডকে কাটিয়া টুকরা করিতে পারিলেও উহা আর অক্সিজন বলিয়া গৃহীত হইবে না। এইরূপ অনুমান চলিতে পারে। এইরূপ অনুমান সঙ্গত এবং উচিত। মূল পদার্থের এই সকল সূক্ষ্মতম খণ্ডের নাম দেওয়া হইয়াছে **পরমাণু**। নব্য রাসায়নিকেরা অনুমানবলে এই পরমাণুর কল্পনা করিয়া রাসায়নিক-সম্মিলন-ঘটিত উল্লিখিত সমস্যার পূরণ করিয়া থাকেন। ডাল্‌টন নামক ইংরেজ পণ্ডিত শতাধিক বৎসর পূর্ব্বে এই পরমাণুর কল্পনা প্রতিষ্ঠিত করেন।

বস্তুতই উপরে যে সমস্যার উল্লেখ করিয়াছি, এইরূপ অনুমানে সেই সমস্যার পূরণ হয়। মনে কর, একখানা কয়লা বহুসংখ্যক অতিক্ষুদ্র অবিভাজ্য কয়লাখণ্ডের সমষ্টি—এক একটা খণ্ড অতিক্ষুদ্র—চক্ষুর অগোচর। এই অতিক্ষুদ্র কয়লা-খণ্ডের নাম দেওয়া হয় কয়লার পরমাণু। কয়লার পরমাণু কয়লার ক্ষুদ্রতম খণ্ড। উহাকে আর ভাগ করা চলে না; উহা অবিভাজ্য। যদিই বা ভাগ চলে, তাহা হইলে উহা আর কয়লা থাকিবে না। কাজেই, কয়লা লইতে হইলে ন্যূন পক্ষে একটা পরমাণু লইতে লইবে; অথবা দুইটা, তিনটা, পাঁচটা, দশটা, লক্ষটা, কোটিটা, লওয়া চলিবে; কিন্তু একটার কম—আধখানা পরমাণু বা সিকিখানা পরমাণু—লওয়া চলিবে না। লইতে হইলে গোটা পরমাণু—একটাই হউক আর অনেকগুলি হউক—লইতে হইবে। দেড়খানা, আড়াই খানা, সাড়ে তিন খানা, পৌনে পাঁচ খানা পরমাণু লওয়া চলিবে না।

এখন মনে কর, এই ক্ষুদ্রতম কয়লাখণ্ড অর্থাৎ কয়লার পরমাণুর নির্দ্দিষ্ট বস্তু আছে; তাহা ওজনে ৩। হাইড্রোজনের ক্ষুদ্রতম খণ্ড,

অর্থাৎ হাইড্রোজনের পরমাণু ওজনে এক ধরা হয়; কয়লা পরমাণু ওজনে তাহার তিন গুণ, অতএব কয়লা পরমাণুর বস্তু ৩। কাজেই, হাইড্রোজনে কয়লা মিলিত হইলে, ন্যূনপক্ষে হাইড্রোজনের একটা পরমাণুর সহিত কয়লার একটা পরমাণুর যোগ হইবে, হাইড্রোজন ১ ভাগ লইলে কয়লা অন্ততঃ ৩ ভাগ লইতে হইবে। কয়লার দুইটা পরমাণু যুক্ত হইলে কয়লার ভাগ ৬ ভাগ হইবে; তিনটা পরমাণু লইলে ৯ ভাগ; চারিটা লইলে ১২ ভাগ হইবে। কাজেই, কয়লার ভাগ, ৩, ৬, ৯, ১২ এইরূপই হইবে। ঐরূপ মনে কর, অক্সিজনের পরমাণু হাইড্রোজন পরমাণুর তুলনায় ৮। কাজেই এক ভাগ হাইড্রোজনে ন্যূন পক্ষে ৮ ভাগ অক্সিজন মিলিত হইবে। অধিক পরমাণু লইলে ১৬, ২৪, ৩২ ভাগ অক্সিজন লওয়া চলিবে। কিন্তু ৮ এর কম, কিছুতেই লওয়া চলিবে না; অপিচ ১৫ বা ১৭, বা ২২ বা ২৩ ভাগ কিছুতেই লওয়া চলিবে না। এইরূপ অন্যান্য মূল পদার্থ সম্বন্ধেও অনুমান চলিতে পারে।

এক খানা কয়লাতে কত পরমাণু আছে? ঐ যে দাতা বাক্সে সিকি বোঝাই করিয়া দান করিতে বসিয়াছেন এবং কেবল সিকিই খয়রাত করিতেছেন, কাহাকেও এক সিকি, কাহাকেও দুই সিকি, কাহাকে পাঁচ সিকি, কাহাকেও বা পঞ্চাশ সিকি, দান করিতেছেন, তাঁহার বাক্সের ভিতর কত সিকি আছে, তাহা আমি জানি না; বাক্সের ভিতরে চোখ দিতে না পারিলে, তাঁহার তহবিলে কত সিকি আছে, তাহা জানিতে পারিব না। তাহা জানিয়াও আমার দরকার নাই। তাহা না জানিলেও আমি অনুমান করিয়া লইতে পারি যে, তাঁহার বাক্সে কেবল সিকিই আছে, দুয়ানি বা একআনি বা পয়সা নাই। সেইরূপ ঐ কয়লাখানাতে কত কয়লার পরমাণু আছে তাহা

না জানিলেও আমি অনুমান করিতে পারি যে, ঐ কয়লাখানা বহু-সংখ্যক পরমাণুতে গঠিত; উহাতে সম্ভবতঃ কোটি কোটি পরমাণু আছে। যত কোটিই থাকুক, সেই চক্ষুর অগোচর ক্ষুদ্র পরমাণু এক একটা গোটা জিনিস—অবিভাজ্য। ঐ যে পরমাণু-রাশি, উহাই ঘনসন্নিবিষ্ট হইয়া কয়লাখানিকে নির্ম্মাণ করিয়াছে।

ধান্যের স্তূপ ছোট ছোট গোটা গোটা ধান্যের সমষ্টি; এক একটি ধান এক একটা গোটা জিনিস, ইহার ভগ্নাংশ হয় না; ভাঙ্গিতে গেলেও ধান থাকে না—তুষ আর চাউল আর ক্ষুদ হইয়া যায়; সেইরূপ কয়লাখানা ছোট ছোট গোটা গোটা কয়লার পরমাণুর স্তূপ। ঐ বালুকার স্তূপ লক্ষ লক্ষ বালুকাকণার সমষ্টি; উহাতে কত বালুকাকণা আছে, কে গণিতে পারে? কিন্তু তথাপি লক্ষ লক্ষ বালুকাকণা ঘনসন্নিবিষ্ট হইয়া বালুকাস্তূপে—ঢিপিতে—পরিণত হইয়াছে—কয়লাও তদ্রূপ। কত পরমাণু আছে, কে জানে? তাহা বলা অসাধ্য। তবে এক মুঠা বালি লইতে হইলে সংখ্যাতীত বালুকা-কণিকাই লইতে হইবে। সেইরূপ একখানা কয়লা লইতে হইলে অসংখ্যেয় কয়লা পরমাণুই লইতে হইবে।

এই খানে একটা খুব সূক্ষ্ম কথা উপস্থিত হয়। গণা আর মাপা দুইটি কথা চলিত আছে। কোন কোন জিনিস আমরা গণিতে পারি ও গণিয়া থাকি, আবার কোন কোন জিনিস মাপিতে পারি ও মাপিয়া থাকি—গণিতে পারি না। গাছে কয়টা ফুল আছে, গোয়ালে কয়টা গরু আছে, আকাশে কত তারা আছে, ইহা গণনার বিষয়—উহা **সংখ্যা** দ্বারা প্রকাশ করি। কিন্তু ঘটিতে কত দুধ আছে, পুকুরে কত জল আছে, একখানা কয়লার ওজনে কত বস্তু আছে, তাহা গণিবার উপায় নাই, তাহা মাপিয়া বলিতে হয়। উহার নাম

পরিমাণ কর্ম। এখন জিজ্ঞাস্য, কোন্ জিনিস গণা যায়, আর কোন্ জিনিস্ মাপা যায়? যাহার খণ্ডগুলি অবিভাজ্য, যাহার ভগ্নাংশ হয় না, তাহাই গণনার বিষয়। বলা বাহুল্য যে, গোয়ালের গরুর ভগ্নাংশ হয় না; প্রত্যেক গরু একটা গোটা গরু; উহার ভগ্নাংশ হিন্দুর পক্ষে অকল্পনীয়, অন্যের পক্ষেও অসাধ্য। একটা গরুকে ভাগ করা না চলিতে পারে, এমন নহে, তবে ভাগ করিলে উহা আর গরু থাকিবে না। এইরূপ একটা ফুলকে ছিঁড়িয়া টুকরা টুকরা করিলে উহা আর ফুল থাকিবে না। গোয়ালে গরুর সংখ্যা, গাছে ফুলের সংখ্যা, আকাশে তারার সংখ্যা, বাক্সে সিকির সংখ্যা, একটার কম হইতে পারে না; আধখানা গরু, আধখানা ফুল, আধখানা তারা, আধখানা সিকি, অকল্পনীয়। সেইরূপ আড়াইটি গরু, দেড়খানা ফুল, পৌনে তিনটা সিকি, সাড়ে ছয়টা তাবাও অকল্পনীয়। কিন্তু জল তেল দুধ মাটি কয়লা সোণা রূপা প্রভৃতি বিভাজ্য; যত ইচ্ছা ততই বিভাগ করা যাইতে পারে। এক সের জল, আধ সের জল, এক ছটাক, এক কাঁচ্চা, এমন কি, কাঁচ্চার যে কিছু ভগ্নাংশ, সবই হইতে পারে। জল তেল দুধ মাপিবার বিষয়, গণিবার নহে। আমরা পাঁচ সের জল বলি, আমরা সাড়ে পাঁচ ছটাক কি পৌনে পাঁচ কাঁচ্চা জল বলি; কিন্তু পাঁচটা জল, দশটা জল, এরূপ বলিতে পারি না।

তবেই দাঁড়াইল এই যে, সকল জিনিসের ভগ্নাংশ হয় না। যাহা অবিভাজ্য, তাহাই গণনার বিষয় এবং সাবধানে গণিলে, সময় থাকিলে ও পরিশ্রমে কাতর না হইলে, সংখ্যা যতই অধিক হউক না কেন, তাহার গণনা অসাধ্য হয় না এবং গণনাতে ভুল হইবারও আশঙ্কা থাকে না। এমন কি, মানুষের যদি সময়ে কুলাইত ও ইন্দ্রিয় সমর্থ হইত, তাহা হইলে গোলার ধান, নদীর বালি ও আকাশের তারা

এমন কি কয়লার পরমাণু পর্য্যন্ত সূক্ষ্মভাবে গণিয়া দিতে পারিত,—একটি একটি করিয়া গণিতে পারিত। তবে গোলার ধান আমরা গণি না, ধান মাপিয়া বিক্রয় করি; কেন না গণিতে অত্যন্ত মেহনত। কয়লার পরমাণুও আমরা গণি না; উহা এত ছোট যে চোখে দেখা যায় না; দেখিতে পাইলেও মেহনত পোষাইত না।

পরমাণুবাদ

স্বীকার করিলাম যে, যাবতীয় মূলপদার্থ অবিভাজ্য পরমাণুর সমষ্টিমাত্র। হাইড্রোজনের একটি পরমাণু ওজনে এক হইলে দশ পরমাণু ওজনে ১০, দেড়শত পরমাণু ওজনে ১৫০ হইবে। কয়লার প্রত্যেক পরমাণু ওজনে ৩ হইলে, দুই পরমাণু ওজনে ৬, তিন পরমাণু ওজনে ৯, চারি পরমাণু ওজনে ১২ হইবে। ঘটেও তাহাই। কয়লার ভাগ ৩, ৬, ৯, ১২ ইত্যাদি হয়, কিন্তু ৭, ৮, ১১, হয় না। কয়লা যখন হাইড্রোজনে মিলিত হয়, তখন কয়লার গোটাকতক পরমাণু, এক বা একাধিক পরমাণু হাইড্রোজনের গোটাকতক পরমাণুর সহিত মিলিত হয়।

এই পরমাণুগুলি তবে কত বড়? উহারা অবিভাজ্য হওয়া চাই। কিন্তু কয়লা ত বিভাজ্য। একখানা কয়লাকে ভাঙ্গিয়া দুখানা, দশখানা, হাজারখানা অক্লেশে করা যায়, এমন কি উহাকে গুঁড়া করিলে অতি ক্ষুদ্র কণিকায় পরিণত হইতে পারে; সেই এক কণিকাকেও আরও ছোট গুঁড়ায় পরিণত করা চলিতে পারে; এত ছোট হইতে পারে যে, চর্ম্মচক্ষুর অদৃশ্য হইয়া যায়, অণুবীক্ষণ যন্ত্রেও ধরা পড়ে না।

ডাল্‌টন বলিলেন, হউক না কেন চক্ষুর অগোচর; সেই চক্ষুর অগোচর কণিকাতেও কোটি কোটি পরমাণু আছে; তাহারা চক্ষুর অগোচর হইলেও কল্পনাগোচর ত হইতে পারিবে। চক্ষুর অগোচর কিন্তু কল্পনার গোচর সেই ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কণিকাটুকুই কয়লার পরমাণু। মনে কর না কেন, তাহারই ওজন ৩, হাইড্রোজনের পরমাণুর তুলনায় ৩।

প্রত্যেক মূল পদার্থ কতকগুলি পরমাণুর সমষ্টি; যত মূল পদার্থ, তত রকমের পরমাণু। হাইড্রোজনের পরমাণু, অক্সিজনের পরমাণু, কয়লার পরমাণু, গন্ধকের পরমাণু, সোণা রূপা লোহা পারা প্রভৃতি সকলেরই পরমাণু আছে। এই পরমাণুই প্রত্যেক মূল পদার্থের ক্ষুদ্রতম অংশ।

হাইড্রোজনের পরমাণুর সহিত অক্সিজনের পরমাণুর পার্থক্য আছে; রূপার পরমাণুর সহিত সোণার পরমাণুর পার্থক্য আছে। কিসের পার্থক্য? বৃহত্ত্বে, না আকারে? তাহা বলিতে পারি না। আয়তনগত বা আকারগত পার্থক্য থাকিতে পারে বা না পারে। ডাল্‌টন কেবল বলিতে চাহেন, যে উহাদের একটা পার্থক্য আছে, উহা বস্তুগত। হাইড্রোজনের পরমাণুর বস্তু যত, অক্সিজনের পরমাণুর বস্তু তাহার আট গুণ; কয়লার বস্তু তাহার তিনগুণ ইত্যাদি। আর বস্তুগত পার্থক্য থাকিলেই ওজনে পার্থক্য থাকিবে।

এইরূপ অনুমান কেন? না, ঐরূপ অনুমান করিলেই বেশ বুঝা যায় যে, কেন একভাগ হাইড্রোজনের সঙ্গে ৮ ভাগ, ১৬ ভাগ অক্সিজন যুক্ত হয়; ৩, ৬, ১২ ভাগ কয়লা মিলিত হয়; আর কয়লা যখন অক্সিজনে মিলে, তখন ৩ ভাগ কয়লায় ৮ ভাগ বা ১৬ ভাগ অক্সিজনই মিলিত হয়।

অর্থাৎ যে সমস্যাপূরণের দরকার, সেই সমস্যার পূরণে ইহার অধিক অনুমান করিতে হয় না।

ঐ সমস্যাটা প্রাকৃতিক নিয়ম; প্রকৃতির খেয়াল। ঐ খেয়ালের তাৎপর্য্য ঐরূপ অনুমানে বুঝা যায়। অক্সিজনের ভাগ ৮ বা ১৬ হয় কেন; ১৩, ১৪ হয় না কেন? ইহা প্রকৃতির খেয়াল বৈ কি? ১৩ বা ১৪ হইলে আমাদিগকে তাহাই মানিয়া লইতে হইত।

দানকর্ম্ম দাতার খেয়াল; তিনি চারি আনা, আট আনা, বার আনা, ইচ্ছামত দান করিতে পারেন। কিন্তু যদি দেখিতে পাই যে, তিনি চারি আনা, আট আনা, বার আনাই দিতেছেন, কিন্তু পাঁচ আনা দশ আনা দিতে পারিতেছেন না, তখন মনে করিতে হয়, তাঁহার তহবিলে কেবল সিকি আছে, এক-আনি দুয়ানি নাই। সেইরূপ অক্সিজনের ভাগ ৮ হয়, ১৬ হয়, ১৩ বা ১৪ হয় না; এই খেয়াল দেখিয়া মনে করি যে, অক্সিজনের তহবিলে প্রত্যেক অক্সিজনখণ্ডের ওজন ৮; উহার ছোট খণ্ড লইবার উপায় নাই।

প্রত্যক্ষ, অনুমান ও কল্পনা

এইখানে একবার দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিতে হইবে, ডাল্‌টন যে এই আন্দাজ করিয়া বসিলেন, ইহাতে আমাদের জ্ঞানের পরিধি বাড়িল কি না? বলা বাহুল্য, এই পরমাণু-তত্ত্বটা নিছক অনুমানের —আন্দাজের ব্যাপার। ডাল্‌টন বা তাঁহার পরবর্ত্তী কোন পণ্ডিত এই পরমাণু প্রত্যক্ষগোচর করেন নাই; করিবার আশাও রাখেন না। পরবর্ত্তী পণ্ডিতেরা এই পরমাণুর আকার অবয়ব সম্বন্ধে বিচার বিতর্ক করিয়াছেন। তাঁহারা স্থির করিয়াছেন, এই পরমাণু কখনও মানুষের প্রত্যক্ষসীমায় আসিবে কি না সন্দেহ। যে আলোর ঢেউ চোখে

পড়িলে আমাদের দৃষ্টিশক্তি জন্মে, এই পরমাণু সম্ভবতঃ সেই এক একটি আলোর ঢেউয়ের চেয়েও ছোট; পরমাণু কাজেই দর্শনেন্দ্রিয়ের অগোচর, অন্য ইন্দ্রিয়ের ত কথাই নাই।

তবে এই নিরবচ্ছিন্ন কল্পনামূলক অনুমানে জ্ঞানের পরিসর বাড়িল কি?

এই লইয়া পণ্ডিতদিগের মধ্যে একটা বিতণ্ডা প্রচলিত আছে। পণ্ডিতেরা বলেন, জ্ঞানমাত্রই প্রত্যক্ষমূলক; অন্য জ্ঞান, জ্ঞানই নহে।

উহা এক হিসাবে সত্য; আমরা ধূম দেখিলে অগ্নির অস্তিত্ব আর গোবর দেখিলে গরুর অস্তিত্ব অনুমান করি; নয় কি? কেননা পূর্ব্ব-প্রত্যক্ষ হইতে আমরা জানি যে, অগ্নি হইতেই ধূম, আর গরু হইতেই গোবর পাওয়া যায়। কাজেই, অনুমানের ভিত্তি পূর্ব্বকালের প্রত্যক্ষ, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

ইহাও সত্য যে, আমরা প্রত্যক্ষলব্ধ জ্ঞান লইয়া যেমন জীবনযাত্রা চালাই, সেইরূপ প্রত্যক্ষ ভিত্তির উপর স্থাপিত অনুমানের উপর নির্ভর করিয়াও জীবনের অনেক কাজ করিতে বাধ্য হই। অনুমানের উপর নির্ভর করিব না, এরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিলে জীবনযাত্রা অচল হইয়া যাইত। কাজেই, অনুমানকে বর্জ্জন করিবার উপায় নাই।

অনুমানের উপর নির্ভর করিলে মাঝে মাঝে যে ঠকিতে হয় না এমন নহে। অগ্নি হইতে ধূম উঠে ইহা প্রত্যক্ষলব্ধ সত্য; কিন্তু অগ্নি ভিন্ন অন্য কিছু হইতে ধূম হইতে পারে না, ইহা বলিবার ক্ষমতা আমাদের নাই। যেটা প্রাকৃতিক ব্যবস্থা, তাহা আমরা প্রত্যক্ষের উপর নির্ভর করিয়া মানিতে বাধ্য; কিন্তু প্রকৃতির ব্যবস্থা অন্যরূপ হইতে পারে না, ইহা বলিবার ক্ষমতা আমাদের নাই। অতীতে এ পর্য্যন্ত ভিন্ন

প্রসব করিতে দেখা যায় নাই; কিন্তু অশ্বডিম্বেরও সম্পূর্ণ অসম্ভাব্যতা নাই। যাহা অনুমান করিতেছি, তাহা ঠিক হইতেও পারে, না হইতেও পারে; উহার উপর ষোল আনা নির্ভর করা চলে না। প্রত্যক্ষের উপর আমরা যতটা ভর দিতে পারি, অনুমানের উপর কখনই ততটা ভর দিতে পারি না।

ডাল্‌টনের পরমাণু অনুমানমাত্র; অনুমান না বলিয়া বরং কল্পনা বলিলে চলে। পরমাণু এপর্য্যন্ত কাহারও ইন্দ্রিয়গোচর হয় নাই, হইবার আশাও নাই। কাজেই, পরমাণুকে পণ্ডিতদের কল্পনামাত্র বলিতে পারি। রাসায়নিক-সম্মিলন সম্বন্ধে প্রকৃতির বিচিত্র ব্যবস্থা প্রত্যক্ষ করিয়া ডাল্‌টন এইরূপ পরমাণুর অস্তিত্ব কল্পনা করিয়াছেন। যদি কোন পণ্ডিত অন্য কল্পনার দ্বারা সেই ব্যবস্থার সঙ্গতি আরও উৎকৃষ্টরূপে বুঝাইতে পারেন, তখন আমরা পরমাণুবাদ ত্যাগ করিয়া সেই নূতন তত্ত্ব গ্রহণ করিব, ইহাতে সন্দেহ নাই। কেননা, এইরূপেই মনুষ্যের জীবন-যাত্রাটাই চলিতেছে। অনেক সময় আমাদের অনুমান ষোলআনা সন্তোষ উৎপাদন করায় না। তদপেক্ষা সঙ্গত অনুমান যতদিন না আসে, ততদিন উহাই লইয়া কাজ চালাইতে হয়। পরে হয়ত প্রমাণ পাইলে পূর্ব্বের অনুমানটা ত্যাগ করিয়া পরের অনুমানটার আশ্রয় করিতে হয়। নতুবা জীবনযাত্রা চলিত না।

ধর্ম্মাধিকরণে বিচারপতি সাক্ষীর নিকট প্রমাণ গ্রহণ করিয়া অপরাধীকে দণ্ড দিয়া থাকেন। সর্ব্বত্র প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায় না। সেখানে অনুমানেরই উপর নির্ভর করিয়া কাজ চালাইতে হয়। ফলে, বহুস্থলে নির্দ্দোষেও দণ্ড পায়। ভুল হয় না এমন নহে, কিন্তু অনুমানের আশ্রয় একবারে লইব না, এরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিলে জজের জজিয়তি চলিবে না, সমাজে লোকস্থিতি চলিবে না।

আবার বলিতেছি, বিজ্ঞানের পন্থা জীবনযাত্রার পন্থা হইতে ভিন্ন নহে। আমরা দিন দিন কাজকর্ম্মে যে পথ অবলম্বন করিয়া চলি, বৈজ্ঞানিকও ঠিক সেই পথ অবলম্বন করিয়া চলেন। আমরা অসাবধান, বৈজ্ঞানিকেরা সাবধান; আমরা সূক্ষ্ম দর্শনের ও সূক্ষ্ম পরিমাণের কষ্ট স্বীকারে কুণ্ঠিত, বৈজ্ঞানিকেরা তাহাতে কাতর নহেন। এইমাত্র প্রভেদ।

কাজেই, ডাল্‌টনের পরমাণুবাদ আমরা আপাততঃ মানিয়া লইতে প্রস্তুত আছি; কিন্তু চিরকালই যে উহা ধরিয়া চলিতে বাধ্য থাকিব, উহা নহে। কালে যদি অন্য প্রকৃষ্টতর অনুমানের বা কল্পনার সাহায্যে প্রাকৃতিক নিয়মের সমস্যাগুলির উৎকৃষ্টতর মীমাংসা পাওয়া যায়, তখন দ্বিধা না করিয়া ডাল্‌টনের পরমাণুবাদকে বর্জ্জন করিয়া সেই নূতন অনুমানের বা কল্পনার আশ্রয় লইব।

প্রকৃতির ব্যবস্থা বদলাইবে না, কিন্তু তাহার সম্পর্কে বৈজ্ঞানিকের অনুমান বা কল্পনা বদলাইতে পারে। তাহাতে বিস্মিত বা দুঃখিত হইবার কোন কারণ নাই। বিজ্ঞানের ইতিহাসে ইহা পুনঃপুনঃ ঘটিয়াছে।

মনুষ্যের জ্ঞানের—অর্থাৎ যে জ্ঞানের উপর নির্ভর করিয়া মানুষ জীবনযাত্রা চালায়, জড়জগতের সহিত আদানপ্রদান ও কারবার চালায়, সেই জ্ঞানের—কিয়দংশ প্রত্যক্ষলব্ধ, কিয়দংশ অনুমানলব্ধ এবং কল্পনালব্ধ; সেই অনুমান ও কল্পনা আবার পূর্ব্বগত প্রত্যক্ষের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। এই উভয় অংশের মূল্য সমান নহে। প্রত্যক্ষলব্ধ জ্ঞান স্পষ্ট জ্ঞান; ইন্দ্রিয় বা বুদ্ধি যদি প্রতারিত না করিয়া থাকে তাহা হইলে উহা অপেক্ষা প্রতিষ্ঠিত জ্ঞান আর নাই। আর অনুমানলব্ধ জ্ঞান তেমন সুপ্রতিষ্ঠ নহে; উহা অস্পষ্ট এবং পরিবর্ত্তনসহ।

কাজেই, উভয়ের মূল্য সমান নহে। কিন্তু তাই বলিয়া অনুমানকে অবজ্ঞা করিলে চলিবে না। কেননা উহাই জ্ঞানের পরিধি প্রসারের বোধ করি সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায়। উহা আঁধারে আলো জ্বালিয়া দেয়; উহা জ্ঞান-মার্গের পথিককে পথ দেখায়; কোন্ পথে চলিলে নূতন তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইবে, তাহা দেখাইয়া দেয়; কাজেই, অনুমানকে অবজ্ঞা করিলে চলিবে না।

প্রাচীন ও আধুনিক পরমাণুবাদ

দুই সহস্র বা ততোধিক বৎসর পূর্ব্বে এদেশে বৈশেষিক দর্শন বর্ত্তমান ছিল। কণাদ-ঋষি ঐ দর্শনের স্থাপনকর্ত্তা বলিয়া প্রসিদ্ধ। বৈশেষিক দর্শনের মত যে, যাবতীয় জড়পদার্থ পরমাণুর যোগে উৎপন্ন। এই পরমাণু অনাদি ও অবিভাজ্য, অতি সূক্ষ্ম পদার্থ। এই পরমাণুগুলি যেন ইষ্টক; এই ইষ্টকগুলি গাঁথিয়া বিশ্বজগতের অট্টালিকা নির্ম্মিত হইয়াছে।

গ্রীক দার্শনিকদের মধ্যেও এইরূপ একটা মত প্রচলিত ছিল। পরমাণুর সমবায়ে জগতের উৎপত্তি হয়, তাঁহারাও এই অনুমান করিয়াছিলেন।

ডাল্টনের পরমাণুবাদের সহিত এই সকল প্রাচীন পরমাণুবাদের প্রভেদ আছে। ডাল্টন্ একটা বিশিষ্ট প্রাকৃতিক নিয়ম বুঝাইবার জন্য পরমাণুর কল্পনা করিয়াছিলেন। দুইটা দ্রব্য যখন সম্মিলিত হইয়া তৃতীয় দ্রব্য উৎপন্ন করে, তখন সেই দুই দ্রব্যের ভাগের একটা নির্দ্দিষ্ট ব্যবস্থা আছে। প্রথমটার যে কোন ভাগ দ্বিতীয়টার যে কোন ভাগে মিলিত হয় না। হাইড্রোজনের ভাগ ১ ধরিলে, অক্সিজনের ভাগ ৮ ও কয়লার ভাগ ৩ হয় অথবা তাহার কোন গুণফল হয়। ঐ ঐ মূল পদার্থ যে কোন যৌগিক পদার্থেই বিদ্যমান থাক্, উহাদের ভাগ ঐরূপই

থাকে। এই প্রাকৃতিক নিয়মটি দেখিয়াই নব্য রসায়নের পরমাণুর কল্পনা। যতরকমের মূল পদার্থ, ততরকমের পরমাণু। অক্সিজনের পরমাণু ওজনে হাইড্রোজন পরমাণুর আটগুণ; কয়লার পরমাণু ওজনে হাইড্রোজন পরমাণুর তিন গুণ। নব্য রসায়ন একটা বিশিষ্ট উদ্দেশ্য লইয়া পরমাণু কল্পনা করিয়াছেন ও নানা উপায়ে কোন জিনিসের পরমাণুর কি ওজন, তাহা নির্দ্ধারণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। পরমাণু প্রত্যক্ষ-গোচর নহে, উহা নিকৃতিতে ওজন করিবার উপায় নাই। কোন্ পরমাণুর কত ওজন, তাহা বলিতেও রাসায়নিক পণ্ডিতেরা সাহস করেন না; তবে এই জিনিসের পরমাণু ঐ জিনিসের পরমাণু অপেক্ষা এত গুণ ভারী, ইহা বলিয়া তাঁহারা নিরস্ত হন।

প্রাচীন দার্শনিকেরা পরমাণুর কল্পনা করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু উক্ত প্রাকৃতিক নিয়মের অস্তিত্ব তাঁহারা জানিতেন না। ঐ নিয়ম নব্য রাসায়নিক পণ্ডিতদের আবিষ্কৃত। প্রাচীনেরা তখন নিকৃতি লইয়া তৌল করিয়া দেখেন নাই। যে রাসায়নিক সম্মিলনে এইরূপ একটা নির্দ্দিষ্ট নিয়ম আছে। কাজেই, নব্য রসায়ন জড়ের যে ধর্ম্ম বুঝাইতে পরমাণু কল্পনা করিয়াছেন, প্রাচীন পণ্ডিতেরা সে ধর্ম্ম বুঝাইতে সে কল্পনা করেন নাই।

প্রত্যক্ষলব্ধ জ্ঞানের উপর যে অনুমান প্রতিষ্ঠিত, এবং প্রত্যক্ষলব্ধ জ্ঞানের সঙ্গত ব্যাখ্যার জন্য যে অনুমানের উৎপত্তি, তাহারই ভিত্তি দৃঢ় ও সেই অনুমানই সার্থক। নতুবা যাহা বিশুদ্ধ কল্পনা মাত্র, প্রত্যক্ষে যাহার ভিত্তি স্থাপিত নহে, পদার্থ বিদ্যায় সে অনুমানের কোন সার্থকতাই নাই।

প্রাচীন দার্শনিকদের অনুমান যে অমূলক কল্পনা, উহা কেবল তাঁহাদের গায়ের জোর, ইহা বলা উচিত নহে। জড়ের কোন না

কোন ধর্ম বুঝাইবার জন্যই ও বুঝিবার জন্যই তাঁহারা ঐ কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। তৎকালে সেই ধর্ম বুঝিবার ও বুঝাইবার জন্য অন্য প্রকৃষ্টতর অনুমান ছিল না। কাজেই, তাঁহাদের পরমাণুবাদ বিজ্ঞানবিরুদ্ধ, এরূপ বলা চলে না; তবে প্রাচীন পরমাণুবাদের অপেক্ষা আধুনিক পরমাণুবাদের ভিত্তি দৃঢ়তর, এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে।

একালের অনেক বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত প্রাচীন দার্শনিকদিগকে গালি দিয়া আনন্দ ভোগ করেন। প্রাচীনেরা প্রত্যক্ষের সাহায্য লইতেন না, অবেক্ষণ ও পরীক্ষণ দ্বারা প্রকৃতির ব্যবস্থা কিরূপ তাহা নির্ণয় করিতে চাহিতেন না, তাঁহাদের ভিত্তিহীন কল্পনাগুলিকে দৈববাণীর মত প্রচার করিতেন এবং শিষ্যবর্গকে অসঙ্কোচে মানিয়া লইতে বলিতেন; ইত্যাদি কতই অপবাদ শোনা যায়। ফলে, এইরূপ নিন্দাবাদ অবৈজ্ঞানিক। অবেক্ষণ ও পরীক্ষণই সত্য নির্ণয়ের একমাত্র উপায়, তাহা মানবজাতির উৎপত্তি অবধি মানবজাতি মানিয়া চলিতেছে। তদ্দ্বারাই সত্যনির্ণয় করিয়া পরে প্রত্যক্ষমূলক অনুমানের দ্বারা ও কল্পনার দ্বারা জ্ঞানের পরিধি বাড়াইবার চেষ্টা করিয়া আসিতেছে। সেকালেও যে পদ্ধতি ছিল, একালেও সেই পদ্ধতি। প্রভেদ কেবল মাত্রাগত। সেকালের চেয়ে একালের লোকে অধিক সাবধান হইয়াছে, সূক্ষ্ম পরিমাণ কর্ম্মে সমর্থ হইয়াছে; আর পূর্ব্বপুরুষের অর্জ্জিত অভিজ্ঞতার আনুকূল্য পাইয়া জ্ঞানের উচ্চতর সোপান আশ্রয়ে সুবিধা পাইয়াছে, এই পর্য্যন্ত প্রভেদ।

পরমাণু ও অণু

রাসায়নিকের মতে পরমাণু মূলপদার্থের সূক্ষ্মতম অংশ; কেননা, উহা অবিভাজ্য। প্রত্যেক পরমাণুর নির্দ্দিষ্ট বস্তু আছে;

সেই বস্তু কত জানি না; তবে এই পরমাণুর বস্তু ঐ পরমাণুর বস্তুর কত গুণ, এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি। হাইড্রোজনের পরমাণুর বস্তু ১ ধরিলে কয়লার পরমাণু ৩ ও অক্সিজনের পরমাণু ৮ হয়।

সম্মিলনকালে এক মূলপদার্থের এক বা একাধিক পরমাণু অন্য মূল পদার্থের এক বা একাধিক পরমাণুর সহিত যুক্ত হইয়া যৌগিক পদার্থের সূক্ষ্মতম অংশ প্রযুক্ত করে। যৌগিক পদার্থের এই সূক্ষ্মতম অংশের নাম দেওয়া হয় **অণু।** মূলপদার্থের ক্ষুদ্রতম খণ্ডের নাম হইল পরমাণু, আর যৌগিক পদার্থের ক্ষুদ্রতম খণ্ডের নাম হইল অণু। পরমাণু যেমন অতীন্দ্রিয় ও কল্পনাগোচর, অণুও তেমনি অতীন্দ্রিয় ও কল্পনাগোচর। জলের একটি অণুতে কতিপয় হাইড্রোজনের পরমাণু ও কতিপয় অক্সিজনের পরমাণু আছে। এক ফোঁটা জলে কোটি কোটি জলের অণু আছে; আর জলের প্রত্যেক অণুতে কতকগুলি হাইড্রোজনের পরমাণু ও কতকগুলি অক্সিজনের পরমাণু রহিয়াছে। জলের অণু ভাঙ্গিলে উহা আর জল থাকে না; অক্সিজনের আর হাইড্রোজনের পরমাণু পৃথক্ হইয়া পড়ে। রাসায়নিক সম্মিলনের সময় হাইড্রোজনের পরমাণুতে অক্সিজনের পরমাণুতে মিলন ঘটিয়া জলের অণু নির্ম্মিত হয়, আর বিশ্লেষণকালে জলের অণুগুলি ভাঙ্গিয়া হাইড্রোজনের পরমাণু এবং অক্সিজনের পরমাণু পৃথক্ হইয়া পড়ে।

কাজেই দাঁড়াইল যে, যৌগিক পদার্থের সূক্ষ্মতম অংশ অণু, আর মূলপদার্থের সূক্ষ্মতম অংশ পরমাণু।

একটা জলের অণুতে হাইড্রোজনের এবং অক্সিজনের কয়টা পরমাণু আছে, তাহা নিরূপণের কোন উপায় আছে কি না? এই খানে একটু সূক্ষ্ম বিচারের প্রয়োজন।

জল বিশ্লেষণ করিয়া দেখা যায়, উহাতে কেবল দুইটা মূল পদার্থ বিদ্যমান, হাইড্রোজন আর অক্সিজন। কোন তৃতীয় পদার্থ নাই। আর দেখা যায় যে, একভাগ হাইড্রোজনের সহিত আট ভাগ অক্সিজনের যোগে নয় ভাগ জল হয়। এক ছটাকে আট ছটাক, এক সেরে আট সের, এক মণে আট মণ—হাইড্রোজনের ও অক্সিজনের মিলনকালে ভাগের অনুপাত এইরূপ। এই প্রাকৃতিক নিয়মটি বুঝাইবার জন্য অণুর ও পরমাণুর কল্পনা; কল্পনার অন্য কোন উদ্দেশ্য নাই। কল্পনা করিতে হয় যে, হাইড্রোজনের ও অক্সিজনের সূক্ষ্মতম অংশগুলিতে, অর্থাৎ পরমাণুগুলিতে, ওজনের এই তারতম্য বর্ত্তমান।

এখন আমরা মনে করিতে পারি, হাইড্রোজনের পরমাণুর ওজন ১, আর অক্সিজনের পরমাণুর ওজন ৮; অপিচ হাইড্রোজনের একটি পরমাণু অক্সিজনের একটি পরমাণুতে যুক্ত হইয়া জলের একটি অণু গঠিত হইয়াছে। পক্ষান্তরে আমরা মনে করিতে পারি যে, হাইড্রোজনের দশটি পরমাণু অক্সিজনের দশটি পরমাণুতে যুক্ত হইয়া জলের একটি অণু গঠিত হইয়াছে। উভয় অনুমানেরই এক ফল। কেননা ১০টি হাইড্রোজন পরমাণুর ওজন ১০, ও ১০টি অক্সিজন পরমাণুর ওজন ৮০, অতএব একটি জলের অণুর ওজন ৯০; তাহা হইলেও নয় ভাগ জলের মধ্যে এক ভাগ হাইড্রোজন ও আট ভাগ অক্সিজন পাওয়া যাইবে।

আবার ভিন্নরূপ অনুমানও চলিতে পারে। ধরিয়া লও, হাইড্রোজনের পরমাণুর ওজন ১, কিন্তু অক্সিজনের পরমাণুর ওজন ১৬; আর জলের প্রত্যেক অণুতে হাইড্রোজনের দুইটি পরমাণু ও অক্সিজনের একটিমাত্র পরমাণু বিদ্যমান। দুইটি হাইড্রোজন পরমাণুর ওজন ২, আর একটি অক্সিজন পরমাণুর ওজন ১৬; অতএব জলের প্রত্যেক অণু ওজনে ১৮। অতএব ১৮ ভাগ জলের মধ্যে ২

হাইড্রোজন এবং ১৬ ভাগ অক্সিজন থাকিল, অর্থাৎ ৯ ভাগ জলের মধ্যে ১ ভাগ হাইড্রোজন ও ৮ ভাগ অক্সিজন থাকিল। অতএব এরূপ অনুমানও অসঙ্গত নহে।

এখন নূতন সমস্যা দাঁড়াইল। অক্সিজনপরমাণুর ওজন ৮ ধরিলেও চলে, ১৬ ধরিলেও চলে। কোন্‌টা ধরিব?

ঐ রূপে কয়লার পরমাণুর ওজন ৩ ধরিলেও চলে, ৬ ধরিলেও চলে। কোন্‌টা ধরিব?

ডাল্‌টনের পরমাণুবাদ ইহার মীমাংসা করিতে অক্ষম। বস্তুতঃ ডাল্‌টন্‌ উহার মীমাংসা করিতে পারেন নাই।

ডাল্‌টনের পরবর্ত্তী পণ্ডিতেরা ডাল্‌টনের কল্পনায় আরও কতিপয় নূতন কল্পনার যোগ দিয়াছেন। তবে ইহার মীমাংসা সাধ্য হইয়াছে।

যৌগিক পদার্থের সূক্ষ্মতম অংশকে আমরা অণু বলিয়াছি; আর মূলপদার্থের সূক্ষ্মতম অংশকে পরমাণু বলিয়াছি। এখন মনে করিতে হইবে যে, মূলপদার্থেরও অণু আছে। মনে করিতে হইবে যে, মূলপদার্থের পরমাণুও আছে, অণুও আছে; কিন্তু যৌগিক পদার্থের পরমাণু নাই, অণু আছে। সে কিরূপ? হাইড্রোজন ও অক্সিজন মূলপদার্থ; উভয়ের মিলনে উৎপন্ন জল যৌগিক পদার্থ। মনে করিতে হইবে, হাইড্রোজনের কতিপয় পরমাণু পরস্পর যুক্ত হইয়া হাইড্রোজনের অণু হয়; আর অক্সিজনের কতিপয় পরমাণু পরস্পর যুক্ত হইয়া অক্সিজনের অণু হয় অপিচ হাইড্রোজনের পরমাণু অক্সিজনের পরমাণুতে যুক্ত হইয়া জলের অণু হয়। জল যৌগিক পদার্থ, উহার প্রত্যেক অণুতে অক্সিজন হাইড্রোজন উভয় বর্ত্তমান, অতএব জলের পরমাণু হইতে পারে না। পরমাণু কেবল মূলপদার্থেরই সম্ভব; আর অণু মূল ও যৌগিক উভয় পদার্থের সম্ভব। এখন প্রশ্ন হইল যে, হাইড্রোজনের একটা অণুতে

হাইড্রোজনের কয়টা পরমাণু আছে? অক্সিজনের একটা অণুতে অক্সিজনের কয়টা পরমাণু আছে? এবং জলের একটা অণুতে হাইড্রোজনের পরমাণু কয়টা ও অক্সিজনের পরমাণুই বা কয়টা আছে? এই সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে ডাল্‌টনের কল্পনায় কুলায় না; নূতন কল্পনার আশ্রয় লইতে হয়। আবোগাড্রো নামক ইটালির পণ্ডিত ডাল্‌টনের কয়েক বৎসর পরে এই নূতন কল্পনার আশ্রয় লইয়াছিলেন।

আবোগাড্রো কল্পনা করিলেন যে, জড়পদার্থমাত্রই যখন অনিলাবস্থায় থাকে, তখন এক ঘন ইঞ্চি পরিমিত স্থানে সকল পদার্থেরই—মূল বা যৌগিক দ্বিবিধ পদার্থেরই—অণুর সংখ্যা সমান থাকে। মনে রাখিও যে, অনিলাবস্থায় থাকা চাই, কঠিন বা তরল অবস্থা হইলে হইবে না; অনিল অবস্থা হওয়া চাই।

কথাটা ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে। হাইড্রোজন মূল পদার্থ; উহা স্বভাবতঃ অনিল অবস্থায় থাকে। কিন্তু জল যৌগিক পদার্থ; উহা স্বভাবতঃ তরল অবস্থায় থাকে। জল গরম করিলে উহা বাষ্প হয়; তখন উহা অনিলাবস্থ হয়। জল তরল, কিন্তু জলীয় বাষ্প অনিল। আবোগাড্রো কল্পনা করিলেন যে, এক ঘন ইঞ্চি হাইড্রোজনে যতগুলি হাইড্রোজনের অণু আছে, এক ঘন ইঞ্চি জলের বাষ্পে জলের অণুও ততগুলি আছে।

আর একটু সূক্ষ্মভাবে দেখিতে হইবে। অনিলমাত্রই গরমে প্রসার লাভ করে, আবার চাপে সঙ্কুচিত হয়। হাইড্রোজনই বল, আর জলীয় বাষ্পই বল, এক ঘন ইঞ্চি অনিলকে গরম করিয়া দুই ঘন ইঞ্চি করা চলে, আবার চাপ দিয়া আধ ঘন ইঞ্চি জায়গায় ঠেসিয়া ধরা চলে। আবোগাড্রো বলিলেন যে, এক ঘন ইঞ্চি হাইড্রোজনে যত অণু আছে,

এক ঘন ইঞ্চি জলীয় বাষ্পেও তত অণু আছে, কিন্তু কখন্? যখন উভয়ে সমান গরম ও উভয়ের সমান চাপ।

তাহা যেন হইল। তাহা হইলে আবোগাড্রোর মতে এক ঘন ইঞ্চি হাইড্রোজনে অণুর সংখ্যা এক ঘন ইঞ্চি জলীয় বাষ্পের অণুর সংখ্যার সমান।

কিরূপে তিনি জানিলেন যে, উভয়ত্র অণুর সংখ্যা সমান? অণু কতগুলি আছে, তাহা কি তিনি গণিয়া দেখিয়াছিলেন? অণু অতি সূক্ষ্ম অতীন্দ্রিয় দ্রব্য; তাহা গণা অসম্ভব। তিনি গণিবেন কিরূপে? তিনিও গণেন নাই, তাঁহার পরেও কেহ গণিতে পারে নাই। তবে উভয়ত্র অণুর সংখ্যা সমান, তাহা তিনি কিরূপে জানিলেন? উত্তরে বলিব যে, তিনি কল্পনাবলে জানিলেন। উভয়স্থলে অণুর সংখ্যা সমান, ইহা তাঁহার কল্পনা—খাঁটি কল্পনা। এই কল্পনায় তাঁহার অধিকার ছিল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বৈজ্ঞানিকেরা এই কল্পনায় অধিকারী। এইরূপ কল্পনা মাঝে মাঝে না করিলে বিজ্ঞানের আঁধারপথে আলো পাওয়া যায় না।

আচ্ছা, মানিয়া লইলাম যে, এক ঘন ইঞ্চি হাইড্রোজনে যত অণু, এক ঘন ইঞ্চি জলীয় বাষ্পে ঠিক্ ততগুলি অণু। শত কোটি, কি সহস্র কোটি, কি কোটি কোটি, তাহা জানিবার উপায় নাই; তবে উভয়ত্র অণুর সংখ্যা ঠিক্ সমান।

মাপিয়া দেখা গিয়াছে, এক ঘন ইঞ্চি হাইড্রোজন আধ ঘন ইঞ্চি অক্সিজনে যুক্ত হইয়া ঠিক্ এক ঘন ইঞ্চি জলীয় বাষ্প হয়। মাপের কথা, ওজনের কথা নহে। এখন উল্লিখিত কল্পনা যদি প্রকৃত হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, কতিপয় জলের অণু প্রস্তুত করিতে ঠিক্ ততগুলি হাইড্রোজনের অণু আবশ্যক হইবে, আর অক্সিজনের অণু তাহার ঠিক্ অর্দ্ধেকগুলি আবশ্যক হইবে।

অর্থাৎ দুইটা জলের অণু প্রস্তুত করিতে হইলে দুইটা হাইড্রোজনের অণুর আর একটিমাত্র অক্সিজন-অণুর প্রয়োজন হইবে।

দুইটা হাইড্রোজনের অণুতে দুইটা জলের অণু হয়; একটা জলের অণু প্রস্তুত করিতে একটা হাইড্রোজন অণু আবশ্যক হইবে।

অতএব প্রত্যেক হাইড্রোজনে যতটি হাইড্রোজন পরমাণু ছিল, সবগুলিই জলের অণুতে প্রবেশ করিবে।

দাঁড়াইল এই,—উক্ত অনুমান সত্য হইলে এক জলের অণুতে যতগুলি হাইড্রোজন পরমাণু আছে, এক হাইড্রোজন অণুতেও ততগুলি হাইড্রোজন পরমাণু আছে। জলের অণুতে কয়টি হাইড্রোজন পরমাণু আছে, তাহা জানিবার কোন উপায় আছে কি? দেখা যাক্, আছে কি না।

জলের হাইড্রোজন আমরা তাড়াইয়া বাহির করিতে পারি। সোডিয়ম পটাশিয়ম প্রভৃতি ধাতু জলে ফেলিলে জলের হাইড্রোজন বাহির হইয়া যায়; ধাতু গিয়া হাইড্রোজনের স্থান গ্রহণ করে ও জলস্থিত অক্সিজনের সহিত মিলিত হয়। কিন্তু এই হাইড্রোজন দুই বারে বাহির করা চলে। এক ছটাক জলে যতটা হাইড্রোজন আছে, তাহার অর্দ্ধেকটা প্রথম বারে তাড়াইলাম; বাকি অর্দ্ধেক থাকিয়া গেল, সেই অর্দ্ধেক আর একবারে তাড়ান চলে; ইচ্ছা করিলে তাহা রাখাও চলে।

জলের অণুতে যদি একটিমাত্র হাইড্রোজন পরমাণু থাকিত, তাহা হইলে উহার অর্দ্ধেক তাড়ান অসম্ভব হইত। একটা গরুর যেমন অর্দ্ধেক গোহালে রাখিয়া অর্দ্ধেক বাহিরে আনা চলে না, একটা সিকির যেমন অর্দ্ধেক রাখিয়া অর্দ্ধেক খয়রাত করা চলে না, তেমনি একটা পরমাণুর অর্দ্ধেক রাখা ও অর্দ্ধেক বাহির করা চলে না। কেন না,

পরমাণুকে অবিভাজ্য ধরিয়া লইয়াছি। অতএব জলের অণুতে একাধিক হাইড্রোজন পরমাণু রহিয়াছে। যখন দুইবারে তাড়াইতে পারি, তখন দুইটা আছে। তিনবারে তাড়ান যায় না; নতুবা তিনটা আছে মনে করিতে হইত।

জলের অণুতে তবে হাইড্রোজনের পরমাণু দুইটা আছে; একটা নাই, একটামাত্র হাইড্রোজন পরমাণু থাকিলে উহাকে হয় রাখিতে হইত, নয় তাড়াইতে হইত; অর্দ্ধেক রাখা, অর্দ্ধেক তাড়ান কখনই চলিত না।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, জলের অণুতে যতটি হাইড্রোজন পরমাণু, হাইড্রোজন অণুতেও ততটি হাইড্রোজন পরমাণু। দেখা গেল, জলের অণুতে দুইটি হাইড্রোজন পরমাণু আছে, অতএব স্থির হইল, হাইড্রোজনের অণুতেও অন্ততঃ দুইটি পরমাণু আছে।

এই রকমের বিচারে স্থির হইয়াছে যে, জলের একটি অণুতে অক্সিজনের একটি পরমাণু বিদ্যমান আছে। অতএব জলের প্রত্যেক অণু ভাঙিলে হাইড্রোজনের দুই পরমাণু ও অক্সিজনের এক পরমাণু পাওয়া যায়। কিন্তু পূর্ব্ব হইতে বলিয়া আসিতেছি যে, একভাগ ওজনের হাইড্রোজন ৮ ভাগ ওজনের অক্সিজনে যুক্ত হইয়া ৯ ভাগ জল হয়। তাহা হইলে একটি অক্সিজন পরমাণুর ওজন দুইটি হাইড্রোজনের পরমাণুর ওজনের আটগুণ হয়। একটি হাইড্রোজন পরমাণুর ওজন ১ ধরাই প্রথা, দুইটি হাইড্রোজন পরমাণুর ওজন ২; অতএব একটি অক্সিজন পরমাণুর ওজন ২এর আটগুণ ১৬।

গোড়ায় প্রশ্ন উঠিয়াছিল, অক্সিজনের পরমাণু ওজনে ৮ ধরিব, না ১৬ ধরিব? ডাল্‌টন এই প্রশ্নের নিশ্চিত উত্তর দিতে পারেন নাই। তার পরে বহু পণ্ডিতে তর্কবিতর্কের পর স্থির করিয়াছেন, যে

অক্সিজনের পরমাণুর ওজন ৮ নহে, ১৬ই বটে। জলের প্রত্যেক অণুতে হাইড্রোজনের দুইটি আর অক্সিজনের একটি পরমাণু বর্ত্তমান আছে। আবোগাড্রোর কল্পনার সাহায্যে ঐরূপ স্থির হইয়াছে। স্থির হইয়াছে বলা অনুচিত; ঐরূপ কল্পিত হইয়াছে, বলা উচিত।

পাঠকেরা উক্ত বিচারে প্রীতিলাভ করিয়াছেন কি না জানি না। সকল কথা বলিতে পারি নাই; যে কয়টা কথা বলিয়াছি, তাহাই সম্ভবতঃ অনেকের পক্ষে বিরক্তিকর হইয়াছে। এরূপ বিচারের নমুনা আর দিব না।

এখানে এই জটিল বিতর্কের অবতারণার একটু উদ্দেশ্য আছে। বিজ্ঞানবিদ্যা কিরূপ বিচারে জ্ঞানের পরিধি বাড়াইবার চেষ্টা করেন তাহা দেখানই এস্থলে উদ্দেশ্য। প্রত্যক্ষলব্ধ জ্ঞানের উপর নির্ভর করিয়া থাকা চলে না। প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারা যাহা পাওয়া যায়, তাহা খাপছাড়া ঠেকে; পরস্পর সঙ্গতি দেখা যায় না; পরস্পর সম্পর্ক দেখা যায় না। অনুমান ও কল্পনা-বলে সঙ্গতি ও সম্পর্ক স্থির করিতে হয়। প্রত্যক্ষলব্ধ জ্ঞান তাতে আরও স্পষ্ট হয়; যাহা অস্পষ্ট ছিল তাহা উজ্জ্বল হয়; যাহা আঁধারে ছিল তাহা আলোতে আসে; যেখানে সম্বন্ধ দেখিতাম না, সেখানে সম্বন্ধ দেখিতে পাই; যেখানে অব্যবস্থা ছিল, সেখানে ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। তবে সর্ব্ববিধ অনুমানের ও কল্পনার একমাত্র ভিত্তি এই প্রত্যক্ষলব্ধ জ্ঞান। এই প্রত্যক্ষ জ্ঞানের একমাত্র দ্বার ইন্দ্রিয়। ইন্দ্রিয় যাহা বুদ্ধির নিকট আনিয়া দেয়, বুদ্ধি তাহাই গ্রহণ করে। বুদ্ধি ইন্দ্রিয়কে যথাস্থানে নিযুক্ত করিতে পারে; স্বকর্ম্মসাধনে অবহিত ও সচেষ্ট করিতে পারে, উপযুক্ত কৌশল উদ্ভাবনা করিয়া ইন্দ্রিয়কে সাহায্য করিতে পারে, কিন্তু স্বয়ং জ্ঞান আহরণ করিতে পারে না। ইন্দ্রিয় যাহা আনিয়া দেয়, বুদ্ধি তাহাই গ্রহণ করে। বুদ্ধি

তাহাকে সাজাইয়া গোছাইয়া তাহার মধ্যে সম্বন্ধ নিরূপণ করিয়া বিভাগ করিয়া কোথায় ব্যবস্থা, কোথায় অব্যবস্থা, কোথায় নিয়ম, কোথায় অনিয়ম, তাহা নির্দ্ধারণ করে। কিন্তু গোড়ায় বুদ্ধি ইন্দ্রিয়ের অধীন।

তার পর বুদ্ধি নিজশক্তি পরিচালনা করিয়া জ্ঞানের সীমা বাড়াইতে চেষ্টা করে; নূতন জ্ঞান—ইন্দ্রিয় যাহার তত্ত্ব আনে না—সেইরূপ জ্ঞানের সঞ্চয়ে প্রবৃত্ত হয়। এই নূতন জ্ঞান-সঞ্চয়ের দুইটা উপায়।

প্রথম—বুদ্ধি জোর করিয়া বলে, প্রত্যক্ষ দর্শনে যখন এই নিয়ম পাইলাম, তখন ঐখানে ঐ ঘটনা ঘটিবেই ঘটিবে; ইন্দ্রিয় হয়ত তাহার খবর রাখে না, কিন্তু পাঠাও ইন্দ্রিয়কে সেই সংবাদ আনিতে,—ইন্দ্রিয় সংবাদ আনিতে সমর্থ হউক, আর না হউক, ঐখানে ঐ ঘটনা ঘটিতেছে, তাহাতে সন্দেহ করিব না। নেপচুন বা মিত্র গ্রহের আবিষ্কার ইহার দৃষ্টান্ত। পূর্ব্বে ইহার উল্লেখ করিয়াছি।

প্রতিভার আলোক জ্বালিয়া নিউটন মাধ্যাকর্ষণঘটিত প্রাকৃতিক নিয়মের অস্তিত্ব দেখিলেন। তার পর তাঁহার শিষ্যগণের বুদ্ধি নূতন জ্ঞান আহরণে ধাবিত হইল।

লেবেরিয়ার বুদ্ধি গণনা করিয়া বলিল, নিউটন-দৃষ্ট মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম যদি সত্য হয়, তবে বরুণ গ্রহের গতিবিধিতে যে ব্যতিক্রম দৃষ্ট হইতেছে, উহার হেতু পাইয়াছি। ঐখানে আর একটা গ্রহ আছে; নিশ্চিত তাহার সান্নিধ্যই, তৎপ্রযুক্ত আকর্ষণই, এই ব্যতিক্রমের হেতু। নিশ্চয়, নিশ্চয়। ইন্দ্রিয় সে গ্রহের খোঁজ পাইতেছে না। উহা চক্ষুর অদৃশ্য। পাঠাও ইন্দ্রিয়কে খোঁজ লইতে। চক্ষু প্রেরিত হইল। মিত্রগ্রহ ধরা পড়িল। নূতন জ্ঞান অর্জ্জিত হইল। মিত্রগ্রহ আবিষ্কৃত

হইল। বুদ্ধির এখানে বাহাদুরি; বুদ্ধি এখানে ইন্দ্রিয়ের অপেক্ষা করে নাই। নিজের বলে নূতন জ্ঞান আহরণ করিয়াছে।

দ্বিতীয়—জ্ঞানবর্দ্ধনের দ্বিতীয় উপায় অনুমান ও কল্পনা। প্রত্যক্ষ দর্শন হইতে জানা গেল, এক মূল পদার্থ অন্য মূল পদার্থে মিলিত হইবার সময় নির্দ্দিষ্ট ভাগে মিলিত হয়। ইহা প্রাকৃতিক নিয়ম, প্রত্যক্ষ-লব্ধ। ইহার ভিতরে অবশ্য গূঢ় রহস্য আছে। সেই রহস্য প্রত্যক্ষের অতীত; সেই অন্ধকার ভেদ করিবার কোন উপায় নাই। ডাল্‌টন প্রতিভার আলোক জ্বালিলেন। আঁধারে কি আছে, তাহা প্রত্যক্ষগম্য হইল না বটে, তবে চিত্তপটে তাহার একটা ছবি অঙ্কিত হইল। ডাল্‌টন কল্পনানেত্রে দেখিলেন, জড়পদার্থ অবিভাজ্য পরমাণুর সমষ্টি; যত মূল পদার্থ, তত শ্রেণীর পরমাণু; একের ওজন অন্যের সমান নহে; এক শ্রেণীর গোটাকতক পরমাণু অন্য শ্রেণীর কতিপয় পরমাণুর সহিত মিলিত হইয়া মৌলিক পদার্থের অণু নির্ম্মাণ করে। এই অনুমানে এই প্রাকৃতিক নিয়মের সঙ্গত তাৎপর্য্য পাওয়া গেল। কিন্তু যে ছবি ডাল্‌টনের চিত্তে কল্পিত হইল, তাহা তত স্পষ্ট নহে। কোন্ অণুতে কোন্ পরমাণু কত আছে, তাহা তিনি স্পষ্ট দেখিলেন না। পরবর্ত্তী পণ্ডিতেরা কল্পনার উপর কল্পনা চড়াইলেন। ক্রমে ছবিটা স্পষ্ট হইয়া আসিল। জলের অণুর ভিতর কোন্ পরমাণু কয়টা আছে, তাহা কল্পিত হইল। কিন্তু ব্যাপারটা কল্পিতই থাকিয়া গেল। প্রত্যক্ষ বিষয় হইল না, হইবার আশাও থাকিল না। জ্ঞান অর্জ্জিত হইল বটে, কিন্তু সেই জ্ঞান অস্পষ্ট। তাহার উপর পূরা ভর দেওয়া চলে না।

বিজ্ঞানবিদ্যা যে-সকল তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছে, তাহার সকল-গুলির মূল্য সমান নহে, সকলের ভিত্তি সমান দৃঢ় নহে। বিজ্ঞান আলোচনার সময়ে কোন্‌টার ভিত্তি কতটুকু দৃঢ়, তাহা জানিয়া লওয়া

আবশ্যক। নতুবা বৈজ্ঞানিকের হাতের ছাপ দেখিয়াই উহাকে অভ্রান্ত খাঁটি সত্য বলিয়া গ্রহণ করিলে প্রতারিত হইবার আশঙ্কা থাকে।

ক্ষার, অম্ল, লবণ

পণ্ডিতেরা যৌগিক পদার্থগুলিকে নানা শ্রেণীতে ভাগ করিয়াছেন। ধর্ম্মসামান্য দেখিয়া এইরূপ শ্রেণীবিভাগ হয়। অতি প্রাচীনকাল হইতে এইরূপ শ্রেণীবিভাগ প্রচলিত আছে। একটা দৃষ্টান্ত লইব।

মনে কর চূণ। চূণ জিনিষটা আমরা পানে খাই, গৃহনির্ম্মাণে লাগাই। চূণের কি গুণ? তাম্বূলভোজী বিলক্ষণ জানেন, গালের পাতলা চামড়ার সহিত চূণের কি সম্বন্ধ; আঙুলের মোটা চামড়াকেও চূণে আক্রমণ করে। চূণ হরিদ্রার হলুদে রঙকে রাঙা করিয়া দেয়। চূণের গুণ তীব্র; এইরূপ তীব্র গুণ যে জিনিসে আছে, তাহার সাধারণ নাম ক্ষার।

ক্ষারের সহিত অম্লের কতকটা অহি-নকুল সম্পর্ক। অম্লরোগী চূণের জল পান করে। চূণের জলে অম্লজল মিশাইলে ক্ষারের তীব্রতা নষ্ট হয়। অম্লের আস্বাদন সর্ব্বজনবিদিত। কাগজে জবাফুল ঘসিলে যে নীল রঙ হয়, অম্লরসে উহা রাঙা হয়।

আর মনে কর লবণ। সামুদ্রিক লবণের আস্বাদনও সর্ব্বজনবিদিত। উহার আস্বাদনও চূণের মত নহে, অম্লের মতও নহে।

ক্ষার, অম্ল আর **লবণ** এই তিনটি শব্দ রসায়নশাস্ত্রে কিছু ব্যাপকতর অর্থে প্রযুক্ত হয়।

চূণ ক্ষার। চূণ আমরা প্রস্তুত করি কিরূপে? ঘুটিং, ঝিনুক, শামুক, খড়ি, মার্ব্বেল পাথর, ভাটির ভিতর প্রখর তাপে গরম করিলে চূণ প্রস্তুত হয়। উত্তাপে একটা অনিল বাহির হইয়া যায়। পড়িয়া থাকে চূণ।

উত্তাপে যে অনিল বাহির হইয়া যায় সেই অনিলটা আমাদের পরিচিত অনিল। কয়লা পোড়াইলে যে অনিল হয়, ইহা সেই অনিল। সোডাওয়াটারে যে অনিল থাকে, সেই অনিল।

এই অনিল জলে দ্রব হয়; জলটা অম্লধর্ম্মাক্রান্ত হয়। নির্ম্মল চূণের জলে দিলে নির্ম্মল জল ঘোলাটে হয়। সেই ঘোলা জল দাঁড়াইয়া রাখিলে সাদা রঙের গুঁড়া থিতাইয়া পড়ে।

এই সাদা রঙের গুঁড়া আর কিছুই নহে। উহা চক বা চাখড়ির গুঁড়া।

খড়ি উত্তপ্ত করিলে চূণ পড়িয়া থাকে, আর কয়লাপোড়া অনিল বাহির হইয়া যায়। কয়লাপোড়া অনিল চূণের জলে প্রবেশ করিলে উহা চূণে যুক্ত হইয়া আবার খড়ি হয়।

চূণ হইল ক্ষার; আর কয়লাপোড়া অনিল যে জলে দ্রব হইয়া আছে, সেই জল হইল অম্ল; আর ঐ যে খড়ি, যাহা ক্ষারধর্ম্মী চূণ আর অম্লধর্ম্মী জলের মিলনে উৎপন্ন হইল, উহা রসায়ন শাস্ত্রের পরিভাষা অনুসারে লবণ।

কয়লা, গন্ধক, ফস্ফরাস প্রভৃতি অপধাতু পোড়াইলে উহারা অক্সিজনে মিলিত হইয়া যে পদার্থ উৎপাদন করে, তাহা অম্লধর্ম্মী। আর সোডিয়ম, পটাশিয়ম, মগ্নীশম, দস্তা প্রভৃতি ধাতু পোড়াইলে উহারা অক্সিজনে মিলিত হইয়া যে সকল ভস্মবৎ পদার্থের উৎপাদন করে, তাহারা ক্ষারধর্ম্মী। ব্যাপক অর্থে অক্সিজনে দগ্ধ ধাতুভস্ম-মাত্রকেই ক্ষার বলা যাইতে পারে। ক্ষারধর্ম্মী পদার্থে অম্লধর্ম্মী পদার্থ যোগ করিলে উহার সম্মিলনে যে পদার্থ জন্মে তাহা লবণধর্ম্মী।

অম্লধর্ম্মী পদার্থের মধ্যে কতকগুলি তীব্রগুণবিশিষ্ট। গন্ধক, দ্রাবক, মহাদ্রাবক প্রভৃতি দ্রাবকের নাম বৈদ্যক শাস্ত্রে পাওয়া যায়।

আজকাল বাজারে ঐ-সকল জিনিস খুব শস্তা। উহারা তীব্র অম্লধর্ম্মী। গন্ধক পোড়াইয়া গন্ধকদ্রাবক হয়। গন্ধকদ্রাবক সহিত সোরা চোঁয়াইয়া মহাদ্রাবক হয়। উহাদের মধ্যে অক্সিজন প্রভূত পরিমাণে বিদ্যমান থাকে। উহারা ক্ষারমাত্রকে লবণে পরিণত করে। কেবল তাহাই নহে, ধাতু দ্রব্যকেও আক্রমণ করিয়া লবণে পরিণত করে। ধাতুকে দ্রবীভূত করিয়া রূপান্তরিত করে বলিয়াই এই সকল অম্ল দ্রব্যের নাম দ্রাবক হইয়াছে।

রাসায়নিক পরিভাষানুসারে লবণ শব্দটির তাৎপর্য্য বুঝা উচিত। কাঠ পাতা পোড়াইলে যে ছাই পড়িয়া থাকে, তাহাতে প্রচুর লবণ আছে। বাজারের সোডা বা সাজিমাটি লবণ; সোরা ফটকারি সোহাগা হীরাকষ তুঁতে এই সকলই লবণ; এমন কি রাসায়নিকের নিকট খড়ি, মাটি, কাচ পর্য্যন্তও লবণ অথবা বিবিধ লবণবৎ পদার্থের মিশ্রণে উৎপন্ন। মোটামুটি বলা চলিতে পারে, ধাতু দ্রব্যকে অক্সিজনে দগ্ধ করিলে উহা অম্লে পরিণত হয়, আর অপধাতুতে অক্সিজনে যুক্ত করিলে উহা ক্ষারে পরিণত হয়, আর ক্ষার ও অম্ল একত্রযোগে লবণ প্রস্তুত হয়। বলা বাহুল্য যে, এস্থলে ক্ষার, অম্ল, লবণ, এই তিনটি শব্দ ব্যাপক পারিভাষিক অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

কয়লা গন্ধক প্রভৃতি দগ্ধ করিলে উহারা অক্সিজনে যুক্ত হইয়া অম্লদ্রব্যে পরিণত হয়, লাবোয়াশিয়া ইহা দেখিয়াই অক্সিজনের নামকরণ করিয়াছিলেন; ইংরেজি অক্সিজন অর্থই অম্লজনক।

কিন্তু ঐ নামটি ঠিক্ হয় নাই। কেন না ধাতুদ্রব্য দগ্ধ হইলে ক্ষার হয়, ঐ ক্ষারেও অক্সিজন বর্ত্তমান থাকে; ক্ষারে অম্লে মিলিত হইয়া লবণ হয়, উহাতেও প্রচুর অক্সিজন থাকে। কাজেই, অক্সিজনযুক্ত দ্রব্যমাত্রই অম্ল নহে।

আবার এমন তীব্র অম্ল পদার্থ আছে, তাহাতে অক্সিজনের কণিকা মাত্র নাই। মিউরিয়েটিক এসিড নামক যে দ্রাবক সুপরিচিত, উহা সামুদ্রিক লবণ হইতে প্রস্তুত হয়। উহাতে অক্সিজনের কণিকা মাত্র নাই। প্রুসিক এসিড নামক পদার্থ অম্ল মধ্যে গণ্য; উহার মত মারাত্মক বিষ আর নাই; উহাতেও অক্সিজন নাই। কাজেই, অক্সিজনের বিদ্যমানতা অম্লত্বের কারণ নহে।

ঐ মিউরিয়েটিক এসিড বা লবণ দ্রাবকও ধাতুদ্রব্যকে আক্রমণ করে। দস্তায় লবণ দ্রাবক দিলে লবণ দ্রাবক হইতে হাইড্রোজন বাহির হয়, আর দস্তা তাহার স্থানে গিয়া বসে; যে জিনিষটা হয়, তাহা লবণ।

সামুদ্রিক লবণ বা সৈন্ধব লবণ, যাহা আমরা রন্ধন কর্ম্মে ব্যবহার করি, তাহাতেও অক্সিজন নাই।

অক্সিজনের অস্তিত্ব অম্লত্বের কারণ নহে, বরং হাইড্রোজনের অস্তিত্বই অম্লত্বের কারণ বলা যায়। এ পর্য্যন্ত যত অম্ল দ্রব্য আবিষ্কৃত হইয়াছে, সকলেতেই হাইড্রোজন বিদ্যমান আছে। ঐ হাইড্রোজনকে দস্তার মত ধাতু পদার্থে তাড়াইয়া দিতে পারে; তাড়াইয়া দিয়া তাহার স্থানে বসিতে পারে। যে সকল যৌগিক পদার্থে হাইড্রোজন বর্ত্তমান, এবং ঐ হাইড্রোজন ধাতুদ্রব্য কর্ত্তৃক অপসার্য্য, তাহার নাম অম্ল। ধাতু যখন হাইড্রোজনকে অপসারণ করিয়া তাহার স্থানে বসে, তখন অম্লের আর অম্লত্ব থাকে না; উহা তখন লবণে পরিণত হয়।

দুইটি দৃষ্টান্ত দিলে স্পষ্ট হইবে। গন্ধককে পোড়াইলে শাদা রঙের যে ধূঁয়া হয়, তাহা সকলেই জানে। গন্ধক পোড়ার এই ধূমের একটা তীব্র গন্ধ আছে, উহা শ্বাসরোধের উপক্রম করে।

এই তীব্রগন্ধী, পদার্থে গন্ধকও আছে; অক্সিজনও আছে; ৩২ ভাগ গন্ধকে ৩২ ভাগ অক্সিজন আছে। কোনরূপে উহার সহিত আরও ১৬ ভাগ অক্সিজন যোগ দিলে যে পদার্থ জন্মে, উহাতে ৩২ ভাগ গন্ধকের সহিত ৪৮ ভাগ অক্সিজন থাকে। এই পদার্থে জল দিলে উহা ১৬ ভাগ জলের সহিত মিলিত হইয়া ৩২+৪৮+১৮ অর্থাৎ ৯৮ ভাগ গন্ধক দ্রাবক হয়। ১৮ ভাগ জলে ছিল দুই ভাগ হাইড্রোজন আর ১৬ ভাগ অক্সিজন। ৯৮ ভাগ গন্ধক দ্রাবকে থাকিল ২ ভাগ হাইড্রোজন, ১৬+৪৮ অর্থাৎ ৬৪ ভাগ অক্সিজন, আর ৩২ ভাগ গন্ধক।

২ হাইড্রোজন+৩২ গন্ধক+৬৪ অক্সিজন=৯৮ গন্ধক দ্রাবক। এই গন্ধক দ্রাবকে তামা তপ্ত করিলে উহার ২ ভাগ হাইড্রোজন বাহির হইয়া যায়, তাহার স্থানে ৬৩ ভাগ তামা আসিয়া বসে। যে লবণটা প্রস্তুত হয় তাহা তুতিয়া। উহার ভাগ এইরূপ; ৬৩ তামা+৩২ গন্ধক+৬৪ অক্সিজন=১৫৯ তুতিয়া। এই তুতিয়া অন্যতম লবণ। লবণ শব্দের পারিভাষিক অর্থ এখন বুঝা যাইবে। অম্লদ্রব্যে হাইড্রোজন থাকে, ঐ হাইড্রোজন ধাতু কর্ত্তৃক অপসারিত হয়। ধাতু যখন হাইড্রোজনের স্থানে গিয়া বসে, তখন ঐ অম্লদ্রব্য রূপান্তরিত হইয়া লবণে পরিণত হয়। অম্লে ছিল হাইড্রোজন; সেই হাইড্রোজন গেল; আসিল ধাতু; হইল লবণ। এই হিসাবে আমাদের সামুদ্রিক লবণও লবণ; সোরাও লবণ, হীরাকস লবণ, তুতে লবণ, খড়ি লবণ, মাটি লবণ; এমন কি, কাঠ পোড়াইয়া যে ছাই থাকে উহাও নানা লবণের সমষ্টি।

দহন ক্রিয়া

দহন-ক্রিয়ার ব্যাপারটা এখন ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে। দহনের ফল অগ্নি; অগ্নির স্বরূপটাও তাহা হইলে বুঝা যাইবে।

অগ্নির সহিত উত্তাপের ও আলোকের চিরন্তন সম্বন্ধ। আগুনে হাত পোড়ে, আগুনের দীপ্তি আঁধার দূর করে। উত্তাপ আর আলোকের স্বরূপ কি, তাহা পরে আলোচ্য। এখন আগুনের স্বরূপ কি, তাহা বুঝিতে হইবে।

কেবল উত্তাপে আগুন হয় না। গরম জলে, গরম ভাতে, উত্তাপ আছে, কিন্তু আগুন নাই। কেবল আলোকেরও আগুন হয় না। জোনাকি পোকায় আলো দেয়, কিন্তু উহাতে আগুন হয় না। আগুনে উত্তাপ আর আলোক দুই থাকা চাই।

উত্তাপ আর আলোক দুই থাকিলেও আগুন হয় না। স্বর্ণকারের মুচির ভিতর তরল সোণা টল টল করে; উহা তপ্ত হয়, উহা দীপ্তি দেয়, কিন্তু উহাকে আগুন বলি না।

কিন্তু ঐ মুচির বাহিরে যে তপ্ত জ্বলন্ত দীপ্তিমান্ অঙ্গার আছে, যাহার উত্তাপে স্বর্ণ দ্রবীভূত হইয়াছে, সেই অঙ্গারে আগুন আছে। কাজেই, উত্তাপ থাকিলেই আগুন হয় না; দীপ্তি থাকিলেই আগুন হয় না। আগুনে আরও কিছু চাই।

তপ্তদীপ্ত স্বর্ণখণ্ড তপ্তদীপ্ত অবস্থায় বহুক্ষণ থাকিতে পারে, উহার ভার কমে না। স্বর্ণকার তাহা জানে, গৃহস্থও জানেন। ভার যদি কমে, গৃহস্থ যেন বুঝেন যে স্বর্ণকার সোণা চুরি করিয়াছে। উত্তাপে সোণার ক্ষয় হয় না। কিন্তু অঙ্গার যতক্ষণ ধরিয়া দীপ্ত-তপ্ত থাকে, ততই উহা ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। উহা ক্ষীণ হইয়া বায়ুতে মিলিয়া যায়; উৎপন্ন হয় একটা অনিল। ঐ অনিলের কথা পূর্ব্বে কতবার বলিয়াছি।

অঙ্গার যতক্ষণ তপ্ত থাকে ও দীপ্ত থাকে, ততই ক্ষীণ হইয়া যায়। অঙ্গার ক্ষয় হইয়া যাহা অবশেষ থাকে, তাহাকে অঙ্গার বলে না। তাহাকে বলে ছাই; উহা অঙ্গারের ধ্বংসাবশেষ।

এই ক্রিয়ার নাম **দহন।** তপ্ত সোণা দগ্ধ হয় না; উহার ভার কমে না। তপ্ত অঙ্গার দগ্ধ হয়, উহার ভার ক্রমে কমিয়া যায়; শেষে অঙ্গারের অবশেষ কিছুই থাকে না; যাহা থাকে তাহা ছাই।

স্বর্ণ দাহ্য নহে, অঙ্গার দাহ্য। অঙ্গারের যে অংশ দহনের পর অবশিষ্ট থাকে তাহা অঙ্গার নহে, ছাই। এই ছাই দাহ্য নহে।

জলন্ত সোণা তাপ দেয়, আলো দেয়, কিন্তু পোড়ে না। জলন্ত কয়লার যেটুকু খাঁটি কয়লা, সেইটুকু তাপ দেয়, আলো দেয়, আর পোড়ে; আর ক্ষয় পায়। যেটুকু পোড়ে না, ক্ষয় পায় না, সেটুকু অবশেষ থাকে, তাহা কয়লা নহে, তাহা ছাই।

দহনকালে কয়লা ক্ষয় পায়, কিন্তু একেবারে লোপ পায় কি? লাবোয়াশিয়ে তাহার উত্তর দিয়াছিলেন। দহনকালে একটা অনিল জন্মে; সেই অনিল সেই কয়লা হইতে উৎপন্ন। যে কয়লাটা অদৃশ্য হইয়াছে তাহা সেই অনিলে বিদ্যমান আছে। কয়লার কণিকামাত্র ধ্বংস পায় নাই; তাহা রূপান্তর গ্রহণ করিয়া অদৃশ্য হইয়া বর্ত্তমান আছে।

এই অনিল—কয়লাপোড়া অনিল—কয়লার ও অক্সিজনের মিলনের ফল। কয়লার যে ভার ছিল এই অনিলের ভার ওজনে তার চেয়ে বেশী। বার ভাগ ওজনের কয়লা পোড়াইয়া চুয়াল্লিশ ভাগ ওজনের অনিল জন্মে। এইরূপে ভাগ দেখান চলে।

১২ কয়লা + ৩২ অক্সিজন = ৪৪ কয়লাপোড়া অনিল। ১২ ভাগ কয়লা ৩২ ভাগ অক্সিজনে যুক্ত হইয়া ৪৪ ভাগ অনিল জন্মিয়াছে; কয়লা অদৃশ্য হইয়াছে বটে কিন্তু লোপ পায় নাই; বলা হয় যে, উহার প্রত্যেক পরমাণু এই নবজাত অনিলে বর্ত্তমান আছে।

সোণা গরম করিলে সোণাই থাকে। কয়লা পোড়াইলে তাহা কয়লা থাকে না। উহা অক্সিজনযুক্ত হইয়া অনিলে পরিণত হয়।

এই অক্সিজনের সহিত কয়লার সম্মিলনের নাম দহনক্রিয়া। কয়লা দাহ্য পদার্থ। অক্সিজন দহন-সহায়। কয়লা ও অক্সিজনের পরস্পর সম্মিলনে দহন-ক্রিয়া; দহন-ক্রিয়ার ফল তাপের উদ্ভব ও আলোকের উদ্ভব; অর্থাৎ আগুনের উৎপত্তি।

দহনক্রিয়ার সময়ে তাপের ও আলোকের উদ্ভব হইলে তবে আগুন হয়।

কয়লাতে ও অক্সিজনে রাসায়নিক সম্মিলন ঘটে; সেই সম্মিলনে তাপ জন্মে, আর আলোক জন্মে; আমরা বলি, আগুন হইল।

সোণার বেলায় এইরূপ সম্মিলন ঘটে না, আগুনও হয় না।

জ্বলন্ত কয়লা দহনকালে আগুন জন্মায়; কিন্তু সেই আগুনে কয়লা ধীরে ধীরে ধিকি ধিকি জ্বলে; জ্বলে আর ক্ষয় পায়, আর অদৃশ্য হইয়া অনিলে পরিণত হয়। আগুন হয় কিন্তু সেই আগুনের শিখা থাকে না। শিখাহীন অগ্নির শোভা সুন্দর; কিন্তু অগ্নির শিখা বুঝি সুন্দরতর। কাঠ পুড়িলে, তেল, ঘি, কেরোসিন বাতি পুড়িলে যে আগুন হয়, তাহার শিখা থাকে। উহার মধ্যে একটাকে দৃষ্টান্ত লইব। কেরোসিন লওয়া যাক।

কেরোসিন দ্রব্য পদার্থ। উহা কয়লা আর হাইড্রোজনের মিলনে উৎপন্ন। উহাতে অন্য কোন মূল পদার্থ নাই।

কয়লাও দাহ্য, হাইড্রোজনও দাহ্য; উভয়ই অক্সিজনে দগ্ধ হয়। কয়লা অক্সিজন-যুক্ত হইয়া একটা অনিল হয়। হাইড্রোজন অক্সিজন-যুক্ত হইয়া জল হয়। কেরোসিন যখন পোড়ে তখন উহার অন্তর্নিহিত কয়লা পুড়িয়া সেই অনিলে পরিণত হয়, আর হাইড্রোজন পুড়িয়া জলে

পরিণত হয়। বায়ুমধ্যে অক্সিজন আছে; সেই অক্সিজন দহনের সহায়। দহন-কালে কেরোসিন ক্রমে ক্ষয় পায়, কিন্তু লোপ পায় না। উহা অনিলে আর জলে পরিণত হয়।

* * * *

দহনকালে তাপ জন্মে ও আলোক জন্মে। দহনকালে তাপ ও আলোক জন্মিলে আমরা বলি আগুন হইয়াছে। কেরোসিনের দহনে আগুন হয়।

কেরোসিন তৈলের দহনফল খানিকটা অনিল আর খানিকটা জল। জলটাও গরম হইয়া বাষ্পাকারে অনিল হইয়া যায়। কয়লা-পোড়া অনিল ও জলের বাষ্পের অনিল, দুই অনিল মিশিয়া থাকে।

দুই অনিলই উত্তপ্ত; উত্তপ্ত ও হাল্‌কা। উত্তপ্ত অনিল-দ্বয়ের প্রবাহ ঊর্দ্ধমুখে উঠিতে থাকে। উত্তপ্ত অনিলপ্রবাহ দগ্ধাবশেষ কয়লার কণিকা জলন্ত ও দীপ্ত অবস্থায় ভাসিতে থাকে। অনিলপ্রবাহকেও দীপ্ত ও তপ্ত করিয়া রাখে। উহাই আগুনের শিখা।

কয়লার অদগ্ধ কণিকা শিখামধ্যে থাকে; তাহার প্রমাণ ধূম। কেরোসিনের শিখা হইতে যে ধূম উঠে উহা অঙ্গার-কণিকা মাত্র।

কেরোসিনের দহনে, তেল বাতি প্রভৃতির দহনে, আগুনের শিখা হয়। তপ্ত-দীপ্ত ঊর্দ্ধমুখ অনিল-প্রবাহ ঐ অগ্নিশিখার উৎপাদন করে। দহনে অবশেষে যাহা থাকে তাহা ধূম। উহা অদগ্ধ অঙ্গার-কণিকা মাত্র; উহা দহনক্রিয়ার অসমাপ্তির পরিচায়ক।

কাঠের দহনেও শিখা হয় ঐ কারণে। কাঠেও কয়লা আছে, হাইড্রোজন আছে; উহারা পুড়িবার সময় শিখা জন্মায়। কাঠের মধ্যে যে অঙ্গার ও হাইড্রোজন থাকে, তাহা নিঃশেষে দগ্ধ হইলে যাহা অবশেষ থাকে, তাহা অদাহ্য লাবণিক পদার্থ—ছাই।

উত্তাপ

দহনক্রিয়ায় উত্তাপ জন্মে। কোন দাহ্যবস্তু, যথা কয়লা, গন্ধক, হাইড্রোজন—যখন* অক্সিজনে যুক্ত হয়, তখন **উত্তাপ** জন্মে। ফলে রাসায়নিক সম্মিলন ঘটিলে প্রায় উত্তাপ জন্মে।

তবে সর্ব্বত্র রাসায়নিক সম্মিলনে সমান উত্তাপ জন্মে না; কোথাও অধিক, কোথাও অল্প। কোথাও তাপের সহিত আলো বাহির হয়; কোথাও উত্তাপ হয়, কিন্তু দীপ্তি হয় না। কোথাও সহসা প্রচুর তাপ নির্গত হয়; কোথাও বা বহুক্ষণ অতি ধীরে তাপ বাহির হয়, তাহা বুঝা যায় বা বুঝা যায় না। তাপ জন্মানর প্রধান উপায় রাসায়নিক সম্মিলন। দহন-ক্রিয়া তাহার একটা দৃষ্টান্ত মাত্র। প্রদীপে, উনানে, এঞ্জিনে এই উপায়ে তাপ উৎপন্ন করা হয়।

তদ্ভিন্ন তাপ জন্মানর অন্য উপায় আছে, যথা ঘর্ষণ। হাতে হাতে ঘষিলে হাত তপ্ত হয়; কাঠে কাঠে ঘষিলে তাপ হয়, এমন কি আগুন জন্মে! সেকালে এইরূপে কাঠে কাঠে ঘষিয়া উত্তাপের উৎপাদন হইত। বরফে বরফে ঘষিয়া তদুৎপন্ন তাপে বরফ গলাইতে পারা যায়।

আর একটা উপায় সংঘট্ট-ঠোকাঠুকি। নেহাই হাতুড়ির আঘাতে তপ্ত হয়; চকমকির আঘাতে পাথর হইতে অগ্নিকণা বাহির হয়। তলোয়ারে তলোয়ারে ঠোকাঠুকিতে আগুন বাহির হয়। আর একটা উপায় সঙ্কোচন। জলে আল্‌কোহল ঢালিলে সঙ্কোচন ঘটে। সঙ্গে সঙ্গে কিঞ্চিৎ উত্তাপ জন্মে। বাতাসকে হঠাৎ চাপ দিয়া সঙ্কুচিত করিলে বাতাস গরম হয়।

আলোকে উত্তাপ জন্মে। সূর্য্যের আলোকে ভূমি উত্তপ্ত হয়, জল গরম হয়, বাতাস গরম হয়। আলোক উত্তাপ নহে; তবে আলোক তাপ জন্মায়, তাপে পরিণতি হয়। সূর্য্যের আলো কাঁচের

পরকলা দিয়া ঘনীভূত করিলে তাহাতে আগুন জ্বলিতে পারে। চাঁদের আলোতেও তাপ জন্মান যায়। বিজ্ঞান-বিদ্যা চাঁদকে হিমাংশু বলিতে চাহিবেন না।

উত্তাপ জন্মাইবার আরও অনেক উপায় আছে; ক্রমশঃ প্রকাশ্য। এখন বুঝিবার চেষ্টা করা যাউক, উত্তাপ পদার্থটা কি?

উত্তাপ আলোক নহে; উহা দর্শনেন্দ্রিয়ের বিষয় নহে। উহা ত্বগিন্দ্রিয়ের বিষয়। স্পর্শ দ্বারা আমরা বুঝিতে পারি; এটা তপ্ত, এটা শীতল।

উষ্ণতা

বিজ্ঞানশাস্ত্রে তাপ নামটার পারিভাষিক অর্থ আছে। বিজ্ঞান-শাস্ত্রে তাপ ঠিক ত্বগিন্দ্রিয়ের বিষয় নহে, যাহা ত্বগিন্দ্রিয়ের বিষয় তাহার নাম **উষ্ণতা**—গরমি—ঘর্ম্ম। আজি কালি ঘর্ম্ম বলিতে ঘাম বুঝায়;—ঘর্ম্ম শব্দের প্রকৃত অর্থ গরমি বা উষ্ণতা। পদার্থবিদ্যায় যাহাকে উত্তাপ বলে তাহা উষ্ণতা নহে। উষ্ণতা তাহার একটা লক্ষণ মাত্র।

স্পর্শেন্দ্রিয় উষ্ণতার পরিচয় দেয়। আমাদের হাতের একটা উষ্ণতা আছে; যে জিনিস হাতের চেয়ে উষ্ণ, তাহাই গরম ঠেকে; যাহা হাতের চেয়ে কম উষ্ণ তাহা ঠাণ্ডা ঠেকে।

এক হাত খুব ঠাণ্ডা জলে, অন্য হাত খুব গরম জলে, কিছুক্ষণ রাখিয়া দুই হাত একসঙ্গে অল্প গরম জলে রাখিলে সেই-একই জল এক হাতে গরম অন্য হাতে উষ্ণ বোধ হয়। কাজেই, উষ্ণতা ত্বগিন্দ্রিয়ের বিষয়। কিন্তু স্পর্শেন্দ্রিয়কে বিশ্বাস করিবার জো নাই।

অথচ উষ্ণতা মাপিয়া দেখিতে হইবে। কোন্ জিনিসটা কত উষ্ণ তাহা মাপিবার একটা উপায় চাই; নহিলে বৈজ্ঞানিকোচিত সূক্ষ্ম বিচার চলিবে না। উষ্ণতা মাপা যাইবে কিরূপে?

উত্তাপবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নানা পদার্থে নানা বিকার ঘটে। কঠিন, তরল, অনিল প্রায় যাবতীয় পদার্থই যত উষ্ণ হয়, ততই একটু না একটু আয়তনে বাড়ে। এই আয়তনের বৃদ্ধি দেখিয়া উষ্ণতার পরিমাণ চলিতে পারে।

একটা পিতলের গোলা পিতলের আংটির ভিতর দিয়া ঠিক গলিয়া পড়ে; আংটির পরিধিটা গোলার পরিধির প্রায় সমান হইলে ঐরূপ হয়। গোলাটাকে গরম করিলে আর আংটির ভিতর যায় না।

একটা কাঁচের বোতল,—তাহার গলাটা খুব লম্বা আর খুব সরু; গলার কিছুদূর পর্য্যন্ত জলে পূর্ণ করিয়া উহাকে যদি গরম করা যায়, তাহা হইলে ঐ জল গলায় উঠিতে থাকে। উত্তাপবৃদ্ধিতে বোতলের আয়তনটা একটু বাড়ে। জলের আয়তন তার চেয়ে অধিক বাড়ে। কাজেই, গলা বাহিয়া জল উঠে। উষ্ণতা যত বাড়ে, জল তত উঠে। জল কতটা উঠিল দেখিয়া উষ্ণতাবৃদ্ধির একটা মোটা হিসাব চলিতে পারে।

ঘর্ম্মমান

এইরূপ খুব ছোট একটা কাঁচের বোতল—অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ অথবা আরও ছোট কাঁচের শিশি—তাহার গলাটা আবার খুব লম্বা ও খুব সরু—চুলের মত সরু—তাহাকে পারায় পূর্ণ করিয়া, উষ্ণতা মাপিবার যন্ত্র তৈয়ার হয়। এই যন্ত্রের ইংরাজি নাম থার্ম্মোমিটার। ডাক্তারেরা ইহা জ্বর-রোগীর বগলে দিয়া দেহের উষ্ণতা দেখেন। কুক্ষণে বাঙ্গলায় ইহার নাম দেওয়া হইয়াছে তাপমান; কেননা, এই যন্ত্রে তাপ মাপা হয়

না। যাহা মাপ হয় তাহা উষ্ণতা। তাপ মাপিবার স্বতন্ত্র যন্ত্র আছে।

কাজেই, তাপমান নামটি অতি সুন্দর হইলেও উহার মায়া কাটাইতে হইবে। আমি পূর্ব্বে উষ্ণতামান নামের প্রস্তাব করিয়াছিলাম, উহাও বড় লম্বা হয়। থার্ম্মোমিটার নামই একরকম চলিয়াছে, কিন্তু সাধারণের পক্ষে উহা দুরুচ্চার্য্য। ঘর্ম্মমান বলিলে—চলিত ভাষায় গরমিমান বলিলে কেমন হয়?

ঘর্ম্মমানের সরু গলায় দুইটা অঙ্ক থাকে। বরফ-জলে ডুবাইলে পারা গলার যে স্থানে দাঁড়ায় সে স্থানে একটা চিহ্ন দেওয়া হয়, উহার শূন্য অঙ্ক। আর ফুটন্ত জল হইতে যে বাষ্প বাহির হয়, সেই বাষ্পে ধরিলে পারা যেখানে দাঁড়ায় সেখানে আর একটা অঙ্ক দেওয়া হয় ১০০।

এই দুই অঙ্কের মাঝে গলাটা ১০০ সমান ভাগে ভাগ করা হয়। এক এক ভাগের নাম দেওয়া হয় এক এক ডিগ্রি।

উত্তাপবৃদ্ধির সহিত পারা এক এক ডিগ্রি উঠে। ডিগ্রি শব্দটি ইংরাজি হইতে পাওয়া গিয়াছে। উহা বাঙ্গলা ভাষার ধাতের সঙ্গে বেশ মিশিয়াছে।

পারার বদলে তেল পূরিয়াও ঘর্ম্মমান তৈয়ার হইতে পারে। বরফ জলের অঙ্ক ০, আর ফুটন্ত জলের অঙ্ক ১০০; এই দুই স্থানে দ্বিবিধ ঘর্ম্মমানে মিল থাকিবে। কিন্তু পারার ঘর্ম্মমান অনুসারে যে জলের উষ্ণতা ২০ ডিগ্রি দেখায়, তেলের ঘর্ম্মমান অনুসারে সে জল ঠিক ২০ ডিগ্রি দেখাইবে না। কেননা, পারার ঘর্ম্মমানে ডিগ্রি চিহ্ন দিবার সময় আমি এই ০ অঙ্ক ও ১০০ অঙ্ক উভয়ের মাঝে গলাটাকে ১০০ সমান ভাগে ভাগ করিয়াছি; সে ভাগ আমার ইচ্ছাধীন। কিন্তু তেল আমার অধীন নহে। পারা আমার অঙ্কিত ২০ দাগে উঠিয়াছে বলিয়া

তেলও যে ঠিক সেই দাগে উঠিবে, প্রকৃতির বিধান এমন নহে। উভয়ের প্রসারণ নিয়ম বিভিন্ন। কাজেই, পারার ঘর্ম্মমানের ডিগ্রির সহিত তেলের ঘর্ম্মমানের ডিগ্রির মিল হয় না।

এখন দ্রব্য ভেদে যদি ডিগ্রির অঙ্ক ভেদ হয়, তবে কোন্ দ্রব্য ব্যবহার করিব? পারাই হউক, আর তেলই হউক, একটাকে মানিয়া লইয়া সর্ব্বত্র তাহার সাহায্যে উষ্ণতা মাপিলে ঠকিতে হইবে না কিন্তু পারার ঘর্ম্মমানের ৫০ ডিগ্রির উষ্ণতা, তেলের ঘর্ম্মমানের ৫০ ডিগ্রির সমান, কি কম, কি বেশী, তাহা বলা চলিবে না। ঘর্ম্মমান নির্ম্মাণের সময় সকলে মিলিয়া পরামর্শ করিয়া এক জিনিসেরই ব্যবহার করিতে হইবে, উহা পারাই হউক, আর তেলই হউক, আর অন্য কোন পদার্থই হউক।

পারায় নানা সুবিধা আছে। থাকিলেও উহার প্রধান অসুবিধা এই যে, কিছু ঠাণ্ডা হইলেই পারা জমিয়া কঠিন হয়, আর কিছু গরম হইলে অনিল হয়। তখন আর পারা দ্বারা ঘর্ম্মমানের কাজ চলে না।

কাজেই, মোটা কাজ পারার ঘর্ম্মমানে চলিতে পারে, কিন্তু সূক্ষ্ম কাজ চলে না; খুব ঠাণ্ডা বা খুব গরমের মাপেও চলে না। তখন এমন কোন জিনিসে ঘর্ম্মমান তৈয়ার করিতে হয়, যাহা ঠাণ্ডায় অথবা গরমে বিকৃত হয় না।

বায়ু অনিল পদার্থ; বায়ু ঠাণ্ডায় সহজে জমে না; আর গরমেও অনিলই থাকে। তাই পারার পরিবর্ত্তে বোতলে বায়ু পুরিয়া বায়ুর ঘর্ম্মমান তৈয়ার হয়। বায়ুকে আটকাইয়া রাখিতে অন্য জিনিষের চাপ দিতে হয় এবং সেই চাপটা আবার কোনক্রমে সমান রাখিতে হয়। পূর্ব্বে বলিয়াছি, চাপ বাড়িলে বায়ুর আয়তন কমে; চাপ কমিলে আয়তন বাড়ে; উষ্ণতা-বৃদ্ধিতে বায়ুর আয়তন বাড়ে। বায়ুর

আয়তনের বৃদ্ধি দেখিয়া যেখানে উষ্ণতা কত বাড়িল বুঝিতে হইবে সেখানে চাপ সমান রাখা চাই, নতুবা চাপেও যদি পরিবর্ত্তন হয়, তাহা হইলে আয়তনের বৃদ্ধি কি কারণে হইল, তাহা ধরা কঠিন হয়।

বায়ুর আর একটা সুবিধা আছে। বায়ু অনিল পদার্থ; আর যাবতীয় অনিল পদার্থের প্রসারণের হার সমান।

বরফ-জলে যে বায়ুটার আয়তন ২৭৩ ঘন ইঞ্চি, ফুটন্ত জলে সেই বায়ুর আয়তন ৩৭৩ ঘন ইঞ্চি। বরফ জলের অঙ্কে ০ ও ফুটন্ত জলের অঙ্কে ১০০ চিহ্ন দিয়া মাঝের স্থানটা ১০০ ভাগে ভাগ করিলে বায়ুর ঘর্ম্মমানের অঙ্কপাত হইবে। এই ঘর্ম্মমানে বায়ু এক এক দাগে উঠিলে উষ্ণতা এক এক ডিগ্রি বাড়িল এইরূপ ধরা যাইবে।

সকল অনিলের প্রসারণমাত্রা সমান। তাহার ফল এই যে, বায়ুর ঘর্ম্মমানে যে উষ্ণতা ১০ ডিগ্রি, হাইড্রোজনের ঘর্ম্মমানেও তাহা ১০ ডিগ্রি। তরলে তরলে, তেলে জলে পারায়, যে অমিল ছিল, অনিলে অনিলে সে অমিল থাকে না।

বৈজ্ঞানিকদের সূক্ষ্ম পরিমাণকর্ম্মে বায়ুর ঘর্ম্মমানই ব্যবহৃত হয়। কিন্তু উহা ব্যবহারে নানা অসুবিধা। যেখানে পারার ঘর্ম্মমান ব্যবহার করিতে হয়, সেখানে পারার ঘর্ম্মমানের কোন্ ডিগ্রি বায়ু-ঘর্ম্মমানের কোন্ ডিগ্রির সমতুল্য, তাহা পূর্ব্বে মিলাইয়া রাখিলে আর সে অসুবিধা থাকে না।

বৈজ্ঞানিকেরা পরিমাণ-কর্ম্মে কত ভাবিয়া চিন্তিয়া হিসাব করিয়া চলেন, তাহারই দৃষ্টান্ত স্বরূপ উষ্ণতাপরিমাণের সম্বন্ধে এত কথা বলিলাম; নতুবা পাঠককে বিরক্ত করিতাম না।

তাপমান

এই পর্য্যন্ত গেল উষ্ণতা মাপিবার কথা। তার পরে বুঝিতে হইবে উত্তাপ মাপিবার কথা। উষ্ণতা কি, তাহা মোটামুটি বুঝা হইয়াছে, কিন্তু উত্তাপটা কি তাহা এখনও বুঝান হয় নাই, বুঝান না হউক তাহাতে পরিমাণ কর্ম্ম আট্‌কাইবে না। বিজ্ঞানবিদ্যার এই একটা রহস্য যে, যে পদার্থটা মাপিতে চাহিতেছি, তাহা কি পদার্থ তাহা ঠিক না জানিয়াও তাহার মাপ চলে, তাহাকে কাজে লাগানো চলে, তাহাকে আমাদের হিতকল্পে নিয়োগ করা চলে। তাড়িত নামক অদ্ভুত পদার্থটা যে কি তাহা আজও ঠিক হয় নাই, অথচ উহার ব্যবহার এত সূক্ষ্ম ভাবে জানা গিয়াছে যে, উহার মত আজ্ঞাকারী সেবক আর কেহ নাই।

উত্তাপের স্বরূপ কি তাহা না জানিয়াও আমরা উত্তাপের পরিমাণ করিতে পারি। উত্তাপের ফল উষ্ণতা বৃদ্ধি। কোন জিনিসে উত্তাপ প্রবেশ করিলে তাহার উষ্ণতা বাড়ে, আর উত্তাপ যে জিনিস হইতে বাহির হইয়া আসে তাহার উষ্ণতা কমে। মনে কর, একসের তেলে খানিকটা উত্তাপ প্রবেশ করায় উহার উষ্ণতা ১০ ডিগ্রি বাড়িল। আর এক সের তেলে ঠিক ততটা উত্তাপ দিলে ঠিক ততটা উষ্ণতা বাড়িবে। অর্থাৎ দশ ডিগ্রি গরম করিতে এক সের তেলে যতটা উত্তাপ লাগিবে, দুই সেরে তাহার দ্বিগুণ লাগিবে, তিন সেরে তার তিন গুণ লাগিবে। কাজেই, এক সের তেলকে দশ ডিগ্রি গরম করিতে যে উত্তাপ লাগে, তাহাকে তাপের একমাত্রা ধরিলে দুই সেরকে দশ ডিগ্রি গরম করিতে দুই মাত্রা, তিন সেরকে দশ ডিগ্রি গরম করিতে তিন মাত্রা, এইরূপে উত্তাপের মাত্রা নিরূপণ চলিবে।

এখন জিজ্ঞাস্য, এক সের পারাকে ০ হইতে ১০ ডিগ্রি তুলিতে যে তাপ লাগে, ১০ হইতে ২০ ডিগ্রি তুলিতে সেই তাপ লাগিবে কিনা? উষ্ণতার বৃদ্ধি সমান হইল; তাপের বৃদ্ধি সমান হইবে কি না? উত্তর—হইতে পারে, না হইতেও পারে। এখানে পারার ঘর্ম্মমান ব্যবহার করিতেছি। পারার ঘর্ম্মমানে প্রসারণ দেখিয়াই উষ্ণতার পরিমাণ হয়। ঘর্ম্মমানের গলায় আঁক কাটিয়া গলাটাকে ১০০ সমান ভাগে ভাগ করিয়া লইয়াছি। কাজেই, ০ অঙ্ক হইতে ১০ অঙ্ক পর্য্যন্ত যে প্রসারণ, ১০ অঙ্ক হইতে ২০ অঙ্ক পর্য্যন্ত ঠিক সেই প্রসারণ। আর প্রসারণ যেখানে সমান, উষ্ণতাও সেখানে সমান পরিমাণে বাড়িয়াছে। কিন্তু যতটা তাপে পারা ০ অঙ্ক ছাড়িয়া ১০ অঙ্কে উঠিয়াছে, ঠিক সেই তাপেই যে ১০ অঙ্ক ছাড়িয়া ২০ অঙ্ক পর্য্যন্ত উঠিবে, তাহার কোন হেতু নাই।

এক সের জলকে ০ হইতে ১ ডিগ্রি পর্য্যন্ত তুলিতে যে উত্তাপ লাগে তাহাকেই উত্তাপের এক মাত্রা বলিয়া ধরা হয়। এক সের বরফ-জল লও; উহার উষ্ণতা ০ ডিগ্রি। এক সের তামা লও; মনে কর, উহা ফুটন্ত জলের মত উষ্ণ অর্থাৎ উহার উষ্ণতা ১০০ ডিগ্রি। তপ্ত তামাকে ঐ ঠাণ্ডা জলে ফেলিয়া দাও, দেখিবে, কিছুক্ষণ পরে দুইয়েরই উষ্ণতা সমান হইয়াছে; জল একটু গরম হইয়াছে, তামা একটু ঠাণ্ডা হইয়াছে। খানিকটা উত্তাপ তামা হইতে বাহির হইয়া জলে প্রবেশ করায় তামা ঠাণ্ডা হইয়াছে।

জল গরম হইয়াছে এবং পরিশেষে জল ও তামা উভয়ের উষ্ণতা সমান দাঁড়াইয়াছে। এরূপ স্থলে পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে, জলের উষ্ণতা বাড়ে যৎসামান্য—তামার উষ্ণতা কমে তার চেয়ে অনেক বেশী।

অর্থাৎ যে তাপ বাহির হওয়ায় তামার উষ্ণতা ১০০ ডিগ্রি হইতে ০ ডিগ্রিতে নামিয়া পড়িল, সেই তাপে এক সের জলের উষ্ণতা ততটা বাড়িল না। তার চেয়ে অল্প বাড়িল। ইহাতে কি বুঝায়? একই তাপে ভিন্ন ভিন্ন জিনিসে ভিন্ন ভিন্ন উষ্ণতা বাড়ায়। যে তাপে জল অতি সামান্ত গরম করে, সেই তাপে তামা, লোহা, সোনা, রূপা প্রভৃতিকে তার চেয়ে অনেক বেশী গরম করে। কোন্ জিনিসকে কত গরম করে তাহা বিনা পরীক্ষায় জানিবার উপায় নাই।

ফলে, পদার্থবিদ্যার ভাষায় উত্তাপ আর উষ্ণতা যে একই পদার্থ নহে তা বুঝা গেল। উষ্ণতা তাপের একটা লক্ষণ মাত্র, উহা তাপ নহে। তাপপ্রবেশে উষ্ণতা বাড়ে কিন্তু দ্রব্য-ভেদে কম বেশী বাড়ে। রূপা, সোনা অল্প তাপেই অধিক উষ্ণ হয়; তাহার তুলনায় জলে অধিক তাপ না দিলে তেমন উষ্ণ হয় না।

কাজেই, উষ্ণতা মাপিবার রীতি ও তাপ মাপিবার রীতি স্বতন্ত্র। তাপের সহিত উষ্ণতার সম্পর্ক আছে; কিন্তু তাপ আর উষ্ণতা এক নহে। কাজেই, বিজ্ঞান-শাস্ত্রে যাহাকে তাপ বলে, কেবল স্পর্শক্রিয়ার সাহায্যে তাহাকে জানিবার উপায় থাকে না। স্পর্শক্রিয়া উষ্ণতার বৃদ্ধি ধরিতে পারে, তাহাও সকল সময়ে ঠিক ধরে না; কিন্তু তাপ অধিক লাগিল কি অল্প লাগিল, তাহা স্পর্শক্রিয়া বলিতে পারে না।

কোন্ দ্রব্যে কত তাপ আছে তাহা বলিবার উপায় নাই। যতই শীতল হউক না, বরফের চেয়েও শীতল হউক না, তাহাতেও কিছু না কিছু তাপ আছে। তাপহীন অবস্থায় কোন দ্রব্যকেই এখনও লইয়া যাইতে পারা যায় নাই। কাজেই, কিসে কত তাপ বিদ্যমান, তাহা পরিমাণের উপায় অদ্যাপি বাহির হয় নাই। তবে কোন দ্রব্যে

যদি তাপ প্রবেশ করে বা তাহা হইতে খানিকটা তাপ বাহির হইয়া যায়, তখন এই তাপের বৃদ্ধি বা হ্রাস পরিমাণ করা চলিতে পারে।

তাপের ধর্ম্ম

তাপ আর উষ্ণতা এক নহে তাহা দেখা গেল। তাপ এমন একটা কিছু—যাহার ফলে উষ্ণতা বাড়ে। আর উষ্ণতাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কঠিন, তরল, অনিল, যাবতীয় পদার্থেরই প্রসার ঘটে। এই নিয়মটার দুই এক স্থলে ব্যভিচার আছে। একটা ব্যভিচারের দৃষ্টান্ত, জল। বরফের মত ঠাণ্ডা জল গরম হইলে প্রসারিত না হইয়া বরং একটু সঙ্কুচিত হয়। ০ ডিগ্রি হইতে ৪ ডিগ্রি পর্য্যন্ত উঠিতে একটু সঙ্কুচিত হয়। তাহার পরে আবার ক্রমশঃ প্রসারিত হইতে থাকে ; কাজেই, জল সাধারণ নিয়মের বাহিরে।

তাপের আর একটা ফল দশান্তর-প্রাপ্তি। কঠিন পদার্থ তাপ পাইয়া তরল হয়, আর তরল পদার্থ তাপ পাইয়া অনিল হয়। বরফ তাপ পাইয়া জল হয়, আর জল তাপ পাইয়া বাষ্প হয়। এইরূপ অন্যান্য জিনিসের পক্ষেও। যে কোন অনিলকে ঠাণ্ডা করিলে তরল হয়, আর তরলকে ঠাণ্ডা করিলে কঠিন হয়। ইহার সর্ব্বজন-বিদিত দৃষ্টান্ত এত আছে যে, তাহার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

কঠিন দ্রব্য তরল হইবার সময় খানিকটা তাপ লুপ্ত হয়। এক সের বরফকে জল করিতে হইলে অনেকটা তাপের দরকার হয় ; যে তাপে অন্ততঃ দুই মণ জল এক ডিগ্রি গরম হইত, ততটা তাপে এক সেরমাত্র বরফ জল হয়, অথচ সেই জলের উষ্ণতা বরফের উষ্ণতার সমানই থাকে। তাপপ্রবেশের স্পষ্ট ও মুখ্য ফল যে উষ্ণতাবৃদ্ধি

তাহা এখানে দেখা যায় না। তাপটা যেন কোথায় লুকাইয়া যায়; উহা উষ্ণতা না বাড়াইয়া কঠিন বরফকে তরল জলে পরিণত করে মাত্র। এ ক্ষেত্রে তাপটা বস্তুতই লুপ্ত হয়।

বরফটা একবার জল হইলে পর, তার পর যত তাপ দাও, ততই ক্রমশঃ তাহার উষ্ণতা বাড়িতে থাকে। ১০০ ডিগ্রিতে পৌঁছিবামাত্র জল ফুটিতে থাকে। প্রথমে ছোট ছোট, পরে বড় বড় বাষ্পের বুদ্বুদ-গুলি জল ভেদ করিয়া উঠে ও উপরিস্থ বায়ুসাগরে মিলাইয়া অদৃশ্য হইয়া যায়। ক্রমে সমস্ত জলটা বাষ্পে পরিণত হইয়া বায়ুতে মিলিয়া অদৃশ্য হইয়া যায়। তরল জল অনিলে পরিণত হয়। অনিল হইবার সমকালেও খানিকটা তাপ লুপ্ত হয়; সেও অল্প নহে। এক সের জলকে বাষ্প করিতে যে তাপ লাগে, তাহাতে ১৩৷৷০ মণ জল এক ডিগ্রি গরম হইতে পারিত; বাষ্পীভবনে এতটা তাপ লাগে, অথচ উষ্ণতা বাড়ে না; ঘর্ম্মমানে দেখা যায়, ফুটন্ত জলেরও যে উষ্ণতা তদুদ্ভূত বাষ্পের সেই উষ্ণতা। এখানেও খানিকটা তাপের বস্তুতই লোপাপত্তি ঘটে। তার পর সেই বাষ্পে আরও তাপ দিলে তখন উহার উষ্ণতা ক্রমে বাড়িয়া যায়।

১০০ ডিগ্রি উষ্ণতায় জল ফুটিতে থাকে। কিন্তু এইখানে একটু গোল আছে। উপরে বাতাসের চাপের সহিত এই জলের ফোটার একটু সম্পর্ক আছে। বাতাসের চাপ বাড়াইলে জল ১০০ ডিগ্রিতে ফুটে না, ১০০ ডিগ্রি ছাড়াইয়া একটু উঠিয়া তবে ফুটিতে আরম্ভ করে। চাপ কমাইলে ১০০ ডিগ্রিতে উঠিবার আগেই ফুটিতে আরম্ভ করে।

উঁচু পাহাড়ের উপর বাতাসের চাপ অল্প। সেখানে জল ১০০ ডিগ্রি পর্য্যন্ত গরম হয় না, তাহার চেয়ে একটু অল্প গরমিতেই জল ফুটিতে থাকে।

জলের হাঁড়ির মুখ বন্ধ করিয়া, জল গরম করিলে, হাঁড়ির ভিতরে যে বায়ু ছিল, তাহাতে আরও খানিকটা বাষ্প মিলিয়া যায়, তজ্জন্য চাপ বাড়িয়া যায়; তখন জল ১০০ ডিগ্রি ছাড়াইয়া উঠে; জলকে ফুটিতে দেয় না। গরম জলে খাদ্য দ্রব্য সিদ্ধ হয়; জল যত গরম, সিদ্ধ করিতে তত অল্প সময় লাগে। হাঁড়ির মুখ বন্ধ রাখিলে রন্ধন কর্ম্মে এই জন্য সুবিধা হয়।

বাষ্প

জল ফুটিবার সময় বাষ্প হয়। ফুটিবার সময় বড় বড় বাষ্পের বুদ্বুদ্ টগবগ শব্দ করিয়া জল ঠেলিয়া উঠিতে থাকে। কিন্তু জল যে কেবল ফুটিবার সময়েই বাষ্প হয়, এমন নহে। জল সকল সময়েই বাষ্প হইয়া যায়। খুব ঠাণ্ডা জলের পিঠ হইতেও নিঃশব্দে বাষ্প উঠিয়া থাকে। নিঃশব্দে উঠিতেছে বলিয়া আমরা তাহার খোঁজ রাখি না। ফুটিবার সময় শব্দ করিয়া, জলকে তোলপাড় করিয়া বাষ্প উদ্গত হয়, তাহাই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। পুষ্করিণীর জল সারা বৎসর নিঃশব্দে শুকাইতেছে। ভিজা কাপড় ক্রমে ক্রমে শুকাইয়া যায়। ইহাতেই বুঝা উচিত যে, জল যেমন উষ্ণই হউক না কেন, সর্ব্বদাই উহা বাষ্প হইতেছে। সেই বাষ্প বায়ুসাগরে মিলিতেছে।

জলোদ্গত এই বাষ্পের চাপের একটা অবধি আছে; বাষ্প সেই অবধির অধিক চাপ দিতে পারে না। উষ্ণতা ভেদে এই অবধিরই আবার ভিন্ন ভিন্ন ভেদ হয়। গরম জলেও বাষ্প উঠে, ঠাণ্ডা জলেও বাষ্প উঠে। গরম জলের বাষ্প গরম, ঠাণ্ডা জলের বাষ্প ঠাণ্ডা। গরম বাষ্পের চাপ যে পর্য্যন্ত উঠিতে পারে, ঠাণ্ডা বাষ্পের চাপ সে পর্য্যন্ত উঠিতে পারে না।

কোন পাত্রের ভিতরে যথেচ্ছ পরিমাণে বাষ্প প্রবেশ করান যাইতে পারে না, যত ইচ্ছা তত বাষ্প উহার মধ্যে ধরান যায় না। বাষ্পের চাপের যে সীমা বা অবধি আছে সেই অবধিতে পৌঁছিবামাত্র, আর বাষ্প সে স্থানে ধরিবে না। তখন জল দাও জলই থাকিবে, বাষ্প দাও সে বাষ্পও জল হইয়া যাইবে।

পৃথিবীর এই বায়ু-সাগরে জলের বাষ্প সকল সময়েই কিছু না কিছু বিদ্যমান আছে। নদী, খাল, বিল, পুষ্করিণীর জলের পিঠ হইতে বাষ্প ত উঠিতেছেই; তা ভিন্ন বিশাল মহাসাগরের পিঠ হইতে অবিশ্রাম বাষ্প উঠিয়া বায়ু প্রবাহ কর্ত্তৃক সর্ব্বত্র নীয়মান হইতেছে। আমাদের বাঙ্গলা দেশের দক্ষিণেই মহাসাগর, সেই মহাসাগর হইতে বাষ্প উঠিয়া বাঙ্গলার বায়ুকে সর্ব্বদাই বাষ্পসিক্ত করিয়া রাখিয়াছে। বাঙ্গলার উত্তরে উচ্চ হিমালয়ের প্রাচীর। সেই প্রাচীর লঙ্ঘন করিয়া বাষ্প যাইতে পারে না। এই জন্য হিমালয়ের উত্তরে তিব্বত দেশে ও মধ্য এসিয়াতে বায়ু তেমন বাষ্পসিক্ত নহে।

বাঙ্গলার বায়ু সর্ব্বদাই বাষ্পসিক্ত অর্থাৎ অদৃশ্য বাষ্পে পূর্ণ। বর্ষাকালে সূর্য্যের উত্তাপে প্রচুর বাষ্পের রাশি দক্ষিণা হাওয়ায় মহাসাগর হইতে এত প্রচুর পরিমাণে চলিয়া আসে যে, উহার চাপ অবধি ছাড়াইয়া উঠিতে চায়। কিন্তু বাষ্প যতই থাকুক, উহার চাপ নির্দ্দিষ্ট অবধি ছাড়াইতে পারে না। তখন সেই অতিরিক্ত বাষ্প ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জল-কণিকা হইয়া বায়ুতে ভাসিতে থাকে। ঐ জল-কণিকার সমবায়ে মেঘ। জল-কণিকা জমাট বাঁধিয়া বৃষ্টি নামে। প্রচুর বৃষ্টি নামে। তাই বঙ্গভূমি সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা।

গরম বাষ্পের চাপের যে অবধি, ঠাণ্ডা বাষ্পের অবধি তার চেয়ে অল্প। ইহার ফলে এই ঘটে যে, গরম বাষ্প কোন কারণে হঠাৎ

শীতল হইলে আর পূর্ব্বের মত চাপ দিবার ক্ষমতা রাখে না, তখন খানিকটা বাষ্প তরল হইয়া জলে পরিণত হয়। শিশির উৎপত্তির এই কারণ। রাত্রিকালে ভূপৃষ্ঠ শীতল হয়, তাহার সংযোগে বাষ্পও শীতল হয়, যে বাষ্প ছিল, তাহার চাপও অধিক ছিল; ঠাণ্ডা হওয়ায় সে চাপ সম্ভবে না। খানিকটা বাষ্প জলবিন্দুর আকারে ভূপৃষ্ঠে লগ্ন হয়।

কুয়াসা উৎপত্তিরও সেই কারণ। বায়ু কোন কারণে শীতল হইলে সেই বায়ুতে স্থিত বাষ্পও শীতল হয় ও তাহার অতিরিক্ত হইলে অংশটা ক্ষুদ্র জলবিন্দুতে পরিণত হয় ও বায়ু-মধ্যে ভাসিতে থাকে।

বাষ্প জমিয়া জলবিন্দুতে পরিণত হয় বটে কিন্তু একটা অবলম্বনের অপেক্ষা করে। বায়ুতে শত সহস্র ধূলিকণা সর্ব্বদা বিদ্যমান আছে। এক একটা ধূলিকণাকে আশ্রয় করিয়া এক একটা জলবিন্দু প্রস্তুত হয়। যত ধূলিকণা, তত জলবিন্দু। ধূলিকণাগুলি অতি ক্ষুদ্র ও প্রায় অদৃশ্য। জলবিন্দুগুলি গণিয়া কতটা বায়ুতে কত ধূলিকণা আছে তাহা গণিবার একটা উপায় হইয়াছে।

বাষ্প ও অনিল

এ পর্য্যন্ত আমরা জলীয় বাষ্পকে এক রকম অনিল বলিয়াই ধরিয়া লইয়াছি। কিন্তু এখন দেখা যাইতেছে, উহার একটু বিশিষ্টতা আছে। অনিলের আয়তন যত কমান যায়, চাপ তত বাড়ে। আয়তন অর্দ্ধেক করিলে চাপ দুই গুণ, আয়তন দশমাংশ করিলে চাপ দশ গুণ হয়। এইরূপ আয়তন যতই কমাইবে, চাপ ততই বাড়িবে। কিন্তু বাষ্পের চাপের সম্বন্ধে এই কথা খাটে না। বাষ্পকে চাপিলে উহার

আয়তন কমে। আবার বাষ্প যে পাত্রে আছে, বাষ্পের সেই পাত্রের আয়তন কমাইলে উহার চাপ বাড়ে, কিন্তু এই চাপ বৃদ্ধির একটা অবধি আছে। সেই অবধিতে পৌঁছিলে আর চাপ বাড়িতে চায় না, তখন চাপ বাড়ে না, খানিকটা বাষ্প জলে পরিণত হয়। আরও আয়তন কমাও, আরও বাষ্প জল হইয়া যাইবে। এই রূপে সমস্ত বাষ্পটাই ক্রমে জলে পরিণত হয়। কিন্তু চাপ সেই অবধি ছাড়াইয়া উঠিতেই পারে না।

কাজেই, বায়ুর মত পদার্থের সহিত বাষ্পের মত পদার্থের ঠিক মিল নাই, উভয়কে এক শ্রেণীতে ফেলা উচিত হয় না।

কয়লা পোড়াইয়া যে অনিল হয় উহার সম্বন্ধে আমরা নানা কথা কহিয়াছি। এই অনিলটার উষ্ণতা যতক্ষণ ৩১ ডিগ্রির অধিক থাকে, ততক্ষণ উহার আচরণ বায়ুর মত, অর্থাৎ উহার আয়তন যত কমাইবে চাপ ততই বাড়িবে। কিন্তু উহার উষ্ণতা ৩১ ডিগ্রির নীচে নামিলে উহার আচরণে বাষ্পের মত হয়। তখন আয়তন কমাইলে চাপ বাড়ে বটে, কিন্তু কিছু দূর বাড়িয়া আর বাড়ে না। তখন উহার কিয়দংশ তরল পদার্থে পরিণত হয়। ৩১ ডিগ্রির উপরে উহার এক রকম দশা; তখন উহার চাপ যতই বাড়ুক, কিছুতেই তারল্য ঘটিবে না। ৩১ ডিগ্রির নীচে উহার অন্য দশা—তখন চাপ বাড়াইলে তরল হইবে। এই দুই দশার মধ্যে যখন পার্থক্য আছে, তখন দুই অবস্থার দুই রকম নাম দেওয়া ভাল। প্রথম অবস্থাকেই অনিলাবস্থা বলা উচিত। আর দ্বিতীয় অবস্থাকে অনিলাবস্থা না বলিয়া বাষ্পাবস্থা বলা উচিত। যেটা প্রকৃত অনিল, তাহার চাপ যত ইচ্ছা বাড়ান চলিবে, কিন্তু তরলতাপাদন চলিবে না, যাহা বাষ্প তাহার চাপবৃদ্ধি দ্বারা তরলতাপাদন চলিবে। কয়লার অনিল যতক্ষণ

৩১ ডিগ্রির উপর থাকে, ততক্ষণ উহা অনিল, ৩১ ডিগ্রির নীচে আসিলেই উহা বাষ্প।

*　　*　　*　　*　　*

সম্প্রতি হাইড্রোজন অক্সিজন প্রভৃতি অনিলকে খুব শীতল করিবার উপায় বাহির হইয়াছে। কিছু দিন পূর্ব্বে সেরূপ শৈত্যের উৎপাদন অসাধ্য ছিল। এখন হাইড্রোজন অক্সিজন বায়ু প্রভৃতি সকল জিনিসকে প্রথমে খুব ঠাণ্ডা করিয়া বাষ্পে পরিণত করা হয়; তার পরে কিছু চাপ দিলেই তরল হাইড্রোজন, তরল অক্সিজন, তরল বায়ু পাওয়া যায়। এইরূপ তরল বায়ু আজিকালি সের-দরুণে প্রস্তুত হইতেছে।

এ পর্য্যন্ত আমরা জড়পদার্থের তিন অবস্থার কথাই বলিয়াছি, এখন হইতে চারি অবস্থা বলা উচিত। কঠিন, তরল, বাষ্পীয় ও অনিল। বাষ্প আর অনিলের মধ্যে ভেদ কেবল উষ্ণতা সাক্ষেপ। একটা নির্দ্দিষ্ট উষ্ণতা আছে—তাহার নীচে থাকিলেই উহা বাষ্প, তখন চাপ দ্বারা উহার তরলতা-সম্পাদন সাধ্য থাকে, আর সেই উষ্ণতার উপরে গেলেই চাপ দ্বারা তরলতাপাদন অসাধ্য হয়। তখনই উহাকে প্রকৃত অনিল বলা যায়। অনিলকে যদি তরল করিতে চাও, আগে ঠাণ্ডা করিয়া উহাকে বাষ্পে পরিণত করিতে হইবে, পরে চাপ দিলে সেই বাষ্প তরল হইবে।

মানুষের দশ দশার কথা শোনা যায়। জলের দশ দশা না হউক, অন্ততঃ চারি দশা হইতে পারে দেখিতে পাইতেছি। তাপ যোগে জলের এই দশা-বিপর্য্যয় ঘটে।

জলের অবস্থা বিকার

তাপযোগে জলের দশা-বিপর্য্যয়টা এখন আর একবার ভাল করিয়া আলোচনা করা যাইতেছে। তাহা হইলে যাহা অস্পষ্ট আছে তাহা স্পষ্ট হইবে।

১। যতক্ষণ উষ্ণতা ০ ডিগ্রির নীচে থাকে, ততক্ষণ জল কঠিন দশায় থাকে। তাপ দিলে উহা ক্রমে উষ্ণ হইয়া যখন ০ ডিগ্রিতে পৌঁছায় তখন উহা গলিয়া জল হইতে আরম্ভ করে।

২। বরফ একবার গলিতে আরম্ভ করিলে আর উষ্ণতা বাড়ে না। যত তাপ দাও সে তাপটা যেন লুপ্ত হইয়া যায়, আর বরফ গলিতে থাকে। এই তাপের পরিমাণ এত অধিক যে, এক সের বরফকে গলাইতে যে তাপের প্রয়োজন হয় তাহাতে ২/০ মণ জল ১ ডিগ্রি গরম করা চলিত। বরফ গলিলে উহার আয়তন কমে, ১২ ঘন ফুট বরফ হইতে ১১ ঘন ফুট জল হয়। বরফ জল চেয়ে হাল্‌কা, কাজেই, উহা জলে ভাসে।

ঐ জলের উষ্ণতা ঠিক বরফের উষ্ণতার সমান অর্থাৎ ০ ডিগ্রি। তার পরে তাপ দিলে ক্রমে উষ্ণতা বাড়ে আর জলের পিঠ হইতে ক্রমাগত বাষ্পোদ্গম হইতে থাকে। ০ হইতে ৪ ডিগ্রি পর্য্যন্ত জলের আয়তন কিঞ্চিৎ কমে, তার পর বাড়িতে আরম্ভ হয়।

৪। ১০০ ডিগ্রি গরম হইলে তখন বড় বড় বাষ্পের বুদ্বুদ জলকে তোলপাড় করিয়া জল ঠেলিয়া বাহির হইতে থাকে ও অচিরে সমস্ত জল বাষ্প হইয়া যায়। এই ব্যাপারের নাম জলফোটা। জল ফুটিতে আরম্ভ হইলে উহার উষ্ণতা আর বাড়ে না। যে তাপটা দেওয়া যায় তাহা বাষ্পীকরণেই লুপ্ত হয়। এক সের জলকে বাষ্প করিতে যে তাপ লাগে, তাহাতে ১৩॥ মণ জল এক ডিগ্রি গরম হইতে

পারিত। এক ঘন ফুট জল হইতে ১৭০০ ঘন ফুট বাষ্প জন্মে। চাপের ইতরবিশেষে জল ফোটায় বিলম্ব ঘটিতে পারে। চাপ অধিক হইলে ১০০ ডিগ্রি ছাড়িয়া উঠিলে তবে জল ফুটিতে থাকে।

বরফ, জল আর জলের বাষ্প তিনটাই জলেরই দশাভেদ। আমরা বলি, তিনই জল, অথচ এই তিন অবস্থায় কত পার্থক্য। এই প্রভেদ সত্ত্বেও আমরা তিনটা জিনিসকে একই জলের অবস্থাভেদ বলিয়া থাকি।

তাপের পরিচালন

তাপের ফলাফল কতক বলা গেল, কিন্তু তাপ পদার্থটা কি তাহা এখনও বুঝান হয় নাই। এখনও তাহার সময় আসে নাই। তাপ যাহাই হউক, উহাকে আটকাইয়া রাখা কঠিন। কোন জিনিস যতই গরম হউক না কেন, উহা ক্রমে ঠাণ্ডা হয়, উহার উষ্ণতা কমে, তাপ বাহির হইয়া যায়। গরম ভাত, গরম ডাল, গরম জল, যদি চিরকাল গরম থাকিত তাহা হইলে ক্ষুৎপিপাসা নিবারণের পক্ষে নানা ব্যাঘাত ঘটিত। তপ্ত লৌহপিণ্ড বা স্বর্ণপিণ্ডও অচিরে শীতল হয়। ভূপৃষ্ঠ দিনের বেলায় গরম, রাত্রে ঠাণ্ডা হয়। তরল, কঠিন, বাষ্প, অনিল—কোন পদার্থেই আমরা তাপ ধরিয়া আটকাইয়া রাখিতে পারি না।

কিরূপেই বা আটকান যাইবে? লৌহখণ্ডের এক প্রান্ত দীপ-শিখায় উত্তপ্ত করিলে সেখানকার তাপ লৌহখণ্ডের ভিতর দিয়া চলিয়া অচিরে অপর প্রান্তকে উষ্ণ করিয়া তোলে। যেন নিরেট লৌহদণ্ডের ভিতরও তাপের অবারিত দ্বার। বরং কাচ, কাঠ, কাগজ, তূলা, রেশম, পশম—এই সকল জিনিসের ভিতর দিয়া তাপ চলিতে বিলম্ব করে; কিন্তু ধাতু-পদার্থের ভিতর দিয়া অক্লেশে চলে।

কোন পদার্থের ভিতর দিয়া তাপের এইরূপ গতিকে পরিচালন বলা যায়। ধাতুদ্রব্য উত্তম পরিচালক, উহা তাপের গতিকে বাধা দেয় না। কাচের পরিচালকতা অল্প। কাচের একদিক গরম হইলেও অপর দিক বহুক্ষণ ঠাণ্ডা থাকিতে পারে।

সম্পূর্ণ অপরিচালক অর্থাৎ তাপকে একবারে আটকাইতে পারে, এমন জিনিস বোধ করি নাই।

বাহিরের তাপ বরফে প্রবেশ করিয়া বরফকে গলাইয়া দেয়। পশমী কম্বল বা কাঠের গুঁড়া দিয়া ঢাকিয়া রাখিলে বাহিরের তাপ তত শীঘ্র চলিতে পারে না; বরফও শীঘ্র গলে না। শীতকালে আমরা পশমী কাপড় বা তুলার লেপ গায়ে দিয়া শরীরের তাপের বহির্গমন কতকটা নিবারণ করি।

তাপ কোথা হইতে কোথায় যায়? উত্তরে বলিব, উষ্ণ স্থান হইতে শীতল স্থানে যায়। একটা গরম জিনিস ও একটা ঠাণ্ডা জিনিস পাশা-পাশি রাখিলে, তাপ গরম জিনিস হইতে বাহির হইয়া ঠাণ্ডা জিনিসেই যায়; কাজেই গরম জিনিসটা একটু ঠাণ্ডা হয়, আর ঠাণ্ডা জিনিসটা একটু গরম হয়। পরিশেষে যখন উভয়েই সমান উষ্ণতা প্রাপ্ত হয় তখন তাপের চলাচলও থামিয়া যায়।

তাপের স্বভাবই এই। জল যেমন উঁচু জায়গা হইতে নীচেই যায়, আপনা হইতে উর্দ্ধমুখে যায় না, তাপও সেইরূপ কখনও আপনা হইতে ঠাণ্ডা জায়গা হইতে গরম জায়গায় যায় না। গরম জায়গা হইতে ঠাণ্ডা জায়গার দিকেই যায়। ইহাই প্রাকৃতিক ব্যবস্থা।

যদি অন্যরূপ ব্যবস্থা হইত তাহা হইলে কি সুখের হইত! জলও যদি আপনা হইতে উর্দ্ধে উঠিবার ক্ষমতা রাখিত তাহা হইলে জল তুলিবার জন্য মজুর লাগাইতে হইত না; বৃষ্টিপাত না হইলেও

জমি সেচিবার জন্য ভাবিতে হইত না। ইচ্ছামাত্রেই বঙ্গসাগরের জলে বঙ্গভূমিকে ডুবাইয়া দেওয়া চলিত। অনাবৃষ্টির ভয় থাকিত না। সেইরূপ তাপের পক্ষেও উল্টা ব্যবস্থা হইলে, একখানা বরফের গায়ে টিকা বসাইয়া সেই টিকা ধরাইয়া তামাক খাওয়া চলিত। বরফের তাপ টিকায় সঞ্চালিত হইয়া টিকায় আগুন ধরাইত। কিন্তু বর্ত্তমান অবস্থায় টিকা ধরাইতে হইলে, উহা ঠাণ্ডা বরফে না ধরিয়া তপ্ত দীপ-শিখাতেই ধরিতে হয়।

এঞ্জিন চালাইতে হইলে কয়লা পোড়াইয়া তাপের উৎপাদন করিতে হয়, এবং সেই তপ্ত কয়লার তাপে জল গরম করা হয়। তপ্ত কয়লার তাপেই লোকে জল গরম করিয়া ভাত রাঁধে, বরফের তাপে জল গরম হয় না।

যাক, তাপ স্বভাবতঃ উষ্ণস্থান হইতে শীতল স্থানে যায়; কোন পদার্থের নিষেধ মানে না। দ্রুতই হউক আর বিলম্বেই হউক, নিরেট কঠিন পদার্থের ভিতর দিয়াও তাপ পরিচালিত হয়। তরল বা অনিলের ভিতর দিয়াও তাপ পরিচালিত না হয় এমন নহে, কিন্তু সে ক্ষেত্রে আবার একটা নূতন উৎপাত ঘটে, তরল দ্রব্যের ভিতর তাপ আসিবামাত্র উহা একটু গরম হয়, গরম হইলেই একটু প্রসারিত হয়, প্রসারিত হইলেই হাল্‌কা হয়, হাল্‌কা হইলেই ঊর্দ্ধে উঠিতে চাহে। একপাত্র জলের নিম্নে তাপ দিলে, নিম্ন স্তরের জল উষ্ণ হয় ও লঘু হয়, লঘু হইয়া ঊর্দ্ধগামী হয় ও উপরের স্তরের শীতল ও গুরু জল স্বস্থানচ্যুত হইয়া নীচে নামিতে বাধ্য হয়; সেও আবার গরম হইয়া উপরে উঠে। এইরূপে জলের মধ্যে একটা জলের প্রবাহ বা স্রোত জন্মে এবং, সেই স্রোতের সঙ্গে সঙ্গে তাপও সমস্ত জলে ব্যাপ্ত হইয়া সমস্ত জলটাকেই অতি শীঘ্র গরম করিয়া তোলে।

তরলপদার্থের যেমন স্রোত জন্মে, অনিলেও তেমনি। গ্রীষ্মকালে তপ্ত ভূপৃষ্ঠের সংলগ্ন বায়ুস্তর গরম হইয়া প্রসারিত হয় ও হাল্‌কা হয়, হাল্‌কা হইয়া উর্দ্ধে উঠে। কেরোসিন দীপের চিমনির উপরে বা দীপশিখার উপরে সূতা ধরিলেই দেখা যাইবে, সেখানে উর্দ্ধমুখে বায়ুর স্রোত উঠিতেছে। ভূপৃষ্ঠের কোন স্থানে এইরূপ তপ্ত ভূমি হইতে উর্দ্ধমুখে বায়ু-প্রবাহ উঠিতে লাগিলে, উহার চতুঃপার্শ্বস্থ শীতল বায়ু উহার স্থান অধিকার করিতে আইসে। এইরূপে বায়ু-প্রবাহ উৎপন্ন হয়। এইরূপ বায়ু-প্রবাহই মন্দবেগে বহিলে হয় হাওয়া, আর প্রবল বেগে বহিলেই হয় ঝড়।

পৃথিবীর নিরক্ষবৃত্তের নিকট প্রদেশটা খুব গরম; সেখানে বায়ু-প্রবাহ উর্দ্ধমুখ তাই উত্তর ও দক্ষিণ হইতে নিরক্ষবৃত্তের অভিমুখে সারা বৎসর বায়ু বহে। এই হাওয়া ধরিয়া মহাসাগরে পাল-তোলা জাহাজের যাতায়াতে সুবিধা ঘটে। গ্রীষ্মকালে আমাদের বাঙ্গলার জমি উত্তপ্ত হওয়ায় দক্ষিণের সমুদ্র হইতে বায়ুর প্রবাহ আসিতে আরম্ভ হয়। সেই বায়ু-প্রবাহ সমুদ্রের বাষ্প বহিয়া আনে; গ্রীষ্মের পরেই বর্ষা উপস্থিত হয়।

আগেই বলিয়াছি, তাপ কঠিনপদার্থের ভিতর দিয়া পরিচালিত হয়, কঠিনপদার্থে কিন্তু স্রোত জন্মিতে পারে না। কিন্তু তরল বা অনিলের ভিতর তাপ যাইবার সময় উহাতে স্রোত জন্মাইয়া যায়। ফলে কঠিন, তরল, অনিল, তাপকে আটকাইবে কি, তাপ উহাদিগের মধ্য দিয়াই চলে। তাপ উহাদিগকে আশ্রয় করিয়াই চলে।

আপাততঃ মনে হইতে পারে, যেখানে কঠিন, তরল, অনিল কোন পদার্থই নাই, যে স্থান একেবারে শূন্য, সেই স্থান দিয়া বুঝি তাপ চলিবে না; কেননা তাপ যে আশ্রয় ধরিয়া চলিবে সেই আশ্রয়

যেখানে নাই, সেখানে তাপ চলিবে কিরূপে? কিন্তু তাহা ত ঠিক নহে। কোন পাত্রের অভ্যন্তর বায়ুশূন্য করিয়া তন্মধ্যে তপ্ত দ্রব্য রাখিলে দেখা যাইবে যে, সেই তপ্ত দ্রব্য হইতে তাপ শূন্যপথেই বাহির হইতেছে। ওরূপ পরীক্ষাতেই বা দরকার কি? এই সূর্য্য আর পৃথিবীর মধ্যে ব্যবধান নয় কোটি মাইলেরও অধিক। এই সমস্ত ব্যবধানটাত একেবারে শূন্য। ভূপৃষ্ঠের উপরে যে বায়ুর আবরণ আছে উহার স্থূলতা ৪০।৫০ মাইলের বড় অধিক নহে। ৫০।৬০ মাইলের পরেও যদি বায়ু থাকে, সে এত বিরল যে থাকা না থাকা সমান। ফলে সূর্য্য ও পৃথিবীর মধ্যে নয় কোটি মাইল পথ শূন্যপথ, সেখানে তাপ চালাইতে পারে এমন কোন পদার্থই নাই। অথচ ঐ সূর্য্যের তাপ ত এই মহাশূন্য অতিক্রম করিয়া পৃথিবীতে আসিতেছে? সেই মহাশূন্য পথে কঠিন, তরল, অনিল, সকল পদার্থেরই অভাব; তবে কি আশ্রয় করিয়া তাপ আসিতেছে? তাপও আসে, আলোকও আসে, তাপ কি তবে আলোকের মূর্ত্তি ধরিয়া আসে? এ প্রশ্নের উত্তরের এখনও সময় আসে নাই। যথাসময়ে উত্তরের চেষ্টা করা যাইবে এখন ধরিয়া রাখা আবশ্যক, তাপকে আট্‌কান যায় না। উহা যে-কোন পদার্থের আশ্রয় ধরিয়া চলিতে পারে; কোন আশ্রয় না পাইলেও কোন না কোন রূপে হয়ত মূর্ত্ত্যন্তর পরিগ্রহ করিয়া চলিয়া আসে।

তাপের স্বরূপ

তাপের স্বরূপ কি আলোচনা না করিয়া আর থাকা যায় না। তাপ উষ্ণতা বাড়ায়; পদার্থের প্রসার বৃদ্ধি করে, অবস্থার পরিবর্ত্তন করে, বাষ্পাবহ ও অনিলাবহ পদার্থের চাপ বাড়ায় এবং যৌগিক পদার্থকে বিশ্লিষ্ট করিয়া অন্যান্য মূলপদার্থে পরিণত করে।

কোন জিনিসই তাপের সঞ্চালনে বাধা দিতে পারে না; বরং ধাতুর মত নিরেট কঠিন জিনিস, উহার সঞ্চালনে সহায় হয়। এই তাপ কি পদার্থ? বলা বাহুল্য তাপ কঠিন, তরল বা অনিল পদার্থ নহে; তবে কঠিন, তরল, অনিল পদার্থমাত্রেই অল্লাধিক পরিমাণে তাপ বিদ্যমান আছে।

শত বৎসর পূর্ব্বে পণ্ডিতেরা অনুমান করিতেন, উহা এক রকমের অতি সূক্ষ্ম জড়পদার্থ। উহা এত সূক্ষ্ম যে পদার্থমাত্রের অভ্যন্তরে প্রবেশে সমর্থ।

এই অনুমানে একটা আপত্তি উঠে। ঠাণ্ডা জিনিসকে যতই উষ্ণ কর উহার ভার বাড়ে না। তাপের ওজন নাই অন্ততঃ এ পর্য্যন্ত কোন নিক্তিতে তাপের ভার ধরা যায় নাই। এ আপত্তিটা কোন কাজের নহে। মনে করিলেই হইল এই সূক্ষ্ম পদার্থটা ভারহীন। উহার বস্তু থাকিতে পারে কিন্তু বস্তু থাকিলেই যে ভার থাকিবে তাহার মানে কি? একই বস্তুর ভার স্থানভেদে দেশভেদে কম-বেশী হইয়া থাকে। একবারে ভার নাই এরকম জিনিস থাকিতে পারে না, কে বলিল? বলিবে নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ ত সকল পদার্থেই খাটে, মাধ্যাকর্ষণ থাকিলেই ভারও থাকিবে। কিন্তু উত্তরে বলিব যে মাধ্যাকর্ষণ, কঠিন, তরল, বাষ্পীয়, অনিল এ সকল অবস্থাতেই খাটে; ঐ সকল স্থানে খাটিতে দেখা যায় তাই খাটে। এমন জিনিস যদি কিছু থাকে যাহাতে মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম খাটে না, তাহাতে বিস্মিত হইবার কারণ নাই। কাজেই ভারহীন জড়পদার্থ থাকিতে পারে না এ কথা চলিবে না। যাঁহারা তাপকে জড়পদার্থ বলিতেন তাঁহারা জোরের সহিতই বলিতেন, এইত এক রকম জড়পদার্থ রহিয়াছে ইহা গতায়াত করিতে পারে কিন্তু ইহার ভার নাই। ইহা প্রত্যক্ষ

প্রমাণে স্পষ্ট, আপত্তি মানিব কেন? ভার নাই অতএব তাপ জড়পদার্থ নহে এরূপ আপত্তি টিকিবে না। বস্তুতই সে যুক্তি খাটিবে না।

এখন অন্য যুক্তির সন্ধান করা যাউক। কাউণ্ট রম্ফোর্ড নামক এক জন বিখ্যাত লোক শতাধিক বৎসর পূর্ব্বে প্রমাণ করেন যথেচ্ছ পরিমাণে আমরা তাপের সৃষ্টি করিতে পারি। তার কিছু দিন পরে সার হাম্ফ্রী ডেভী আর এক জন বিখ্যাত লোক পরীক্ষা করিয়া দেখান দুইখানা বরফ পরস্পর ঘর্ষণে এত তাপ জন্মে যে, বরফ দুইখানা গলিয়া যায়। পরীক্ষাটা এরূপে সম্পাদিত হইয়াছিল যে, বাহির হইতে তাপ আসিয়া বরফ গলাইবার সম্ভাবনা মাত্র ছিল না। বাহির হইতে তাপ আসিতেছে না, ভিতরেও কোথাও তাপ যাতায়াতের প্রমাণ পাওয়া গেল না, অথচ বরফ গলিয়া গেল, বরফ গলাইতে যে প্রচুর তাপের আবশ্যক হয়, সে তাপ কোথা হইতে আসিল? স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে এখানে তাপের সৃষ্টি হইয়াছে; তাপ পূর্ব্বে ছিল না, নূতন আবির্ভূত হইয়াছে।

এখন সেই দার্শনিক তত্ত্ব; অভাব হইতে ভাব পদার্থ আসিতে পারে না। যাহা ছিল না তাহা আসিল, ইহা অসম্ভব! অতএব সিদ্ধান্ত হইল যে তাপ জড়পদার্থ নহে।

বস্তুত লাবোয়াশিয়ার তৎপূর্ব্বে প্রতিপন্ন করিয়া গিয়াছেন যে, জড়পদার্থের সৃষ্টিও নাই, ধ্বংসও নাই। তাপের যখন সৃষ্টি দেখিতেছি তখন উহা জড় নহে। কিন্তু প্রশ্ন উঠিবে লাবোয়াশিয়ারের প্রমাণের দৌড় কত? তিনি সাধারণ, কঠিন, তরল ও অনিল পদার্থেরই সৃষ্টি নাই ইহাই প্রতিপন্ন করিয়াছেন, আর তাহাও তিনি প্রতিপন্ন করিয়াছেন নিক্তির ওজনে। নিক্তির ওজনে কঠিন, তরল ও অনিলাবস্থ

পদার্থের ভার বাড়ে না ইহাই তিনি দেখাইয়াছেন। কিন্তু তাপকে যখন কঠিন, তরল, অনিল হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন পদার্থ বলিতেছি এবং ইহাকে যখন ভারহীন জড়পদার্থ বলিয়াই ধরিতেছি তখন লাবোয়াশিয়ারের নিকৃতির ওজনের প্রমাণ এখানে মানিব কেন?

বলিতে পার, তাপের ভার না থাকিলেও বস্তু থাকিবে ত? ভার হ্রাসবৃদ্ধিহীন কিন্তু বস্তু ক্ষয়বৃদ্ধিহীন। তাপের ভার না থাকিতে পারে কিন্তু উহার বস্তু আছে কি না তাহা দেখিলেই ত চলিবে। তাপে যদি বস্তু না থাকে তবে উহা জড়পদার্থ নহে, আর যদি বস্তু থাকে তাহা হইলে উহাকে জড়পদার্থ বলিতেই হইবে। কেননা এই বস্তুতেই জড়ের জড়ত্ব।

এখন প্রশ্ন হইতেছে তাপের বস্তু আছে কি না? ভার না থাকিলেও বস্তু থাকিতে পারে, ভার না মাপিয়াও বস্তুর পরিমাণ নির্দ্ধারণ করা চলে, তাপের বস্তু আছে কি? দেখা গিয়াছে, তাপের বস্তু পর্য্যন্ত নাই; তাপের ভার নাই, বস্তুও নাই। বস্তুতেই যখন জড়ত্ব বলিয়াছি, তখন যাহার বস্তু নাই তাহাকে জড় বলিব কিরূপে? অতএব তাপকে জড়পদার্থ বলিতে পারি না।

তবে তাপের স্বরূপ কি? তাপের ভারও নাই, বস্তুও নাই অথচ দেশব্যাপকতা আছে; তাপ খানিকটা দেশ অধিকার করিয়া থাকে এবং এক দেশ হইতে অন্য দেশে চলিতে পারে। সাধারণতঃ তাপ জড়পদার্থের আশ্রয় লইয়াই থাকে এবং জড়পদার্থের আশ্রয়েই যাতায়াত করে; কিন্তু জড়পদার্থের আশ্রয় না পাইলেও ইহা শূন্যপথে কোনরূপে চলিতেও সমর্থ। নতুবা সূর্য্যের তাপ পৃথিবীতে আসে কিরূপে? আবার কঠিন, তরল, অনিল কোন জড়পদার্থের সৃষ্টিও

নাই, ধ্বংসও নাই। কিন্তু তাপের সৃষ্টি আছে। যত ইচ্ছা তাপ আমরা জন্মাইতে পারি।

এই তাপের স্বরূপ কি বলিব? বিজ্ঞানবিদ্যা এই প্রশ্নের উত্তর দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তজ্জন্য বিজ্ঞানবিদ্যাকে জড়পদার্থ হইতে ভিন্ন, জড়পদার্থ হইতে অতিরিক্ত, আর একটি পদার্থের কল্পনা করিতে হইয়াছে। সেই পদার্থের নাম দিয়াছেন শক্তি। এই শক্তি পদার্থ কি বুঝিবার চেষ্টা করা যাউক।

শক্তি ও তাপ

কামার সবেগে নেহাইএর উপর হাতুড়ির ঘা দিল। আঘাতের অব্যবহিত পূর্ব্বে নেহাইএর প্রচণ্ড যানশক্তি ছিল। উহার যখন বেগও ছিল, ঝোঁকও ছিল, তখন যানশক্তি ছিল বৈকি? কিন্তু আঘাতের সঙ্গে সঙ্গে উহার স্থিরত্ব প্রাপ্তি, তবে ঐ যানশক্তি গেল কোথায়?

এবার ত বলা চলিবে না যে, উহা স্থানশক্তিতে রূপান্তরিত হইয়াছে? ঊর্দ্ধে উঠিবার সময় স্থানশক্তি বাড়ে, কিন্তু নীচে নামিবার সময় ত স্থানশক্তি কমে বই বাড়ে না। হাতুড়ি ত ঊর্দ্ধে উঠে নাই, উহা নীচে নামিয়া নেহাইএর উপর পতিত হইয়াছে। উহার যানশক্তি গেল কোথায়? এবার ত উহার যানশক্তির ধ্বংস হইয়াছে। পণ্ডিত মহাশয় ত এবারও একটা কল্পনার আশ্রয় লইতে পারিতেন; কিন্তু তাহা লইতে হয় না। এ ক্ষেত্রে যানশক্তির ধ্বংস হয় বটে, কিন্তু একটা নূতন পদার্থের আবির্ভাব প্রত্যক্ষ গোচর হয়। নেহাইটা গরম হইয়া উঠে। খানিকটা তাপের আবির্ভাব হয়, এই তাপ পূর্ব্বে ছিল

না, ইহার সৃষ্টি হইয়াছে। আঘাতের সঙ্গে সঙ্গে, যানশক্তির তিরোভাবের সঙ্গে সঙ্গে খানিকটা তাপের আবির্ভাব হইয়াছে।

একটামাত্র দৃষ্টান্ত দিলাম, এরূপ সহস্র দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। আঘাতের ফলে তাপোদ্ভব প্রতিনিয়ত ঘটিতেছে, চকমকি উত্তম দৃষ্টান্ত।

যানশক্তির তিরোভাবের সঙ্গে তাপের আবির্ভাব ঘটে; পরীক্ষার দ্বারা দেখা যায় যানশক্তির তিরোভাব যত অধিক হয় তাপের আবির্ভাবও তত অধিক হয়। ইংরাজ বৈজ্ঞানিক জুল মাপিয়া দেখেন একসের জিনিসের পৌনে সাতশ ফুট অধঃপতনে যে যানশক্তির উদ্ভব হয়, তাহার তিরোধানে যে তাপ জন্মে তাহাতে একসের জল একডিগ্রি গরম হইতে পারে।

তাপের সঙ্গে শক্তির এই সম্পর্ক আবিষ্কৃত হইবামাত্র তাপের স্বরূপ-সম্বন্ধে একটা নূতন কথা বলিবার সময় উপস্থিত হইল। জুল যে দিন জল মাপিয়া ঐ সম্পর্কটা বাহির করিলেন, সেদিন বিজ্ঞানের ইতিহাসে একটা দিন। তাপ জড়পদার্থ বটে কিনা তাহা লইয়া গণ্ডগোল ত ছিল, জড়পদার্থ হইলেই আমাদের পরিচিত অন্যান্য জড়পদার্থের সহিত উহার কোন বিষয়েই মিল নাই, ইহাও স্বীকৃত ছিল। কিন্তু আজ দেখা গেল, উহার সহিত শক্তি নামক কল্পিত পদার্থের একটা গূঢ় সম্পর্ক রহিয়াছে। শক্তি লুপ্ত হয়, সঙ্গে সঙ্গে তাপের সৃষ্টি হয়। আবার শক্তি লোপ যত অধিক, উৎপন্ন তাপও তত অধিক। বল না কেন তাপটা শক্তিরই রূপান্তর। শক্তি নষ্ট হয় নাই, উহা রূপান্তর পরিগ্রহ করিয়া তাপে পরিণত হইয়াছে।

পূর্ব্বে কল্পিত হইয়াছে লোষ্ট্রখণ্ডের উৎপতনের সময় উহার যানশক্তি স্থানশক্তিতে রূপান্তরিত হয়। আবার অধঃপতনের সময়

সেই স্থানশক্তি যানশক্তিতে রূপান্তরিত হইয়া থাকে। এখানে একটা প্রত্যক্ষ দেখা যাইতেছে, অধঃপতিত লোষ্ট্রখণ্ড ভূমিতে আঘাত করিয়া স্থিরত্ব পাইলে তাহার যানশক্তি নষ্ট হইল বটে, কিন্তু খানিকটা তাপের উৎপত্তি হইল, এখন জোর করিয়া বলা চলিতে পারে, শক্তির ধ্বংস নাই তবে রূপান্তর পরিগ্রহ আছে। তাপ শক্তিরই মূর্ত্ত্যন্তর।

একবার এই মূর্ত্তিভেদের কল্পনাটা স্পষ্ট হইলে তখন আর বৈজ্ঞানিককে সংকোচ করিতে হয় না।

শক্তির রূপভেদ ও অবিনাশিতা

যানশক্তির লোপে তাপের উদ্ভব হয়, তদ্ভিন্ন অন্য স্থানেও অন্য কারণে তাপের আবির্ভাব দেখা যায়। ধাতুদ্রব্যের ভিতর দিয়া তাড়িতপ্রবাহ চলিতে থাকিলে, সেই ধাতুদ্রব্য তপ্ত হয়। সূর্য্যের আলো পড়িয়া ভূপৃষ্ঠ তপ্ত হয়। এইরূপ যেখানে তাপের উৎপত্তি দেখা যাইবে, সেইখানেই শক্তির কোন না কোন একটা মূর্ত্তি তাপে পরিণত হইতেছে, এইরূপ মনে করা যাইতে পারে। তাহার ফলে এই দাঁড়ায় যে, বিশ্বজগতে শক্তি-নামক কল্পিত পদার্থ নানারূপে নানা মূর্ত্তি ধরিয়া বিদ্যমান আছে। শক্তি এক মূর্ত্তি ছাড়িয়া অন্য মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া থাকে। উহার রূপভেদ ঘটে, কিন্তু ধ্বংস ঘটে না বা সৃষ্টি ঘটে না।

শক্তির সৃষ্টিও নাই ধ্বংসও নাই; এই তত্ত্বটি ঊনবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানশাস্ত্রের সর্ব্বপ্রধান আবিষ্কার বলিয়া গৃহীত হইয়া থাকে। কোন একজন পণ্ডিতে এই তত্ত্বের আবিষ্কার করিয়াছেন বলা চলে না। যাটি সত্তর বৎসর পূর্ব্বে কল্পনাটা অস্পষ্টভাবে কিছুদিন হইতেই অনেকের

মনে উদিত হইতেছিল। জুল যেদিন তাপের সহিত যানশক্তির ঐ সম্পর্ক আবিষ্কার করিলেন, সেইদিন এই তত্ত্বের ভিত্তির দৃঢ়প্রতিষ্ঠা হইল মনে করা যাইতে পারে। জুলের কিছুদিন পূর্ব্বে মেয়ার নামক একজন জার্ম্মাণ ডাক্তারের মনেও কল্পনাটার অনেকটা স্পষ্ট আভাস আসিয়াছিল। অধঃপতন কালে লোষ্ট্রখণ্ড যখন কাজ করে, বায়ুকে চাপিয়া সঙ্কুচিত করিলে সেইরূপ কাজ করা হয়। এই কাজের সঙ্গে তাপ জন্মিয়া থাকে। মেয়ার এই ক্ষেত্রে কাজের পরিমাণ ও তাপের পরিমাণ নির্ণয় করিয়া উভয়ের সম্পর্ক বাহির করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তবে মেয়ারের কথা বৈজ্ঞানিকমণ্ডলী বড় কানে তুলেন নাই। জুলের কথাটাকে কানে তুলিতে হইয়াছিল, এবং তাহার অল্প পরেই হেল্‌মহোলৎজ নামক দিগ্বিজয়ী পুরুষশ্রেষ্ঠ শক্তির অবিনাশিতা-সম্বন্ধে তত্ত্বটিকে পরিস্ফুট করিয়া তুলেন।

বস্তুতঃ এই শক্তিতত্ত্ব বর্ত্তমান বিজ্ঞানশাস্ত্রের ভিত্তিরূপে গৃহীত হয়। ইহার তাৎপর্য্যটা আরও স্পষ্টভাবে বুঝিবার চেষ্টা করিতে হইবে। কেননা যাঁহারা স্বয়ং বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে লাঙ্গল ধরেন নাই, কেবল পাছে দাঁড়াইয়া কৃষিকার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করেন, তাঁহারা এই শক্তিতত্ত্ব লইয়া অনেক অবৈজ্ঞানিক কথা বলিয়া থাকেন। অনেক বৈজ্ঞানিকের মুখেও অবৈজ্ঞানিক বাক্যবিন্যাস শুনিয়া অনেক সময়ে মরমে আঘাত লাগে।

শক্তির বিবিধ মূর্ত্তি, তাড়িতশক্তি, চৌম্বকশক্তি, তাপশক্তি, আলোকশক্তি, চলন্ত দ্রব্যের যানশক্তি, ও স্থির দ্রব্যের স্থানশক্তি ইত্যাদি। শক্তি এক মূর্ত্তি ছাড়িয়া অন্য মূর্ত্তি গ্রহণ করে; একটা মূর্ত্তিতে শক্তির অন্তর্দ্ধান হয় ও সঙ্গে সঙ্গে শক্তির অন্য মূর্ত্তির আবির্ভাব হয়। এই দেখিয়া বলা হয় জগতে শক্তির পরিমাণ হ্রাসবৃদ্ধিহীন,

উহা মূর্ত্ত্যন্তর গ্রহণ করে, কিন্তু কখনও নষ্ট হয় না। জগতে শক্তির পরিমাণ সর্ব্বদা সমান অর্থাৎ হ্রাসবৃদ্ধিহীন রহিয়াছে।

হাতুড়ি যখন নেহাইয়ে আঘাত দেয়, তখন খানিকটা যানশক্তির লোপ হইল বা নষ্ট হইল কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে খানিকটা তাপের আবির্ভাব বা সৃষ্টি হইল। কিন্তু মোটের উপর শক্তির নাশ বা সৃষ্টি হইল না; উহা একরূপে প্রত্যক্ষগোচর ছিল অন্যরূপে প্রত্যক্ষগোচর হইল। উহার পরিমাণ সমান থাকিল। যে যানশক্তির লোপ হইল তাহার পরিমাণ, যে তাপের উদ্ভব হইল তাহার পরিমাণের সমান।

সমানতা ও তুল্যতা

পূর্ব্বের সমান শব্দটার অর্থ কি? পাঁচটা গরুর সংখ্যা পাঁচটা ঘোড়ার সংখ্যার সমান। কিন্তু অন্য কোন বিষয়ে সমান নহে। গোয়ালের পাঁচটা গরু কমিয়া আস্তাবলে পাঁচটা ঘোড়া বাড়িলে আমি বলিতে পারি আমার পশুসংখ্যা সমান আছে; কিন্তু ঐ পর্য্যন্ত। আমার ধনবত্তা বা ঐশ্বর্য্য যে সমান আছে তাহা বলা যায় না। একটা টাকা ষোল গণ্ডা পয়সার সমান, কিসে সমান? মূল্যে সমান। একটা টাকাতে যত চাউল পাই, ষোল গণ্ডা পয়সাতেও তাহাই পাইব। তদ্ভিন্ন আকারে, আয়তনে, ওজনে, সৌন্দর্য্যে, কোন বিষয়ে একটা টাকার সহিত ষোল গণ্ডা পয়সার মিল নাই। আমার বাক্সে দুইটা টাকার বদলে ৩২ গণ্ডা পয়সা রাখিলে আমার ধনবত্তার কোন হানি হয় না, কিন্তু আমার যে ভৃত্যকে ঐ বাক্স-বহন করিতে হয়, তাহার পক্ষে বাক্স-বহনপ্রীতি সমান হয় না। এক গামলা জলো দুধকে এক গামলা খাঁটি দুধের সমান করিয়া চালাইতে গোয়ালা খুবই ব্যগ্র হইতে পারে, কিন্তু গৃহস্থের পক্ষে ঐ সমানতা কিছুতেই প্রীতির হেতু হইতে পারে না।

এক গামলা খাঁটি জল কিন্তু প্রায় সর্ব্বতোভাবে আর এক গামলা খাঁটি জলের সমান হয়, যদি গামলা দুটির আয়তনে কোন ভেদ না থাকে। রাম বয়সে শ্যামের সমান, কিন্তু আর কিছুতেই সমান নহে। বিধাতার বিধানে কালা-ধলার জীবনের মূল্য সমান হইলেও হইতে পারে, কিন্তু ধলার বিধানে নহে।

এই কয়টি উদাহরণেই বুঝা যাইবে, সমান বলিলেই যে সর্ব্বতো-ভাবে সকল বিষয়ে সমান বুঝায় তাহা নহে, সমানতারও প্রকার-ভেদ আছে।

হাতুড়ির ধাক্কা নেহাইএর উপর পড়িল, খানিকটা স্থানশক্তির বদলে খানিকটা তাপ বাড়িয়া গেল। উভয়ে সমান কিসে? বলা যায় উভয়ের পরিমাণ সমান। প্রায় যে কোন বিজ্ঞানের পুঁথি বাহির কর, সর্ব্বত্রই লেখা আছে দেখিবে যে, উভয়ের পরিমাণ সমান। কিন্তু উভয়ের পরিমাণ সমান জানিলাম কিরূপে? স্থানশক্তির পরিমাণ স্থির হয় উহার ঝোঁকের মাত্রার ও বেগের মাত্রার গুণফলের অর্দ্ধেক লইয়া; আর তাপের পরিমাণ হয় কতটা জল এক ডিগ্রি গরম করিতে পারে দেখিয়া। উভয়ত্র মাপিবার প্রণালীই স্বতন্ত্র।

কাপড় মাপিলাম গজ কাঠি দেখিয়া এবং সময় মাপিলাম ঘড়ির কাঁটা কতটুকু সরিয়াছে দেখিয়া। এই দুই পরিমাণ তুলনা করিয়া কতটা কাপড়, কয় ঘণ্টা কয় মিনিট সময়ের সমান যদি স্থির করা সম্ভব হয়, তাহা হইলে কতটা যানশক্তি কতটা তাপের সমান তাহাও নির্ণীত হইতে পারে।

ফলে যানশক্তি গণিতবেত্তার একটা কল্পিত পদার্থ মাত্র। আর তাপ পদার্থটার স্বরূপ যাহাই হউক, উহার একটা ফল, অন্ততঃ যাহাকে আমরা উষ্ণতা বলি, সেটা মনুষ্য সাধারণের স্পর্শেন্দ্রিয়গম্য।

একের পরিমাণ অন্যের পরিমাণের সমান কিনা কিরূপে স্থির করিব ?

একটা টাকাকে ষোল গণ্ডা পয়সার সমান না বলিয়া তুল্যমূল্য বলাই সঙ্গত। তুল্যমূল্য বলিলে এই বুঝাইবে যে ক্রয়বিক্রয়ের ক্ষেত্রে একটা টাকাতেও যে ফল পাওয়া যায়, ষোল গণ্ডা পয়সাতেও ঠিক সেই ফল পাওয়া যায়। আর একটা টাকার বদলে ষোল গণ্ডা পয়সা বা ষোলগণ্ডা পয়সার বদলে একটা টাকা লইতে কেহ দ্বিধা করে না। উভয়ের এই তুল্যমূল্যতা বিধাতার বিধান নহে, উহা রাজসরকারের বিধান। বিধাতার বিধানে একটাকা ও ষোলগণ্ডা পয়সা কোন বিষয়ই সমান নহে, সকল বিষয়েই ভিন্ন।

যানশক্তিকে সেইরূপ তাপের সমান না বলিয়া তুল্য বা তুল্যমূল্য বলাই সঙ্গত। উভয়েরই ফল সমান। খানিকটা যানশক্তির বদলে যতটা তাপ পাওয়া যায় সেই তাপটুকুর বদলে আবার ঠিক ততটুকু যানশক্তি পাওয়া যাইতে পারে। ইহা অহরহ ঘটিতেছে। এঞ্জিনে কয়লা পোড়াইয়া তাপ জন্মে, সেই তাপের বদলে রেলের গাড়ীতে যানশক্তির উদ্ভব হয়। খানিকটা তাপের লোপ ও তাহার তুল্যমূল্য যানশক্তির আবির্ভাব হয়; তুল্যমূল্য কেননা সেই চলন্ত গাড়ীকে থামাইয়া ঠিক সেই লুপ্ত তাপটুকু ফেরত পাওয়া যাইতে পারে। টাকাপয়সাতে ক্রয়বিক্রয় চলে; শক্তি হইতে কাজ পাওয়া যায়। "কাজ" কাহাকে বলে তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। কোন ভারী জিনিসকে উপরে তুলিতে হইলেই গণিতবেত্তার ভাষায় খানিকটা "কাজ" করা হয়। বেগে উৎক্ষিপ্ত লোষ্ট্রখণ্ড আপনাকে আপনি উপরে তোলে ও কাজ করে। আবার এঞ্জিনে কয়লা পোড়াইয়া তদুদ্গত তাপের কিয়দংশে খরচ করিয়া বা নষ্ট করিয়া কূপের ভিতর হইতে জল তোলা

যায়, জল তুলিতেও কাজ হয়। এখানে তাপের বলে কাজ হইল। একটা টাকাতে য' গণ্ডা আম পাওয়া যায়, ষোল গণ্ডা পয়সাতেও ত' গণ্ডা আম পাওয়া যায় বলিয়াই যেমন টাকা ও ষোল আনা পয়সা তুল্যমূল্য, খানিকটা যানশক্তি হইতেও যতটা কাজ পাওয়া যায় খানিকটা তাপ হইতেও ঠিক ততটুকু কাজ পাওয়া যাইতে পারে বলিয়া ঐ যানশক্তিও ঐ তাপ তুল্যমূল্য।

ঐরূপে কতটা তাড়িতশক্তি, কতটা চৌম্বকশক্তি, কতটা আলোকশক্তি হইতে একসের জলকে এক ডিগ্রি গরম করা যাইতে পারে তাহা পরীক্ষা ও পরিমাপ দ্বারা নির্দ্ধারণ করিয়া আমরা বলিতে পারি, এতটা তাড়িতশক্তি, এতটা চৌম্বকশক্তি ও এতটা তাপশক্তি ইহারা পরস্পর তুল্যমূল্য। সমান ফল দেয় বলিয়া ইহারা তুল্যমূল্য। আবার ক-য়ের বদলে যতটা খ পাওয়া যায়, খ-য়ের বদলেও ঠিক ততটা ক পাওয়া যায় বলিয়া উভয়ে তুল্যমূল্য। তুল্য বা তুল্যমূল্য (equivalent) বলা উচিত। সমান (equal) বলা উচিত নহে।

অবশ্য এস্থলে এই তুল্যমূল্যতা বিধাতার বিধান, ইহা প্রত্যক্ষ দর্শনে লব্ধ, ইহার উপর রাজসরকারের কোন কর্ত্তৃত্ব নাই।

কাজেই যখন বলা যায় জগতে শক্তির পরিমাণ সর্ব্বদা সমান রহিয়াছে, উহার হ্রাসও নাই বৃদ্ধিও নাই, তখন যে ভাষার প্রয়োগ হইতেছে তাহা অনেকটা অলঙ্কৃত ভাষা ও কবিতার ভাষা। বৈজ্ঞানিকের উচিত ঐ ভাষা পরিহার করা। যদি না করেন, তিনি কি অর্থে ব্যবহার করিতেছেন তাহা বুঝাইয়া বলিয়া সাধারণকে সতর্ক করিয়া দেওয়া উচিত। নতুবা তাঁহার অলঙ্কৃত বাক্যে মুগ্ধ হইয়া এখনই কে কোন্ মহাকাব্য রচনা করিয়া বসিবে।

শক্তি অনাদি ও অবিনাশী, উহার সৃষ্টি নাই, ধ্বংস নাই, হ্রাস নাই, বৃদ্ধি নাই, এই সকল বাক্য লইয়া কাব্যরচনা বেশ চলিতে পারে, অনেক বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক পণ্ডিতেও কাব্যরচনা না করিয়াছেন এমন নহে, কিন্তু সাধু সাবধান!

অভাব হইতে ভাব উৎপন্ন হয় না, অসৎ হইতে সৎ জন্মে না, এই দার্শনিক তত্ত্বকে অবলম্বন করিয়াও অনেকে উক্ত শক্তিতত্ত্বের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। হার্ব্বার্ট স্পেনসারের মত সর্ব্বজনপূজ্য গভীরবিদ্যাশীল দার্শনিক ত এই স্থানে হাবুডুবু খাইয়াছেন দেখিয়া ইতরকে শঙ্কিত হইতে হয়।

বস্তুতঃ শক্তির বিভিন্ন রূপের পরস্পর তুল্যমূল্যতা প্রত্যক্ষলব্ধ তত্ত্ব। কাল যদি বৈজ্ঞানিক কোন স্থানে স্পষ্ট প্রত্যক্ষ দেখেন যে খানিকটা তাপের লোপ হইল, অথচ তাহার স্থানে অন্য কোনও মূর্ত্তির আবির্ভাব হইল না; বৈজ্ঞানিককে ঘাড় পাতিয়া উহা মানিয়া লইতে হইবে। তখন কোন দার্শনিক তত্ত্বের দোহাই দিলে চলিবে না।

জড়ের অবিনাশিতা যখন প্রত্যক্ষলব্ধ তত্ত্ব, শক্তির অবিনাশিতাও ঠিক সেইরূপ প্রত্যক্ষলব্ধ তত্ত্ব। জড়ের অবিনাশিতার অর্থ কি, পূর্ব্বে স্পষ্ট করিবার যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি, শক্তির অবিনাশিতার কি অর্থ তাহাও এ স্থলে স্পষ্ট করিবার চেষ্টা করিলাম। ঝোঁকের ও বেগের গুণফলের অর্দ্ধেক লইয়া যানশক্তি পরিমিত হয়। আর কতটা জল একডিগ্রি গরম করে দেখিয়া তাপের পরিমাণ হয়। কাজেই যান-শক্তির সহিত তাপের সমানতা নিরূপণ করা চলে না। তবে উভয়ের তুল্যতা বা তুলামূল্যতা স্থির করা চলে। জুল সাহেব তাহাই করিয়া ধন্য হইয়া গিয়াছেন। তিনি প্রত্যক্ষ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া উভয়ের তুল্যমূল্যতার নিরূপণ করিয়া গিয়াছেন।

জড়ের গঠনপ্রণালী

বৈজ্ঞানিক কেবল প্রত্যক্ষের উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে চাহেন না। অন্তরালে যে স্থান প্রত্যক্ষের অগোচর, সেখানেও তিনি মনশ্চক্ষুকে প্রেরণ করিয়া অবস্থাটা অনুমান করিতে চাহেন। এক্ষেত্রেও বৈজ্ঞানিক একটা অনুমানের আশ্রয় লইয়াছেন। সেই বৃত্তান্তের এবার অবতারণা করিব। জল মথিয়া খানিকটা যানশক্তির বদলে জুল খানিকটা জল গরম করিলেন ও প্রত্যক্ষদর্শনে বলিলেন এই তাপটা এই যানশক্তির তুল্যমূল্য। তার পরেই সেই জুল আর তাঁহার সহবর্ত্তীরা বলিলেন, আচ্ছা প্রত্যক্ষগোচর নাই বা হইল, মনে কি করা যায় না, তাপ যানশক্তির কেবল তুল্যমূল্য নহে, উহাও যানশক্তি? মনে কর না কেন ঐ জলের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণাগুলি বেগে ছুটাছুটি করিতেছে? প্রত্যেক কণারই কিঞ্চিৎ বস্তু আছে, আর যদি উহা খানিকটা বেগে ছুটাছুটি করে, তাহা হইলে প্রত্যেক কণার ঝোঁকও আছে, কেননা বস্তুর মাত্রার সহিত বেগের মাত্রার গুণফলের নামই ত ঝোঁক। আর ঝোঁকের বেগের গুণফলের অর্দ্ধেক যদি যানশক্তি হয়, তবে প্রত্যেক জলকণারই যানশক্তি রহিয়াছে। আর ঐ জলরাশি যখন ঐরূপ কোটি কোটি জলকণার সমষ্টি মাত্র, তখন মনে কর না কেন যে উহার তাপ সেই জলকণা সমূহের যানশক্তির সমষ্টি মাত্র। তাহা হইলে তাপকে আমরা যানশক্তির তুল্যমূল্য মনে না করিয়া উহাকে প্রকৃতই যানশক্তি বলিয়া মনে করিতে পারি। উহা জলরাশির যানশক্তি নহে; উহা জলকণার যানশক্তির সমষ্টি। জলরাশি প্রত্যক্ষগোচর কিন্তু সেই অদৃশ্য জলকণা প্রত্যক্ষ বিষয় নহে; কিন্তু উহা অনুমানগোচর করিয়া লইতে পারি।

চক্ষু কর্ণ প্রভৃতি বহিরিন্দ্রিয় যেখানে প্রবেশে অক্ষম, বুদ্ধি সেইখানে অন্তরিন্দ্রিয় মনকে প্রেরণ করে। মন সেখানে একটা কল্পনা করিয়া বুদ্ধির সমীপে প্রত্যক্ষের অগোচর অবস্থার একটা চিত্রপট ধরিয়া দেয়। এই ব্যাপারের নাম অনুমান, ইহা বৈজ্ঞানিকের একটা অবলম্বন।

হাতুড়ি বেগে নেহাইএর উপর আপতিত হইল। হাতুড়ি বেগে চলিতেছিল, উহার গতিবিধি প্রত্যক্ষ বিষয় ছিল। আঘাতের পর যানশক্তি লোপ হইল, আবির্ভাব হইল তাপের। নেহাইটা গরম হইল; উহার উষ্ণতাও প্রত্যক্ষ বিষয় ত্বগিন্দ্রিয়ের গম্য।

কিন্তু বৈজ্ঞানিক অনুমান করিলেন, নেহাই বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র অদৃশ্য লৌহ-কণিকার সমষ্টি মাত্র। সেই অদৃশ্য কণিকাগুলি এখন বেগে ছুটিতে লাগিল। প্রত্যেক কণিকার কিঞ্চিৎ যানশক্তি সঞ্চারিত হইল। যে যানশক্তি হাতুড়িতে নিহিত ছিল, তাহাই এখন নেহাইএর লৌহ-কণিকাতে সংক্রান্ত ও সঞ্চারিত হইল। উক্ত অদৃশ্য সঞ্চরণের প্রত্যক্ষ ফল উষ্ণতা বৃদ্ধি। হাতুড়ির সমস্ত শরীরটা একই বেগে, একই মুখে ছুটিতেছিল। কিন্তু নেহাইএর কণিকাগুলি হয় ত বিভিন্নবেগে বিভিন্নমুখে ছুটিতেছে। কিন্তু যানশক্তি মূর্ত্ত্যন্তর গ্রহণ করে নাই, উহা যানশক্তিই রহিয়াছে, এইখানে রসায়নবেত্তা পণ্ডিতের সহিত পদার্থবিদ্যাবিৎ পণ্ডিতের মহাহর্ষে সন্ধিমিলন ঘটিল। রসায়নবেত্তারাও জড়পদার্থের গঠনপ্রণালী সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন, মৌলিক ও যৌগিক যাবতীয় পদার্থ বহুসংখ্যক অণুর সমাবেশে গঠিত। ঐ অণুগুলিই জড়ের সূক্ষ্মতম অংশ, অণুগুলিকে ভাঙ্গিলে পরমাণু পাওয়া যায়; কিন্তু পরমাণুকে আর বিভাগ করা চলে না।

একফোঁটা জলে কোটি কোটি অণু রহিয়াছে; প্রত্যেক অণু জলেরই অণু। কিন্তু সেই অণুকে ভাঙ্গিলে **হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের** পরমাণু পাওয়া যায়, সেই পরমাণুতে জলধর্ম্ম কিছু থাকে না। কাজেই জলের অণু জলের সূক্ষ্মতম অংশ।

পদার্থবিদ্যাবিৎ পণ্ডিতেরাও এইখানে রসায়নবিদের মতে সায় দিলেন। তাঁহারা বলিলেন, এক ফোঁটা জলে কোটি কোটি অণু রহিয়াছে। সেই অণুই জলের সূক্ষ্মতম অংশ। উহাকে ভাঙ্গিলে পরমাণু পাওয়া যায় যাউক, ক্ষতি নাই; কিন্তু সেই পরমাণুতে যখন আর জলধর্ম্ম থাকিবে না, তখন জলের অণুকেই জলের সূক্ষ্মতম অংশ বলিয়া গ্রহণ করা চলিতে পারে।

পদার্থবিদ্যাবিৎ পণ্ডিতের মতে এই অণুগুলি চলন্ত। উহারা এক-স্থানে স্থির থাকে না। উহারা স্থির না থাকিয়া বেগে ছুটাছুটি করিতেছে, এইরূপ অনুমান করিলে তাপ যে যানশক্তির মূর্ত্যন্তর নহে, উহাই যানশক্তি, তাহা বেশ বুঝা যাইতে পারে।

তাপের পরিমাণভেদে জলের ত্রিবিধ অবস্থা; কঠিন জল বরফ; উহাতে খানিকটা তাপ প্রবেশ করিলে উহা তরল জল হয়; আরও খানিকটা তাপের যোগে তরল জল বাষ্পাবস্থা পায়। এখন তাপ যদি একটা ছুটাছুটির ব্যাপার হয়, তাহা হইলে মনে করিতে হইবে যে, তাপের অণুগুলিতে ছুটাছুটিটাও সবচেয়ে বেশী, তরলে তার চেয়ে কম, কঠিনে আরও কম। এইরূপ অনুমানের বলে কঠিন, তরল, বাষ্প ও অনিল এই চতুর্ব্বিধ অবস্থারই এক রকম ব্যাখ্যার চেষ্টা হইতে পারে। এখন কোন্ অবস্থার ছুটাছুটিটা কিরূপ তৎ-সম্বন্ধে পদার্থবিদ্যাবিৎ কি বলেন তাহা দেখা যাক।

মনে কর, একটা বাক্সের ভিতরে খানিকটা জলের বাষ্প পোরা আছে। ঐ বাষ্প বাক্সের সমস্ত অভ্যন্তর দেশটা ব্যাপিয়া আছে; বাক্সটার ভিতরের যে আয়তন, বাষ্পেরও সেই আয়তন; বাক্সের গায়ে বাষ্পের চাপ পড়িতেছে, বাক্সের গায়ে প্রতি বর্গ ইঞ্চি জায়গার উপর কত চাপ তাহা সহজেই জানা গেল; আর ঘর্ম্মমান দ্বারা ঐ বাষ্পের উষ্ণতা কত তাহাও বলা যাইতে পারে।

পদার্থবিৎ অনুমান করেন, ঐ বাক্সের ভিতরে জলের কোটি কোটি অণু ছুটিয়া বেড়াইতেছে; প্রচণ্ড বেগে ছুটিয়া বেড়াইতেছে। এদিক, ওদিক, ঊর্দ্ধমুখে অধোমুখে এপাশে ওপাশে দিগ্বিদিকে যে যে-মুখে পাইতেছে ছুটিতেছে, আর বাক্সের গায়ে ধাক্কা দিতেছে। রবরের বল যেমন দেওয়ালে ধাক্কা দিয়া ঠিকরিয়া পড়ে ও অন্য মুখে প্রত্যাবর্ত্তিত হয়, সেইরূপ বাক্সের দেওয়ালেও ধাক্কা দিয়া অণুগুলি ঠিকরিয়া পড়িতেছে ও ফিরিয়া অন্যপথে চলিতেছে। আবার মাঝে মাঝে অণুতে অণুতে ধাক্কা লাগিয়া উভয়েরই গতি অন্য মুখে ফিরিতেছে। যতক্ষণ দেওয়ালের গায়ে বা অন্য অণুর গায়ে ধাক্কা না লাগে ততক্ষণ অণুগুলি এক মুখে সরল পথে ছুটিতে থাকে।

এই অণুগুলি যদি আমাদের চক্ষুর গোচর হইত তাহা হইলে কিরূপ দৃশ্য দেখিতাম? রাত্রিকালে ঘরের ভিতরে লক্ষ লক্ষ মশা উড়িতে থাকিলে যে রকম দেখায় কতকটা সেই রূপ। অথবা অভিমন্যুকে সপ্তরথীতে ঘিরিয়া যখন ব্যূহ-মধ্যস্থ স্থানটাকে বাণে বাণে ছাইয়া ফেলিয়াছিলেন, তখন সেই স্থানের অবস্থা যেরূপ হইয়াছিল কতকটা সেইরূপ। ঐ মশাগুলি বা বাণগুলি যেন আমাদের অণু।

বাক্সটার মধ্যে বহু কোটি অণু ছুটাছুটি করিতেছে বটে, কিন্তু এক একটা অণু এতই ছোট যে বস্তুতঃ বাক্সটা অণুতে পরিপূর্ণ হয়

নাই। অণুগুলি যদি গায়ে গায়ে লাগিয়া থাকিত তাহা হইলে তাহাদের বেগে ছুটাছুটি সু-কর হইত না। কিন্তু দুই দুইটা অণুর মধ্যে প্রচুর স্থান ফাঁক রহিয়াছে, প্রচুর ফাঁক আছে বলিয়াই উহারা বেগে ছুটিবার অবকাশ পাইতেছে। তবে বহুসংখ্যক অণু আছে বলিয়াও তাহারা দশ দিকেই ছুটিতেছে বলিয়া মাঝে মাঝে অণুতে অণুতে ঠোকাঠুকি হইতেছে মাত্র। অণুগুলি বাক্সের ভিতরটা দখল করিয়া আছে মাত্র, অর্থাৎ সেই ভিতরের মধ্যেই উহাদের ছুটাছুটি, সেখানে যে প্রবেশ করিতে চাহিবে তাহাকেই সেই অণুগুলির ধাক্কা খাইতে হইবে এই পর্য্যন্ত। কিন্তু অণুতে সমস্ত স্থান ব্যাপিয়া নাই। কেন না অণুগুলির নিজের আয়তন অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র।

এখন দেখা যাউক এই অদ্ভুত অনুমানে জলীয় বাষ্পের অবস্থার কিরূপ ব্যাখ্যা হয়।

১। অণুগুলির মাঝে প্রচুর অবকাশ বা ফাঁক আছে বলিয়াই আমরা ইচ্ছা করিলে আরও বিস্তর অণু ঐ বাক্সের মধ্যে প্রবেশ করাইতে পারি। যে বাষ্পটা বাক্সে রহিয়াছে আমরা আরও বাষ্প উহার মধ্যে প্রবেশ করাইতে পারি। বাক্সটা যদি তরল জলে পূর্ণ থাকিত, তাহা হইলে উহাতে আর খানিকটা জল বা অন্য কোন দ্রব্য প্রবেশ করান অসাধ্য হইত। কিন্তু বাষ্পে পূর্ণ থাকিলে আরও বাষ্প— আর বাষ্পই বা কেন উদান, অম্লান, জবান যে কোন অনিল প্রচুর পরিমাণে প্রবেশ করান চলে। মাঝে ঐরূপ স্থান আছে বলিয়াই চলে।

২। বাক্সের কোন এক জায়গাতে ফুটা করিলে সেই দিক দিয়া বাষ্প বাহির হইয়া আসিবে। তা উপরেই কর, আর নীচের

তলেই কর, আর পাশেই কর। বাষ্পাবস্থ বা অনিলাবস্থ পদার্থকে খোলামুখ পাত্রে রাখা চলে না। খোলা জানালা পাইলেই সেই পথে পলাইয়া আসে। কিন্তু তরল বা কঠিন দ্রব্য সে রকম পলায় না। উহা খোলামুখ পাত্রে রাখা চলে।

ইহাতে বুঝা গেল, অণুগুলি সকল দিকেই সকল মুখেই বেগে ছুটিতেছে। দেওয়ালের ধাক্কা পাইয়া সেখান হইতে ঘুরিয়া আইসে; কিন্তু দেওয়ালে ফুটা থাকিলে সেই পথ দিয়া বেগে বাহির হইয়া আসিবে।

৩। সকল দিকেই বেগে ঘুরিতেছে বলিয়াই বাষ্পাবস্থ বা অনিলাবস্থ পদার্থ সকল দিকেই চাপ দেয়। বাক্সের ভিতরে যে বাষ্প আছে, তাহা বাক্সের ছয়টা দেওয়ালেই, অর্থাৎ উপরের ডালায় নীচের তলে ও চারিপাশে এই ছয় দেওয়ালেই চাপ দেয়। প্রত্যেক অণু বেগে ছুটিয়া আসিয়া দেওয়ালে ধাক্কা দিতেছে আবার ঠিকরিয়া পড়িতেছে। প্রত্যেক অণুরই একটা ঝোঁক আছে; সেই ঝোঁকের সহিত ধাক্কা আবার সেই ঝোঁকের সহিত প্রত্যাবর্ত্তন। এক একটা অণু অতিক্ষুদ্র ও উহার ঝোঁক যৎসামান্য হইলেও কোটি কোটি অণু যেখানে প্রতি সেকেণ্ডে প্রতি বর্গ ইঞ্চি দেওয়ালে ধাক্কা দিতেছে, তখন মোটের উপর দেওয়ালে ঝোঁক সামান্য পাইতেছে না। প্রত্যেক অণুর বস্তুর মাত্রাকে উহার বেগ দিয়া গুণ করিলে উহার ঝোঁকের মাত্রা পাওয়া যায়। আমরা প্রত্যেক অণুর বস্তু-পরিমাণ কত তাহা জানি না, তবে সমস্ত অণুর বস্তু-পরিমাণের সমষ্টি জানি। কেন না সমুদায় অণুর সমষ্টিটাই ত বাক্সের ভিতরে বাষ্প; আবার বাক্সের গায়ে কত চাপ পড়িতেছে, সেটা ত মাপিয়া বাহির করিতে পারি। এখন কত বেগে ধাক্কা দিলে ঐ চাপটুকু ঠিক পাওয়া যাইবে তাহা গণনা করিতে পারা যায়।

বাষ্পটা মাপিয়া, আর বাষ্পটার বস্তু-পরিমাণ স্থির করিয়া এই বেগের মাত্রা কত গণিয়া দেখা হইয়াছে। তাহাতে যে ফল পাওয়া যায় তাহা বিস্ময়কর। অণুগুলির ছুটাছুটির বেগ সামান্য নহে। বাষ্পটা যদি ফুটন্ত জলের বাষ্প হয়, অর্থাৎ উহার উষ্ণতা ১০০ ডিগ্রী হয়, তাহা হইলে গণিয়া দেখা যায় প্রত্যেক অণুর বেগ, অতি প্রচণ্ড। রেলওয়ের ট্রেনের বেগ ইহার নিকট বেশী নহে।

কোটি কোটি অণু এই প্রচণ্ড বেগে ধাক্কা দিলে দেওয়ালের গায়ে যে চাপ পড়িবে তাহা বিচিত্র কি? দেওয়াল কেন, যে কোন দ্রব্য কোন বাষ্প বা অনিলের মধ্যে অবস্থান করে, তাহার পিঠেও ঐরূপ অবিরত ধাক্কা পড়িবে ও তাহার দরুণ চাপ পড়িবে।

বাক্সের ভিতরে যে বাষ্পটা আছে তাহার উপর আরও খানিকটা বাষ্প প্রবেশ করান যায়, তাহাতে অণুর সংখ্যা বাড়াইয়া দেওয়া হইল, কয়েক কোটি অণু আগেই ছিল তাহার উপর আরও কয়েক কোটি প্রবেশ করিল। ইহারাও ধাক্কা দিতে থাকিবে, চাপের মাত্রা আরও বাড়িবে। ফলেও তাহাই দেখা যায়।

বাষ্পের পরিমাণ না বাড়াইয়া যদি বাক্সটাকে ছোট করা যায়; অর্থাৎ যে বাষ্পটুকু বৃহৎ বাক্সে ছিল, সেই বাষ্পটুকু ছোট বাক্সে রাখা যায় তাহা হইলে কি হইবে? এবার সেই সমুদায় অণু আরও অল্প জায়গাতে ছুটিতে লাগিল। অল্প জায়গাতে অধিক অণু থাকিলে ঠোকাঠুকিও বাড়িয়া যাইবে। খোলা জায়গা কম পাওয়াতে অণুতে অণুতে ঠোকাঠুকি ও অণুতে দেওয়ালে ঠোকাঠুকি বাড়িয়া যাইবে। আগে যেখানে যে সময়ে একটা ধাক্কা পড়িত, এখন সেইখানে সেই সময়ে হয়ত পাঁচটা ধাক্কা পড়িবে। অণুর সংখ্যা মোটের উপর

বাড়ে নাই বটে কিন্তু ধাক্কার সংখ্যা বাড়িয়াছে। কাজেই চাপও বাড়িয়া যাইবে।

ফলেও তাহাই দেখা যায়। অনিলই বল আর বাষ্পই বল উহাকে সঙ্কুচিত করিলে, উহার আয়তন কমাইলে, অর্থাৎ বড় জায়গা হইতে ছোট জায়গায় আবদ্ধ করিলে চাপ বাড়ে। তাহা স্পষ্ট রবার্ট বয়েল প্রথম প্রত্যক্ষ দর্শনে আবিষ্কার করিয়াছিলেন। উহা পূর্ব্বে বলা গিয়াছে।

৪। তার পর উষ্ণতা। উষ্ণতা বাড়িলে চাপ বাড়ে তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। ইহা প্রত্যক্ষলব্ধ তত্ত্ব,—ইহার উপরে কথাটি বলিবার জো নাই। এখন এই চাপ বাড়িবার কারণ কি বুঝিবার চেষ্টা করা যাউক।

এক একটি অণু যতই ছোট হউক উহার কিঞ্চিৎ বস্তু আছে, আর বেগও আছে; অতএব ঝোঁকও আছে। বস্তু আর ঝোঁকের গুণফলের অর্দ্ধেকের নাম যানশক্তি। অতএব প্রত্যেক অণুরই একটু যানশক্তি আছে। বাষ্পের ভিতরে যে কয় কোটি অণু রহিয়াছে তাহাদের প্রত্যেকের যানশক্তি রহিয়াছে। ঐ যানশক্তির সমষ্টিটাই হইল ঐ বাষ্পে নিহিত তাপ।

এখন যদি বাষ্পে আরও খানিকটা তাপ দেওয়া যায়, তাহা হইলে প্রত্যেক অণুরই যানশক্তি একটু করিয়া বৃদ্ধি পাইবে। বস্তুর বৃদ্ধি হইতে পারে না তাহা পূর্ব্বে দেখা গিয়াছে। অতএব বেগের বৃদ্ধি হয়, ঝোঁকের বৃদ্ধি হয়। আর প্রত্যেক অণুর ঝোঁক বাড়িলে শত কোটি অণুর ঝোঁকের ধাক্কার ফল যে চাপ, সেই চাপও বাড়িয়া যাইবে।

বাষ্পাবস্থ ও অনিলাবস্থ পদার্থ কিরূপে চাপ দেয়, আয়তনের হ্রাস ও উষ্ণতার বৃদ্ধি ঘটিলে সেই চাপ কিরূপে বাড়িয়া যায়, যানশক্তি

কিরূপে তাপে পরিণত হয়, এই কয়েকটি বিষয়ের একরকম সুন্দর ব্যাখ্যা পাওয়া গেল। কাজেই পদার্থবিৎ পণ্ডিতের এই অনুমান অগ্রাহ্য করিবার নহে; বরঞ্চ শ্রদ্ধার বিষয়। বস্তুতই এখন আমরা বিশ্বাস করি যে, বাষ্পাবস্থায় ও অনিলের অবস্থায় অণুগুলি ঐরূপেই ইতস্ততঃ ভীমবেগে ছুটাছুটি করিয়া থাকে। অণুগুলি পরস্পর দূরে থাকিয়া আপন আপন পথে ছুটিয়া বেড়ায়, তবে মাঝে মাঝে তাহাদের ঠোকাঠুকি হয়। ঠোকাঠুকির সময় উহাদের পরস্পর একটা সম্পর্ক ঘটে; দুইটা অণু আপন পথে চলিতেছিল, হঠাৎ ধাক্কা লাগিয়া এটা গেল এ-পথে, ওটা গেল ও-পথে। কিন্তু প্রশ্ন উঠে যে, এই ঠোকাঠুকির সময় ব্যতীত অন্য সময় উহাদের পরস্পরের কোন সম্পর্ক থাকে কি না? একটা অণু আর একটা অণু হইতে দূরে থাকিয়াও উহার গতিবিধি কোনরূপে পরিবর্ত্তিত করিতে পারে কি না? চাঁদ পৃথিবী হইতে এত দূরে থাকিয়াও যখন পৃথিবীর সম্পর্ক ছাড়িতে পারে না, পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়ায়, সেইরূপ একটা অণু দূরস্থ অন্য অণুর গতিবিধির উপর কোন প্রভুত্ব রাখে কি না? পৃথিবীর ও চাঁদের ক্ষেত্রে বলা যায় উহারা এত দূরে থাকিয়াও পরস্পরকে আকর্ষণ করে, ঐরূপ অণুদের পরস্পর কোন আকর্ষণ বা বিকর্ষণ আছে কি না? এক কালে কোন কোন পণ্ডিত বলিতেন, অনিল পদার্থের অণুগুলির মধ্যে পরস্পর আকর্ষণ নাই, বরং বিকর্ষণ আছে এবং তাহার ফলেই এ উহার কাছ হইতে দূরে পলাইতে যায়, কেহ কাহারও নিকটে যাইতে চায় না। এইরূপ পলায়ন-প্রবণতা আছে বলিয়াই অনিল পদার্থকে কোন পাত্র মধ্যে আটকান এত কঠিন। মুখ খোলা পাইলেই সেই পথে বাহির হইয়া আসে। এই বিকর্ষণের কথা অনেক বৈজ্ঞানিক গ্রন্থেও একালে দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু বস্তুতঃ এরূপ বিকর্ষণের অস্তিত্ব অনুমান

আবশ্যক নাই। উপরে বলা গিয়াছে অণুগুলি বেগে ভ্রমণশীল, উহারা বেগে ছুটিতেছে বলিয়াই উহাদের পলায়নে প্রবৃত্তি। এই ভ্রমণশীলতার জন্য যে যানশক্তি আবশ্যক, তাহা উহাদের আছে। গ্রহ-উপগ্রহগণ যেমন আপন আপন বেগে গগনমার্গে ভ্রমণশীল, উহারাও তেমনি আপন আপন বেগে ভ্রমণশীল, কোন পদার্থ যতই শীতল হউক উহাতে কতকটা তাপ আছেই ; আর সেই তাপ যখন অণুসমূহের যানশক্তি মাত্র, তখন ত এই বেগে ভ্রমণশীলতা থাকিবেই। ইহার জন্য কোনরূপ বিকর্ষণের অস্তিত্ব কল্পনার প্রয়োজন নাই।

বরং এক-আধটু আকর্ষণের পক্ষে প্রমাণ আছে। সূক্ষ্ম পরিমাপ দ্বারা দেখা গিয়াছে যে বাষ্প সকল ও অনিল সকল বয়েলের আবিষ্কৃত নিয়মটা ষোল আনা মানিয়া চলে না। প্রত্যেকেরই ক্ষেত্রে উক্ত নিয়ম হইতে এক-আধটু ব্যত্যয় আছে। সেই ব্যত্যয়টুকু বুঝাইতে বরং আকর্ষণের অস্তিত্ব অনুমান করিতে হয় ; বিপ্রকর্ষণের অস্তিত্ব অনুমান করিতে হয় না। বান্দার ওয়ালস্ নামক ওলন্দাজ পণ্ডিত এ বিষয়ে অনেক আলোচনা করিয়াছেন। এখানে তাহা তুলিলে পাঠকের প্রীতিকর হইবে না।

তবে আকর্ষণের মাত্রা যৎসামান্য। অণু দুইটি যখন খুব নিকটে আইসে, তখনই এই আকর্ষণের কাজ কতকটা বুঝা যায়। একটু দূরে গেলেই সে আকর্ষণ একেবারে নগণ্য হইয়া পড়ে। দুইটা অণু খুব কাছাকাছি আসিয়াছে ; স্পর্শ করে নাই, স্পর্শ করে-করে হইয়াছে, তখনই এই আকর্ষণের মাত্রাটা গণনার আমলে আসে, তখন এ উহাকে আটকাইয়া ধরিয়া রাখিতে চায়।

বাক্সের ভিতর বাষ্পের পরিমাণ যদি ক্রমেই বাড়ান যায়, ভিতরে চাপ ক্রমেই বাড়ে। আর এই অণুর সংখ্যাও ক্রমশঃ বাড়িয়া যাওয়ায়

অণুদের পরস্পর দূরত্ব ক্রমেই কমিতে থাকে। অবশেষে এমন সময় আসে যখন সেই স্থানের মধ্যে এত অণুর সমাবেশ হইয়াছে যে, তখন আর পরস্পরের মধ্যে অধিক ব্যবধান নাই। এক বিঘা জমিতে যদি দশ জন লোক চোক বাঁধিয়া ছুটাছুটি করে, তখন তাহাদের পরস্পর ব্যবধানও মোটের উপর বেশী থাকে ও ছুটিবার সময় পরস্পর ধাক্কার সম্ভাবনাও কম থাকে। কিন্তু সেই জমিতে হাজার লোককে চোক বাঁধিয়া ছুটিতে বলিলে উহাদের পরস্পর ব্যবধানও থাকে না, ও দুই পা অগ্রসর হইতেই অন্যের সহিত ধাক্কার সম্ভাবনা ঘটে। এ ক্ষেত্রেও সেইরূপ। অণুর সংখ্যা খুব অধিক হইলে পরস্পর সান্নিধ্য হেতু পরস্পরের মধ্যে আকর্ষণের মাত্রাটাও গণনার বিষয় হয়, আর স্বাধীনভাবে সোজা পথে অধিক দূর ছুটিবার উপায় থাকে না। তখন কেবলই ঠোকাঠুকি ঘটে। অণুর সংখ্যা বৃদ্ধিতে যখন উহারা গায়ে গায়ে লাগিবার উপক্রম করে, তখন ঐরূপ স্বাধীন গতির অবকাশ থাকেই না, তবে একটা ভিড়ের মধ্যে লোকগুলিকে যেমন ভিড় ঠেলিয়া এদিক ওদিক চলিতে হয়, দশ বারে দশ জায়গায় ধাক্কা খাইয়া অনেক চেষ্টার পরে খানিকটা অগ্রসর হইতে হয়, অণুদেরও অবস্থা সেইরূপ ঘটে।

অণুগুলির এই অবস্থা ঘটিলে আমরা বলি জিনিসটা আর অনিলাবস্থায় বা বাষ্পাবস্থায় নাই, উহা এখন তরলাবস্থা পাইয়াছে। বাক্সের ভিতর বাষ্পের পরিমাণ বাড়াইতে বাড়াইতে এমন সময় আসে তখন আর নূতন বাষ্প কুলায় না, তখন যেটা প্রবেশ করান যায় সেটা তরল অবস্থায় যায়। বাষ্পের তখন তরলতাপাদন ঘটে।

বাষ্পকে ক্রমে সঙ্কুচিত করিয়া অল্প স্থানে আবদ্ধ করিলে কেন পরিশেষে তাহার তরলতা প্রাপ্তি ঘটে, এখন বুঝা গেল। ১৭০০ ঘন

ফুট জলের বাষ্পকে ক্রমে সঙ্কুচিত করিয়া এক ঘন ফুটে আবদ্ধ করিলে অণুগুলি প্রায় গায়ে গায়ে ঠেকিয়া পড়ে, তখন উহাদের আর বেগে বহুদূর ছুটিবার অবকাশ থাকে না; কেবল ভিড় ঠেলিয়া বহুক্ষণে অল্পদূর চলিতে পারে মাত্র।

লোকের ভিড়ের যে অবস্থা তরল পদার্থের অণুগুলির সেই অবস্থা। ভিড়ের মধ্যে লোকের মাঝে মাঝে কিছু কিছু ব্যবধান না থাকে এমন নহে, একবারে হাত পা বাঁধা হইয়া থাকিতে হয় না। তরল পদার্থের অণুদের মাঝেও কিঞ্চিৎ ব্যবধান থাকে। নতুবা তরল পদার্থকে চাপ দিয়া সঙ্কুচিত করা অসাধ্য হইত। প্রবল চাপ দিলে সকল তরল পদার্থই একটু না একটু সঙ্কুচিত না হয় এমন নহে। স্থিতিস্থাপকতা বিচারের কালে বলা গিয়াছে তরল পদার্থ মাত্রেরই সঙ্কোচ্যতা আছে। আবার এইরূপ যৎকিঞ্চিৎ ফাঁক থাকে বলিয়াই অণুগুলিকে একবারে নিশ্চল থাকিতে হয় না। উহারা ভিড় ঠেলিয়া এদিক ওদিক চলিতে পারে। জলের মধ্যে কোথাও এক ফোঁটা আলতা দিলে ঐ আলতা জলের মধ্যে পরিব্যাপ্ত হয়। ইহাতে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে তরল পদার্থের অণু একেবারে নিশ্চল নহে, উহাদেরও বেগ আছে অতএব চলৎশক্তি বা যানশক্তি আছে, সে বেগও নিতান্ত সামান্য না হইতে পারে, কিন্তু স্থানাভাবে সেই বেগ সত্ত্বেও উহারা এক মুখে অধিক দূর চলিতে পারে না। কেবলই ধাক্কা খাইয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া অধিক সময়ে অল্প দূর যাইবার অবকাশ পায় মাত্র।

একটা বোতলে বায়ু পূরিলে উহা বোতলের সমস্তটা অধিকার করিয়া বসে, তা যত অল্প বায়ু হউক না, কিন্তু জল পূরিলে উহা বোতলের কিয়দংশ মাত্র অধিকার করে। বোতলের অধোভাগটা মাত্র অধিকার করে; কাজেই তরল দ্রব্যের একটা নির্দ্দিষ্ট আয়তন

থাকে। উহার একটা সমতল পিঠ দেখা যায়, সেই পিঠের উপর আর তরল জল থাকে না। এই জন্যই নদীতে, কূপে, তড়াগে জল সঞ্চিত থাকে। বায়ু কিংবা বাষ্প কোন পুষ্করিণীতে ওরূপে সঞ্চয় রাখা চলিত না। তরল পদার্থের অণু খুব কাছাকাছি থাকে ও কাছাকাছি থাকিলেই পরস্পরের আকর্ষণের মাত্রাটাও কতকটা প্রবল হয়, তাই পরস্পরকে নির্দ্দিষ্ট সীমার মধ্যে আটকাইয়া রাখিতে চায়। পরস্পরের মধ্যে এই জড়াজড়ি আটক।-আটকি ব্যাপার আছে বলিয়াই তরল পদার্থের নির্দ্দিষ্ট আয়তন, জলাশয়ে জলসঞ্চয়ের সম্ভাব্যতা। কিন্তু তাই বলিয়া সমস্ত জলটাকেই যে এরূপে আটকান চলে, জলের অণুগুলির পলায়নে প্রবৃত্তি নাই, এরূপ বলা চলে না। জলের অণুরা ত নিশ্চল নহে, উহাদেরও বেগ আছে, যানশক্তি আছে, পলাইবার প্রবৃত্তি আছে। তবে ভিড় ঠেলিয়া চলিবার অবকাশ পায় না, তাই জড়াজড়ি ছাড়াইয়া ঠেলাঠেলি করিয়া চলে। জলের পিঠের নিকট অণুগুলি অনেকটা স্বাধীন; তাহাদের নিম্নে অধোভাগে ভিড় কিন্তু উর্দ্ধভাগে খোলা জায়গা, সেখানে ভিড় নাই। তাই সেই খোলা জায়গাতে অণু ক্রমাগত উর্দ্ধগামী হইতে চাহে। জল যত গরম বা যত ঠাণ্ডাই হউক না কেন, উহার পিঠ হইতে বাষ্প উঠে, তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। জলাশয়ের পৃষ্ঠ, নদী-পৃষ্ঠ, সাগর-পৃষ্ঠ হইতে ক্রমাগত বাষ্প উঠিতেছে। বোতলের অধোভাগে জল থাকিলেও উহার উর্দ্ধভাগে জলের বাষ্প থাকে, একবারে শূন্য থাকে না। তাহার কারণই উহাই। পিঠ ছাড়িয়া অণুগুলি ছুটিয়া বাহিরে আসিতেছে, তখন আর তাহাদিগকে কে পায়। বোতলের মুখ বন্ধ করিয়া তাহাদিগকে আটকাইয়া রাখিতে পার, তাহা নহিলে খোলামুখ দিয়া বাহির হইয়া আসিবে ও কালে সমস্ত জলই বাষ্পীভূত হইয়া যাইবে।

বাস্তবিকই একখানা থালায় জল রাখিয়া দিলে উষ্ণতাভেদে কয়েক ঘণ্টায় বা কয়েক দিনে সমস্ত জলটাই বাষ্পীভূত হইয়া ঊর্দ্ধে বায়ু-সাগরে মিশিয়া যায়; এক ফোঁটা জলও শেষ পর্য্যন্ত অবশেষ থাকে না। গরম জলের অণুর বেগ বেশী তাই অণু সকল পিঠ হইতে শীঘ্র শীঘ্র পলায়; ঠাণ্ডা জলের অণুর বেগ তদপেক্ষা কম তাই কিছু বিলম্ব হয় এই প্রভেদ।

বোতলে ছিপি দিয়া রাখিলে কাকের সচ্ছিদ্র ছিপি না হইয়া কাঁচের নিরেট ছিপি হইলে কিন্তু সমস্ত জলের বাষ্প হওয়া ঘটে না। কতকটা জল বাষ্প হইয়া বোতলের ঊর্দ্ধ ভাগটায় সঞ্চিত হয়, উহার অণুগুলি সেইখানে ছুটাছুটি করে; কিন্তু একটা সীমা আছে; সেই ঊর্দ্ধভাগে অণুর সংখ্যা বাড়িতে বাড়িতে শেষে এমন সময় আসে, যখন সেই জায়গায় আর অধিক অণু স্থান পায় না। কেন না পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বাষ্পের অণুর ঘনসন্নিবেশের একটা সীমা আছে, সেই সীমায় পৌঁছিলে অণুগুলি পরস্পর প্রবল আকর্ষণের আমলে আসে, ও বাষ্পের তখন তরলতা-প্রাপ্তি ঘটে।

যখন এই সীমায় পৌঁছায় তখন বাষ্পীভবন কাজেই ক্ষান্ত হয়। ক্ষান্ত হয় বলিয়া জলের পিঠ ছাড়িয়া কোন অণুই আর ছুটিয়া পলাইয়া যাইতেছে না, ইহা মনে করিবার কারণ নাই। কতক অণু জল ছাড়িয়া ঊর্দ্ধে ছুটিয়া আসিতেছে, তেমনি ঊর্দ্ধ ভাগে বাষ্পের অন্তর্গত কতক অণু নিম্ন মুখে ছুটিয়া গিয়া জলের পিঠের সমীপে আসিয়া সেই অণুর আকর্ষণে আটকা পড়িয়া তরল জলের অন্তর্ভুক্ত হইয়া যাইতেছে। যত অণু জলের বাহিরে আসিতেছে, তত অণুই আবার জলের ভিতরে প্রবেশ করিতেছে, এইরূপ অনুমানই সঙ্গত। মোটের উপর বোতলের ঊর্দ্ধ সংখ্যা বাড়িতে পাইতেছে না। আমরা ত অণুগুলি দেখি না,

আমরা মোট বাষ্পের পরিমাণ দেখি। বাষ্পের পরিমাণ আর বাড়িতে দেখি না।

বোতলের মুখে ছিপি দেওয়ার এই ফল। ছিপি না দিলে অবশ্য বোতলের সমস্ত অণুই কালক্রমে খোলামুখ দিয়া বাহিরে আসিয়া পড়িত। বাহিরে এত যায়গা যে সেখানে প্রচুর অণুর সমাবেশেও ভিড় ঘটে না। যখন ঘটে, তখন মেঘ হয়, কুয়াসা হয়, শিশির হয়।

তরলের সহিত বাষ্পের আর অনিলের প্রভেদ কিরূপ তাহা বুঝা গেল। বাষ্পে আর অনিলে প্রচুর অবকাশ বা স্থান থাকায় অণুগুলি স্বাধীন বিচরণের সুবিধা পায়, তাই মাঝে মাঝে ঠক্কর খাইয়াও প্রবল বেগে বহুদূর ছুটিতে যায়, আর তরলের অণুগুলিকে পরস্পরের জড়াজড়ি ছাড়াইয়া ভিড় ঠেলিয়া প্রবল বেগ সত্ত্বেও ধীরে চলিতে বাধ্য হইতে হয়। তরলের পিঠের নিকট অনেকটা স্বাধীনতা থাকায় সেখানে বাষ্পীভবন ঘটে। আর উষ্ণতা-বৃদ্ধির সহিত অণুগুলির বেগবৃদ্ধি ঘটে। শেষে এত ঘটে যে তখন অণুগুলি আর কোন বন্ধন মানিতে চায় না। তরলের ভিতর হইতেও জল ঠেলিয়া ও উপরের অণু সমূহের চাপ ঠেলিয়া বাহিরে বেগে বাহির হইতে থাকে, তখন জল ফুটিতে আরম্ভ করে।

বাষ্পের অবস্থা অনেকটা অনিলেরই সমান, তবে একটু প্রভেদ আছে। বাষ্পকে সঙ্কোচন দ্বারা তরল পদার্থে পরিণত করা চলে, কিন্তু অনিলকে যতই সঙ্কোচ কর উহা তরলে পরিণত হইবে না।

একই জিনিষ উষ্ণতাভেদে বাষ্প হয় বা অনিল হয়। প্রত্যেকের পক্ষেই একটা উষ্ণতার সীমা আছে, উষ্ণতা তাহার উপর থাকিলে, অনিল, তখন তরলতাপাদন ঘটে না। আর নীচে থাকিলেই বাষ্প, তখন তরলতাপাদন সম্ভাব্য।

উষ্ণতাবৃদ্ধির অর্থ অণুগুলির বেগের বৃদ্ধি। অতি অধিক বেগ থাকিলে অণুগুলি যে কোন বাঁধনেই ধরা দিবে না, বাঁধন ছাড়িয়া পলাইবে, আর অল্প বেগ থাকিলে ধরা দিয়া ভিড়ে প্রবেশ করিবে, ইহা বোঝা কঠিন নহে।

এই বার কঠিনের কথা। তরলপদার্থ ঠাণ্ডা হইলে শেষ পর্য্যন্ত কঠিন হয়। তখন আয়তন আরও কমে। জলের ব্যবহারটা বিপরীত তাহা আগেই বলিয়াছি। তবে সাধারণ নিয়ম এই যে, তরল পদার্থ কঠিন হইয়া সংহত হইলে তখন আয়তন একটু কমে। কাজেই বুঝিতে হইবে, অণুর ভিড়টা তখন আরও জমাট হইয়াছে; অণুগুলি পরস্পর আরও সন্নিহিত হইয়াছে। মাঝে ফাঁক আছে, না একেবারে লোপ পাইয়াছে? আছে বৈকি, কেন না, অত্যধিক চাপে কঠিন পদার্থ মাত্রই,—লোহাই হউক আর সোণাই হউক—কিছু না কিছু সঙ্কুচিত হয়। কঠিন পদার্থেরও আয়তনগত স্থিতিস্থাপকতা আছে বলা গিয়াছে। আবার কঠিন পদার্থের সচ্ছিদ্রতা অনেক সময় প্রত্যক্ষগোচর। নিরেট দেখাইলেও উহার ভিতর ছোট ছোট ছিদ্র থাকে। মাটীর কলসীর বা কয়লার সচ্ছিদ্রতা ত এক রকম চোখেই দেখা যায়, উহার ভিতর দিয়া বায়ুর ত কথাই নাই, তরল পদার্থও বাহির হইয়া আসে। কাজেই ছিদ্রও বড় বড়। সোণার মত, সীসার মত নিরেট জিনিষও সচ্ছিদ্র, তাহার ভিতর দিয়াও জল গলিয়া আসিতে পারে, তাহা দেখান যাইতে পারে। এ সব ছোট বড় ছিদ্রের কথা থাক, ইহা কঠিন পদার্থের সঙ্কোচ্যতাই সপ্রমাণ করিতেছে; অণুগুলি যতই ঘনসন্নিবিষ্ট হউক উহাদের মধ্যে সামান্য অবকাশ আছে। বস্তুতঃ উহারাও একেবারে গায়ে গায়ে সংলগ্ন হইয়া নাই।

তারপর কথা উঠে, অণুগুলি সেই ভিড় ঠেলিয়া চলিতে পারে কি না? উহাদের গতি আছে কি না?

এইখানে তরলে কঠিনে ব্যবহারের প্রভেদ দেখা আবশ্যক। অনিল বা বাষ্প যে পাত্রে থাকে, সেই পাত্রের গায়ে চাপ দেয়। তরল পদার্থও যে পাত্রে থাকে সেই পাত্রের গায়ে চাপ দেয় এবং সেই চাপ সর্ব্বতোমুখ চাপ—ঊর্দ্ধমুখ, নিম্নমুখ, পার্শ্বমুখ। শুধু পাত্রের গায়ে কেন, কোন কঠিন দ্রব্য অনিলে, বাষ্পে বা তরলে নিমগ্ন করিলে সেই দ্রব্যের আশে-পাশে উপরে-নীচে সকল দিকেই চাপ পড়ে ও সেই চাপের ঠেলে কঠিন দ্রব্যটা একটু ঊর্দ্ধগামী হইবারই চেষ্টা করে। প্রত্যক্ষদৃষ্টিতে উহার ভার যেন কমিয়া যায়। অনিলের, বাষ্পের, তরলের এই সর্ব্বতোমুখ চাপ বেশ বুঝা যায়। অণুগুলির বেগে গতিমত্তাই এই চাপের কারণ। প্রত্যেক অণু ঝোঁকের সহিত গিয়া ধাক্কা দেয় ও ধাক্কা খাইয়া ঝোঁকের সহিত ফিরিয়া আইসে, সেই জন্যই এই চাপ। অনিল, বাষ্প ও তরল সকলেরই অণু গতিশীল; তাই সকলেই চাপ দেয়। কিন্তু কঠিনের এইরূপ চাপ দিবার ক্ষমতা আদৌ নাই। একটা পাত্র লোহাচূরে বা বালিতে বা মাটিতে পূর্ণ করিলে পাত্রের তলদেশে চাপ পড়ে বটে, সে চাপ ভারের দরুণ চাপ। সে চাপ সকল পদার্থেরই আছে। উহার সহিত মাধ্যাকর্ষণের সম্বন্ধ। পৃথিবীর সান্নিধ্য উহার হেতু। পৃথিবী ছাড়িয়া বহু দূরে গেলে এই চাপের মাত্রা কমিয়া যায়; চন্দ্রের নিকটে গেলে নব্বই মণের চাপ এক সেরের চাপের সমান হইয়া দাঁড়ায়। আর আশে-পাশে বা ঊর্দ্ধ মুখে চাপ দিবার ক্ষমতা কঠিন পদার্থের আদৌ নাই। তরলের আর অনিলের যে চাপের ক্ষমতা আছে, কঠিনের সে ক্ষমতা আদৌ নাই। তরলের

বা অনিলের অণুগুলিকে চলন্ত অণু মনে করা গিয়াছে, উহারা চলিতে চলিতে ঝোঁকের সহিত ধাক্কা দেয় বলিয়া চাপ দেয়। কঠিন পদার্থ যখন চাপ দেয় না তখন উহার অণুগুলিকে আর চলন্ত মনে করা চলে না। উহারা স্বস্থানে স্থির আছে। আপন আপন স্থান ছাড়িয়া উহারা অন্যত্র চলে না। অনিলের, বাষ্পের ও তরলের অণুগুলির বৈশিষ্ট্য যে চাঞ্চল্য, ছুটাছুটি, কঠিনের অণুগুলি সেই চাঞ্চল্যে বর্জ্জিত। তাই তাহারা এদিকে ওদিকে ছুটিয়া ধাক্কা দিতে পারে না ও চাপ দিতে পারে না। তবে পৃথিবীর সান্নিধ্যে পৃথিবীর কেন্দ্রমুখে অন্যান্য জিনিষের মত চলিতে পারে ও তজ্জন্য অধোমুখে একটা চাপ দেয় বটে। একখানা সীসার ফলকের উপর একটা খাঁটি সোণার স্তম্ভ কয়েক বৎসর ধরিয়া চাপাইয়া রাখাইয়া পরে সেই সোণা বিশ্লেষণ করিয়া উহাতে কিঞ্চিৎ সীসা পাওয়া গিয়াছিল। সীসার অণুগুলি ঊর্দ্ধমুখে আপনা হইতে উঠিয়া সোণার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল, ইহাতে কঠিন পদার্থের অণুগুলির চাঞ্চল্যের কিঞ্চিৎ প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। বহু বৎসরে অল্প মাত্রায় যে সীসক স্বর্ণে প্রবেশ করিয়াছিল তাহার পরিমাণ এত সামান্য যে উহা ধর্ত্তব্যের মধ্যে নহে। কঠিন পদার্থের অণু একেবারে স্থির—একেবারে চাঞ্চল্যবর্জ্জিত বলিলে বোধ করি ঠিক হয় না, তবে সেই চাঞ্চল্য এত সামান্য যে তাহার দরুণ চাপ ধর্ত্তব্যের মধ্যে নহে। মোটামুটি কঠিন পদার্থের অণুকে স্থিরস্বভাব মনে করিলে ভুল হইবে না।

একেবারে যে স্থিরস্বভাব নহে তাহা মনে করিবার আরও কারণ আছে। তরল পদার্থের পিঠ হইতে যেমন বাষ্প নির্গত হয়, কঠিনের পিঠ হইতেও অল্পবিস্তর মাত্রায় বাষ্প উঠে। বরফের পিঠ হইতে অবিরত বাষ্প উঠে। কর্পূরের মত কঠিন দ্রব্য কালক্রমে অদৃশ্য

হয়, ইহার অর্থ উহার পিঠ হইতে ক্রমাগত বাষ্প নির্গত হইতেছে। কঠিন পদার্থ প্রথমে তরল ও তরল পদার্থ বাষ্প হয়, ইহাই সর্ব্বদা পরিচিত ঘটনা, কিন্তু কঠিন পদার্থ তারল্য না পাইয়াও একেবারে বাষ্পীভূত হইতেছে ইহাও নিতান্ত অপরিচিত ঘটনা নহে; এই ঘটনাকে উবিয়া যাওয়া বলে। অতএব মনে করিতে হইবে, কঠিন পদার্থের পিঠের কাছের অণুগুলি অন্ততঃ চঞ্চল, তাহারা ছুটিয়া বাহিরে যাইতেছে। তবে ভিতরের অণুতে ততটা চাঞ্চল্য না থাকিতেও পারে।

কর্পূর প্রভৃতি দ্রব্যের গন্ধ দূরে হইতে পাওয়া যায়, তাহারও এই কারণ। উহার অণুগুলি ছুটিয়া আসিয়া নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করিলে তবে ত গন্ধ পাওয়া যায়। তামা, লোহা প্রভৃতি ধাতু-দ্রব্যেরও নাকি কিরূপ একটা মৃদু গন্ধ আছে। যাঁহাদের ঘ্রাণেন্দ্রিয় তীক্ষ্ণ, তাঁহারা গন্ধদ্বারা ধাতুও চিনিতে পারেন। তাহা হইলে ঐ সকল ধাতুর পিঠ হইতেও অণুগুলি ছুটিয়া আসিতেছে অনুমান চলিতে পারে।

পিঠের কাছে যাহাই হউক, কঠিন পদার্থের অভ্যন্তরে অণুগুলি স্থিরস্বভাব মনে করা চলে। যদি বা কিঞ্চিৎ চাঞ্চল্য থাকে, তাহা ধর্ত্তব্যের মধ্যে নহে। তাহারা শুধুই যে স্থিরস্বভাব, তাহারা যে স্বস্থানে প্রায় অবিচলিত ভাবে দাঁড়াইয়া থাকে তাহা নহে। স্থানবিশেষে তাহাদের দাঁড়াইবার একটা প্রথা বা প্রণালী আছে।

অনেক কঠিন পদার্থ দানা বাঁধে। সকলে না বাঁধিলেও অনেকে বাঁধে, তাহা পূর্ব্বে বলা গিয়াছে। চিনির মত জীবজ পদার্থ দানা বাঁধে। তুঁতে, হীরাকস, সোরার মত লাবণিক পদার্থ দানা বাঁধে, গৈরিক আকরিক পদার্থ অনেকে দানা বাঁধিয়া থাকে। সীসা, তামা,

লোহার মত ধাতুতেও দানা বাঁধে। বরফের দানা আপাততঃ দেখা যায় না, কিন্তু উহার কণিকাগুলিও সুন্দর ষট্‌কোণ দানার আকারে সাজান, তুষার-কণিকায় তাহা স্পষ্ট দেখা যায়। এই সকল দানাদার পদার্থের অণুগুলি কেবল যে দাঁড়াইয়া আছে তাহা নহে, বেশ একটা প্রণালীক্রমে সাজান আছে মনে করিতে হয়। এলোমেলো হইয়া থাকিলে ওরূপ দানা বাঁধিত না। ত্রিকোণ জমির উপর একটা পিরামিড তুলিয়া এইরূপ দুইটা পিরামিড একই জমির দুই দিকে সংলগ্ন করিলে যেমন দেখায়, হীরকের দানাও দেখিতে সেইরূপ। হীরা কয়লারই রূপান্তর, পোড়াইলে হীরা ও কয়লা উভয় জিনিষই অম্লানযুক্ত হইয়া একই অনিলে পরিণত হয়। ঐ অনিল চুণের জলকে ঘোলা করে। কাজেই, হীরা ও কয়লা একই জিনিষের রূপান্তর। তবে কয়লা দানা বাঁধে না। উহার অণুগুলি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত এলোমেলো হইয়া বর্ত্তমান, কোনরূপ একটা সজ্জা বা শৃঙ্খলা নাই। কিন্তু হীরক অতি সুন্দর দানা বাঁধে। উহার অণুগুলি বেশ প্রণালী-মত সাজান রহিয়াছে।

কতকগুলি লোক এক জায়গায় ভিড় করিয়া থাকিতে পারে; আবার তাহারাই একটা শৃঙ্খলাক্রমে সারি বাঁধিয়া দাঁড়াইলেই বা কেমন দেখায়। সেনাপতি যুদ্ধের সময় সৈন্যদিগকে একটা বিশেষ রকমে সাজাইয়া ব্যূহ রচনা করেন। থিয়েটার গ্যালারিতে দর্শকেরা থাকে থাকে বসিয়া থাকে। ক্লাসে ছাত্রেরা সারি বাঁধিয়া পণ্ডিত মহাশয়ের সম্মুখে ও দুই পাশে বেঞ্চের উপর বসে। ঐরূপ সাজানই, প্রণালী-মত সাজান। ঐরূপ সাজাইলে অবশ্য আর যার যেখানে ইচ্ছা তার সেখানে থাকা চলে না। মাঠের মধ্যে ইষ্টকরাশি স্তূপাকার করিয়া রাখিলে এক রকম দেখায়, আর সেই ইষ্টকগুলি একখানির পাশে

একখানি, একখানির উপর একখানি, প্রণালী-মত সাজাইলে তাহাতেই সুরম্য অট্টালিকা হয়, তাহা কেমন সুন্দর। কিন্তু প্রত্যেক ইষ্টক যথাস্থানে বিন্যস্ত করা চাই। যিনি সাজাইয়াছেন তাঁহার অভিপ্রায়-মত গাঁথা চাই, যেখানে সেখানে রাখা চলিবে না। সেইরূপ ব্যূহ-মধ্যে সৈন্যেরা নিজের ইচ্ছামত দাঁড়াইতে পারে না, সেনাপতির ইচ্ছামত দাঁড়ায়; ক্লাসের ছেলেরা মাষ্টার মহাশয়ের অভিপ্রায়-মত বসে। দানাদার পদার্থের অণুগুলিও ঐরূপ যেন কোন একটা অভিপ্রায়-মত সাজান হইয়াছে। অণুগুলির আর স্বাধীনতা নাই। তরল ও অনিলের অণুগুলি যেমন যথেচ্ছভাবে অসংযতভাবে এদিকে ওদিকে ছুটিয়া স্বাধীনভাবে বিচরণ করিতেছে, দানাদার কঠিন পদার্থের অণুগুলির সেই স্বাধীনতা নাই; উহারা ইচ্ছামত ছুটাছুটি করিতে অসমর্থ। উহাদের উপর যেন একটা কঠিন হুকুম কোথা হইতে আসিয়াছে। সেই হুকুমের প্রতিপালনে উহারা বাধ্য।

অণুগুলির কি নিজেরই এমন একটা ক্ষমতা আছে যে, আপন আপন স্থান পছন্দ করিয়া নির্ব্বাচন করিয়া আপনাদিগকে শৃঙ্খলা-বদ্ধ শ্রেণীবদ্ধ করিয়া সাজাইয়া লইতে পারে, অথবা বাহিরের কোন কর্ত্তার বা বিধাতার আদেশক্রমে বা অভিপ্রায়ক্রমে উহারা ঐরূপ সজ্জিত থাকে; তাহা একটা দর্শনশাস্ত্রের সমস্যা। এস্থানে ঐ সমস্যাটার উল্লেখমাত্র করিয়া নিরস্ত থাকিলাম। স্থানান্তরে পুনরায় ইহার আলোচনা করা যাইবে। যাঁহারা অধিক মাত্রায় কাব্যরস-পিপাসু, তাঁহারা এই স্থলে নানা কাব্যরসের অবতারণার অবকাশ পাইবেন।

কঠিন পদার্থের এই দানা বাঁধিবার প্রকৃতিতে স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যাইতেছে যে, উহাদের সম্পূর্ণ চাঞ্চল্য, সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য নাই। প্রত্যেক অণুকে তাহাদের পার্শ্ববর্ত্তী অণুর মুখ চাহিয়া দাঁড়াইতে হয়।

ছুটাছুটি করিবার অবকাশ থাকে না। অর্থাৎ মোটের উপর কঠিন পদার্থের অণু স্থিরস্বভাব।

কিন্তু এইখানে আর একটা প্রশ্ন আইসে। তরল পদার্থের, বাষ্পের ও অনিলের উষ্ণতা বুঝিবার জন্য উহাদের অণুগুলির গতিশীলতা অনুমান করিতে হইয়াছে। খানিকটা তাপ প্রবেশে উষ্ণতা বাড়ে; তাপ পদার্থটা যানশক্তির রূপান্তর; অতএব অণুগুলির যানশক্তি বৃদ্ধি হয়। উহাদের বেগ বাড়ে, চাঞ্চল্য বাড়ে। যে যত উষ্ণ তাহার অণু ততই চঞ্চল, তত অধিক বেগে বিচরণশীল। কিন্তু কঠিন পদার্থে ত উষ্ণতাভেদ আছে। তাপযোগে সোণা, লোহা, কাঠ, পাথর, তুঁতে, হীরাকস, কয়লা, হীরা সবই ত উষ্ণ হয়, কিন্তু উহাদের অণুগুলি যদি স্থিরস্বভাবই ধরা গেল, তাহা হইলে আর বেগবৃদ্ধির অবসর কোথায়? এস্থানে তবে তাপটা কি হইল? যে তাপটা ভিতরে প্রবেশ করায় উষ্ণতাবৃদ্ধি ঘটিল, সে তাপ ত যানশক্তিরই রূপান্তর, কিন্তু অণুগুলি যদি স্থিরস্বভাব হয়, উহারা যদি অচল হইয়াই দাঁড়াইয়া থাকে, তাহা হইলে উহাদের অন্তর্গত তাপের পরিণতি কিরূপে বুঝা যাইবে?

ইহার উত্তর এইরূপে দেওয়া যায়। কঠিন পদার্থের অণুগুলি চলে না, কিন্তু উহারা কাঁপে। উহারা স্বস্থানে দাঁড়াইয়া কাঁপে। কম্পনও একরূপ গতি; তবে উহাকে চলন বা বিচলন বলা যায় না। চলন, সঞ্চলন, বিচরণ অর্থে একস্থান হইতে দূরে যাওয়া, আর কম্পন অর্থে একস্থানে দাঁড়াইয়া এদিকে ওদিকে আন্দোলিত হওয়া। জ্বরের রোগী শয্যাতে শুইয়া কাঁপিয়া থাকে। ঝড়ের সময় গাছের বড় বড় ডাল কাঁপে, মৃদু হাওয়ায় গাছের পাতাগুলি কাঁপে। কিন্তু উহারা স্বস্থান ছাড়িয়া অধিক দূর যায় না। স্বস্থানেরই একবার ডাহিনে একবার বামে, একবার উপরে একবার নীচে যায় মাত্র।

তরল ও অনিলের অণু যেমন সঞ্চরণশীল, ছুটিয়া বেড়াইতে সমর্থ, কঠিনের অণু তেমন সঞ্চরণশীল নহে; তেমন ছুটিয়া বেড়ায় না; উহারা আপন স্থানে দাঁড়াইয়া কাঁপে। থিয়েটারের গ্যালারীর দর্শক-বৃন্দও তামাসা-কৌতুক দেখিয়া হর্ষভরে শরীর আন্দোলন করিতে পারেন, ক্লাসের ছাত্রেরা বেঞ্চে বসিয়া মাষ্টার মহাশয়ের বেতের ভয়ে কাঁপিতে পারেন, এই স্বাতন্ত্র্যটুকু তাঁহাদের আছে। সেইরূপ কঠিন পদার্থের অণুগুলিও স্বস্থানে দাঁড়াইয়া, এমন কি দানাদার পদার্থের অণুগুলিও আপন নির্দ্দিষ্ট স্থানে দাঁড়াইয়া হেলিতে বা কাঁপিতে পারে। চলার নাম ছোটা, আর কাঁপার নামান্তর ছট্‌ফটানি। তরলের ও অনিলের অণু ছোটে আর কঠিনের অণু ছট্‌ফট্‌ করে। এই ছট্‌ফটানিটাও যানশক্তির ফল। যানশক্তি বাড়িলে ছট্‌ফটানিও বাড়িবে। তাপ যানশক্তির রূপান্তর; তাপাধিক্যে অণুদিগের ছট্‌ফটানি বাড়িয়া যায় এরূপ অনুমান চলিতে পারে।

অনুমান ত চলিতে পারে কিন্তু সেই অনুমান সঙ্গত কি না? বৈধ কি না? সেই অনুমানের অনুকূলে আর কোন কথা বলিবার আছে কি না? আছে বৈ কি! বাস্তবিকই কঠিন পদার্থের অণুগুলি কম্পনশীল, এইরূপ অনুমান করিবার আরও হেতু আছে। কেবল যে তাপ যানশক্তির রূপান্তর এই তথ্য বাহাল রাখিবার জন্যই ঐরূপ কল্পনা আবশ্যক তাহা নহে; ঐরূপ কল্পনার আরও স্বতন্ত্র কারণ আছে।

সেই হেতুগুলি এখন আলোচ্য। আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, কেবল যে কঠিন পদার্থের অণুই কম্পনশীল তাহা নহে। তরলের, বাষ্পের, অনিলেরও অণুসকল কম্পনশীল। কঠিনের অণু স্বস্থানে বসিয়া কাঁপে, আর তরলের, বাষ্পের ও অনিলের অণু কাঁপিতে

কাঁপিতে ছুটে। কঠিনের অণু কেবল ছট্‌ফট্‌ করে, তরলের, বাষ্পের ও অনিলের অণু ছোটে এবং ছট্‌ফট্‌ করে অথবা ছট্‌ফট্‌ করিতে করিতে ছোটে। গায়ে মৌমাছির পাল বসিয়া হুল বিঁধিতে আরম্ভ করিলে যেমন ছট্‌ফট্‌ করিয়া হাত পা ছুড়িতে ছুড়িতে ছুটিতে হয়, উহারা সেইরূপ ছট্‌ফট্‌ করিতে করিতে ছোটে। বঙ্কিম বাবু "রজনী" নামক কাব্যে মুগ্ধ মানসনেত্র বিস্ফারণ করিয়া লিখিয়াছেন, "ললিত-লবঙ্গলতা ললিত-লবঙ্গলতার ন্যায় দুলিতে দুলিতে দুলিতে বলিল।" বৈজ্ঞানিকের সেরূপ মোহ ঘটে কিনা জানি না; কিন্তু তিনিও মানসনেত্রে দেখেন, কঠিনের অণুগুলি দোলে মাত্র কিন্তু তরলের ও অনিলের অণুগুলি দুলিতে দুলিতে চলিতে থাকে।

এই তথ্যটি বড় গুরুতর তথ্য। ইহার আলোচনা করিতে গিয়া বিজ্ঞানশাস্ত্রের নূতন পর্য্যায়ে আমাদিগকে নামিতে হইবে। কম্পন-গতি একপ্রকার বিশেষরূপ গতি, উহার স্বরূপ ও উহার ফলাফল বিশেষরূপে বিবেচ্য। উহার স্পষ্ট ধারণা না জন্মিলে অণু সকলের ছট্‌ফটানি তত্ত্বটা ঠিক বোঝা যাইবে না। জড়পদার্থের গঠনপ্রণালী সম্বন্ধেও জ্ঞান অস্পষ্ট থাকিবে। কাজেই, জড় পদার্থের গঠন-প্রণালী-সম্বন্ধে আলোচনাও এইখানে ক্ষান্ত করা যাক এবং কম্পনতত্ত্বের আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাক।

কম্প-গতি

কম্প-গতির স্বরূপ নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হওয়া যাক। কম্পন, স্পন্দন, আন্দোলন, নর্ত্তন প্রভৃতি বিবিধ নামে এই গতি অভিহিত হইতে পারে। ইহার দৃষ্টান্তের এত বাহুল্য যে, দৃষ্টান্তস্থলে ভগবানের হিন্দোল দোলের বা রাসনৃত্যের উল্লেখ না করিলেও চলিতে পারে। যেখানে

কোন বস্তু পুনঃপুনঃ ঘুরিয়া ফিরিয়া স্বস্থানে প্রত্যাবৃত্ত হয়, সেইখানেই কম্প-গতি। কম্প-গতি কাহাকে বলে জিজ্ঞাসা করিলে বলিব, যে গতি নির্দ্দিষ্টকাল পরে পরে পুনরাবৃত্ত হয় তাহাই কম্প-গতি। হাতের কাছে প্রকৃষ্ট উদাহরণ ঢেঁকি যন্ত্র। পৃথিবীতে যাহার সৌভাগ্যের ইয়ত্তা নাই, যে যাবজ্জীবন সুন্দরী তরুণীর চরণ-তাড়না অকাতরে সহ্য করে, যাহার সৌভাগ্য দেখিয়াই বোধ করি দেবর্ষি তাহাকে বাহন-রূপে নির্ব্বাচন করিয়াছিলেন। তরুণী যেমন তালে তালে নির্দ্দিষ্ট কাল অন্তরে চরণক্ষেপ করেন, ঢেঁকিও তেমনি পুনঃপুনঃ গর্ব্ব-ভরে মাথা কুটিয়া আপনার সৌভাগ্যের কথা বিশ্ববাসীকে সশব্দে জানায়। উহার এই উঠানামাই কম্প-গতির উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত।

উদাহরণের অভাব নাই। জল পড়ে, পাতা কাঁপে, হৃৎপিণ্ড কাঁপে, শ্বাসযন্ত্র কামারের হাপিনার মত সঙ্কোচ প্রসার প্রাপ্ত হয়। সমুদ্রের জল জোয়ার-ভাঁটায় দিনে দুইবার যথাকালে উঠে-নামে। এমন কি, ঘানিগাছের বলদের ঘূর্ণনগতিকেও কম্প-গতির প্রকারভেদ বলিতে পারা যায়, কেননা বলদ ঘুরিয়া ফিরিয়া যথাকালে যথাস্থানে প্রত্যাবৃত্ত হয়। নির্দ্দিষ্ট কাল ব্যবধানে যেখান হইতে বাহির হইয়াছিল সেখানে ফিরিয়া আইসে। এই হিসাবে গ্রহ, উপগ্রহ, জ্যোতিষ্কের কক্ষাভ্রমণও কম্প-গতির উদাহরণ। চন্দ্র প্রায় উনত্রিশ দিন পরে পরে সূর্য্য ও পৃথিবীর মাঝে আসিয়া দাঁড়ায়—তখন অমাবস্যা। অমাবস্যা হইতে অমাবস্যা, এই নির্দ্দিষ্টকাল চান্দ্রমাস। পৃথিবী ৩৬৫ দিন পরে সূর্য্য প্রদক্ষিণ করিয়া যাত্রাস্থলে প্রত্যাবৃত্ত হয় ও আবার সেই পথে যাত্রারম্ভ করে, আবার ঘুরিবার জন্য।

কিন্তু এক হিসাবে কম্প-গতির সর্ব্বাপেক্ষা সহজ উদাহরণ ঘড়ির পেণ্ডুলাম বা পরিদোলক। দোলে বলিয়াই উহার নাম পরিদোলক।

এক গাছি সূতা বা তারের এক প্রান্তে একটা লোষ্ট্রখণ্ড বাঁধিয়া অন্যপ্রান্ত ধরিয়া দোলাইয়া দিলেও উহা ঠিক পেণ্ডুলামের মত দোলে, অথবা উহাই পেণ্ডুলাম।

এই পরিদোলকের গতিটা কিরূপ একবার আলোচনা করা উচিত। পরিদোলক একবার ডাহিনে যায়, একবার বামে যায়। দোলন আরম্ভের পূর্ব্বে যে স্থানে লোষ্ট্রখণ্ডটা স্থির ছিল, ঐ স্থানকেই উহার স্বস্থান বলিব। স্বস্থান ছাড়িয়া উহা ডাহিনে চলে, চলিতে চলিতে কিছু দূর পর্য্যন্ত গিয়া থামে, আর যায় না, তারপর ফিরিয়া আবার স্বস্থানে আসে। স্বস্থান ছাড়িয়া যতদূর পর্য্যন্ত যায়, যাহার অধিক আর যায় না, সেই দূরত্বকে উহার কম্পের পরিসর বলা যাউক।

স্বস্থানে ফিরিয়া আসিয়া দোলক থামে কি ? না ; তখন উহার বামে গতির আরম্ভ হয়। তখন বামে কিছু দূর পর্য্যন্ত গিয়া আবার স্বস্থানে ফিরিয়া আসে। তবেই উহার গতি হইল (১) স্বস্থান হইতে দক্ষিণ প্রান্ত পর্য্যন্ত (২) সেই দক্ষিণ প্রান্ত হইতে স্বস্থান পর্য্যন্ত (৩) স্বস্থান হইতে বাম প্রান্ত পর্য্যন্ত (৪) বামপ্রান্ত হইতে আবার স্বস্থান পর্য্যন্ত। এই চারিটি গতির সমন্বয়ে উহার একবার আন্দোলন বা একবার কম্পন সমাপ্ত হয়। তৎপরে আবার সেইরূপ আন্দোলন বা কম্পন পুনঃপুনঃ আবর্ত্তিত হইতে থাকে। একটা আন্দোলনের মধ্যে চারিটি পাদ যথাক্রমে (১) (২) (৩) (৪) দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। (১) ও (২) পাদ একত্রযোগে আন্দোলনের পূর্ব্বার্দ্ধ। (৩) ও (৪) একত্রযোগে অপরার্দ্ধ। পূর্ব্বার্দ্ধে পরিদোলক স্বস্থানের ডাহিনে থাকে, অপরার্দ্ধে বামে থাকে। পূর্ব্বার্দ্ধেও যতটা সময় লাগে, অপরার্দ্ধেও ঠিক ততটা সময় লাগে। পূর্ব্বার্দ্ধে স্বস্থান ছাড়িয়া ডাহিনে যতদূর যায়, অপরার্দ্ধেও স্বস্থান ছাড়িয়া বামে ঠিক ততদূরই যায়। অপরার্দ্ধ সর্ব্বাংশে ঠিক

পূর্ব্বার্দ্ধেরই প্রতিরূপ ; যেন পূর্ব্বার্দ্ধকে উল্‌টাইয়া দিলেই অপরার্দ্ধ হয়। তরুণীর বদনচন্দ্রের সহিত দর্পণগত বদনচন্দ্র-প্রতিবিম্বের যে সম্পর্ক, পরিদোলকের কম্প-গতির পূর্ব্বার্দ্ধের সহিত অপরার্দ্ধেরও কতকটা সেইরূপ সম্পর্ক। একবার কম্পে যদি বার সেকেণ্ড সময় লাগে, পূর্ব্বার্দ্ধে সময় লাগিবে ছয় সেকেণ্ড ; অপরার্দ্ধেও সময় লাগিবে ছয় সেকেণ্ড।

শুধু তাহাই নহে, কম্পের প্রথম পাদে ও দ্বিতীয়পাদেও সেইরূপ সম্পর্ক। প্রথম পাদে স্বস্থান ছাড়িয়া দক্ষিণপ্রান্তে পৌঁছিতে যে সময়, দক্ষিণপ্রান্ত হইতে স্বস্থানে পুনরাগমনে সেই সময় ; প্রথম পাদে তিন সেকেণ্ড হইলে দ্বিতীয় পাদেও তিন সেকেণ্ড।

আবার তৃতীয় পাদও চতুর্থ পাদের ঠিক প্রতিরূপ। তৃতীয় পাদে স্বস্থান হইতে বামপ্রান্ত পৌঁছিতে তিন সেকেণ্ড লাগিলে, চতুর্থ পাদে বামপ্রান্ত হইতে স্বস্থান প্রাপ্তিতে সেই তিন সেকেণ্ড লাগিবে। এক-বার পূর্ণ কম্পে বার সেকেণ্ড ; অর্দ্ধ কম্পে ছয় সেকেণ্ড ; পাদ কম্পে তিন সেকেণ্ড।

এই কম্পের সহিত ঢেঁকির কম্পের তুলনা করা যাক। ঢেঁকি উঠে-নামে, স্বস্থান ছাড়িয়া উপরে উঠে, আর উর্দ্ধ প্রান্ত হইতে নীচে নামে। এই দুই অর্দ্ধ লইয়া হইল এক পূর্ণ কম্প। তার পর আবার উঠে-নামে, আবার উঠে-নামে ; অর্থাৎ কম্প পুনঃপুনঃ আবর্ত্তিত হয়। কিন্তু এ স্থলে এক পূর্ণ কম্পের প্রথম অর্দ্ধ ও দ্বিতীয় অর্দ্ধ তুলনা করিলে দেখা যায়, উভয় ঠিক সমকালব্যাপী নহে। উঠিবার সময় ধীরে উঠে, কেননা তরুণীর চরণ বরাবর যন্ত্রে সংলগ্ন থাকে ; তার পর তরুণী সহসা চরণ সরাইয়া লন, আর ঢেঁকি ধপ্ করিয়া পড়ে, অপরার্দ্ধ কাজেই দ্রুত নামে। এখানে পূর্ব্বার্দ্ধ অপরার্দ্ধের সমকালব্যাপীও নহে, ঠিক প্রতিরূপও নহে।

পরিদোলকের কম্পকে দুই অর্দ্ধে ও চারি পাদে ভাগ করা চলে। পূর্ব্ব অর্দ্ধেও যে সময়, অপর অর্দ্ধেও সেই সময়। ঢেঁকির কম্পকে দুই অর্দ্ধে ভাগ করিলে দেখা যায়, পূর্ব্বার্দ্ধ অপরার্দ্ধের সমকালব্যাপী নহে। আর ঢেঁকির বেলায় চারি পাদে ভাগের কথাই উঠে না। প্রত্যেক অর্দ্ধকে আবার দুই সমান ভাগে ভাগ করিবার কোনও সুবিধা দেখা যায় না।

কাজেই, পরিদোলকের কম্পে যে শৃঙ্খলা আছে ঢেঁকির কম্পে সে শৃঙ্খলা নাই। সেই জন্যই বলিয়াছি যে, পরিদোলকের গতি এক হিসাবে কম্প-গতির মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সহজ। উহা সহজবোধ্য, কেননা উহাতে এই শৃঙ্খলা আছে, এই ব্যবস্থাটুকু আছে। ঢেঁকির কম্প উহা অপেক্ষা জটিল। ফলে, কম্প-গতির স্বরূপ-আলোচনায় ঐ সুনিয়ত সহজবোধ্য পরিদোলকের গতি লইয়াই আরম্ভ করিতে হয়। ঢেঁকির কম্প সহজ না হইলেও উহা কম্প; কেননা কম্প-গতির যে লক্ষণ,—নির্দ্দিষ্ট কাল পরে পরে পুনরাবৃত্তি, তাহা পরিদোলকেও আছে, ঢেঁকিতেও আছে।

পরিদোলকে কম্পের পর কম্প, তার পর তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, এইরূপ কম্প নির্দ্দিষ্ট কাল পরে পরে ঘটে; ঢেঁকিতেও সেইরূপ পরিদোলকের প্রথম কম্পে যদি বার সেকেণ্ড সময় লাগে, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ—প্রতিকম্পেও সেই বার সেকেণ্ড সময় লাগিবে। তরুণীও সেইরূপ সাবধানে পা ফেলিয়া বার সেকেণ্ড পর পর ঢেঁকি ফেলিতে পারেন। এই যে বার সেকেণ্ড কাল, যে কালে এক পূর্ণ কম্প সমাপ্ত হয়, উহার নাম দেওয়া যাউক কম্পনকাল। কম্পনকাল যত অধিক হইবে, সেকেণ্ডে কম্প-সংখ্যা তত কম হইবে। সেকেণ্ডে যত বার কম্প ঘটে সেই সংখ্যাকে কম্পন-দ্রুতি বলিব। সেকেণ্ডে কম্প-সংখ্যা

যদি দশ বার হয়, তাহা হইলে এক কম্পের কাল সেকেণ্ডের দশমাংশ; আর কম্প-সংখ্যা যদি শতবার হয়, তবে কম্প-কাল সেকেণ্ডের শতাংশ। কম্প-দ্রুতির সহিত কম্প-কালের এই সম্বন্ধ। একটা যে হারে বাড়ে, অন্যটা সেই হারে কমে।

উপায় কি?

পরিদোলকের কম্প-কাল বাড়াইবার বা কমাইবার এক গাছা দড়িতে ইঁট ঝুলাইয়া পরিদোলক তৈয়ার করিয়াছি; দড়িগাছটা লম্বা কর, কম্প-কাল বাড়িবে, কম্প-দ্রুতি কমিবে; দড়ি খাট কর, কম্প-কাল কমিবে, কম্প-দ্রুতি বাড়িবে। অতএব দড়িগাছটার দৈর্ঘ্যের সহিত কম্প-কালের ও কম্প-দ্রুতির সম্পর্ক। কিরূপ সম্পর্ক?

দড়ি চারিগুণ লম্বা কর, কম্প-কাল দ্বিগুণ হইবে। নয়গুণ লম্বা কর; কম্প-কাল তিনগুণ হইবে; ষোলগুণ কর, চারিগুণ হইবে। আর ২ × ২ = ৪, ৩ × ৩ = ৯, ৪ × ৪ = ১৬; কম্প-কাল যতগুণ বাড়াইতে চাও, দড়ির দৈর্ঘ্য তাহার বর্গানুসারে বাড়াইতে হইবে।

কোন পরিদোলক বার সেকেণ্ডে একবার দোলে, আমি উহাকে একশ বিশ সেকেণ্ডে অর্থাৎ দুই মিনিটে একবার দোলাইতে চাই। অর্থাৎ কম্প-কাল দশগুণ করিতে চাহি। দড়িগাছটা ১০ × ১০ অর্থাৎ একশ গুণ দীর্ঘ করিতে হইবে।

পরিদোলক খাট হইলেই দ্রুত দোলে, আর লম্বা হইলেই মন্দ দোলে, এই তাৎপর্য্য।

ইষ্টকখণ্ডের বদলে যদি প্রস্তরখণ্ড বা ধাতুখণ্ড ঝুলাই, কম্প-কালের কিছু ইতরবিশেষ হয় কি? কিছুই না। তাজ্জব ব্যাপার!

কিন্তু স্থানভেদে ইতরবিশেষ ঘটে। কলিকাতায় যে পেণ্ডুলম যে সময়ে দোলে, লণ্ডনে সেই পেণ্ডুলম তার চেয়ে কিঞ্চিৎ শীঘ্র দোলে; আবার উঁচু পর্ব্বতের উপর বা ব্যোমযানের উপর কিঞ্চিৎ বিলম্বে দোলে। পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ এজন্য দায়ী। লণ্ডনে মাধ্যাকর্ষণ একটু বেশী, পর্ব্বতের উপর একটু কম। তাহার সহিত এই ইতরবিশেষের সম্পর্ক।

পরিদোলক একবার দোলাইয়া দিলে, লাখবার ছুলিতে থাকে। ঘড়ির পেণ্ডুলম তাহার পেণ্ডুলম-জন্ম ব্যাপিয়াই ছুলিতেছে। প্রতিবার কম্পে যদি কিঞ্চিৎ সময়ের তারতম্য হয়, লাখবার কম্পে আর সেই তারতম্যটা আর কিঞ্চিৎ থাকে না, সময়ের অনেকটা তফাৎ হইয়া পড়ে। কাজেই, একটি পরিদোলককে কলিকাতায় ও লণ্ডনে দোলাইয়া উভয় স্থানে মাধ্যাকর্ষণের যে কিঞ্চিৎ তারতম্য তাহা ধরা চলে। স্থানভেদে মাধ্যাকর্ষণের বা ভারের তারতম্য ধরিবার এমন সুন্দর উপায় আর নাই।

মাধ্যাকর্ষণ স্থানভেদ বিচার করে, কিন্তু দ্রব্যভেদ বিচার করে না। একসের লোহা ও একসের পাথর উভয়ের বস্তুও সমান, ওজনও সমান। ইহা আগে বলিয়াছি। পরিদোলকে লোহাই ঝুলাও, আর পাথরই ঝুলাও, মাধ্যাকর্ষণের ভেদ না থাকায় কম্প-কালের ভেদ হয় না। নিউটন এই পরিদোলক দ্বারাই সপ্রমাণ করিয়াছিলেন, মাধ্যাকর্ষণ দ্রব্যবিচার করে না। একসের সোণারও যে ওজন, একসের লোহারও সেই ওজন।

গ্যালিলিওর নাম পূর্ব্বে কতবার করিয়াছি, তিনি নিউটনের পূর্ব্বগামী। তিনি পরিদোলকের কম্পঘটিত একটি অদ্ভুত নিয়ম আবিষ্কার করেন। তাহা এই—কম্পের পরিসর যাহাই হউক, উহার

কম্প-কালের সহিত তাহার সম্পর্ক নাই। পরিদোলক স্বস্থান ছাড়িয়া ডাহিনে যতদূর পর্য্যন্ত যায়, সেই দূরত্বকে উহার পরিসর বলিয়াছি। ঐ পরিসর এক ইঞ্চি, দুই ইঞ্চি, দশ ইঞ্চি, যাহাই হউক কম্প-কালের সহিত তাহার সম্পর্ক নাই। দশ গজ লম্বা দড়িতে ইঁট ঝুলাইয়া উহাকে স্বস্থান হইতে এক ইঞ্চি ভ্রষ্ট করিয়া দোলাইয়া দাও, তাহাতে যত ক্ষণে যত বার দুলিবে, দশ ইঞ্চি ভ্রষ্ট করিয়া দোলাইয়া দাও তাহাতেও তত ক্ষণে তত বার দুলিবে। কম্প-কাল পরিসরের অপেক্ষা করে না।

একেবারেই যে করে না এমন নহে। এক ইঞ্চি বা দশ ইঞ্চি দশ গজের তুলনায় সামান্য, কিন্তু দুই হাত, পাঁচ হাত, দশ গজের তুলনায় অকিঞ্চিৎকর নহে। কম্পটা এক ইঞ্চি, দশ ইঞ্চির পরিবর্ত্তে দুই হাত, পাঁচ হাত ভ্রষ্ট করিয়া দোলাইয়া দিলে কম্প-কালের কিছু প্রভেদ বুঝা যায়, কিন্তু সেও কিঞ্চিৎ-মাত্র। ইঞ্চিতে হাতে যত তফাৎ, কম্পকালের তেমন তফাৎ ঘটে না।

কম্প-কালের এই পরিসর-নিরপেক্ষতাতে একটা বড় উপকার হইয়াছে। পরিদোলককে স্বস্থান হইতে ভ্রষ্ট করিয়া দোলাইয়া দিলে উহা পুনঃপুনঃ দুলিতে থাকে, কিন্তু এই আন্দোলনের একটা বিঘ্ন আছে। প্রধান বিঘ্ন বায়ু। পরিদোলককে বায়ু ঠেলিয়া যাইতে হয়; পরিদোলকের যানশক্তির কিঞ্চিৎ বায়ুতে সঞ্চারিত হয়; পরিদোলকের যানশক্তি প্রত্যেক কম্পেই একটু একটু কমিতে থাকে। যে ঝোঁক লইয়া উহা স্বস্থান হইতে ভ্রষ্ট হয়, আর যে ঝোঁকে উহা স্বস্থানে ফিরিয়া আসে, যানশক্তির ক্রমিক অপচয়ে সেই ঝোঁকের পরিমাণ ক্রমে কমে। ঝোঁক যত কমে কাজেই স্বস্থান হইতে ছাড়িয়া যাইবার ক্ষমতাও তত কমে; কম্পের পরিসরটা ক্রমশঃ কমিয়া যায়। বায়ু বা অপর বিঘ্ন না থাকিলে এরূপ ঘটিত না; একবার দোলাইয়া দিলে পরিদোলক চির-

কালটা সমান পরিসর বাহাল রাখিয়া পুনঃপুনঃ দুলিতে থাকিত। কিন্তু ঐসকল বিঘ্নের ফলে চিরকাল দুলিতে পারে না। ক্রমেই শক্তির অপচয় ও ব্যত্যয় ঘটে, ক্রমেই ঝোঁকের মাত্রা কমে ও পরিসর কমে, শেষে পরিসর এত কম হয় যে, দুলিতেছে কি না তাহা বুঝাই কঠিন হয়। মনে হয়, আর দুলিতেছে না—স্বস্থানেই স্থির থাকে।

বায়ুহীন স্থান নাই, বিঘ্নহীন স্থান নাই, কাজেই পরিদোলকের পরিসর ক্রমেই কমিতে থাকে। ঐ সঙ্গে যদি কম্পকাল ব্যতিক্রম হইত, তাহা হইলে আর পরিদোলক সময়-মাপার কাজে লাগিত না। কিন্তু পরিসর যাহাই হউক না, কম্পকালের ইতরবিশেষ হয় না, যদি কিছু হয় তাহাও নগণ্য। কাজেই, একবার কম্পে যে সময়, শতবার কম্পে ঠিক তাহার শতগুণ সময়, লক্ষ কম্পে তাহার লক্ষগুণ সময় ধরিতে কোনও বাধা থাকে না।

এই গুণেই পরিদোলক এত আদরের জিনিস হইয়াছে। উহাতেই আমাদের সময় মাপিবার যন্ত্র তৈয়ার হইতেছে। ক্লক ঘড়ির পেণ্ডুলম কেবলই দুলিতেছে, কিন্তু যতই দুলুক প্রত্যেক কম্পে সেই ঠিক এক সময়। এক কম্পে যদি এক সেকেণ্ড হয়, ষাটিকম্পে ঠিক ষাটি সেকেণ্ড বা এক মিনিট, আর ষাটিগুণ ষাটি বা ছত্রিশ শত কম্পে, ষাটি মিনিট বা এক ঘণ্টা। আর চব্বিশগুণ ছত্রিশ শ অর্থাৎ ৮৬৪০০ কম্পে এক দিন।

এই দিনের অর্থ কি ? আজ সূর্য্যদেব মধ্যাহ্নে মাথার উপর আসেন, কাল আবার সূর্য্যদেব মধ্যাহ্নে মাথার উপর আসেন, মধ্যাহ্ন হইতে মধ্যাহ্ন ব্যবধানের নাম দিন। বলা সহজ, কিন্তু এই ব্যবধানটুকু নির্দ্ধারণ করা তত সহজ নহে। কেননা, মাথার উপর ত গগনমণ্ডলের অনেকটা জায়গা, তার মধ্যে একটা বিন্দু কল্পনা করিয়া লইতে হইবে,

সূর্য্যদেবের সেই বিন্দুতে আসা যায়। অথচ সূর্য্যদেবের বৃহৎ শরীরটা ত একবারে এক বিন্দুতে আসিবে না। তাহার মণ্ডলাকার বিম্বের কেন্দ্রবিন্দুটি যখন সেই নভঃস্থ বিন্দুতে—যাহার নাম স্বস্তিক বিন্দু, সেই বিন্দুতে আসিবে তখনই হইবে মধ্যাহ্ন। আবার সূর্য্যদেব ত মাথার উপর আসিতেই চান না। প্রায় সারা বৎসর ধরিয়া দক্ষিণ চাপিয়াই থাকেন, কেবল আষাঢ় মাসে মাথার উপরে আসেন, সেও আমাদের দেশে; আরও উত্তরে বা বিলাতে কখনও মাথার উপরে আসেন না। কাজেই, স্বস্তিকে আগমন যদি না ঘটিল, তবে আকাশমণ্ডলে একটা রেখা কল্পনা করিয়া লইতে হয়, যাহা আকাশের উত্তর ধ্রুববিন্দু হইতে আসিয়া স্বস্তিকবিন্দু ভেদ করিয়া দক্ষিণ ধ্রুববিন্দুগামী হইয়াছে। সূর্য্যদেব অর্থাৎ তাঁহার চক্রের কেন্দ্রবিন্দু যখন সেই রেখায় আসেন, তখনই হইবে মধ্যাহ্ন। ইহাতেও রক্ষা নাই। কেননা সূর্য্যদেব সকল দিন সমান বেগে চলেন না; গ্রীষ্মকালে মন্দগতিতে চলেন, শীতকালে দ্রুত গতিতে চলেন। এই কারণে ও তদ্বিধ অন্য কারণে বৈশাখে মধ্যাহ্ন হইতে পর মধ্যাহ্নের যে ব্যবধান, আশ্বিনে মধ্যাহ্ন হইতে পর মধ্যাহ্নের সে ব্যবধান হয়। কাজেই, বৈশাখের দিনমান আশ্বিনের দিনমানের সমান নহে। সূর্য্যদেবের এই চপলতার জন্য জ্যোতিষীদিগকে একটা কৃত্রিম সূর্য্যদেবের কল্পনা করিতে হইয়াছে; তিনি সারা বৎসর ধরিয়া সমান বেগে চলেন, তাঁহার বৈশাখ আশ্বিন ভেদ নাই; আমাদের প্রত্যক্ষগোচর সূর্য্যের কখনও একটু আগে, কখনও একটু পশ্চাতে থাকেন। কিন্তু সারা বৎসর পরে সেই কল্পিত সূর্য্য আসিয়া প্রত্যক্ষ সূর্য্যের নাগাইল ধরেন। এই কল্পিত সূর্য্যের কল্পিত মধ্যাহ্ন হইতে পরবর্ত্তী কল্পিত মধ্যাহ্নের যে ব্যবধান বৈজ্ঞানিকের নিকট তাহাই এক দিন। সেই দিনের চব্বিশ ভাগের এক ভাগের নাম ঘণ্টা, ঘণ্টার ষাটি

ভাগের এক ভাগের নাম মিনিট ও মিনিটের ষাটি এক ভাগের নাম সেকেণ্ড।

বৈজ্ঞানিক তাঁহার ঘটিকাযন্ত্রের পরিদোলকটিকে এরূপ দৈর্ঘ্য দিয়া থাকেন যাহাতে তাহার একবার কম্পে সেই সেকেণ্ডের ঠিক দুই সেকেণ্ড অতিবাহিত হয়। সেই দৈর্ঘ্য দিয়া পরিদোলক দুলাইয়া দেন; পরিদোলকে সোনা ঝুলিল কি লোহা ঝুলিল তাহা দেখিতে হয় না; উহার পরিসর কমিল কি বাড়িল দেখিতে হয় না। দৈর্ঘ্যটা যদি ঠিক থাকে তবে প্রত্যেক কম্পে সেই দুই সেকেণ্ডই লাগিবে ও ত্রিশ কম্পে এক মিনিট লাগিবে, ইত্যাদি।

বায়ুর বিঘ্ন ঠেলিয়া পরিদোলককে দুলিতে হয়, তাহাতে কম্পকালের ব্যতিক্রমের জন্য ভাবিতে হয় না, কিন্তু প্রতিকম্পে কিঞ্চিৎ শক্তির অপচয় ঘটে। শক্তি একেবারে ফুরাইয়া গেলে পরিদোলক অচল হইবার সম্ভব। সেইজন্য মাঝে মাঝে শক্তি মজুদ করিয়া দিতে হয়। পরিদোলকে শক্তি মজুদ করিবার জন্য যে প্রক্রিয়া তাহার নাম ঘড়িতে দম দেওয়া।

দৈর্ঘ্যটা ঠিক থাকিলেই ঘড়ি ঠিক সময় রাখিয়া চলে, কিন্তু বৈজ্ঞানিকের দুর্ভাগ্যক্রমে দৈর্ঘ্য ঠিক থাকে না। গ্রীষ্মের গরমে পরিদোলকের দৈর্ঘ্য একটু বাড়ে, শীতের ঠাণ্ডায় একটু কমে, কাজেই কম্পকালের কিঞ্চিৎ ইতরবিশেষ হয়। এক কম্পে ইতরবিশেষ যৎকিঞ্চিৎ, কিন্তু সপ্তাহব্যাপী বহু কম্পে আর যৎকিঞ্চিৎ থাকে না। ঘড়ি গ্রীষ্মকালে "শ্লো" চলে, আর শীতে "ফাষ্ট" হয়। এইজন্য কত অদ্ভুত কৌশলে উহার দৈর্ঘ্য ঠিক রাখার ব্যবস্থা করিতে হয়। সে সকল উত্থাপন করিব না, ইহাতেই পুঁথি বাড়িয়া গেল।

পরিদোলক তৈয়ার করিতে হইলে যে একগাছি দীর্ঘ রজ্জুতে একটা

ভারী জিনিস ঝুলাইতেই হইবে এমন নহে। যে কোন জিনিসকে তাহার যে কোন কিছু ধরিয়া দোলাইয়া দিলে উহা পরিদোলকের মত দুলিবে। তখন উহার গতি কম্প-গতি হইবে, অর্থাৎ সহজবোধ্য সুনিয়ত কম্প-গতি হইবে, ঢেঁকির মত জটিল হইবে না। উহার নির্দ্দিষ্ট কম্পকাল থাকিবে। দড়ির পরিদোলকের কেবল দৈর্ঘ্যটা জানিলেই উহার কম্প-কাল অক্লেশে জানিয়া বলা চলে। এক্ষেত্রে তত অক্লেশে গণা চলিবে না, কিন্তু উহার আকার ও আয়তনের সঙ্গে কম্প-কালের অবিচ্ছিন্ন সম্পর্ক থাকিবে। সেই আকার-আয়তন বজায় রাখিলে কম্প-কালের ব্যতিক্রম ঘটিবে না। ইচ্ছা করিলে একটা হাতীকেও একটা পরিদোলকে পরিণত করা চলে। উহার শুণ্ডাগ্র বা দন্তাগ্র ধরিয়া দোলাইতে পারিলে উহার নির্দ্দিষ্ট কম্পকাল থাকিবে। তবে শুণ্ডাগ্র ধরিলে যে কাল হইবে দন্তাগ্র ধরিলে সে কাল হইবে না।

জোয়ার-ভাঁটা

জ্যোতিষীর হাতে একটা পরিদোলক আছে, উহা হাতী অপেক্ষাও বৃহৎ। ভাগীরথীর স্রোতে ঐরাবত ভাসিয়া গিয়াছিলেন; ভাগীরথী যে সাগরে গিয়া আত্মহারা হইয়াছেন, সেই মহাসাগরই এই পরিদোলক। মহাসাগরের বক্ষ দিনে দুইবার ফাঁপিয়া উঠে। সাগরের বুক ফাঁপিয়া উঠিলে একটা জলের স্রোত ভাগীরথীর মুখে প্রবেশ করে ও কলিকাতা ছাড়িয়া উত্তরে কিছুদূর পর্য্যন্ত দিনে দুইবার সেই স্রোত ঠেলিয়া চলে। তখন হয় জোয়ার। আবার সাগরের বুক নামিয়া গেলে সেই জল-স্রোত ভাগীরথীর মুখে বাহির হইয়া যায়, তখন হয় ভাঁটা। গঙ্গায় আসিয়া হয় জলের স্রোত; কিন্তু সাগর-বক্ষে উহা স্রোত নহে, উহা কম্প। মহাসাগরের দিনে দুইবার হৃৎকম্প হয়। স্রোত হইল জলের ছুট, আর

কম্পন হইল জলের উঠা নামা ছট্‌ফটানি। সাগর-বক্ষে স্রোত হয় না, সেখানে জল দুইবার উঠে, দুইবার নামে। এইস্থলে দুইবার উঠা দুইবার নামা ধরিয়া এক পূর্ণ কম্প।

গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকায় দেখিলাম, কলিকাতার গঙ্গার জোয়ার-ভাঁটার সময়নির্ণয়ে লেখা আছে, জোয়ার আরম্ভের সময় দশমীর দিন বেলা ৬টা ৮মিনিট। একাদশীর দিন কিন্তু বেলা ৬টা ৫৬ মিনিট। এই সময়নির্দ্দেশ ষোল আনা ঠিক না হইলেও মোটামুটি ঠিক। ইহাতে এক পূর্ণ কম্পের কাল হয়, এক দিনের চেয়ে কিছু বেশী—২৪ ঘণ্টা ৪৮ মিনিট। অর্থাৎ এক চান্দ্রদিনের বা এক তিথির গড়ে যে পরিমাণ, বারিধির এই কম্পকালের সেই পরিমাণ। বারিধিরূপ পরিদোলক সৌরদিনের সম্পর্ক রাখেন না, চান্দ্রদিনের হিসাব করেন। জোয়ারের সহিত চন্দ্রের এই সম্পর্ক আমাদের প্রাচীনদের জানা ছিল। কবি কালিদাস লিখিয়া গিয়াছেন—"চন্দ্রোদয়ারম্ভ ইবাম্বুরাশিঃ।" পূর্ণিমার দিন সন্ধ্যায় চাঁদ উঠে, পরদিন প্রতি-পদে দণ্ড দুই রাত্রে চাঁদ উঠে। আর আজ যখন জোয়ার আসে, কাল তাহার ৪৮ মিনিট অর্থাৎ দুই দণ্ড পরে জোয়ার আসে। ইহাই পর্য্যবেক্ষণ করিয়া এই সম্পর্ক আবিষ্কৃত হইয়াছিল সন্দেহ নাই। পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা তথ্যাবিষ্কারের ইহা উৎকৃষ্ট উদাহরণ।

কিন্তু এত বড় সূর্য্যকে ছাড়িয়া চন্দ্রের সহিত সাগরের এই প্রীতিউচ্ছ্বাসের মূলে কি আছে, ইহার উত্তর দেন সেই নিউটন্। উত্তরটা বুঝিবার যোগ্য।

ভূমণ্ডল বৃহৎ বর্ত্তুলপিণ্ড, উহার ব্যাসার্দ্ধ প্রায় ৪০০০ মাইল। চন্দ্রও বৃহৎ বর্ত্তুলপিণ্ড, পৃথিবীর চেয়ে অনেক ছোট হইলেও বৃহৎ, উহার দূরত্ব প্রায় ৬০ × ৪০০০ মাইল। পৃথিবীর পিঠ জলের আবরণে

আবৃত; ষোল আনা নহে প্রায় বার আনা জলে আবৃত। পৃথিবীর কেন্দ্র চন্দ্র হইতে যত দূরে, পৃথিবীর পিঠ অর্থাৎ পৃষ্ঠস্থ জলাবরণ তার চেয়ে কিছু কম দূরে। কেন্দ্রের দূরত্ব যদি হয় ৬০ জলাবরণের অর্থাৎ সমুদ্রের দূরত্ব তাহা হইলে ৫৯। সমুদ্র চাঁদের কিছু কাছে আছে, কাজেই, সমুদ্রে চাঁদের আকর্ষণ কিছু বেশী। ভূকেন্দ্রে চাঁদের যে আকর্ষণ, ভূপৃষ্ঠে সমুদ্রে তার চেয়ে কিছু বেশী। আবার পৃথিবীর অপর পৃষ্ঠে যেখানে দূরত্ব ৬১, সেখানে সমুদ্রের প্রতি-আকর্ষণ কিছু কম।

ভূমণ্ডলটা কঠিন পিণ্ড, সংহত জমাট পদার্থ, উহার এক জায়গায় টান পড়িলে সেই টানে অন্য স্থানও সরিয়া আসে। কঠিনের এক স্থান এক বেগে, অন্য স্থান অন্য বেগে চলিতে পারে না। কিন্তু তরল পদার্থ সংহত নহে, উহার একাংশে এক বেগ, অন্য অংশে অন্য বেগ স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারে। ফলে এই দাঁড়ায়, ভূপিণ্ড চন্দ্রের প্রতি যে বেগে চলিতে যায়, এ পিঠের জল তার চেয়ে বেশী বেগে চঁদের দিকে চলিতে যায়; ফলে জলটা চাঁদের দিকে ফাঁপিয়া উঠে। আর ভূপিণ্ড যে-বেগে চাঁদের দিকে চলিতে যায়, ও পিঠের জল তার চেয়ে কম বেগে চলিতে যায় বা পিছাইয়া পড়ে, সেখানেই কতকটা জলের রাশি স্তূপাকৃতি হয়। পৃথিবীর যে পিঠ চাঁদের সম্মুখে, ও যে পিঠ তাহার বিপরীত, উভয় দিকেই জল ফাঁপিয়া উঠে ও জোয়ার ঘটে। আশ-পাশের জল সরিয়া আসিয়া ঐ দুই পিঠে স্তূপাকার হয়, তাই দুই পাশে জলের কমতি ঘটিয়া ভাঁটা ঘটে।

এখন বঙ্গসাগর যখন চাঁদের সম্মুখে, তখন বঙ্গসাগরে জোয়ার, ও তাহার ওপিঠে অর্দ্ধ পৃথিবীর ব্যবধানেও জোয়ার। কিন্তু পৃথিবী ত বসিয়া থাকেন না; তিনি ২৪ ঘণ্টায় নিজদেহের একবার আবর্ত্তন

করেন। তাই যখন বঙ্গসাগর চাঁদের সম্মুখ ত্যাগ করিয়া বিপরীত দিকে যায়, তখনও আবার বঙ্গসাগরে জোয়ার। পর দিন আবার বঙ্গসাগর চাঁদের সম্মুখে আসিলে আবার জোয়ার। এইরূপে দিনে রাত্রে দুইবার জোয়ার। আর দুইবার জোয়ার হইলে দুইবার ভাঁটা।

পৃথিবী চব্বিশ ঘণ্টায় একবার দেহ উল্টাইয়া আসেন। বঙ্গসাগরও চব্বিশ ঘণ্টা পরে ফিরিয়া চাঁদের সম্মুখে আসেন, কিন্তু চাঁদকে ঠিক সেখানে সম্মুখে দেখিতে পান না। চাঁদ বসিয়া থাকেন না, তাঁহাকে আবার সাতাইশ দিন কয়েক ঘণ্টায় পৃথিবীকে একপাক ঘুরিয়া আসিতে হয়। বঙ্গসাগর, দিনে অর্থাৎ চব্বিশ ঘণ্টায় একপাক ঘুরিয়া আসিতে আসিতে চাঁদ খানিকটা আপন-পথে অগ্রসর হইয়া গিয়াছেন, কাজেই চাঁদের নাগাল ধরিতে আরও খানিকটা সময় যায়,—দণ্ড দুই সময় যায়। পরদিন দণ্ড দুই পরে আবার বঙ্গসাগর চাঁদের সম্মুখে আসিলে আবার জোয়ার।

এখন চাঁদের সহিত জোয়ারের সম্পর্ক বুঝা গেল, এবং কেন চান্দ্রদিনের সহিত সাগরের কম্প-কালের ঐক্য, তাহা বুঝা গেল।

এখন কথা এই, সূর্য্যের আকর্ষণ ত চন্দ্রের আকর্ষণ চেয়ে অনেক বেশী। সূর্য্য বহুদূরে থাকিলেও উহা এত প্রকাণ্ড বস্তু যে, চন্দ্রের আকর্ষণ চেয়ে সূর্য্যের আকর্ষণ অনেক বেশী। তবে সূর্য্যের সহিত জোয়ারের সম্পর্ক দেখা যায় না কেন?

ইহারও উত্তর পাওয়া যায়। আকর্ষণের ফল জোয়ার নহে, ভূকেন্দ্র ও ভূপৃষ্ঠে আকর্ষণের ভেদই জোয়ারের কারণ। উভয় স্থলে আকর্ষণ সমান হইলে জোয়ার ঘটিবে না। ভূকেন্দ্র হইতে ভূপৃষ্ঠের দূরত্ব ১ ধরিলে চন্দ্রের দূরত্ব হয় ৬০। ৬০ এর নিকট ১ একবারে ফেলিবার নহে,—নগণ্য নহে। কিন্তু ভূকেন্দ্র হইতে ভূপৃষ্ঠের দূরত্ব

১ ধরিলে সূর্য্যের দূরত্ব হয় প্রায় ২৩০০০। ২৩০০০ এর তুলনায় ১ নগণ্য। কাজেই সূর্য্যের আকর্ষণ অতি প্রবল আকর্ষণ হইলেও উহার পরিমাণ সমুদ্রেও যত ভূকেন্দ্রেও প্রায় তত; কাজেই সূর্য্যের জোয়ারও নগণ্য।

নগণ্য বটে, কিন্তু একেবারে শূন্য নহে। ফলে সূর্য্যের দরুণও সমুদ্রবক্ষের স্ফীতি কিঞ্চিৎ ঘটে; এবং উহার কম্পের কাল এক সৌরদিন বা চব্বিশ ঘণ্টা।

চন্দ্রের নিমিত্ত যে জোয়ার হয়, সূর্য্যের জোয়ার তাহাতে মিলিত হয়। ফলে উভয়ে মিলিয়া কম্পটাকে একটু জটিল করে। একটা বৃহৎ পরিসরযুক্ত কম্পে একটা ক্ষুদ্র পরিসর-যুক্ত কম্প চাপিয়া বৃহৎ কম্পটার সরলতা নষ্ট করিয়া উহাকে জটিল করিয়া তোলে। পরিদোলকের কম্প সরল, আর ঢেঁকির কম্প জটিল।

সেইরূপ সূর্য্যের জোয়ার চাঁদের জোয়ারকে একটু জটিল করিয়া দেয়। গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকা যেমন জোয়ার নির্ণয়ের সহজ উপায় দিয়াছেন, বস্তুতঃ নিয়ম তত সহজ নহে। কম্পের সহিত কম্প-যোগে যে জটিল কম্পের উৎপত্তি হয়, পাঞ্জিকা সেই জটিলতাটুকু ধরেন নাই। কেবল চাঁদের জন্য কম্পের স্থূল হিসাবটাই দিয়াছেন।

কম্পের সহিত কম্প যুক্ত হইলে কম্পের জটিলতা বৃদ্ধি হয়; এই কথাটা মনে রাখিতে হইবে, পরে কাজে লাগিবে।

জোয়ারভাঁটা-সম্বন্ধে আর একটা প্রশ্ন তুলিয়া এই প্রসঙ্গ শেষ করিব। প্রশ্ন এই; ঘড়ির পরিদোলককে বায়ুর বিঘ্ন ঠেলিয়া চলিতে হয়, কাজেই উহার শক্তির ক্ষয় ঘটে; তজ্জন্য মাঝে মাঝে দম দিয়া শক্তি সঞ্চার করিতে হয়। মহাসাগররূপী বৃহৎ পরিদোলককে এরূপ কোন বিঘ্ন ঠেলিতে হয় কিনা?

বিঘ্ন নাই কোথায়? এ জগৎ তেমন জগৎই নহে। মহাসাগরেরও আন্দোলনে বিঘ্ন আছে।

ভূপিণ্ড একদিনে একপাক ঘুরিয়া থাকে; চন্দ্র কিন্তু ২৭ দিনে একপাক ঘুরিয়া আসেন। চন্দ্র যদি আরও দ্রুত চলিয়া একদিনে পৃথিবীর চারিদিকে একপাক ঘুরিয়া আসিতেন তাহার ফল কি হইত? বঙ্গসাগর চাঁদের সম্মুখে থাকিলে উহা চিরকাল চাঁদের সম্মুখেই থাকিত। কিন্তু তাহা ত হয় না। পৃথিবী তাড়াতাড়ি এক পাক ঘুরিয়া আসেন, আর চাঁদ একদিনে একচক্রের ২৭ ভাগের এক ভাগ মাত্র চলিবেন। কাজেই চাঁদকে পিছনে থাকিতে হয়। ভূপৃষ্ঠ চাঁদের সম্মুখ ছাড়িয়া চলিয়া যায়, আবার পর দিনে চাঁদের সম্মুখে আসে—দণ্ড দুই পরে আসে, কেননা সেই সময়ে চাঁদ কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া গিয়াছেন। যাক, চাঁদ পিছনে পড়েন, কিন্তু নিজে সম্মুখে সমুদ্রের জলকে ফাঁপাইয়া রাখেন। পৃথিবী বেগে আবর্ত্তন করিতেছে কিন্তু চাঁদ তাহার পিঠের আবরণ জলরাশিকে নিজের দিকে টানিয়া ঠেলিয়া রাখিবার চেষ্টা করিতেছে। ঐ জল ত পৃথিবীরই আবরণ, পৃথিবীরই পরিচ্ছদ, তারল্যবশেই উহার ঐরূপ সঞ্চরণ সম্ভব। তারল্য না থাকিলে উহাকে পৃথিবীর সঙ্গে সঙ্গে যাইতে হইত, চাঁদের দিকে হেলিয়া থাকা চলিত না। ইহার ফল হয় এই যে, জলরূপী পরিচ্ছদকে টানিয়া থাকায় পৃথিবীর আবর্ত্তনে বাধা পড়ে। আমি দৌড়িয়া যাইব, কেহ আমার জামা ধরিয়া টানিয়া ধরিলে যেরূপ ব্যাপার হয়, কতকটা সেইরূপ ঘটে। পৃথিবী বলে, আমি বেগে ঘুরিব ও আমার পিঠের জলকে লইয়াই ঘুরিব। চাঁদ বলেন, জলের রাশি আমার সম্মুখে স্তূপাকার হইয়া থাকিবে। কাজেই, পৃথিবীর আবর্ত্তনে বিঘ্ন জল, জলের জোয়ারের বিঘ্ন পৃথিবীর আবর্ত্তন। একখানা চাকা বেগে ঘুরিতেছে, সেই চাকার পরিধিতে একখানা

কাঠ চাপিয়া ধরিলে যেমন হয় কতকটা সেইরূপ। কাঠে চাকার পরিধিতে ঘর্ষণ ঘটে, চাকার শক্তিক্ষয় ঘটে, উহার যানশক্তি ক্রমে তাপে পরিণত হয়; চাকার পরিধি ও কাঠখানা গরম হয়। এ ক্ষেত্রেও তাই হয়। পৃথিবীরূপ চাকা বেগে ঘূর্ণ্যমান, চন্দ্রাভিমুখ জলের স্তূপ তাহার উপর ঘর্ষণশীল। ফলে, পৃথিবীর আবর্ত্তনের শক্তিক্ষয় ও সেই শক্তির তাপে পরিণতি। শক্তির সৃষ্টিও নাই, ধ্বংসও নাই, এই তথ্যে যদি বিশ্বাস করিতে হয়, তাহা হইলে এটুকু মানিতে হইবে। অতি অল্পমাত্রায় হইলেও পৃথিবীর আবর্ত্তনে যে যানশক্তি সঞ্চিত, তাহা ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া তাপে পরিণত হইতেছে। অবশ্য যন্ত্র দিয়া এই তাপের পরিমাণ ধরিবার আশা নাই। তবে যানশক্তির ক্রমশঃ ক্ষয় এইরূপ অবশ্যম্ভাবী।

পৃথিবীর আবর্ত্তন বেগ একটু একটু কমিতেছে; দুই দশ কি দুই শত দশ শত বৎসরে বেগের হ্রাস ধরা না পড়িতে পারে, কিন্তু দুলাখ দশলাখ বৎসরে উহার পরিমাণ আর নগণ্য থাকিবে না। ফলে, লাখ-খানেক বৎসর আগে পৃথিবী আরও বেগে আবর্ত্তন করিত, তখন দিন ছিল চব্বিশ ঘণ্টার ছোট। লাখ-খানেক বৎসর পরে পৃথিবী আরও কম বেগে আবর্ত্তন করিবে। তখন দিন হইবে চব্বিশ ঘণ্টার অধিক। এই ক্রমিক তাপক্ষয়ের শেষ পরিণতিতে বহু-লক্ষ বৎসরে এমন দিন আসিতে পারে, তখন পৃথিবীর আবর্ত্তন বেগ এখনকার সাতাইশ ভাগের একভাগ হইবে। অর্থাৎ এখনকার প্রায় একমাসে এক দিনরাত্রি ঘটিবে! সংবৎসরে তেরটা মাত্র অহোরাত্র ঘটিবে!

সাতাইশ দিনে যখন পৃথিবী ঘুরিবে, বলা বাহুল্য, চন্দ্র তখন পৃথিবীর এক পিঠেরই সম্মুখে থাকিবেন। পৃথিবী ঘুরিবেন একচক্র সাতাইশ দিনে, চন্দ্রও ঘুরিবেন একচক্র সাতাইশ দিনে। ফলে চন্দ্র ও

পৃথিবী মুখোমুখি করিয়া ঘুরিবেন। বঙ্গসাগর যদি চাঁদের সম্মুখে থাকে তাহা হইলে উহা বরাবরই চাঁদের সম্মুখে থাকিবে। জলস্তূপ আর বঙ্গসাগর হইতে সরিয়া অন্যত্র যাইবে না। জোয়ার-ভাঁটার পুনরাবৃত্তি বন্ধ হইবে। পৃথিবীর আর শক্তিক্ষয়ও ঘটিবে না। অতএব অপেক্ষা কর, যদি জোয়ার-ভাঁটার পরিদোলকের গতি লোপ দেখিতে চাও, তবে অপেক্ষা কর সেই সময়ের জন্য, যখন পৃথিবী সাতাইশ দিনে আপন দেহ আবর্ত্তন করিবেন।

না, অতদিন অপেক্ষা করিতে হইবে না। ইহার ফলভোগী কেবল পৃথিবী নহেন, চন্দ্রও ইহার ফলভোগী। চন্দ্রেরও শক্তিক্ষয় ঘটিবে, তাঁহার যানশক্তি কমিবে, তাঁহার পৃথিবী হইতে দূরত্ব আরও বাড়িবে।

তরঙ্গ

ক হইতে ম পর্য্যন্ত অক্ষরগুলি পর পর সাজান আছে।

অ .... আ

ক খ গ ঘ ঙ চ ছ জ ঝ ঞ ট ঠ ড ঢ ণ ত থ দ ধ ন প ফ ব ভ ম

ই .... উ

প্রত্যেকটি অক্ষরের কম্প-গতি কল্পনা কর। কাঁপিবার সময় স্বস্থান ছাড়িয়া ৫ সেকেণ্ডে উপরে উঠিয়া অ-আ রেখা স্পর্শ করে, আবার ৫ সেকেণ্ডে নামিয়া স্বস্থানে আইসে আর ৫ সেকেণ্ডে নিম্নে ই-উ রেখা স্পর্শ করে ও আবার ৫ সেকেণ্ডে উঠিয়া স্বস্থানে পৌছে। এইরূপে ২০ সেকেণ্ডে উহার একবার কম্পন সম্পাত হয়। তার পর দ্বিতীয় কম্প। ক এর কম্পনারম্ভের এক সেকেণ্ড পরে খ, ২ সেকেণ্ড পরে গ, ৩ সেকেণ্ড পরে ঘ, এইরূপ যথাক্রমে অক্ষরগুলির কম্পন আরম্ভ

হইল। প্রত্যেকরই কম্পন একবিধ, ৫ সেকেণ্ডে স্বস্থান হইতে অ-আ রেখা, ৫ সেকেণ্ডে অ-আ রেখা হইতে স্বস্থান, ৫ সেকেণ্ডে স্বস্থান হইতে ই-উ রেখা ও ৫ সেকেণ্ডে ই-উ রেখা হইতে স্বস্থান। ক'র ৫ সেকেণ্ড পরে চ, ১০ সেকেণ্ড পরে ট, ১৫ সেকেণ্ড পরে ত, ২০ সেকেণ্ড পরে প কাঁপিতে আরম্ভ করিবে। প এর যখন প্রথম কম্পের আরম্ভ তার ৫ সেকেণ্ড পূর্ব্বে ত'র কম্প আরম্ভ হইয়াছে। অতএব ত তখন অ-আ রেখায় (ত স্থান) কিন্তু থ দ ধ ন ইহারা

(১)
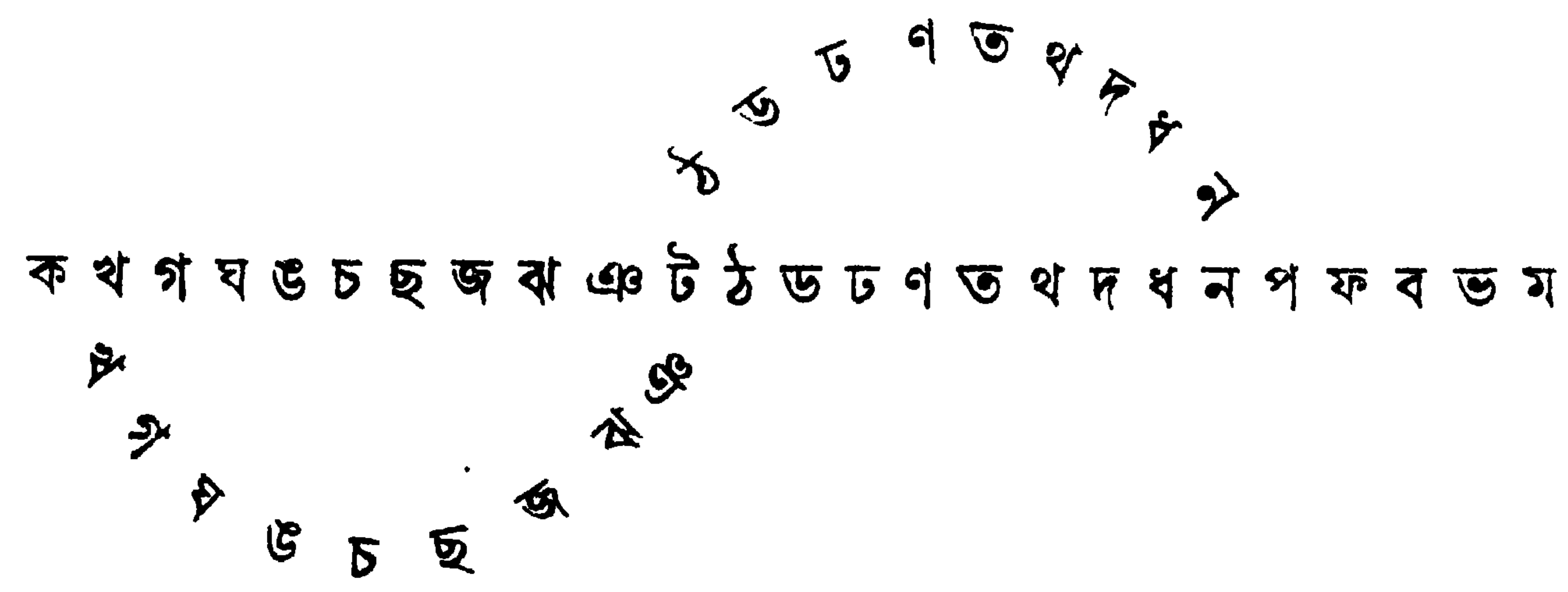

(২)
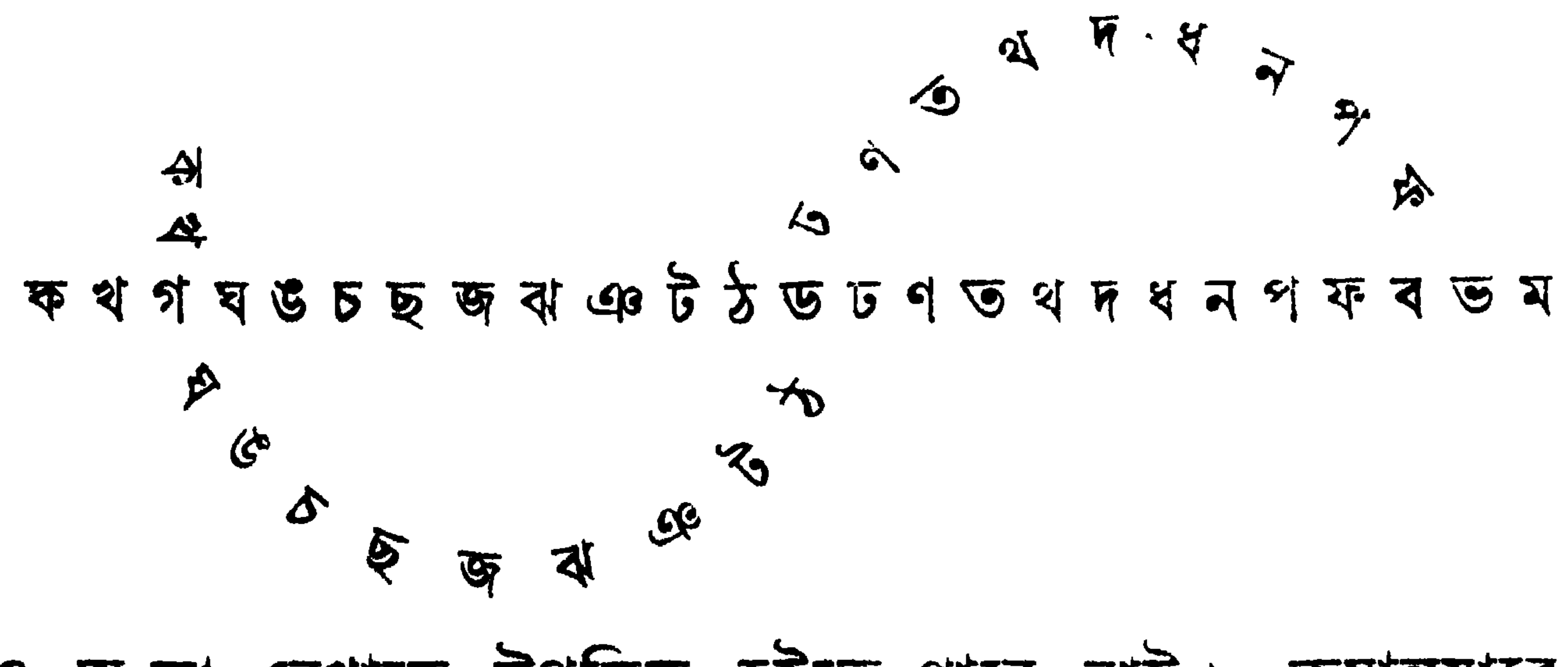

তখনও অ-আ রেখাতে উপস্থিত হইতে পারে নাই। ক্রমানুসারে অ-আ রেখার একটু একটু নীচে আছে। ট এর কম্প আরও ৫ সেকেণ্ড আগে আরম্ভ হইয়াছে; উহা অ-আ রেখা ছাড়িয়া আবার স্বস্থানে ফিরিয়াছে; কিন্তু ঠ ড ঢ ণ এখনও স্বস্থানে ফিরিতে পারে নাই। ক্রমানুসারে এক-একটু উপরেই আছে। চ এর কম্প আরও ৫ সেকণ্ডে

পূর্ব্বে আরম্ভ হইয়াছে, সে আবার স্বস্থান ছাড়িয়া নীচে ই-উ রেখায় ; কিন্তু ছ জ ঝ ঞ এখনও ই-উ পর্য্যন্ত নামিতে পারে নাই, ক্রমানুসারে ই-উ রেখার একটু উপরেই আছে। ক এর কম্পারম্ভ আরও ৫ সেকেণ্ড পূর্ব্বে ; সে ই-উ রেখা ত্যাগ করিয়া স্বস্থানে ফিরিয়া আসিয়াছে ও দ্বিতীয় কম্পারম্ভের উদ্যোগ করিতেছে। খ, গ, ঘ, ঙ তখনও ফিরিতে পারে নাই ; ক্রমানুসারে স্বস্থানের একটু নীচেই আছে।

২০ সেকেণ্ড পূর্ব্বে ক হইতে প পর্য্যন্ত সকলেই এক সরল রেখায় সারি বাঁধিয়া অবস্থিত ছিল। যদি সকলের কম্প এক সঙ্গে আরম্ভ হইত তাহা হইলেও উহারা সকলেই অন্য এক সরল রেখায় সারি বাঁধিয়া থাকিত, কিন্তু এক সঙ্গে সকলের কম্প আরম্ভ না হওয়ায় ফলে উহারা আর এক সরল রেখায় অবস্থিত নাই ; একটা বক্র রেখার অবস্থিত। এই বক্র রেখাটিকে আমরা একটি উর্ম্মি বা ঢেউ বলিতে পারি। উর্ম্মিটার প্রথমার্দ্ধ ক-প সরল রেখার নীচে, দ্বিতীয়ার্দ্ধ ঐ সরল রেখার উপরে ; চএর অবস্থান নিম্নতম, ঐ অবস্থায় তএর অবস্থান উর্দ্ধতম। ত স্থানটিকে ঢেউটির মাথা ও চ স্থানকে ঢেউর কোল বলা যাইতে পারে।

ক'র কম্পারম্ভের ২০ সেকেণ্ড পরে প'র কম্পারম্ভ। তখন অপরগুলির অবস্থানে ঐ ঢেউটি উৎপন্ন হইয়াছে। তখনও ফ, ব, ভ প্রভৃতির কম্পন আরম্ভ হয় নাই। আর এক সেকেণ্ড পরে ফ এর, দুই সেকেণ্ড পরে ব এর কম্প আরম্ভ হইবে। তখন অন্যান্য অক্ষরগুলি কোথায় দেখা যাউক। ব এর কম্পের যখন আরম্ভ ফ তখন একটু উপরে, প আরও উপরে এইরূপে যথাক্রমে অবস্থিত। ব এর ৫ সেকেণ্ড পূর্ব্বে দ এর কম্প আরম্ভ, অতএব দ তখন অ-আ রেখায়। ত তখন অ-আ রেখা হইতে নামিয়া আসিয়াছে। ভ এর কম্পারম্ভ ব এর

দশ সেকেণ্ড পূর্ব্বে, অতএব ড তখন স্বস্থানে, ঢ ণ তখনও স্বস্থানে পৌঁছিতে পারে নাই। জ এর কম্পারম্ভ আরও ৫ সেকেণ্ড পূর্ব্বে, সে তখন নামিয়া ই-উ রেখায়। ঝ ঞ ট ঠ তখনও ই-উ পর্য্যন্ত পৌঁছিতে পারে নাই। গ এর কম্পারম্ভ আরও ৫ সেকেণ্ড পূর্ব্বে, সে তখন ই-উ ছাড়িয়া স্বস্থানে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া দ্বিতীয় কম্পের উদ্যোগ করিয়াছে। ঘ, ঙ, চ, ছ তখনও স্বস্থানে পৌঁছিতে পারে নাই। খ ও ফ দ্বিতীয় কম্প আরম্ভ করিয়া স্বস্থান ছাড়িয়া ক্রমানুসারে এক-একটু ঊর্দ্ধে উঠিয়াছে। এখন ক হইতে ব পর্য্যন্ত অক্ষরগুলি যে বক্র রেখায় অবস্থিত তাহা চিত্রে দেখা যাইতেছে।

বলা বাহুল্য, এবার ঢেউটির মাথা আর ত'এ নাই, এবার মাথা দ'য়ে। আর ঢেউটির কোল চ'য়ে নাই কোল এখন জ'য়ে। ঢেউটির মাথা ও কোল উভয় স্থানই দুই সেকেণ্ড মধ্যে একটু সরিয়া আসিয়াছে। সমস্ত ঢেউটাই যেন একটু ডানি দিকে সরিয়া অগ্রসর হইয়াছে।

বলা বাহুল্য, ঢেউয়ের মাথা এইরূপে ক্রমেই অগ্রসর হইবে। উহার পিছনে ঢেউয়ের কোলটিও ক্রমে অগ্রসর হইবে।

অক্ষরগুলির এক সঙ্গে কম্পন আরম্ভ হইলে এইরূপ ঊর্ম্মির সৃষ্টি হইত না। একসঙ্গে কম্পন আরম্ভ না হইয়া পর পর আরম্ভ হইলে ঊর্ম্মির বা ঢেউয়ের সৃষ্টি হয়। কিন্তু ঐ ঊর্ম্মি একস্থানে স্থির থাকে না; উহা ক্রমেই অগ্রসর হয়। ঊর্ম্মির মাথা থাকে, তার পিছনে কোল থাকে, ঊর্ম্মির মাথা ধীরে ধীরে সরিয়া যায়, কোলও তার পিছনে পিছনে অগ্রসর হয়। এইরূপ গতির নাম **তরঙ্গ-গতি**।

জলের মধ্যে একটি কণিকা কাঁপিতে লাগিলে সেই কম্পন পর পর কণিকায় সংক্রান্ত হইয়া এইরূপ ঊর্ম্মির সৃষ্টি করে। ঊর্ম্মির মাথা

জলপৃষ্ঠ ছাড়িয়া উপরে উঠে; কোল নীচে থাকে। কণিকাগুলি স্বস্থানে উঠানামা করে, উহারা অগ্রসর হয় না; কেবল ছট্‌ফট্‌ করে মাত্র; ছোটে না। সেই ছট্‌ফটানির ফলে ঢেউ জন্মে, উর্ম্মির উপর উর্ম্মি জন্মে। প্রথম ঢেউটি জন্মিয়া অগ্রবর্ত্তী হয়, তাহার পিছনে দ্বিতীয় ঢেউ চলে, তাহার পিছনে তৃতীয় ঢেউ চলে। এইরূপে উর্ম্মির পর উর্ম্মি সারি দিয়া কাতার দিয়া চলিতে থাকে। এইরূপ গতির নাম তরঙ্গ-গতি; ইহা কোন জড়পদার্থের গতি নহে, ইহা উর্ম্মির গতি। উর্ম্মি কোন জড় পদার্থ নহে, উহা জড়পদার্থের একটা অবস্থান-ভেদ মাত্র, একটা মূর্ত্তি মাত্র; ঐ উর্ম্মির গতির নাম তরঙ্গ-গতি।

জলাশয়ে লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিলে এইরূপ তরঙ্গ-গতি উৎপন্ন হয়; শস্যক্ষেত্রে হাওয়া দিলে শস্যের শীর্ষগুলি হাওয়াতে উঠানামা করে ও তাহাতে ঢেউ খেলিয়া যায়। তন্ত্রীতে আঙ্গুলের ঘা দিলে পার্শ্বস্থ বায়ুতে এইরূপ ঢেউ খেলিতে আরম্ভ করে।

শব্দ-তরঙ্গ

একটা তারে ঘা দিলে তারটা পুনঃপুনঃ কাঁপিতে থাকে। তারের প্রত্যেক কম্পে বায়ুতে একটি করিয়া উর্ম্মি উৎপাদন করে। প্রত্যেক কম্পে তার একবার আগে আসে, একবার পিছু হটে। আগে আসিবার সময় সম্মুখের বায়ুকে ঠেলিয়া দেয়, বায়ুস্তর সেই চাপে একটু সঙ্কুচিত হয়; আবার তারের পিছু হটিবার সময় সেই চাপ আল্‌গা হয়; বায়ুস্তর তখন প্রসারিত হয়, চাপটা স্তর হইতে স্তরে সংক্রান্ত হয়, আর ঢেউয়ের পর ঢেউ চলিতে থাকে। বায়ুস্তরে তরঙ্গ-গতি উৎপন্ন হয়। ঢেউগুলি বায়ুস্তর আশ্রয় করিয়া যে বেগে অগ্রসর হইতে থাকে, সে বেগ নিতান্ত সামান্য নহে। মাপিয়া দেখা

গিয়াছে উহা সেকেণ্ডে প্রায় ১১০০ ফুট। বায়ুর উষ্ণতা অধিক হইলে বেগেরও পরিমাণ কিঞ্চিৎ বাড়ে। তবে মোটামুটি ১১০০ ফুট ধরা যাইতে পারে।

একটা তারে ঘা দিলে উহা কাঁপিতে থাকে; সেকেণ্ডে কয় বার কাঁপিবে তাহা সহসা বলা যায় না। পেণ্ডুলমের কম্প-সংখ্যা উহার দৈর্ঘ্যের উপর নির্ভর করে; তারের কম্প-সংখ্যাও দৈর্ঘ্যের উপর নির্ভর করে। লম্বা তারের চেয়ে খাট তার সেকেণ্ডে কাঁপে বেশী। আবার পেণ্ডুলমের কম্প-সংখ্যার সহিত মাধ্যাকর্ষণের সম্পর্ক আছে। তারের কম্প-সংখ্যার সহিত উহাতে যে টান দেওয়া যায়, সে টানের সম্পর্ক আছে। টান বেশী হইলে সেকেণ্ডে কম্প-সংখ্যাও বাড়ে। কাজেই, দীর্ঘতাভেদে ও টানের মাত্রাভেদে সেকেণ্ডে কোন তার দশ-বারও কাঁপিতে পারে, কোন তার দশ হাজার বারও কাঁপিতে পারে। প্রত্যেক কম্পে কিন্তু পার্শ্বস্থ বায়ুরাশিতে একটি উর্ম্মি জন্মে। সেকেণ্ডে দশবার কাঁপিলে সেকেণ্ডে দশটি উর্ম্মি জন্মে, দশ হাজার বার কাঁপিলে দশ হাজার উর্ম্মি জন্মে। উর্ম্মিগুলি একস্থানে বসিয়া থাকে না। বায়ুকে আশ্রয় করিয়া উর্ম্মির পর উর্ম্মি সেকেণ্ডে ১১০০ ফুট বেগে সারি বাঁধিয়া চলিতে থাকে। বায়ুস্তরের সঙ্কোচের পর প্রসারণ, তার পর আবার সঙ্কোচ, আবার প্রসারণ, এইরূপে উর্ম্মিমালার সৃষ্টি হয়। কোন উর্ম্মি বড়, কোনটা ছোট, সকলেই কিন্তু সেই সেকেণ্ডে ১১০০ ফুট বেগে অগ্রবর্ত্তী হয়। এক মাইল রাস্তা যাইতে পাঁচ সেকেণ্ডও লাগে না।

মনে কর, তার, সেকেণ্ডে দশবার কাঁপিতেছে; সেকেণ্ডে দশটা উর্ম্মি উৎপন্ন হইল। প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় কম্প যথাক্রমে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় উর্ম্মির সৃষ্টি করে। প্রথম উর্ম্মি চলিল; তার পিছনে

দ্বিতীয় চলিল; তার পিছনে তৃতীয় চলিল; এইরূপে এক সেকেণ্ড মধ্যে দশটি উর্ম্মির সারি চলিল। একাদশ উর্ম্মি তার হইতে উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বেই প্রথম উর্ম্মি তার ছাড়িয়া ১১০০ ফুট দূরে চলিয়া গিয়াছে। তার পশ্চাতে তারের নিকট পর্য্যন্ত আরও নয়টি উর্ম্মি সারি বাঁধিয়া রহিয়াছে। ১১০০ ফুটের ভিতর দশটি উর্ম্মি; প্রত্যেক উর্ম্মির দৈর্ঘ্য কাজেই ১১০ ফুট; খুব বৃহৎ ঢেউ সন্দেহ নাই।

আবার মনে কর, তার সেকেণ্ডে ১০০ বার কাঁপিতেছে, এবারও প্রত্যেক কম্পে এক এক উর্ম্মির সৃষ্টি হয়। এক সেকেণ্ড মধ্যে ১০০ উর্ম্মির সৃষ্টি হয়। প্রথম উর্ম্মি এক সেকেণ্ড মধ্যে তার ছাড়িয়া ১১০০ ফুট চলিয়া গিয়াছে, তার পশ্চাতে ৯৯ টি উর্ম্মি সারি বাঁধিয়া যথাক্রমে থাকে। ১১০০ ফুট পথের মধ্যে ১০০টি উর্ম্মি; কাজেই এবার প্রত্যেক উর্ম্মির দৈর্ঘ্য ১১ ফুট মাত্র।

প্রতি সেকেণ্ডে তার যতবার কাঁপে, ততগুলি উর্ম্মি উৎপন্ন হয়। আর উর্ম্মির সংখ্যা যত অধিক, উহার দৈর্ঘ্য তত অল্প। তার সেকেণ্ডে দশবার কাঁপিলে উর্ম্মির দৈর্ঘ্য ১১০ ফুট, ১০০ বার কাঁপিলে দৈর্ঘ্য ১১ ফুট, ১০০০ বার কাঁপিলে এক ফুটের কিঞ্চিৎ অধিক, ১০০০০ বার কাঁপিলে এক ইঞ্চির কিঞ্চিৎ অধিক

বায়ুতে উর্ম্মি বর্ত্তমান বলিলে কি বুঝিব? বুঝিব এই যে, এক-স্থানে বায়ুস্তরটা কিঞ্চিৎ সঙ্কুচিত, সেখানে চাপের মাত্রা কিঞ্চিৎ অধিক। তার পশ্চাতে আর একস্থানে বায়ুস্তর কিঞ্চিৎ প্রসারিত, সেখানে চাপের মাত্রা কিঞ্চিৎ অল্প। আবার আর একটু পশ্চাতে বায়ুস্তর আবার কিঞ্চিৎ সঙ্কুচিত ও সেখানে চাপ অধিক। এইরূপ ক্রমান্বয়ে সঙ্কুচিত ও প্রসারিত বায়ুস্তর; বায়ুরাশিতে বর্ত্তমান। কিন্তু বায়ু অদৃশ্য পদার্থ; উহা দর্শনেন্দ্রিয়ের গোচর নহে। চাপের যে

কিঞ্চিৎ অল্পাধিক্য হয়, তাহাও সহজে বোধগম্য হয় না। তবে এই ঊর্ম্মির অস্তিত্ব জানিব কিরূপে? ১৮৮৩ সালের আগষ্ট মাসে যবদ্বীপের নিকট ক্রাকাটোয়া নামক অগ্নেয়গিরির ভীষণ অগ্ন্যুদ্গার হইয়াছিল ২৭শে আগষ্ট তারিখে দ্বীপটার একাংশ ভীষণ আঘাতে একবারে উৎক্ষিপ্ত ও লুপ্ত হয়। তাহাতে বায়ুস্তরে যে ভীষণ আঘাত লাগে, সেই আঘাতের ফলে সঙ্কোচ-প্রসারণের উৎপত্তি ঘটিয়া বায়ুরাশিতে প্রকাণ্ড ও প্রচণ্ড ঊর্ম্মির সৃষ্টি করে। সেই ঊর্ম্মি যবদ্বীপ হইতে বাহির হইয়া সমস্ত ভূমণ্ডল বেষ্টন করিয়া আসে। সেই ঊর্ম্মিসঞ্চারণের ফলে পৃথিবীর সর্ব্বত্র বায়ুরাশির চাপ পর্য্যায়ক্রমে একবার বৃদ্ধি একবার হ্রাস পাইয়াছিল। পৃথিবীর যাবতীয় বায়ুমান যন্ত্রে সেই চাপের হ্রাস-বৃদ্ধি ধরা পড়িয়াছিল। অগ্ন্যুৎপাত ও ভূমিকম্প হইয়াছে যবদ্বীপের নিকটে, ইংলণ্ডে বা আমেরিকায় তাহার সংবাদ পর্য্যন্ত জানে না; অথচ সেখানকার বায়ুমান যন্ত্রে পারদপৃষ্ঠ আন্দোলিত হইতে থাকিল। কিছুদিন পরে প্রকাশ পাইল, সেই আন্দোলন ক্রাকাটোয়ার অগ্ন্যুৎপাতের ফল।

ক্রাকাটোয়ার ভীষণ অগ্নিকাণ্ডে বায়ুতে যে ভীমাকার প্রচণ্ড ঊর্ম্মির উৎপত্তি হইয়াছিল, তাহার ফলে চাপের হ্রাসবৃদ্ধি বায়ুমান যন্ত্রে ধরা পড়িয়াছিল, কিন্তু তানপুরার তারে আঘাত ক্রাকাটোয়ার অগ্ন্যুৎপাতের সহিত তুলনীয় নহে। তদুৎপন্ন ঊর্ম্মিতে বায়ুরাশিতে চাপের যে কিঞ্চিৎ হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে তাহা বায়ুমানে ধরিবার আশা নাই; আর বায়ুও দর্শনেন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য। বজ্রপাতের সময় বায়ুতে যে প্রচণ্ড আঘাত পড়ে, তাহার ঊর্ম্মির আঘাতে ঘরের শাশীর কাঁচ কাঁপিয়া উঠে। তানপুরার তারের আঘাতে উৎপন্ন ঊর্ম্মিতে সে আশাও করা যায় না। তবে এই ঊর্ম্মির কম্পনগুলি কি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে?

তার সেকেণ্ডে দশবারও কাঁপিতে পারে; শতবারও কাঁপিতে পারে। দশবার কম্পনে সেকেণ্ডে দশ ঊর্ম্মি জন্মে ও বায়ু মধ্যে চালিত হইয়া কর্ণপটহে আঘাত করে। কিন্তু তাহাতে আমাদের চেতনার সঞ্চার হয় না। কিন্তু সেকেণ্ডে শতবার কম্পনে শতঊর্ম্মির সৃষ্টি করিলে, সেকেণ্ডে শতবার কর্ণপটহে আঘাত করে, তখন উহা চেতনার বিষয় হইয়া একটা অনুভূতির জ্ঞান জন্মায়, ঐ জ্ঞানের নাম শব্দজ্ঞান। এই শব্দজ্ঞান কেন জন্মায় বলিতে পারি না, কিরূপে জন্মায় তাহা কতকটা বলিতে পারা যায়।

সেকেণ্ডে কতগুলি ঊর্ম্মির আঘাত কাণে পড়িলে শব্দজ্ঞান জন্মায়, বলা কঠিন। সকল মানুষের ইন্দ্রিয়-ক্ষমতা সমান নহে। মোটামুটি বলা যায়, সেকেণ্ডে ঊর্ম্মির সংখ্যা ত্রিশের অধিক হইলে শব্দজ্ঞান জন্মে। তার নীচে কাহারও কাহারও জন্মিতে পারে, অনেকেরই জন্মে না। আবার ঊর্ম্মির সংখ্যা সেকেণ্ডে হাজার ত্রিশের অধিক হইলে আর শব্দ-জ্ঞান জন্মে না। শ্রবণেন্দ্রিয় এখানে বাহ্য বিষয়ের সংবাদ লইতে অসমর্থ হয়।

মোটামুটি সেকেণ্ডে ত্রিশ হইতে ত্রিশ হাজার পর্য্যন্ত ঊর্ম্মি কাণে আঘাত দিলে শব্দজ্ঞান জন্মে। সেই শব্দজ্ঞানের আবার ইতর বিশেষ আছে।

শব্দজ্ঞান

শব্দজ্ঞান একটা জ্ঞান। শ্রবণেন্দ্রিয় একটা অনুভবকে অন্তরিন্দ্রিয় মনের সমীপস্থ করিলে মন উহাকে গ্রহণ করিয়া বুদ্ধির সমীপে পৌছাইয়া দেয়, বুদ্ধি তখন উহা দ্বারা হর্ষ-ক্লেশ অনুভব করে ও মনের সাহায্যে উহাকে স্বকর্ম্মে নিযুক্ত করে। ইন্দ্রিয়দ্বারা অনুভূতি

বুদ্ধির সমীপে আনীত হইলে উহা চেতনার বিষয় হয়, তখন উহাকে বলি জ্ঞান। উর্ম্মির আঘাতের ফলে শ্রবণেন্দ্রিয়ের আনীত যে জ্ঞান, তাহা শব্দজ্ঞান; উহা চেতনার গোচর; জড়জগতে উহার স্থান নাই।

জড়জগতে আছে উর্ম্মি, উর্ম্মির অন্তর্গত বায়ুস্তরের সঙ্কোচ, প্রসার; উহা দর্শনস্পর্শের প্রায় অগোচর। এই শব্দজ্ঞানের আবার নানাভেদ আছে। কোন শব্দ মধুর, কোনটা কর্কশ। যাহা চেতনাকে হর্ষ দেয় তাহা মধুর; যাহা চেতনাকে ক্লেশ দেয় তাহা কর্কশ। মধুর শব্দের বিন্যাসে সঙ্গীতের উৎপত্তি। মধুর শব্দের সঙ্গীতশাস্ত্রের আখ্যা সুর। যে শব্দ বেসুরা তাহা ক্লেশকর বা কর্কশ; তাহা গণ্ডগোল বা কোলাহল মাত্র। সুরের আবার ভেদ আছে। কোন সুর উচ্চ বা দূরশ্রাবী, যেমন শঙ্খশব্দ; কোনটা মৃদু বা নিকট হইতে শোনা যায়, যেমন কণ্ঠশব্দ। কিন্তু এই লক্ষণটা সুরের প্রধান লক্ষণ নহে: ইহা ধরিয়া সুর চিনিয়া লওয়া যায় না। সুর চিনিতে হইলে, আমরা বলি এই সুরটা চড়া, ঐ সুরটা নরম বা ঐটা তার, ঐটা উদার। পুরুষের কণ্ঠ স্বর কোমল উদার, নারীর স্বর তীব্র, তার। বয়স্কের অপেক্ষা বালকের স্বর তীব্র। শাঁখের শব্দ কোমল, গম্ভীর; ট্রামগাড়ী চালকের বাঁশির শব্দ তীব্র, কর্ণভেদী।

ফলে তীব্র-কোমল ভেদেই স্বরের স্বরূপ নির্ণীত হয়। এই ভেদটাকেই শ্রবণেন্দ্রিয়ের প্রেরণায় চেতনা স্বরের প্রধান ভেদ বলিয়া জানে। স্বরগ্রামে এই ভেদ ধরিয়াই ষড়জ, ঋষভ, গান্ধার, মধ্যমাদি ক্রমে সা রি গা মা ক্রমে সুরের পর্য্যায় নির্ণীত হয়। গ্রামের মধ্যে যাহা সব চেয়ে কোমল, তাহাই সা, তার উপর রি, তার উপরে গা ইত্যাদি। কোন স্বর দূর হইতে শোনা যায়,

বা নিকট হইতে শোনা যায়, সঙ্গীতজ্ঞ তাহার বড় খবর লন না। কিন্তু কোন্‌টা কোমল কোন্‌টা তীব্র তাহার যথাযথ জ্ঞানই সঙ্গীত-কলার প্রাণ। তীব্র-কোমল নানা স্বর পর পর নানা বিধানে বিন্যাস করিয়া সঙ্গীতকলাবিৎ নানা অপরূপ সঙ্গীতের সৃষ্টি করেন, চেতনা তাহাতে মুগ্ধ ও অভিভূত হয়। কেন হয়, কে জানে?

সঙ্গীত-রসজ্ঞ ঊর্ম্মিতত্ত্বের কোন ধারই ধারেন না; তিনি মধুর সঙ্গীতের মাধুর্য্য উপভোগ করেন। কিন্তু পদার্থবিদের উপভোগ নিয়ত থাকিলে চলে না। তাঁহাকে তথ্যনির্ণয় করিতে হয়। চেতনার নিকট স্বরের এই যে কোমলে তীব্রে ভেদ, বাহ্যজগতে বায়ুমধ্যে ঊর্ম্মিমধ্যে তাহার আনুষঙ্গিক ভেদ কিরূপ?

তারকে কাঁপাইয়া ঊর্ম্মির সৃষ্টি হয়। সেকেণ্ডে যত কম্পন, সেকেণ্ডে তত ঊর্ম্মি; অদৃশ্য ঊর্ম্মিগুলি গণিতে না পারিলেও কম্পনসংখ্যা যন্ত্রযোগে গণিতে পারা যায়। পদার্থবিৎ গণিয়া দেখিয়াছেন, কম্পনসংখ্যা যত বাড়ে, আনুষঙ্গিক স্বরও তত তীব্র বা তীব্র হয়। সেকেণ্ডে তুইশ, চারিশ, পাঁচশ কম্পে স্বর গম্ভীর কোমল, দুই হাজার পাঁচ হাজার কম্পনে স্বর তীব্র। কম্পনসংখ্যা যতই বাড়িবে, স্বর ততই তীব্র হইবে।

সা এর অপেক্ষা রি তীব্র; তন্ত্রীটা খাট করিলেই কম্পন-সংখ্যা বাড়ে ও স্বরের তীব্রতাও সঙ্গে সঙ্গে বাড়ে। ষড়জ ক্রমে চড়িতে চড়িতে ঋষভে পরিণত হয়। যাঁহার শ্রবণেন্দ্রিয় শিক্ষিত তিনি তারের পানে না চাহিয়া বলিয়া দিবেন, ঋষভ পর্য্যন্ত উঠিয়াছে কি না! কতটুকু চড়িলে ষড়জ গিয়া ঋষভে দাঁড়ায়, তাহা সঙ্গীতবেত্তার শ্রবণাগ্রে। পদার্থবিৎকে তারের দৈর্ঘ্য মাপিয়া বা কম্পন মাপিয়া বলিতে হইবে, ষড়জ ঋষভে পরিণত হইবার সময় আসিয়াছে কি না?

স্বরের প্রধান লক্ষণ যে, তীব্রকোমল-ভেদ, যাহা লইয়া স্বরের স্বরত্ব,

তাহার সহিত আহত তন্ত্রীর কম্পনসংখ্যার সম্পর্ক। অতএব প্রতি সেকেণ্ডে শ্রবণেন্দ্রিয়ের আনীত ঊর্ম্মিসংখ্যার সম্পর্ক। আর কিছুরও সম্পর্ক নাই। তবে শব্দের দূরশ্রাবিতার সহিত সম্পর্ক কিসের? আমি যখন বন্ধুর কাণে কাণে কথা বলি, তখনই বা ঊর্ম্মিগুলি কি লক্ষণ-বিশিষ্ট হয়, আর যখন গলা ছাড়িয়া সভাস্থলে বক্তৃতা করি, তখনই বা বায়ুমধ্যে ঊর্ম্মিগুলি কিরূপ হয়? উত্তর সহজ। কামানের গর্জ্জন দূরশ্রাবী; মেঘগর্জ্জন, বজ্রগর্জ্জন দূরশ্রাবী; ঊর্ম্মিগুলা এত জোরে আসিয়া ধাক্কা দেয় যে, ঘরের জানালা কপাট পর্য্যন্ত কম্পান্বিত হয়। তন্ত্রীকে বহুদূর টানিয়া ছাড়িয়া দিলে উহার শব্দ দূর পর্য্যন্ত যায় ও অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত শব্দ টিকিয়া থাকে। মৃদু অঙ্গুলির তাড়নায় যে মৃদু শব্দ উৎপন্ন হয়, তাহা অল্পক্ষণ স্থায়ী, অল্প দূরেও শুনা যায় না। কম্পের পরিসরের কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। তন্ত্রীকে স্বস্থান হইতে চ্যুত করিয়া যত দূরে লইয়া যাইবে, কম্পনের পরিসর ততই অধিক হইবে। স্বস্থানে ফিরিবার সময় যত বেগের সহিত ঝোঁকের সহিত ফিরিবে ততই উহা শক্তিসম্পন্ন হইবে। কম্পশীল দ্রব্য শক্তিসম্পন্ন। যাহাতে শক্তি যত নিহিত থাকে, তাহার সেই শক্তিক্ষয়ে তত অধিক সময় যায়। সেই শক্তি বহুদূর পর্য্যন্ত চালিত হইলেও উহার ফল দেখায়। কম্পনের এই পরিসরের আধিক্যে, কম্পমান তন্ত্রীতে নিহিত যানশক্তির আধিক্যে এই দূরশ্রাবিতা বৃদ্ধি পায়।

আগেও বলিয়াছি, আবার বলিতেছি, এই দূরশ্রাবিতা স্বরের প্রধান লক্ষণ নহে। আলোকের যেমন বর্ণ ধরিয়া চেনা যায়, এই আলো লাল, উহা নীল; শব্দ সেইরূপ সুর ধরিয়া চেনা যায়, ইহা কোমল, ইহা তীব্র। একই নীলালোকের ঔজ্জ্বল্য-ভেদ থাকিতে পারে, একই সুরের দূরশ্রাবিতার ভেদ থাকিতে পারে।

এই দূরশ্রাবিতা যে লক্ষণ তাহা তুচ্ছ লক্ষণ ; স্বরের প্রধান লক্ষণ সুর ; যাহার সহিত সম্পর্ক কম্প-দ্রুতির। তদ্ব্যতীত আর একটা লক্ষণ আছে, সঙ্গীতশাস্ত্র তাহাকে উপেক্ষা করিতে পারে না। উহাকে ধ্বনি বা আওয়াজ আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে! এই তৃতীয় লক্ষণের আলোচনার পূর্ব্বে একবার স্বরোৎপাদক বাদ্যযন্ত্র সমূহের আলোচনা আবশ্যক।

বাদ্যযন্ত্র

যাহার কম্পে বায়ুরাশিতে তরঙ্গগতির সৃষ্টি হয়, তাহার প্রকৃতি-ভেদে বাদ্যযন্ত্রের শ্রেণীভেদ হয়। স্থূলতঃ চারিটা শ্রেণী—

১। বীণাযন্ত্র—এখানে তন্ত্রীর বা তারেব কম্পে বায়ুতে তরঙ্গোৎপত্তি। উদাহরণ—তানপূরা, একতারা, সেতার প্রভৃতি।

২। বেণুযন্ত্র—এখানে যন্ত্রের বিবরগত বায়ুর কম্পে বাহিরের বায়ুতে তরঙ্গোৎপত্তি। উদাহরণ—ভগবানের মুরলী ও পাঞ্চজন্য হইতে অরগ্যান হারমোনিয়ম, ক্লারিওনেট ও শিশুজনপ্রিয় কর্ণবিদারক বাঁশী পর্য্যন্ত। বিবরবদ্ধ বায়ুর কম্প উত্তেজনার জন্য বিবর-মুখে কোথাও রীড়ের ব্যবস্থা, কোথাও প্রবেশদ্বারের বায়ুসংঘর্ষের ব্যবস্থা থাকে। কোথাও বা বাদকের ওষ্ঠের চর্ম্ম রীড়ের কাজ করে।

৩। পটহ যন্ত্র—সূক্ষ্মচর্ম্মের কম্পে বায়ুতে তরঙ্গের উৎপত্তি ; দৃষ্টান্ত—ঢাক ঢোল মৃদঙ্গাদি।

৪। কাংস্য যন্ত্র—তাড়িত ধাতুফলকের কম্পে বায়ুতে তরঙ্গের উৎপত্তি ; দৃষ্টান্ত,—কাঁসর, ঘণ্টা, ঘড়ি, করতাল।

বীণাযন্ত্রে তার যত দীর্ঘ হয় সুর তত তীব্র হয়। সেতারের তন্ত্রীর পর্দ্দায় পর্দ্দায় আঙ্গুল দিয়া তারকে ইচ্ছামত বড় ছোট করিয়া

কোমল, তীব্র স্বর উৎপন্ন করা হয়। তারে টান বাড়াইলে স্বর তীব্র হয়। ভারী ওজন ঝুলাইয়া টান বাড়ান চলে, বা, বেহালাতে কাণ মোচড়াইয়া টান বাড়ান চলে। তারের সরু মোটা ভেদেও স্বরের ভেদ হয়। সরু তারে তীব্র স্বর, মোটায় কোমল। তারের দ্রব্য-ভেদেও স্বরভেদ হয়। তন্ত্রীযন্ত্রের সরু তার অধিক পরিমাণে বায়ুকে আহত করিতে পারে না, সেইজন্য যন্ত্র মধ্যে একটা বিবরে বায়ু আবদ্ধ করিয়া রাখিয়া সেই বায়ুতে আঘাত সঞ্চারণের ব্যবস্থা থাকে। আবদ্ধ বায়ুর আঘাতে বাহিরের অনেকটা বায়ুতে আঘাত পায়। তানপূরা বেহালা প্রভৃতির কাঠের খোলের এই তাৎপর্য্য। পটহযন্ত্রেও এইরূপ ব্যবস্থা থাকে। ঢাক ঢোলের পেটের ভিতর বায়ুরাশি সঞ্চিত থাকে।

বেণুযন্ত্রে বিবরের আকৃতি ও আয়তনভেদে স্বরের ভেদ হয়। স্থূলতঃ বাঁশী যত দীর্ঘ হয়, স্বর তত কোমল। যত খাট হয়, স্বর তত তীব্র। বাঁশের বাঁশীতে ও ক্লারিওনেটে রন্ধ্র সমূহ অঙ্গুলিবদ্ধ করিয়া বিবরের দীর্ঘতা কমান বাড়ান হয়। ভগবান মুরলীর রন্ধ্রে রন্ধ্রে বায়ুনির্গমের ব্যবস্থা করিয়া গোপীদের প্রাণ আকর্ষণ করিতেন।

পটহ যন্ত্রের ও কাংস্যযন্ত্রের স্থূল নিয়ম এই যে, কম্পমান পটহ বা ফলক যত খাট ও ছোট হইবে স্বরের তীব্রতা তত‌ই বাড়িবে।

এই সকল কম্পমান দ্রব্যের একটা অদ্ভুত ক্ষমতা আছে। একটা তারে আঘাত করিলে সমস্ত তারটা কাঁপিতে থাকে; অথবা উহা আপনাকে দুই বা ততোধিক খণ্ডে বিভক্ত করিয়া লইয়া প্রত্যেক খণ্ড স্বতন্ত্রভাবে কাঁপিতে থাকে। দীর্ঘ ভাগটা কাঁপিলে যে স্বর জন্মে, তাহার কোন ভগ্নাংশ কাঁপিলে অবশ্য তদপেক্ষা তীব্র স্বর জন্মিবে। সময় সময় এমন ঘটে যে, সেই তারের নিজস্ব কোমল স্বর না বাজিয়া

তারের ভগ্নাংশের তীব্র স্বরটাই বাহির হয়। কেবল যে তারে এইরূপ ঘটে এমন নহে। বেণুযন্ত্রে, পটহযন্ত্রে কাংস্যযন্ত্রে সর্ব্বত্র এই ব্যাপার ঘটিতে দেখা যায়। দীর্ঘ বাঁশী বাজাইতে চেষ্টা করিতেছি, উহার স্বাভাবিক কোমল স্বরের বদলে একটা উচ্চ তীব্র স্বর বাহির হইল। বুঝিতে হইবে, আবদ্ধ বায়ুরাশি আপনাকে বহুখণ্ডে বিভক্ত করিয়া লইয়াছে ও তাহার প্রত্যেক খণ্ড স্বতন্ত্রভাবে কাঁপিতেছে।

ইহার ফল এই যে, বীণাই বল, আর বেণুই বল, আর পটহই বল, উহাদের নিজস্ব বিশুদ্ধ স্বরটি পাওয়া ভার। তাড়নার পর কম্পন আরম্ভ হয়। সমস্তটা কাঁপে, সঙ্গে সঙ্গে ভগ্নাংশ খণ্ডগুলিও কাঁপে। স্বাভাবিক কোমল স্বরের সঙ্গে সঙ্গে কতিপয় উচ্চতর তীব্রতর স্বর বাহির হয়। যাঁহাদের সাধা কাণ, তাঁহারা অনেক সময় ঐ তীব্রতর আনুষঙ্গিক স্বরগুলি অবধান করিলেই শুনিতে পান। সাধা না থাকিলে, কিরূপে যন্ত্রযোগে উহাদের অস্তিত্ব ধরা পড়ে, তাহা মনীষী হেলম্‌হোল্‌ৎজ দেখাইয়াছেন। এই হেল্‌মহোল্‌ৎজের নাম আগে বলিয়াছি। ইনিই উনবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত যে সর্ব্বপ্রধান তত্ত্ব অর্থাৎ শক্তিতত্ত্ব, সেই শক্তি-তত্ত্বের প্রথম ব্যাখ্যান-কর্ত্তা। তিনি ছিলেন ডাক্তার, ডাক্তারি ছাড়িয়া তিনি শারীরবিদ্যার অধ্যাপনা ধরেন; শারীরবিদ্যার অধ্যাপনা ছাড়িয়া পদার্থ-বিদ্যার অধ্যাপনা ধরেন। তিনি যখন তনুত্যাগ করেন, তখন শারীরবিদ্যা, পদার্থবিদ্যা ও গণিতবিদ্যা—এই ত্রিমূর্ত্তি-ধারিণী সরস্বতী আর্ত্তনাদ করিয়া উঠেন। হেলম্‌হোলৎজ স্বর-বিশ্লেষণের উপায় বাহির করিয়া দেখান যে, সাধারণ যন্ত্রোদ্গত স্বর প্রায় বিশুদ্ধ স্বর হয় না। স্বাভাবিক কোমল স্বরের সহকারে তীব্রতর কতিপয় স্বর বাহির হয়। আপন স্বরের সহকারে এই

উপরের স্বরগুলি থাকায়, সুরে সুরে জড়িত হইয়া শব্দ-জ্ঞানে একটা বিশিষ্টতা দেয়। উহারই নাম দিয়াছি স্বরের আওয়াজ বা ধ্বনি।

স্বরের প্রধান লক্ষণ যে তীব্রতা, তাহা কম্পন-সংখ্যার উপর নির্ভর করে। কিন্তু দুইটা সুর সমান তীব্র হইলেও উহার ধ্বনির ভেদ থাকে। এই ধ্বনিভেদকে সঙ্গীত শাস্ত্র উপেক্ষা করিতে পারে না। কেননা ইহার ফলে আনন্দের ভেদ হয়। একই সুর যন্ত্রভেদে বিবিধ ধ্বনিতে ধ্বনিত হয়। এই ধ্বনি-ভেদের রহস্যভেদ হেলমহোলৎজের হাতে হইল। যন্ত্রের আপন সুরের সহিত তীব্রতর সুর জড়িত ও মিলিত হইয়া উহার ধ্বনি বা আওয়াজ বদলাইয়া দেয়। খাঁটি সুর বিশুদ্ধ সুর; উহারা উচ্চতর কতিপয় সুরের সহিত মিলিত হইয়া কখন জমকাল হয় ভরকাল হয়, কখন মিঠা হয়, মোলায়েম হয়, কখনও বা আবার নাকি সুরে পরিণত হয়। বিশুদ্ধ সুরে কোন্ কোন্ সুর মিলিত হইয়া কিরূপ আওয়াজ হয়, হেলমহোলৎজ তাহা শব্দবিশ্লেষণ করিয়া দেখান। আবার বিশ্লেষণে যে যে সুরের অস্তিত্ব সপ্রমাণ হইল, সেই সেই সুর ভিন্ন ভিন্ন যন্ত্র হইতে এক সঙ্গে নির্গত ও মিলিত করিয়া আবার সেই সেই আওয়াজ সৃষ্টি করেন।

একটা উদাহরণ দিয়া এই কথাটা স্পষ্ট করা যাউক। নরকণ্ঠে বেণু যন্ত্রের স্বর বাহির হইতে পারে "এ" অথবা "ও"। যাত্রার জুড়ী আধ ঘণ্টা ধরিয়া কখনও কেবলই "এ" ভাঁজেন, কখনও কেবলই "ও" ভাঁজেন। "এ" অবশ্য "ও" হইতে ভিন্ন; ভিন্ন না হইলে ভিন্নরূপ শুনায় কেন? এই ভেদ কোন্ লক্ষণের ভেদ। ইহা সুরের তীব্রতা ভেদ নহে। নরকণ্ঠের "এ" ও নারী-কণ্ঠের "এ"তে তীব্রতা ভেদ থাকিতে পারে; সেইরূপ উভয় কণ্ঠের উভয় "ও"তে তীব্রতা ভেদ থাকিতে পারে। কিন্তু "এ" এবং "ও" এই উভয়ে ভেদ সে-ভেদ

নহে। আবার এই ভেদ দূরশ্রাবিতা জন্য ভেদ নহে। একই "এ" আমি তোমার কাণে কাণে বলিতে পারি, পাশের লোকে শুনিবে না, অথবা উচ্চৈঃস্বরে "এ" ডাকিয়া অর্দ্ধক্রোশ কম্পিত করিতে পারি। তবে এই ভেদ কোন্ লক্ষণে ভেদ? ইহা ধ্বনি ভেদ, আওয়াজের ভেদ। হেলম্হোল্‌ৎজ দেখাইলেন, "এ" স্বরে মূল সুরের সহিত যে যে উপরের স্থর মিলিত ও জড়িত আছে, "ও" স্বরে মূলের সহিত সেই সেই উপরের সুর মিলিত ও জড়িত নাই। "এ" স্বরেই বা কোন্ কোন্ সুর আছে, আর "ও" সুরেই বা কোন্ কোন্ সুর আছে, তাহা হেলমহোল্‌ৎজ স্বরবিশ্লেষণ দ্বারা আবিষ্কার করিলেন। আবার যন্ত্রযোগে সেই সেই সুর একত্র মিলিত করিয়া "এ" স্বর এবং "ও" স্বরের উৎপাদন করিলেন। সপ্রমাণ হইল অ ই উ এ ও প্রভৃতি বর্ণপরিচয়ের চিরপরিচিত স্বরগুলির ধ্বনিভেদ বিভিন্ন সুরের সমবায়ের ভেদে উৎপন্ন।

মুখ ব্যাদান করিয়া ঐ সকল স্বরের নির্গম সাধিত হয়। ব্যাদিত মুখের অন্তর্গত মূল কোটর এই স্থলে বেণুযন্ত্রের কাজ করে। বুকের ভিতর ফুসফুস হইতে বায়ু নির্গত হয়। কণ্ঠনালী দিয়া বেগে বাহির হইবার সময় নালীর মাংসপেশী কম্পিত হইয়া কোটরস্থ বায়ুর কম্প উত্তেজিত করে। মুখ-কোটরের আকৃতি ও আয়তন-ভেদে ভিন্ন ভিন্ন স্বর নির্গত হয়। কোটরগত বায়ুর নিজের একটা সুর থাকে, আর উহা খণ্ডশঃ বিভক্ত হইয়া উপরের সুর কতিপয়ের সৃষ্টি করে। সকল সুরে মিলিত হইয়া নূতন নূতন আওয়াজের উৎপাদন করে।

অর্গানের পাইপে অথবা বীণার তারেও সেইরূপ ঘটে। পাইপের আবদ্ধ বায়ু বা বীণার তার যখন সমস্তটা কাঁপে, তখন উহার মূল সুর

বাহির হয়। কিন্তু এই কম্পের সহিত অন্য কম্প থাকে। পাইপের কোটরবদ্ধ বায়ু অথবা বীণাতন্ত্রী আপনাকে কতিপয় খণ্ডে বিভক্ত করে। প্রত্যেক ভগ্নাংশ স্বতন্ত্রভাবে কাঁপিয়া উপরের সুরগুলির সৃষ্টি করে। তন্ত্রী দুই তিন চারি পাঁচ সমান টুকরায় বিভক্ত হয়। প্রত্যেক টুকরা স্বতন্ত্র ভাবে কাঁপে। কম্পন-সংখ্যা দুই তিন চারি পাঁচ গুণ হয়। সুরও কম্পন-সংখ্যানুসারে তীব্র হইতে তীব্রতর হয়। মূল সুরের সহিত এই তীব্র সুরগুলি জড়িত ও মিলিত হইয়া আওয়াজ বদলায়। সেই আওয়াজে সঙ্গীতরসজ্ঞের রসবোধের তারতম্য হয়।

সুরে সুরে সম্মিলন-সাধন সঙ্গীতশাস্ত্রের একটা কায়দা। ইউরোপের সঙ্গীতশাস্ত্র এই কায়দার প্রচুর ব্যবহার করে; পাশ্চাত্য সঙ্গীতশাস্ত্র এই কায়দার বলে বাহবা লন। দুইটা সুরের সম্মিলনের ফল কখনও প্রীতিকর, কখনও বা অপ্রীতিকর হয়। উভয়ত্র কম্পনসংখ্যা সমান হইলে দুই সুর বেমালুম মিশিয়া যায়। একের কম্পনসংখ্যা অপরের দুই তিন চারি পাঁচ গুণ হইলেও মিশিয়া আওয়াজ বদলায়, তাহাও প্রায় প্রীতিকর। উভয়ত্র কম্পনসংখ্যার অনুপাত যদি $\frac{২}{৩}$, $\frac{৪}{৫}$ $\frac{৫}{৬}$ এইরূপ হয়, তাহা হইলেও ফল প্রীতিকর হয়। কিন্তু অনুপাত $\frac{৮}{৯}$, $\frac{১০}{১১}$, $\frac{১৭}{১৮}$, এইরূপ হইলে তখন আর প্রীতিকর হয় না। তখন সুরে সুরে মিলিয়া যে স্বর জন্মে, তাহা কাণে বাজে, তাহা কর্কশ হয়। এই কর্কশতা সঙ্গীতের বিরোধী। কর্কশতার বাহুল্যেই গণ্ডগোল ও কোলাহল। এই কর্কশতার পরিহার সঙ্গীতের গোড়ার কথা। বাদ্যযন্ত্রে মূল সুরের সহিত যে সকল উপরের সুর বাহির হয়, তাহাদের পরস্পর সম্মিলনে যাহাতে এই কর্কশতা না জন্মায়, তাহারই উদ্ভাবনাতেই বাদ্যযন্ত্রে কারিকরি।

পদার্থবিৎ অবশ্য রসবোধের ধার ধারেন না। তাঁহার দৃষ্টি কম্পের প্রতি ও উর্ম্মির প্রতি। সঙ্গীতরসজ্ঞ দেখেন স্বরে স্বরে মিলিয়া ফল প্রীতিকর হইল কি না; পদার্থবিৎ দেখেন কম্পে কম্পে মিলিত হইয়া তারের মূল কম্পের সহিত তাহার ভগ্নাংশের কম্প জড়িত হইয়া কম্পটার কি পরিবর্ত্তন হইল? কম্পে কম্পে মিলিয়া কম্পের পরিণাম কি হয়, তাহা পূর্ব্বে দৃষ্টান্ত দ্বারা দেখান গিয়াছে। পেণ্ডুলমের কম্প সরল কম্প; উহার পূর্ব্বার্দ্ধ অপরার্দ্ধের অনুরূপ, উহার প্রথম পাদ দ্বিতীয় পাদের অনুরূপ। কিন্তু ঢেঁকির কম্প জটিল কম্প। উহার পূর্ব্বার্দ্ধ অপরার্দ্ধের অনুরূপ নহে; উহার পাদ বিভাগ ত চলেই না। চাঁদের জোয়ারে সমুদ্রের কম্প সরল কম্প; সূর্য্যের জোয়ারে সমুদ্রের কম্পও সরল কম্প। কিন্তু উভয় কম্পের মিলনে যে জটিল কম্প হয়, তাহার মত অসরল কম্প আর নাই। কেবল চাঁদের জন্য কম্পটুকু থাকিলে গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকার সময়নির্দ্দেশই গ্রহণ করিতাম। কিন্তু উভয় কম্পের সমবায়ে যে জটিল কম্প হয়, তাহা অত সরল তালিকায় নির্দ্দিষ্ট হইবে না। সঙ্গীত-রসপিপাসু যখন দেখেন স্বরের আওয়াজের ব্যতিক্রম, পদার্থবিৎ তখন দেখেন কম্পের সরলতা নষ্ট হইয়া জটিলতার বৃদ্ধি; কে অধিক সৌভাগ্যশালী পুরুষ পাঠকমহাশয় বিবেচনা করিবেন।

বাদ্যযন্ত্র আহত হইলে উহা আপনাকে নানাখণ্ডে বিভক্ত করিয়া লয় ও প্রতি খণ্ডের স্বতন্ত্র কম্পে বিভিন্ন স্বর জন্মে। এই ভগ্নাংশগুলির কম্প-সংখ্যার অনুপাত যতক্ষণ $\frac{২}{৩}, \frac{৪}{৫}, \frac{৫}{৬}$, এইরূপ থাকে, ততক্ষণ স্বর-সম্মিলনে ফল প্রীতিকর থাকে; কিন্তু তাহা ছাড়িয়া $\frac{৮}{৯}, \frac{১৭}{১৮}, \frac{২৩}{২৫}$, এইরূপ ঘটিলেই বিপত্তি! তখন মাধুর্য্য স্থলে কর্কশতা আসে। একটা টেবিলে যখন একটা ঠোকা দিই তখন টেবিলের বৃহৎ কাষ্ঠ

তাহার বৃহৎ অবয়বকে নানাখণ্ডে বিভক্ত করিয়া খণ্ডে খণ্ডে কাঁপিতে থাকে। ঐ সকল খণ্ডের মধ্যে না আছে কোন মিল, না আছে কোন সামঞ্জস্য, উহাদের কম্পন-সমবায়ে উৎপন্ন জটিল কম্পনের ফল যে শব্দ তাহার নাম ঠক্কর বা ঠোকর। উহা সঙ্গীতশাস্ত্রের অগ্রাহ্য, উহা কর্কশ, শ্রুতিকটু; উহা সুর নহে, উহা বেসুর; উহা স্বর নহে, উহা ব্যঞ্জন। উহা "আ" নহে "ই" নহে, "এ ও" নহে, উহা "ঠক্"।

কঠিন পদার্থে কঠিন পদার্থে বা কঠিনে তরলে সংঘট্টের ফলে এই জটিল কম্প বা আলোড়ন বা বিঘট্টন হইয়া ফলে যে শব্দ হয়, তাহাই কর্কশ শব্দ। উহার ফল বর্ণপরিচয়ের লিপিতে স্বরবর্ণের তালিকায় নিবদ্ধ নাই। ব্যঞ্জনের তালিকায় উহাদিগকে পাওয়া যাইবে। টেবিলের আঘাতে হইল "ঠক্", আর কেতাবখানা মাটিতে পড়িলে হইল "ধপ," হাতের তালিতে হইল "চট্," জলের আঘাতে হইল "ছপ্"। ঐরূপে কণ্ঠ হইতে বায়ুপ্রবাহ মুখকোটর দিয়া নির্গমের সময় যদি জিহ্বা গিয়া কোথাও আঘাত করিয়া বায়ু-প্রবাহকে ক্ষণেকের জন্য আট্‌কাইয়া দেয়, সেই আঘাতের ফলে কখনও বা "ক" কখনও "চ" কখনও "ত" কখনও "ট," জিহ্বামূলের আঘাতে "ক", তালুর আঘাতে "চ," জিহ্বাগ্রে দন্তে প্রতিহত হইলে "ত," উভয় ওষ্ঠের আঘাতে "প"। বায়ুপ্রবাহকে একেবারে না আট্‌কাইলে স্থানভেদ "য" "র" "ল" "শ" "ষ" ইত্যাদি।

সৌভাগ্যক্রমে এই সকল কর্কশ শব্দ ক্ষণস্থায়ী। আঘাতের সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় তাহারা নির্ব্বাণ পায়; শেষ পর্য্যন্ত যে সুরটা থাকিয়া যায়, তাহা "স্বর"। "কে" এই শব্দের "ক" টুকু ক্ষণিক মাত্র, কিন্তু উহার "এ" টুকু দীর্ঘকালব্যাপী। এমন কি, "এ" টার আশ্রয়

লইয়াই "ক" টার অস্তিত্ব। বাগ্‌যন্ত্রের যেরূপ ব্যবহার অন্য যন্ত্রেও সেইরূপ। ঘড়িতে হাতুড়ির ঘা দিলে "ঘ ঙ" বাহির হয়, তাহার "ঘ"টা প্রায় আঘাতের সঙ্গেই চলিয়া যায়, পরে যে সানুনাসিক "অং" বহুক্ষণ ধরিয়া চলে, ইহাকে সঙ্গীতশাস্ত্র নিতান্ত অনাদরে অগ্রাহ্য করিবে না। কাংস্যফলকে আঘাতের সময়, উহার বহু ভগ্নাংশে যে এলোমেলো কম্পগুলির উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহাদের অধিকাংশই আঘাতের পরক্ষণে নিবৃত্ত হইয়াছে। শেষ পর্য্যন্ত যে কয়টা তিষ্ঠিয়া গিয়াছে তাহাদের কম্পসংখ্যার অনুপাত তেমন এলোমেলো নহে। ত্রেতাযুগে রামাভিষেকে মদবিহ্বলা তরুণীর কক্ষচ্যুত হেমঘট সোপান-শ্রেণী অবতরণ কালে কঠোর ভূমিতে আঘাতের পর আঘাতে ঠঠং ঠঠং ঠং, ঠঠঠং ঠঠং শব্দ করিয়া শেষে "ছ" শব্দে জলস্পর্শ করিয়াছিল। উহার শ্রুতিকটু ঠকারসমূহের অব্যহিত অনুস্বরগুলা যে নিতান্তই শ্রুতিকটু, তাহা কোন রসবেত্তাই বলিতে পারিবেন না।

প্রত্যক্ষ না অনুমান

শব্দজ্ঞান যে কম্প-গতির আনুষঙ্গিক ফল তাহার সবিস্তার আলোচনা হইল। এখন প্রশ্ন হইতে পারে, এই তথ্যটা প্রত্যক্ষলব্ধ না অনুমানলব্ধ? এক হিসাবে ইহাকে প্রত্যক্ষলব্ধই বলা চলিতে পারে। অঙ্গুলি-তাড়নায় তারের কম্প, করতল-তাড়নায় পটহের কম্প প্রায় প্রত্যক্ষগোচর। ঐ কম্প চোখেই দেখা যায়, স্পর্শেও বুঝা যায়। তারের উপর কাগজের টুকরা রাখিলে উহা কাঁপিতে থাকে; চামড়ার উপর বালি ছড়াইয়া দিলে বালি কাঁপিতে কাঁপিতে স্থানে স্থানে গিয়া স্তূপীকৃত হয়। কাজেই, কম্পের ফলে যে শব্দোৎপত্তি তাহা প্রত্যক্ষলব্ধ

সত্য। টেলিফোন ও ফোনোগ্রাফ যন্ত্রে একখানি পটহকে কম্পিত করাইয়াই শব্দ উৎপাদিত হইয়া থাকে। তারের কম্প বা চর্ম্মের কম্প দেখা যায়, কিন্তু অদৃশ্য বায়ুর কম্প, উহার সঙ্কোচ-প্রসার ত দেখা যায় না। বায়ুতেও যে কম্প-গতি তরঙ্গাকারে সঞ্চালিত হইতেছে, ইহা ত প্রত্যক্ষগোচর হয় না। অর্গান যন্ত্রের পাইপের মধ্যে আবদ্ধ বায়ু যে কম্পিত হয়, তাহাও এক রকমে দেখান চলে; একটা বাতি জ্বালাইয়া সেই বায়ুমধ্যে নামাইলে উহার শিখার কম্পনে বায়ুর কম্পন সপ্রমাণ করে। কিন্তু বাহিরের বায়ু-সাগরের স্থির বায়ুতে যে ঊর্ম্মির পর ঊর্ম্মি চলিতেছে ও সেই ঊর্ম্মিমালা কর্ণে আহত হইলে শব্দজ্ঞান জন্মিতেছে, ইহা প্রত্যক্ষ প্রমাণে দেখান কঠিন। উহাকে কতকটা অনুমানলব্ধ সত্য বলিতে হইবে। এরূপ অদৃশ্য ঘটনার স্থলে অনুমান দ্বারা কারণনির্ণয় অবশ্য সাহসের কাজ। বায়ুমধ্যে যে ঊর্ম্মিরাজি চলিতেছে, এই অনুমানও সাহসের কাজ। এ দেশের প্রাচীন পণ্ডিতেরা কতকটা এই সাহসিক অনুমানের আশ্রয় লইয়াছিলেন। ন্যায়শাস্ত্রের গ্রন্থে স্পষ্ট উল্লেখ আছে, জলে লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিলে যেমন সারি বাঁধিয়া ঢেউ উঠে, সেইরূপ সারি বাঁধিয়া কোন আহত দ্রব্য হইতে ঢেউ আসিয়া শ্রবণে আঘাত করিলে শব্দানুভব হয়। সেই ঢেউগুলি কোন্ পদার্থের আশ্রয়ে সঞ্চালিত হয়? এখানে অনুমান যে, উহা বায়ুর আশ্রয়ে আসে। বায়ুনিষ্কাশন যন্ত্র দ্বারা কোন স্থানকে বায়ুশূন্য করিলে আর সেই প্রদেশ দিয়া ঢেউ আসিতে পারে না। ঐ অনুমানের পক্ষে এই প্রমাণই যথেষ্ট অনুকূল।

আমাদের প্রাচীন পণ্ডিতদের অনুমান ছিল অন্য রূপ। তাঁহারা স্থির করিয়াছিলেন, আকাশ নামক একটা সূক্ষ্ম পদার্থ বিশ্বজগৎ ব্যাপিয়া আছে, উহা বায়ু নহে। কিন্তু উহা বায়ুর ভিতরেও আছে। সেই

আকাশের আশ্রয়ে ঢেউগুলি আসিয়া শ্রবণেন্দ্রিয়ে খবর দেয়। তাঁহাদের অনুমানটা অবশ্য ঠিক নহে। বায়ুনিষ্কাশন যন্ত্রের সাহায্যেই তাহা ধরা পড়ে। কিন্তু তাই বলিয়া এই অনুমানকে অবৈজ্ঞানিক বলিয়া উপহাস করা উচিত নহে। যখন কোন প্রদেশকে যন্ত্র দ্বারা বায়ুশূন্য করিবার কৌশল আবিষ্কৃত হয় নাই, তখন শব্দজনক উর্ম্মিগুলি বায়ুপথে যায় কি আকাশ-পথে যায় তাহা নির্ণয়ের উপায় ছিল না। আকাশ নামক কাল্পনিক অর্থাৎ প্রত্যেক্ষের অবিষয় পদার্থের অনুমান অবৈজ্ঞানিক নহে। কেন না, পরে আমরা দেখিব, একালের বৈজ্ঞানিকদিগকেও একশ্রেণীর তরঙ্গ-গতির সঞ্চালন বুঝাইবার জন্য সেই বিশ্বব্যাপী সূক্ষ্ম অতীন্দ্রিয় প্রত্যক্ষের অবিষয় পদার্থের কল্পনা বা অনুমান করিতে হইয়াছে। আজিকালি আমরা সেই পদার্থকেই সেই পুরাতন আকাশ নামে অভিহিত করি। কিছুদিন পূর্ব্বে পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরাও তাপকে একরূপ ভারহীন সূক্ষ্ম পদার্থ বলিয়া অনুমান করিতেন। তাঁহাদের সেই অনুমানও যেমন অবৈজ্ঞানিক ছিল না, প্রাচীন পণ্ডিতদের শব্দ-তরঙ্গবাহী আকাশের অনুমানও সেইরূপ অবৈজ্ঞানিক নহে।

তবে অনুমান-মাত্রেরই ভিত্তি প্রত্যক্ষ প্রমাণের অপেক্ষা শিথিল। যতদিন কোন একটা অনুমানের অসঙ্গতি বাহির না হয়, ততদিন সেই অনুমানটা গ্রাহ্য হয়; পরে সঙ্গততর অনুমান পাইলেই পূর্ব্বের অনুমান ত্যাগ করিতে হয়। বিজ্ঞান-শাস্ত্রের ইতিহাসে ইহার ভূরি পরিচয় আছে। পরবর্ত্তী অধ্যায়েই তাহার একটা দৃষ্টান্ত পাওয়া যাইবে।

ফলে, তন্ত্রী পটহাদির কম্প-গতিই যে বায়ু-মধ্য দিয়া সঞ্চারিত হয় তাহা এক রকম প্রত্যক্ষলব্ধ সত্য বলিয়াই আমরা গ্রহণ করিতে পারি। তবে সেই কম্প-গতি বায়ু-মধ্য দিয়া যাইবার সময় তরঙ্গ-গতির আকার গ্রহণ করে অর্থাৎ উর্ম্মি উৎপাদন করে। ইহাকে

অনুমান বলিলেও চলিতে পারে। এই অনুমানের সমর্থনে আর কোনও অনুকূল প্রমাণ আছে কিনা দেখা আবশ্যক।

উর্ম্মির স্বরূপ আলোচনাতে আমরা দেখিয়াছি, উহার একটা বিশিষ্টতা আছে, অন্য কোনরূপ গতিতে তাহা পাওয়া যায় না। উর্ম্মির একটা স্থানকে আমরা উর্ম্মির মাথা, আর একটা স্থানকে উর্ম্মির কোল ধরিয়াছি। এই উভয় স্থানের সম্পর্ক পরস্পর বিপরীত। কতকগুলি অক্ষর সাজাইয়া উহাদের কম্পনে কিরূপে উর্ম্মি উৎপন্ন হয়, তাহা দেখান গিয়াছে। যেখানে উর্ম্মির মাথা, সেখানে অক্ষরটি উর্দ্ধে উঠিয়া "অ-আ" রেখা স্পর্শ করিয়াছে, আর যেখানে উর্ম্মির কোল সেখানে নিম্নে নামিয়া "ই-উ" রেখা স্পর্শ করিয়াছে। মাথার গতি উর্দ্ধে, কোলের গতি নিম্নে; মাথায় যদি গতি হয় দক্ষিণে, কোলে গতি হইবে বামে। মাথায় যদি বায়ুস্তর সঙ্কুচিত হয়, কোলে বায়ুস্তর প্রসারিত হইবে। মাথায় যদি বায়ুস্তরের চাপ বৃদ্ধি ঘটে, কোলে বায়ুস্তরের চাপের হ্রাস ঘটিবে। উর্ম্মির এইটি বিশিষ্ট লক্ষণ। একটা মাথা হইতে পরের মাথা পর্য্যন্ত যে দূরত্ব তাহাই উর্ম্মির দৈর্ঘ্য। মাথা হইতে কোলের দূরত্ব তাহার অর্দ্ধেক; এইটুকু স্মরণ রাখিতে হইবে।

পুষ্করিণীর জলে লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিলে সেই স্থানকে কেন্দ্র করিয়া উর্ম্মির পর উর্ম্মি সঞ্চারিত হইতে থাকে। প্রত্যেক উর্ম্মির মাথা আছে, আর কোলও আছে; উর্ম্মির পর উর্ম্মি, তার পর উর্ম্মি; মাথার পর কোল; কোলের পর মাথা। এইরূপ ব্যবস্থা। পুষ্করিণীর আর একস্থানে আর একটি লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিলে সেই স্থানকেও কেন্দ্রগত করিয়া আর এক সারি উর্ম্মির উৎপত্তি হইবে। এই সারিতেও মাথার পর কোল, কোলের পর মাথা এইরূপ ব্যবস্থা থাকিবে।

দুইটা কেন্দ্র হইতে দুইটা ঊর্ম্মির সারি চলিতে আরম্ভ করিবে। এখন এরূপ ঘটিতে পারে যে, কোন একটা স্থানে যে সময় প্রথম সারির ঊর্ম্মির মাথা উপস্থিত ঠিক সেই সময়ে দ্বিতীয় সারি ঊর্ম্মির কোল উপস্থিত। ইহার ফলে মাথার উপর কোল পতিত হইয়া উভয়ে কাটাকাটি হইবে। মাথার গতি উর্দ্ধমুখে; কোলের গতি অধোমুখে। এক সময়ে মাথায় কোলে মিলিত হওয়ায় গতি না উর্দ্ধমুখে না অধোমুখে ঘটিবে। মাথার উপর কোল আর কোলের উপর মাথা পড়িলে এই ফল ভিন্ন অন্য ফলের সম্ভাবনা নাই। ঊর্ম্মির সহিত ঊর্ম্মি মিলিত হইয়া উভয়েরই অন্তর্দ্ধান অবশ্যম্ভাবী। জলাশয়ে দুইস্থানে লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিয়া এইরূপ ঊর্ম্মিতে ঊর্ম্মিতে কাটাকাটি সহজেই প্রত্যক্ষ করা যাইতে পারে। পাঠক যদি না দেখিয়া থাকেন, পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন।

বায়ুরাশিতে দুই স্থান হইতে, দুইটা তন্ত্রী বা দুইটা পটহ হইতে ঊর্ম্মি চলিবার সম্ভব, এইরূপ কথা অসম্ভব নহে। এখানেও এক সারির মাথায় অন্য সারির কোল পড়িলে উভয়েরই অন্তর্দ্ধান অবশ্যম্ভাবী। ঊর্ম্মিগুলি কাণে আসিয়া আঘাত দিলে পরে তবে শব্দ-জ্ঞান জন্মে। এখন এরূপ যদি বন্দোবস্ত করা যায়, দুইস্থান হইতে বায়ুরাশি আশ্রয় করিয়া দুই সারি ঊর্ম্মি আসিয়া যুগপৎ কাণে পৌঁছিতেছে; প্রথম সারির মাথা আসিবার সময় দ্বিতীয় সারির কোল আসিয়া পৌঁছিল; আর প্রথম সারির কোল আসিবার সময়েই দ্বিতীয় সারির মাথা আসিয়া পৌঁছিল, তাহা হইলে মাথায় কোলে কাটাকাটি হইয়া যাইবে, কাণে কোন ধাক্কাই লাগিবে না। শব্দে শব্দে সম্মিলন হইয়া একেবারে নিঃশব্দতা দাঁড়াইবে।

শব্দে শব্দে মিলিত হইয়া উভয় শব্দের লোপ ইহা শুনিতে

হেঁয়ালির মত লাগে, কিন্তু বস্তুতঃই ইহা পরীক্ষার দ্বারা দেখান চলে ; ইহা অলীক প্রলাপবাক্য নহে।

তানপুরার খোলের উপর দুইটা সমান দীর্ঘ ও সমান স্থূল একই ধাতুতে নির্ম্মিত তার সমান টানে আঁটিলে উভয়েরই কম্পনসংখ্যা ঠিক সমান হইবে, উভয় তারেই একই স্বর নির্গত হইবে। দুইটি এক সুরে বাঁধা হইবে। এই একই সুরে বাঁধা দুইটি তার এক সঙ্গে আহত হইলে উভয়ের স্বর বেমালুম মিলিয়া যাইবে। একটা তারের টান ঈষৎ আল্‌গা করিয়া দিলে উহার সুরটা কিঞ্চিৎ নামিয়া যাইবে, তখন তার দুইটা কিঞ্চিৎ বেসুরা হইবে। এখন দুইটা তারে ঘা দিলে দেখা যাইবে যে, দুই সুর মিশিয়া যেন একটু বিচিত্র-গোছ হইয়াছে। এখন বোঁ বোঁ বোঁ এইরূপ ক্রমে স্বরটা উঠানামা করিতেছে। যতক্ষণ তার দুটি এক সুরে বাঁধা ছিল, ততক্ষণ এই কেবল এক বোঁ ছিল ; এখন বোঁ বোঁ বোঁ এইরূপ ক্রমান্বয়ে স্বরের উত্থান-পতন ঘটিতেছে। অর্থাৎ স্বর যেন থামিয়া-থামিয়া রহিয়া-রহিয়া বাহির হইতেছে। শব্দ তাহার পর শব্দাভাব, তার দুইটির কোনটিরই কম্পন থামে নাই ; তাহারা বরাবর সমান ভাবেই কাঁপিতেছে ; কিন্তু শব্দের এই উত্থান-পতন, থাকিয়া-থাকিয়া শব্দের এই অন্তর্দ্ধান কেন ঘটিল ? ইহার উত্তর পূর্ব্বেই দেওয়া গিয়াছে। যখন বায়ু-তরঙ্গে এক ঊর্ম্মির মাথায় অন্য ঊর্ম্মির কোল পড়ে তখন ঊর্ম্মিতে ঊর্ম্মিতে কাটাকাটি হয়। মাথায় মাথা বা কোলে কোল পড়িলে ঊর্ম্মির প্রবলতা ঘটে ; কিন্তু মাথায় কোলে একত্র সম্মিলনে প্রবলতার পরিবর্ত্তে দুর্ব্বলতা, এমন কি অন্তর্দ্ধান পর্য্যন্ত ঘটে।

এক্ষেত্রে পর্য্যায়ক্রমে প্রবলতা ও দুর্ব্বলতার ঘটিতেছে তাহারই ফল বোঁ বোঁ বোঁ।

আর একটু ভিতরে প্রবেশ করিয়া বুঝিবার চেষ্টা করা যাউক। মনে কর, একটা তারের কম্পন-সংখ্যা সেকেণ্ডে ১০০, উহাতে এক সেকেণ্ডে একশত উর্ম্মি উৎপন্ন হয়। উর্ম্মি তারের নিকট উৎপন্ন হইয়া সেকেণ্ডের মধ্যে ১১০০ ফুট দূরে যাইবে, ও তাহার পশ্চাতে আরও একটা উর্ম্মি সারি বাঁধিয়া থাকিবে। ১১০০ ফুট পথে ১০০ উর্ম্মি দাঁড়াইলে প্রত্যেক উর্ম্মির দৈর্ঘ্য হয় ১১ ফুট। দ্বিতীয় তারটার টান একটু বেশী হওয়ায় মনে কর উহার কম্পন সংখ্যা সেকেণ্ডে ১১০। এখানে ১১০০ ফুট পথে ১১০ টি উর্ম্মি দাঁড়াইবে, প্রত্যেক উর্ম্মির দৈর্ঘ্য হইবে ১০ ফুট।

১১ ফুট ঢেউগুলির ১০টি ঢেউ যে সময়ে কাণে লাগিবে, ১০ ফুট ঢেউগুলির ১১টি ঢেউ সেই সময়ে কাণে লাগিবে। অথবা ১১ ফুট ঢেউগুলির ৫ ঢেউ যে সময়ে কাণে পৌঁছিবে, ১০ ফুট ঢেউগুলির ৫॥ ঢেউ সেই সময়ে কাণে পৌঁছিবে। মনে কর, উভয় তারের ঢেউএর মাথা একই সময়ে কাণে পৌঁছিল। দুইয়েরই মাথা এক সঙ্গে পৌঁছায় কাণে, প্রবল ধাক্কা লাগিল; পরেই শব্দটাও প্রবল হইল। আর একটু মধ্যেই প্রথম তার হইতে ৫ ঢেউ আসিয়াছে, কিন্তু দ্বিতীয় তার হইতে ৫॥ ঢেউ আসিয়াছে, অর্থাৎ আধ ঢেউ বেশী আসিয়াছে। একের (১) মাথা কোল (২) মাথা কোল (৩) মাথা কোল (৪) মাথা কোল (৫) মাথা কোল পর্য্যন্ত আসিয়া কাণে পৌঁছিয়াছে। অন্যের (১) মাথা কোল (২) মাথা কোল (৩) মাথা কোল (৪) মাথা কোল (৫) মাথা কোল (৬) মাথা পর্য্যন্ত কাণে পৌঁছিয়াছে। অর্থাৎ যে সময়ে প্রথম তারের প্রথম উর্ম্মির কোল পৌঁছিল, ঠিক সেই সময়ে দ্বিতীয় তারের ষষ্ঠ উর্ম্মির মাথা পৌঁছিল। মাথায় কোলে কাটাকাটিতে উভয়েরই অন্তর্দ্ধান, শব্দেরও লোপপ্রাপ্তি।

আবার সেই সময় পরে মাথায় মাথায় যোগ হইয়া শব্দের প্রবলতা। কাজেই বোঁ বোঁ বোঁ।

তরঙ্গগতির এইটি বিশিষ্ট লক্ষণ, উর্ম্মিতে উর্ম্মিতে যোগ হইয়া উভয় উর্ম্মিরই বিলোপ ঘটিতে পারে। জলাশয়ে ঢেউ তুলিয়া ইহা দেখান যাইতে পারে। একটা স্থান আছে সেখানে নদীমুখে তুই দিক হইতে জোয়ার-ভাঁটা আসে। একদিক হইতে যখন জোয়ার আসে, অন্য দিক হইতে ঠিক সেই সময় ভাঁটা আসে। ফলে, সেই নদীতে জোয়ারও হয় না, ভাঁটাও হয় না। এইরূপে গতিতে গতিতে সম্মিলনে গতি-লোপের এক তরঙ্গ-গতি ভিন্ন অন্য কোথাও সম্ভাবনা নাই। শব্দে শব্দে নিঃশব্দতার উৎপত্তি প্রত্যক্ষ বিষয়। কাজেই, এস্থলেও এই তরঙ্গ-গতিরই আশ্রয় লইতে হয়। যেখানেই দেখা যাইবে, ভাবে ভাবে অভাব উৎপত্তি হইয়াছে, সেইখানেই এইরূপ ব্যাখ্যার আশ্রয় লইতে হইবে।

দার্শনিক পণ্ডিতেরা কথাটা শুনিয়া হয়ত শিহরিবেন; কিন্তু ভাবে ভাবে অভাব উৎপন্ন হউক আর নাই হউক, শব্দে শব্দে মিলিয়া নিঃশব্দের উৎপত্তি প্রত্যক্ষ বিষয়; আর আলোকে আলোকে মিলিয়া আঁধারের উৎপত্তিও প্রত্যক্ষ বিষয়। কাজেই, শব্দের উৎপত্তি বুঝাইতে যেমন তরঙ্গগতির আশ্রয় লইতে হয়, আলোকের উৎপত্তি বুঝাইতেও তেমনি তরঙ্গগতির আশ্রয় লইতে হয়।

আলোক

শব্দরহস্য অলোচনা করা গেল। এইবার আলোক-রহস্যের আলোচনা করা যাউক। কিন্তু আলোকে আলোকে আঁধারের উৎপত্তি বুঝিবার আগে আলোকের সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য কথাগুলির আলোচনা আবশ্যক। শ্রবণসহায় যাহা তাহা শব্দ, দর্শনসহায় যাহা তাহার

নাম আলোক। দর্শনেন্দ্রিয়-গোচর পদার্থ হইতে আলোক চক্ষে পড়িলে দর্শনেন্দ্রিয় তাহা মনের সমক্ষে লইয়া যায়; মন তাহা গ্রহণ করিয়া বুদ্ধির সমীপস্থ করিলে উহা দৃষ্টিগোচর হয়। দৃষ্টিগোচর যাবতীয় পদার্থের কেহ স্বয়ম্প্রভ, যথা সূর্য্য, নক্ষত্র, দীপশিখা, জোনাকি পোকা। উহারা নিজের আলোকে দেখা দেয়। অবশিষ্ট নিষ্প্রভ। তাহারা পরের আলোকে প্রভান্বিত হইয়া দেখা দেয়। আলোকের ঔজ্জ্বল্যভেদ বা দীপ্তিভেদ আছে। সূর্য্যের আলোর মত উজ্জ্বল বা দীপ্তিমান আলো আর কিছুই নাই। আলোকের আবার বর্ণভেদ আছে। যেমন রক্ত, নীল, পীত। সূর্য্যের আলো শুভ্র, দীপের আলো পীত, বাজি পোড়াইয়া রক্ত, হরিৎ আলো জন্মান হয়। দীপশিখায় তুঁতের গুঁড়া দিলে সবুজ আলো হয়। এই বর্ণ-ভেদ আলোকের প্রধান লক্ষণ; বর্ণ দেখিয়া আলোক চিনিতে হয়। শব্দের যেমন সুরভেদ, আলোর তেমনি বর্ণভেদ।

যাহার ভিতর দিয়া আলোক অবাধে চলিয়া যায় তাহা স্বচ্ছ; যেমন কাচ, অভ্র, হীরক, জল, বায়ু। যাহার ভিতর আলো যায় না তাহা অনচ্ছ; কাঠ, পাথর, ধাতু। অনচ্ছ পদার্থে ছিদ্র থাকিলে সেই ছিদ্র-দ্বার দিয়া আলোক চলিতে পারে। উদয়ের পর বা অস্তগমনের পূর্ব্বে সূর্য্যের আলো জানালার ফুটা দিয়া প্রবেশ করিয়া সম্মুখের দেওয়ালে পড়ে। আলোকের পথে বায়ুরাশিতে ভাসমান ধূলিকণা সকল আলোকিত হইয়া আলো ঠিক সরলপথে চলে তাহা দেখাইয়া দেয়। আলো সরল পথে চলে—পাশ কাটাইয়া যায় না বলিয়া অনচ্ছ পদার্থের পশ্চাতে উহার ছায়া পড়ে। আলোকের অভাবই ছায়া। প্রদীপ ও চক্ষের মাঝে হাত ধরিলে হাতের ছায়া চক্ষের উপর পড়ে। অনচ্ছ হাত ভেদ করিয়া ছায়া আসে না, হাতের পাশ দিয়া বক্রপথেও

চোখে আসে না। কাজেই, আলো আটকাইয়া যায়, প্রদীপ তখন দেখা যায় না। ঐরূপে ছোট হাতখানির আড়াল দিয়া প্রকাণ্ড সূর্য্যবিম্বের সমস্তটা কিংবা খানিকটা আমরা আচ্ছাদিত করিতে পারি। অমাবস্যার দিনে চাঁদ, সূর্য্য ও পৃথিবীর মধ্যে আসিয়া সূর্য্যের সমস্তটা ঢাকিলে, সূর্য্যের পূর্ণগ্রাস গ্রহণ হয়, খানিকটা ঢাকিলে আংশিক গ্রাস হয়। পূর্ণিমার রাত্রিতে পৃথিবী, সূর্য্য ও চাঁদের মাঝে পড়িলে পৃথিবীর ছায়া চাঁদে পড়ে। চাঁদ স্বয়ং নিষ্প্রভ, উহা সূর্য্যের আলোকেই জ্যোতিষ্মান্। কাজেই, পৃথিবীর ছায়ায় প্রবেশ করিলে চাঁদ অদৃশ্য হয় ও চাঁদের পূর্ণ বা আংশিক গ্রহণ ঘটে।

হাতের ব্যবধানে সূর্য্যের বা প্রদীপের আলোক অক্লেশে চোখ হইতে আটকান যায়, কিন্তু কোন বাদ্য যন্ত্রের শব্দ হাতের আড়ালে কাণ হইতে আটকান যায় না। শব্দ হাতের পাশ কাটিয়া বক্রপথে কাণে প্রবেশ করে, আলোক তাহা করে না। আলোকের ও শব্দের গমন-পথের এই পার্থক্য পরে বিবেচ্য।

আলোক এইরূপ সরলপথে চলে বলিয়া আমরা আলোকের পথকে রেখারূপে কল্পনা করিতে পারি। এক সরলরেখা ধরিয়া যে আলোক চলে তাহাকে কিরণ বলা যাইবে। জ্যোতিষ্মান্ পদার্থ হইতে চতুর্দ্দিকে আলোকের কিরণ ধাবিত হয়। কতকগুলি কিরণের গোছা চক্ষে প্রবেশ করিলে, আমরা সেই জ্যোতিষ্মান্ পদার্থ দেখিতে পাই।

কোথায় দেখি? দূরে দেখি সন্দেহ নাই, কিন্তু কতদূরে দেখি বলা কঠিন। দর্শন দ্বারা দূরত্বের নির্ণয় হয় বটে, কিন্তু সূক্ষ্মভাবে হয় না। দুই দশ রশির মধ্যে কোন্ গাছটা দূরে, কোন্‌টা নিকটে, আমরা দেখিয়া বলি, কিন্তু দুই চারি ক্রোশ দূরের জিনিসের মধ্যে কোন্‌টা কাছে, কোন্‌টা দূরে, তাহা বলা চলে না।

আরও অধিক দূরে স্থিত চন্দ্রসূর্য্য গ্রহনক্ষত্রের দূরত্ব-সম্বন্ধে কে কত দূরে, দর্শনেন্দ্রিয় তাহার কোন তথ্যই নির্দ্দেশ করে না।

দূরত্ব বলা চলে না, তবে কে কোন্ দিকে আছে তাহা বলা চলে। প্রাতে সূর্য্যকে দেখি পূর্ব্বে, মধ্যাহ্নে ঊর্দ্ধে, বৈকালে পশ্চিমে। রাত্রিতে খগোলে যে কয়েক হাজার নক্ষত্র দেখা যায়, উহাদের দূরত্ব সমান নহে; দৃষ্টি সেই দূরত্ব-বিচারে অক্ষম। মনে হয়, সকল নক্ষত্রই এক অর্দ্ধ-বর্ত্তুলাকার নীলপটে চিত্রিত আছে। তবে বিভিন্ন দিকে বিভিন্ন নক্ষত্র দেখা যায় বলিয়া সেই পটে তাহাদের অবস্থানভেদ নির্ণীত হয়।

আলোক-রেখা বা কিরণ যে পথে আসিয়া চক্ষুতে প্রবেশ করে, আমরা সেই পথের কোন না কোন স্থানে জ্যোতিষ্মান্ পদার্থের অবস্থান নির্ণয় করি। কিরণগুলি চক্ষুতে প্রবেশের সময় যে পথে চলে সেই পথের কোন্‌খানে দেখি এই কথাটা স্মরণ রাখিতে হইবে।

আলোক-কিরণ সরল-রেখায় চলে কিন্তু মসৃণ পদার্থের পৃষ্ঠে পড়িয়া উহার পথ বাঁকিয়া যায়। কাচের পিঠ, জলের পিঠ, পালিশ-করা ধাতুর পিঠ, মসৃণ পিঠের উদাহরণ। ঐ পিঠে পড়িয়া আলোকের পথ ঘুরিয়া যায়; কিন্তু পতনের সময় সেই পিঠ হইতে কিরণপথ যতটুকু হেলিয়া থাকে, ফিরিবার সময় ঠিক ততটুকুই হেলিয়া থাকে।

পূর্ব্ব দিকে নবোদিত সূর্য্যের কিরণ সরলপথে নামিয়া আসিয়া জলাশয়ের পিঠে পড়িল। কিরণ জলপৃষ্ঠ স্পর্শের সময়ে হেলিয়া নামিয়াছে। জলপৃষ্ঠে পড়িয়া উহার রাস্তা পশ্চিমমুখে ফিরিল। তবে নামিবার সময় যতটুকু হেলিয়া ছিল, উঠিবার সময় ঠিক ততটুকু হেলিয়া উঠিল। আমি জলাশয়ের পশ্চিম পারে দাঁড়াইয়া আছি। সূর্য্যকিরণ জলপৃষ্ঠ হইতে হেলিয়া উঠিয়া সরল-পথে চলিয়া আমার

চোখে পড়িল। আমার চোখে পড়িবার সময় কিরণ জলের পিঠ হইতে আসিতেছে। যে দিক হইতে আলো আসে আমি মনে করি জ্যোতিষ্মান্ পদার্থ সেই দিকে আছে। এখানেও আমি মনে করি, সূর্য্য জলের পিঠের নীচে ওধারে রহিয়াছে; আলোক যেন সেইখান হইতে বরাবর সরল-পথে আসিয়া আমার চোখে পড়িতেছে। বাস্তবিক সূর্য্য আছে আকাশে, ঊর্দ্ধে, উহার কিরণের পথ এইরূপে ঘুরিয়া যাওয়ায় আমি মনে করি, সূর্য্য আছেন জলের নিম্নে। জলের নিম্নে যে সূর্য্যের অবয়ব দেখা যায়, তাহার নাম দিই সূর্য্যের প্রতিবিম্ব। আর কিরণের রাস্তা যে এইরূপে ঘুরিয়া যায়, এই ঘটনার নাম দিই আলোকের প্রতিফলন।

দর্পণপৃষ্ঠে আলোককিরণ প্রতিফলিত হইয়া মুখ ঘুরাইয়া চোখে পড়িলে বোধ হয় দর্পণের পিঠের ওধারে জিনিসটা আছে, সেইটা প্রকৃতপক্ষে জিনিসের প্রতিবিম্ব। আরসীতে মুখ দেখার এই রহস্য।

যাহার পিঠ মসৃণ নহে—বন্ধুর, তাহার পিঠে আলোক পড়িলে সেই আলোকও প্রতিফলিত হইয়া প্রত্যাবৃত্ত হয়, কিন্তু এবার কোন এক পথে ফিরে না। ভিন্ন ভিন্ন কিরণ ভিন্ন ভিন্ন পথে ফিরিয়া যায়, পূর্ব্বে, পশ্চিমে, উত্তরে, দক্ষিণে, ঊর্দ্ধে ছট্‌কাইয়া পড়ে। জ্যোতিষ্মান্ পদার্থ হইতে কিরণ যেমন চারিদিকে বা দশদিকে ছট্‌কাইয়া বাহির হয়, অনচ্ছ পদার্থের বন্ধুর পৃষ্ঠে পড়িয়াও সেইরূপ চারিদিকে ছট্‌কাইয়া পড়ে। কোন্ পদার্থ স্বয়ম্প্রভ, কোন্ পদার্থ নিষ্প্রভ, চক্ষু তাহা সহসা বিনা বিচারে স্থির করিতে পারে না। ঐ দিক হইতে আলোক আসিতেছে দেখিলে সেই দিকে পদার্থ আছে ঠিক করিয়া লয়। স্বয়ম্প্রভ পদার্থ যেমন চারিদিকেই আলো ছড়ায়,

নিষ্প্রভ অনচ্ছ পদার্থের বন্ধুর পিঠ, পরের-ধার-করা আলোর কিরণগুলিকে তেমনি চারিদিকে ছড়ায়। চক্ষু উহাকেও দীপ্তিমান মনে করে ও সেইরূপ দেখে। নিষ্প্রভ অনচ্ছ পদার্থের উপর কিন্তু মসৃণ হইলে উহা চারিদিকে আলো ছড়ায় না, ধার-করা আলোকে কেবল একটা নির্দ্দিষ্ট দিকে ছড়ায়। চক্ষু তখন সেই নিষ্প্রভ পদার্থকে না দেখিয়া তাহার পশ্চাতে অন্য পদার্থ দেখে।

বিরল পদার্থ হইতে নিবিড় পদার্থে প্রবেশ কালেও কিরণের পথ ফিরিয়া যায়। বিরল বায়ু হইতে ঈষৎ হেলিয়া আলোকের কিরণ নিবিড়তর জলে প্রবেশ করিল; প্রবেশ করিয়া মুখটা একটু ফিরাইয়া লয়। জলের পিঠের দিকে যতটা হেলিয়া ছিল, এখন তার চেয়ে কিছু বেশী হেলিয়া চলিতে আরম্ভ করে। জলের ভিতর হইতে আলোক বাহির হইয়া বায়ুতে প্রবেশ করিবার সময় উল্টা বিধি। জলের ভিতর থাকিতে সেই পিঠের দিকে যতটা হেলিয়া ছিল, জলের বাহিরে আসিয়া আর ততটা হেলিয়া থাকে না; কতকটা পিঠ ঘেঁসিয়া চলে। সেই আলো চোখে পড়িলে মনে হয়, উহা পিঠের নীচে অথচ নিকটবর্ত্তী কোন স্থান হইতে আসিতেছে। বস্তুতঃ উহা হয়ত গভীর স্থান হইতে আসিয়াছে; কিন্তু পিঠের দিকে হেলিয়া যাওয়াতে বোধ হয়, উহা তত গভীর স্থান হইতে আসে নাই; প্রকৃত স্থান চেয়ে উচ্চতর স্থান হইতে আসিয়াছে। বাটিতে জল রাখিলে তাই মনে হয়, বাটির তলাটা উঠিয়া পড়িয়াছে। চৌবাচ্চার জলের বাহিরে দাঁড়াইলে বোধ হয়, চৌবাচ্চার তলাটা যেন উঠিয়া পড়িয়াছে। একটা কলম হেলাইয়া ধরিয়া জলে অর্দ্ধমগ্ন করিলে, মগ্ন ভাগের প্রত্যেক অংশই একটু যেন উচ্চে উঠে, বোধ হয় কলমটা যেন বাঁকিয়া গিয়াছে।

মনে কর, চৌবাচ্চার জল দুই হাত গভীর, ও সেই গভীর জলে অর্থাৎ পিঠ হইতে দুই হাত নীচে একটি টাকা আছে। জলের উপর টাকাটির প্রায় উর্দ্ধে যদি চোখ রাখি, তাহা হইলে কিরণগুলি প্রায় লম্বভাবে আসিয়া চোখে প্রবেশ করে। কিন্তু ঠিক উর্দ্ধে চোখ না রাখিয়া একটু পাশে সরিয়া দাঁড়াইলে কিরণগুলিকে লম্বভাবে না আসিয়া জলের পিঠের দিকে একটু হেলিয়া আসিতে হয়। ভিতরে যতটা পিঠ ঘেঁসিয়া থাকে, বাহিরে বায়ুমার্গে আসিয়া আরও অধিক ঘেঁসিতে হয়, তার পর চোখে পড়ে। তখন মনে হয় টাকাটিও পিঠ ঘেঁসিয়া আছে, দুই হাত নীচে নাই, হয়ত দেড় হাত নীচে আছে। চোখ যদি আরও পাশে আরও দূরে সরাইয়া লই তাহা হইলে কিরণকে আরও জলের গা ঘেঁসিয়া আসিতে হইবে। টাকাটি আরও উচ্চে আছে মনে হইবে। যত চোখ সরাইবে, টাকাটি ততই যেন উচ্চে উঠিবে, মনে হইবে এক হাত, আধ হাত, সিকি হাত, নীচে আছে। আর একটু দূরে গেলে টাকাটি আর নজরেই পড়িবে না। এখন কিরণগুলি বাহিরে আসিয়া একেবারে জলের পিঠ অত্যন্ত ঘেঁসিয়া প্রায় জলের পিঠ স্পর্শ করিয়াই চলিতেছে, চোখ জলের পিঠ ছাড়িয়া একটু উচ্চে আছে, কাজেই, কিরণগুলি জলের বাহিরে আসিয়া আর চোখে পড়িবার অবকাশই পাইতেছে না। যে সকল কিরণ জলের ভিতরেই এইরূপ অল্প হেলিয়া থাকে, তাহারা বাহিরে আসিয়া একেবারে জলের পিঠ ছুঁইয়া চলে, চোখে প্রবেশ করে না। যে সকল কিরণ জলের ভিতর আরও অল্প হেলিয়া থাকে, তাহারা জলের বাহিরে আসিতেই পায় না; ভিতরেই প্রতিফলিত হয়। জলের ভিতরে যথাস্থানে চোখ রাখিলে বোধ হইবে, যেন ঐ প্রতিফলিত কিরণ জলের উপর হইতে আসিতেছে, অর্থাৎ দর্পণে যেমন ওপিঠে প্রতিবিম্ব দেখা যায়, এখানেও সেইরূপ জলমগ্ন

চক্ষু জলের পিঠের উপর টাকার প্রতিবিম্ব দেখে। টাকাও আছে জলে, চোখও আছে জলে, কিন্তু এমন জায়গায় আছে যে, জলের কিরণ জলপৃষ্ঠে প্রতিহত ও প্রতিফলিত হইয়া আবার জলের ভিতরে প্রবেশ করিয়া চোখে পৌঁছিল। চোখ দেখিল জলের উপর বায়ুর মধ্যে টাকার প্রতিবিম্ব।

মরুভূমিতে তপ্ত উষ্ণ ভূমির উপর বায়ুর স্তর তপ্ত, উষ্ণ ও প্রসারিত হইয়া বিরল হয়, তার উপরের স্তর শীতল ও নিবিড় থাকে। দূরের গাছপালা হইতে আলোকের কিরণ হেলিয়া নামিতে নামিতে উপরের নিবিড় বায়ুস্তর হইতে নীচের বিরল বায়ুস্তরে নামিতে নামিতে আর নামিতে পারে না, সেইখানে প্রতিহত ও প্রতিফলিত হইয়া উপর মুখে হেলিয়া চলে ও দূরে দর্শক থাকিলে তাহার চোখে পড়ে। ভূপৃষ্ঠ হইতে প্রতিফলিত কিরণ আসিয়া দর্শকের চোখে পড়িলে দর্শক মনে করে ভূপৃষ্ঠের নীচে হইতে সেই কিরণ আসিতেছে। ভূপৃষ্ঠের নীচে সেই দূরস্থ গাছপালার প্রতিবিম্ব দেখা যায়। ভূপৃষ্ঠে সংলগ্ন উত্তপ্ত বিরল বায়ুস্তর দর্পণের মত ব্যবহার করে, অথবা জলাশয়ের জলপৃষ্ঠের মত ব্যবহার করে। ভূমির নিম্নে গাছপালার প্রতিবিম্ব দূর হইতে দেখিলে দর্শকের স্বতঃই মনে হয় এখানে বুঝি জলাশয়ই আছে। কিন্তু জল নাই সেখানে এক ফোঁটা, আছে কেবল তপ্ত বালি, আর তপ্ত পাষাণ; জলাশয় প্রতারণা মাত্র; উহার নাম মরীচিকা।

খগোলে জ্যোতিষ্কগণের আলো, পৃথিবীকে আচ্ছাদন করিয়া যে বায়ু আছে সেই বায়ু ভেদ করিয়া তবে আমাদের চোখে পড়ে। নীচের বায়ুস্তর উপরের বায়ুর চাপে নিবিড়, উপরের বায়ুস্তরের উপর চাপও কম, কাজেই, উহা অপেক্ষাকৃত বিরল। যত উর্দ্ধে যাওয়া যায় বায়ু ততই বিরল হয়। খুব উঁচু পর্ব্বতের উপর বায়ু এত বিরল যে

নিশ্বাস লইতে কষ্ট হয়। নক্ষত্রাদির আলো পৃথিবীতে পৌঁছিবার পূর্ব্বে উপরের বিরল বায়ু ভেদ করিয়া ক্রমশঃ নিবিড় বায়ুস্তরে প্রবেশ করে। কাজেই, বায়ু হইতে জলে প্রবেশের সময় কিরণের পথ যেমন একটু পরাগ্‌পতিত হয় এখানেও কতকটা সেইরূপ ঘটে। ঠিক মাথার উপরে স্বস্তিক বিন্দুতে যে নক্ষত্র আছে তাহার আলো লম্বভাবে ঊর্দ্ধাধোভাবে বায়ুস্তর ভেদ করিয়া আসে, সে কিরণগুলি হেলিয়া না থাকায় তাহাদের মুখ ঘুরে না। কিন্তু স্বস্তিকের আশে-পাশে নীচে, বিশেষতঃ দিগ্বলয়ের কিঞ্চিদূর্দ্ধে যে সকল নক্ষত্র আছে, তাহাদের কিরণগুলিকে অত্যন্ত হেলিয়া আসিতে হয়, তাহাদের পথ কাজেই অনেকটা তির্য্যগ্‌গামী হয়। ফলে, যে নক্ষত্র খগোলপটে যেখানে আছে, আমরা ঠিক সেইখানে দেখিতে পাই না, তদপেক্ষা একটু ঊর্দ্ধে অবস্থিত দেখি। জ্যোতির্ব্বিদ্‌কে এজন্য বড় সাবধানে পর্য্যবেক্ষণ করিতে হয়।

দূরে কোন দ্রব্য আছে। তাহার প্রত্যেক বিন্দু হইতে আলোকের কিরণ সরলরেখা ক্রমে ছুটিয়া আসিতেছে। কতিপয় কিরণের গুচ্ছ আমার চোখে প্রবেশ করিল। কতক চোখের ডানি পাশে কতক বাম পাশে পড়িল। সেগুলি আমার কোনও কাজে লাগিল না। যেগুলি চোখে পড়িল দৃষ্টিজ্ঞানের জন্য সেইগুলিই যথেষ্ট। সেই কিরণগুলি যে-দিক হইতে আসিতেছে, সেই দিকেই আমি সেই দ্রব্যটি অবস্থিত দেখিলাম। ঐ কিরণের পথে অর্থাৎ সেই দ্রব্য আর চোখের মাঝখানে যদি একখানি কাচের পরকলা রাখা যায়, যাহার একপিঠ সমতল আর একপিঠ কুব্জ (অর্থাৎ লোহার কড়াইয়ের বাহিরের পিঠের মত) অথবা দুই পিঠ কুব্জ, তাহা হইলে ফলে এই দাঁড়ায়, যে আলোকের রেখাগুলির পথ সেই কাচের পরকলায় প্রবেশ করিয়া একটু একটু বাঁকিয়া যায়।

যে মুখে আসিতেছিল সে মুখ ছাড়িয়া একটু অন্যমুখে চলিতে থাকে ও পরকলার বাহিরে আসিয়া সেই অন্যমুখে চলিয়া চোখে প্রবেশ করে। যে কিরণগুলি চোখে প্রবেশ করিতেছিল, সেগুলিও এইরূপ বাঁকিয়া যায়; যেগুলি চোখের ডাহিনে বামে পড়িতেছিল সেগুলিও বাঁকিয়া যায়। কোন্ মুখে বাঁকিয়া যায়? চোখের দিকে? যে সকল কিরণ চোখের ডাহিনে বামে পড়িতেছিল, তাহাদের কতকগুলি মুখ ফিরাইয়া এখন চোখে প্রবেশ করে। এই মুখ-ফিরানর ফলে বোধ হয় কিরণগুলি আরও দূর হইতে আসিতেছে। বস্তুতঃ যে দ্রব্য হইতে আসিতেছে, এখন মনে হয় সেই দ্রব্যের আরও পিছনে, আরও দূরে, কোন জায়গা হইতে আসিতেছে। অর্থাৎ সেই দ্রব্যই যে স্থানে অবস্থিত, আমাদের মনে হয় উহা তাহার পিছনে, দূরে এক জায়গায় সরিয়া গিয়াছে। দূরে সরিয়া যায় এবং আকারেও বৃহত্তর দেখায়। কাচের পরকলা না থাকিলে উহা যত বড় দেখাইত, তাহার চেয়েও বড় দেখায়। এইরূপ কাচের পরকলার ক্ষমতাই এই যে উহা ছোট জিনিসকে বড় করিয়া দেখায়, বুড়া মানুষের চোখের চশমা এইরূপ পরকলা। সেই পরকলা লইয়া পরীক্ষা করিলেই ইহা বুঝা যাইবে। এইরূপ পরকলা ছোট জিনিসকে বড় দেখানর জন্য ব্যবহার করা চলে।

পরকলার গুণে দ্রব্যটা যেন পিছনে হঠিয়া যায়। বস্তুত আমরা দ্রব্যটা না দেখায় তাহার একটা দূরস্থ প্রতিবিম্ব দেখিতে পাই।

দ্রব্যটা হইতে পরকলার দূরত্ব বাড়াইলে প্রতিবিম্ব আরও দূরে হঠে; খুব তাড়াতাড়ি হঠিয়া যায়। আরও খানিকটা দূরে লইয়া গেলে প্রতিবিম্বটা এত দূরে সরিয়া যায়, যে তখন উহা আর দৃষ্টির বিষয় থাকে না।

বুড়া মানুষের চশ্‌মাতে ইহার পরীক্ষা চলিবে। একখানা বহি

খুলিয়া উহার সামনে চশমা ধরিলে অক্ষরগুলিকে বড় দেখায়। বহি একটু দূরে লইয়া গেলে অক্ষর এত দূরে পড়ে ও এত বড় হয় যে আর স্পষ্ট দেখাই যায় না।

আরও একটু দূরে লইলে তখন একটু অন্যরূপ ব্যাপার ঘটে। কিরণগুলি তখন এতটা মুখ ফিরাইয়াছে যে, চশমার এ পারে আসিয়া অর্থাৎ যে পারে চোখ আছে, সেই পারে আসিয়া মিলিত হয়। দ্রব্যটার প্রত্যেক বিন্দু হইতে যে কিরণগুলি বাহির হইয়াছিল তাহারা চশমা পার হইয়া এ পারে আসিয়া আবার একটা বিন্দুতে একত্র হয়। প্রত্যেক বিন্দুর পক্ষে এইরূপ ঘটায় চশমার এ পারে বায়ু মধ্যে চশমারই যেন একটা ছবি, একটা প্রতিকৃতি উৎপন্ন হয়। যেখানে কিরণগুলি এইরূপে একত্র মিলিয়াছে, সেইখানে একখানা কাগজ ধরিলে দেখা যাইবে, কাগজের গায়ে যেন একটা ছবি অঙ্কিত হইয়াছে। চশমার একধারে থাকিল সেই দীপ্তিমান দ্রব্য, যেমন একটা দীপশিখা, অন্যধারে থাকিল কাগজের গায়ে সেই শিখার একটা প্রতিকৃতি। এই ছবি চশমা হইতে দূরেও হইতে পারে, আবার নিকটেও হইতে পারে। দূরে হইলে ছবিটা বড় হয়, নিকটে হইলে ছবিটা ছোট হয়; যে দ্রব্যের ছবি সে দ্রব্য চেয়ে ছোট হয়। সূর্য্য খুব দূরে আছে; বুড়া মানুষের চশমা সূর্য্যের আলোতে ধরিয়া, চশমার এপারে সূর্য্যের সেই ছবি অনায়াসে দেখান যাইতে পারে। যেন চশমাটা সূর্য্যের এক এক গোছা কিরণকে ধরিয়া তাহার মুখ ফিরাইয়া ওপারে কেন্দ্রীভূত করিয়াছে। তাই একটা ছোট কিন্তু উজ্জ্বল সূর্য্যের ছবি, এপারে তৈয়ার হইয়াছে। এই ছবির দীপ্তি এত প্রখর, যে সেখানে কাগজ রাখিলে পুড়িয়া যাইতে পারে, দিয়াশলাই জ্বালানো যাইতে পারে।

ফটোগ্রাফ তুলিবার ক্যামেরার মুখে ঐরূপ একখানা পরকলা

থাকে। পরকলার সামনে যিনি দাঁড়াইয়া আছেন, পরকলার এ পারে তাঁহার একটি ছোট ছবি পড়ে।

কতকগুলি রূপা-ঘটিত যৌগিক পদার্থ আছে; তাহা আলোক পাইলে বিশ্লিষ্ট ও বিবর্ণ হইয়া যায়। কাচের গায়ে তেমনি পদার্থের প্রলেপ দিয়া ক্যামেরার বাক্সে পরকলার এ ধারে যথাস্থানে ধরিলে সেই কাচের উপর ছবি পড়ে ও প্রলেপটা বিবর্ণ হইয়া গিয়া ছবিটার স্থায়ী চিহ্ন রাখিয়া যায়।

এইরূপ কাচের পরকলার গুণ কি বুঝা গেল। কোন দ্রব্যের নিকটে ধরিলে বোধ হয় দ্রব্যটা কিছু হঠিয়া গিয়াছে ও আকারে বৃহত্তর হইয়াছে। আর পরকলা দ্রব্যটা হইতে অধিক দূরে ধরিলে, প্রতিবিম্ব পিছু হঠিতে হঠিতে শেষে অদৃশ্য হয়, কিন্তু এ ধারে একটা ছবি পড়ে। পরকলা যত অধিক দূরে থাকে, ছবিটা ততই পরকলার কাছে যায় ও ছোট হয়।

পরকলার এই গুণে দূরবীণ ও অণুবীক্ষণ যন্ত্র তৈয়ার হইয়াছে। ঐ দুই যন্ত্র তৈয়ার করিতে দুইখানি করিয়া পরকলা আবশ্যক। অণুবীক্ষণ যন্ত্রে একখানি বড় ও একখানি ছোট পরকলা থাকে। ছোট খানি একটি পিঁপীড়ার সামনে ধরিলে, ঐ পিঁপীড়ার একটা ছবি পরকলার এ ধারে পড়ে। এই ছবিটা পরকলা হইতে দূরে থাকে ও খুব বড় ছবি হয়। এই বড় ছবির সামনে ও নিকটে আর একখানি বড় পরকলা ধরিলে সেই বড় ছবিটাই যেন আরও দূরে হঠিয়া যায় ও আরও বড় হয়। কাজেই, চোখে একটা বৃহৎ পিঁপীড়া দেখা যায়। যে সকল দ্রব্য সহজে চক্ষুর অগোচর তাহাকে বড় করিয়া দেখাইবার জন্য এই অণুবীক্ষণ যন্ত্র।

দূরবীক্ষণ যন্ত্রেও দুইখানি পরকলা থাকে। ইহার বড়

পরকলাখানি সূর্য্যের সম্মুখে ধরিলে, পরকলার এধারে সূর্য্যের একটা ছোট ছবি পড়ে। আর একখানা ছোট পরকলা সেই ছোট ছবি ও চোখের মাঝে ধরিলে ছোট ছবিটা পিছনে হঠিয়া গিয়া বড় দেখায়।

পরকলার এক পিঠ অথবা উভয় পিঠ কুব্জ হইলে সেই পরকলাতে আলোকের কিরণগুলি যাহা বাহির হইয়া ছট্‌কাইয়া পড়িতেছিল তাহাদিগকে একত্র আনিবার চেষ্টা করে। তাহার ফলে কি হয়, বলা গেল। পরকলার এক পিঠ বা উভয় পিঠ যদি কুব্জ না হইয়া ন্যুব্জ হয়, অর্থাৎ কটাহের ভিতরের পিঠের মত হয়, তাহার ফল হয় উল্টা। উহাতে কিরণগুলিকে আরও ছট্‌কাইয়া দেয়। যে সকল কিরণ দূরের জিনিস হইতে আসিতেছিল, তাহারা আরও ছট্‌কাইয়া পড়ায় মনে হয় নিকট হইতে আসিতেছে। জিনিসটাকে যেন টানিয়া নিকটে আনে। মনে হয়, জিনিসটা কাছে আসিয়াছে ও ছোট হইয়াছে। এ কালের অনেক যুবক ভাগ্যদোষে দূরের জিনিস ভাল করিয়া দেখিতে পান না; তাঁহাদিগকে চশমার জন্য এইরূপ পরকলা ব্যবহার করিতে হয়।

কাচের পরকলার পরিবর্ত্তে কাচের কলম, ঝাড়ে যেমন কলম ঝুলে সেইরূপ তিন পাশ ও তিন শির যে কলমে আছে, সেইরূপ কাচের কলম লইয়া তাহাতে সূর্য্যের আলোক ফেলাইলে ঐ আলোকের কিরণগুলিও মুখ ফিরাইয়া এ-পাশ দিয়া বাহির হয়। কিন্তু বাহির হইবার সময় একটা বিচিত্র ঘটনা ঘটে। সূর্য্যের আলোক শুভ্র, কিন্তু কলমের ভিতর প্রবেশ করিয়া বাহিরে আসিলে উহা আর শুভ্র থাকে না। উহা নানা বর্ণের হয়। ঝাড়ের কলমে সূর্য্যের আলো পড়িয়া ঐরূপ বর্ণের বিকাশ সকলেই দেখাইয়াছেন, কিন্তু এই ব্যাপারের তাৎপর্য্য একটি লোকের পূর্ব্বে কেহই বুঝিতে পারেন নাই। সেই লোকটি আর কেহই নহেন—নিউটন। একখানা থালে একটা সরু

ফুটা করিয়া সেই ফুটার ভিতর দিয়া সূর্য্যের শুভ্র আলোক অর্থাৎ রৌদ্র আনিয়া সেই আলোকের পথে কলম ধরিয়া নিউটন দেখিলেন, যে কলম পার হইয়া আলোকের কিরণগুলি ভিন্ন পথে মুখ ঘুরাইয়া চলিয়াছে। কিন্তু সেই আলোক আর শুভ্র নাই। উহা ভাঙ্গিয়া নানা বর্ণের আলোক হইয়াছে। কত বর্ণের? প্রায় অসংখ্য বর্ণের, এত বর্ণ যে, অভিধানে তাহাদের সকলের নাম নাই; যে গুলির নাম আছে, তাহার মধ্যে রক্ত, অরুণ, পীত, হরিৎ, আশমান, নীল ও শিম্বী। "বেগুনী" শব্দটা অভব্য শুনায়. বার্ত্তাকু করিলেও উন্নতি হয় না; কাজেই, বেগুনী রংএর শিম্বীর বা শীমের বর্ণকে শিম্বী বর্ণ বলিলাম। আমাদের মত লোক চোখ থাকিতে অন্ধ; নিউটনের চোখই চোখ; তিনি দেখিলেন আর বুঝিলেন, শুভ্রবর্ণের আলোর মধ্যেই এই নানা বর্ণের আলো বর্ত্তমান ছিল। উহারা যতক্ষণ একমুখে চলিয়া একযোগে চোখে প্রবেশ করিতেছিল, তখন শুভ্র বর্ণের জ্ঞান জন্মিতেছিল। কিন্তু কলমে প্রবেশ করিয়া ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের আলোক ভিন্ন ভিন্ন মুখে বাহির হয়, উহারা আর একত্র হয় না। একত্র আসিবার অবসর পায় না বলিয়াই পরস্পর পৃথক্ থাকে ও তখন আপন আপন বর্ণ লইয়া দেখা দেয়। একধারে থাকে রক্ত, অন্য ধারে থাকে শিম্বী, মাঝে থাকে অন্যান্য বর্ণ। রক্তের পরে ওপাশে অরুণ, তার পাশে পীত, এইরূপ।

নিউটনের এই আবিষ্কারটাকে অনুমানলব্ধ সত্য বলা চলে না, ইহা এক রকম প্রত্যক্ষলব্ধ সত্য। অপরে চোখ থাকিতেও কাণা, তাই প্রত্যক্ষ বিষয়ও দেখিতে পান নাই; নিউটন চক্ষুষ্মান্ ছিলেন বলিয়াই দেখিয়াছিলেন।

কোন বিষয়কে ইন্দ্রিয় দ্বারা অবহিত হইয়া প্রত্যক্ষগোচর করার নামই অবেক্ষণ। পাঁচটা জিনিস এক সঙ্গে অবেক্ষণ করিলে গোলমালে

গণ্ডগোল ঘটে বলিয়া কৌশলক্রমে সেই গণ্ডগোল দূর করিয়া অবেক্ষণের নাম পরীক্ষণ। নিউটন এখানে কেবল অবেক্ষণ করেন নাই, পরীক্ষণও করিয়াছিলেন। খুব সরু ছিদ্রের ভিতর দিয়া সূর্য্যের আলো আনিয়াছিলেন। ছিদ্রটা মোটা হইলে অবেক্ষণে দোষ ঘটে, একটা গণ্ডগোল ঘটে, মোটা ছিদ্র দিয়া যে বিস্তর কিরণ আসে, সেই কিরণের গোছাটাও মোটা হয়। রক্ত বর্ণ আলোর পাশ দিয়া অরুণ বর্ণের আলো চলে। কিরণের মোটা গুচ্ছ লইলে, কতকগুলি অরুণ কিরণ, কতিপয় রক্ত কিরণের সহিত মিলিয়া যায়; তাহাতে যে বর্ণের জ্ঞান হয় তাহা না রক্ত, না অরুণ। সরু ছিদ্র দিয়া কিরণের সরু গোছা আনিলে উহারা ঐরূপ গায়ে গায়ে পড়িয়া মিলিতে অবসর পায় না; রক্ত হইতে অরুণকে পৃথক করিয়া দেখা যায়। ছিদ্র যতই সরু হইবে, ততই বিশুদ্ধ রক্ত ও বিশুদ্ধ অরুণ ও বিশুদ্ধ পীত দেখা যাইবে।

সূর্য্যের আলো শুভ্র, উহাতে রক্ত হইতে শিম্বী পর্য্যন্ত নানা বর্ণের আলোক আছে। সকলে মিলিয়া শুভ্র বর্ণের আলোকের জ্ঞান জন্মায়। কিন্তু ঐ সূর্য্যের শুভ্র আলো রঙিন শাসীর কাচের ভিতর প্রবেশ করিলে উহা আর শুভ্র থাকে না। যে আলো কাচ হইতে বাহির হইয়া আসে তাহা রঙিল। উহার অর্থ এই যে, সূর্য্যের শুভ্র আলো কাচে প্রবেশ করে; তাহার অন্তর্গত কতকগুলি বর্ণের আলো, ঐ কাচে অপহরণ করে বা গ্রাস করে; যেগুলি কাচের গ্রাস এড়াইয়া বাহির হইয়া আসে, তাহারা মিলিয়া আর শুভ্র দেখায় না, রঙিল দেখায়। তাহারা মিলিয়া যে বর্ণের জ্ঞান জন্মায়, কাচও সেই বর্ণের দেখায়। লাল কাচের অর্থ এই যে, উহা শুভ্র সূর্য্যালোকের আর সকলকে হরণ করে, কেবল রক্তবর্ণের আলোক-কিরণগুলিকে আটকায় না, যাইতে দেয়। কেবল যে রক্তবর্ণের আলোকই যাইতে দেয় এমন না হইতে পারে,

রক্তের সঙ্গে অন্য রঙের আলোকও কিছু কিছু যাইতে দেয়। তবে রক্তের ভাগ বেশী বলিয়া মোটের উপর রাঙা দেখায়। এইরূপে নীল কাচ সকল বর্ণের আলোক হরণ করে; যে গুলিকে যাইতে দেয় তাহার মধ্যে নীলের ভাগ বেশী। এইরূপে রঙিল কাচের মত স্বচ্ছ কঠিন পদার্থ রঙিল দেখায়। তরল ও অনিল পদার্থও রঙিল আছে। জলে তুঁতে দ্রব করিলে নীল জল ও আল্‌তা দ্রব করিলে লাল জল হয়। অনিলের মধ্যে ক্লোরীণ হরিদ্রাভ ও আয়োডিন শিখীবর্ণ। ইহাদেরও রঙিল দেখানর কারণ ঐরূপ। উহারা সূর্য্যের শুভ্র আলোকের মধ্যে কতকগুলি রং চুরি করিয়াছে। যাহারা বাহিরে আসিয়াছে তাহাদের একযোগে ঐ রং।

যে সকল জিনিস স্বচ্ছ নহে অথচ রঙিল, যেমন রঙিল কাপড়, রঙিল কাগজ, নীল বড়ি, ইত্যাদি, ইহাদেরও বর্ণের ঐ রহস্য। নীল রঙের কাগজের উপর শুভ্র সূর্য্যালোক পড়িতেছে। সেই সূর্য্যালোকের কতকগুলি রং কাগজ চুরি করিয়া লইতেছে; অবশিষ্ট যাহারা কাগজের পিঠ হইতে ছট্‌কাইয়া আসিয়া চোখে পড়িতেছে, তাহাদের মধ্যে নীলের ভাগই অধিক।

সূর্য্যের শুভ্র আলোক সরু ছিদ্র দিয়া আনিয়া কাচের কলমে বিশ্লেষণ করিলে রক্ত অরুণ পীত হইতে শিখী পর্য্যন্ত যে সকল বর্ণ দেখা যায়, তাহাদিগকে বিশুদ্ধ বর্ণ বলা যাইতে পারে। শুভ্র সূর্য্যালোকে ঐ সকল নানাবিধ বিশুদ্ধ বর্ণের আলোক রহিয়াছে। উহাদের সংখ্যা যত, নাম তত নাই, কাজেই, গোটা ছয় সাত নাম দিয়াই নিরস্ত থাকিতে হয়। বস্তুতঃ বিশুদ্ধ রক্ত ও বিশুদ্ধ অরুণের মাঝে আরও নানাবর্ণ আছে, তাহা রক্ত ও অরুণের মাঝামাঝি; কিন্তু মাঝামাঝি হইলেও বিশুদ্ধ বর্ণ।

কিন্তু কঠিন তরল অনিল পদার্থ স্বচ্ছই হউক আর অনচ্ছই হউক, উহাদের যে রং দেখা যায় তাহা প্রায় বিশুদ্ধ হয় না। যে রংকে নীল বোধ হইতেছে, উহাতে বিশুদ্ধ নীলের সঙ্গে অন্যান্য বিশুদ্ধ রংও হয়ত কিছু কিছু আছে। তবে নীলের ভাগ বেশী। কোন্ কোন্ বিশুদ্ধ বর্ণ আছে তাহা বিশ্লেষণ ব্যতীত জানা যায় না। রঙিল কাচের মধ্য দিয়া যে রঙিল আলো আসিতেছে, তাহাকেও সরু ছিদ্র দিয়া আনিয়া কাচের কলমে প্রবেশ করাইলে তবে বুঝা যাইবে উহার মধ্যে কোন্ কোন্ বিশুদ্ধ বর্ণের আলো আছে।

পাটল, কপিশ, ধূমল প্রভৃতি বর্ণ বিশুদ্ধ বর্ণ নহে। ঐ ঐ বর্ণের আলো বিশ্লেষণ করিলে উহার কোন্‌টিতে কোন্ কোন্ বিশুদ্ধ বর্ণের আলো আছে, তাহা বুঝা যায়। বিশ্লেষণের প্রণালী ঐ পূর্ব্ববিধ।

রঙিল জিনিস কেন রঙিল দেখায় তাহা বুঝা গেল। উহারা বর্ণ চুরি করিয়া শুভ্রকে রঙিল করিয়া দেয়। শ্বেতবর্ণ ও কৃষ্ণবর্ণ সম্বন্ধে আর একটু বলা আবশ্যক। নির্ম্মল জল, নির্ম্মল বায়ু ইহাদের বর্ণই নাই। উহারা সাদাও নহে; কালও নহে; রঙিলও নহে। উহাদের ভিতর দিয়া সূর্য্যের শুভ্র আলোকের সকলেই বিনা আপত্তিতে চলিয়া যায়। ফলে, আমরা উহাদিগকে দেখিতেই পাই না; উহাদের পশ্চাতে ওদিকে যে জিনিস আছে, তাহাই দেখি; অবিকৃত ভাবে দেখি। যাহাকে সাদা কাচ বলা যায়, তাহা সাদা নহে, বর্ণহীন কাচ। তবে সাদা কাগজ, সাদা কাপড়ের বর্ণ সাদা বা শুভ্র। উহাদের গায়ে সূর্য্যের শুভ্র আলোক পড়ে, পড়িয়া আবার ছট্‌কাইয়া বিক্ষিপ্ত হয়; উহারা কোন রং চুরি করে না। শুভ্র আলোকেই ছড়াইয়া দেয়। সেই শুভ্র আলোর সাহায্যে উহাদিগকে সাদা দেখায়। কৃষ্ণবর্ণ কয়লার ব্যবহার উল্টা। নামের মাহাত্ম্যে বোধ হয় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ শৈশবে ননী চুরি

করিতেন, কৈশোরে গোপীদের বসনের সহিত মন চুরি করিতেন। কয়লা শুভ্র আলোকের অন্তর্গত সকল বর্ণের আলোকই চুরি করে, কোন বর্ণের প্রতি উহার পক্ষপাত বা তাচ্ছিল্য নাই; সকলকেই চুরি করে, কাজেই, চোখ আর কাহাকেও পান না। কৃষ্ণবর্ণ সকল বর্ণের অভাব, সকল আলোকের অভাব, উহা অন্ধকার, অমাবস্যার অন্ধকার। ফলে, কয়লা আমরা দেখি না। আমরা কয়লার আশ-পাশের সকল জিনিস দেখিয়া থাকি। যেখানটা দেখিত পাই না, বা আঁধার দেখি, সেইখানটাই কয়লা!

সূর্য্যের আলোক শুভ্র। আলোকের পথের সম্মুখে মেঘের টুকরা পড়িলে, সেই আলোক বর্ণনির্ব্বিশেষে মেঘ কর্ত্তৃক বিক্ষিপ্ত হইয়া আসিলে মেঘখানা শুভ্র বা সাদা দেখায়। আর মেঘ যখন সূর্য্যকে আচ্ছাদন করে তখন সূর্য্যের আলোক মেঘের স্তর ভেদ করিয়া আসে না, মেঘের উপরের পিঠ হইতেই বিক্ষিপ্ত হইয়া ঊর্দ্ধে ছড়াইয়া পড়ে; ভূতলবাসীর চোখে পড়ে না; তখন মেঘকে ঘন কৃষ্ণ দেখায়। আর প্রাতে বা সায়ংকালে সূর্য্যের শুভ্র আলো গভীর বায়ুস্তর ভেদ করিয়া আসিবার সময় উহার কোন কোন বর্ণ—শিখী বর্ণ নীলবর্ণ বায়ুস্তরের ভাসমান ধূলিকণা কর্ত্তৃক বিক্ষিপ্ত হইয়া যায়। যাহা আসিয়া চোখে পড়ে, তাহা মোটের উপর অরুণ বা রক্তারুণ দেখায়। আবার কখনও কখনও মেঘের কোণে বারিবিন্দুর মধ্যে প্রবেশ করিয়া কাচের কলমে প্রবেশ করিলে যেমন বিশ্লিষ্ট হয় তেমনি বিশ্লিষ্ট হইয়া ইন্দ্রধনুর বা পরিবেশের উৎপাদন করে।

স্বয়ম্প্রভ দ্রব্যের মধ্যে সূর্য্যের আলোক শুভ্র। সেই আলোক বিক্ষিপ্ত করিয়া নিষ্প্রভ দ্রব্য সকল সাদা, কতক চুরি করিয়া রঙিল ও সমস্ত চুরি করিয়া কাল দেখায়। কিন্তু স্বয়ম্প্রভ অথচ রঙিল এমন

দ্রব্যও আছে। দীপশিখার আলো পীতবর্ণ। উহাকে কাচের কলমে বিশ্লেষণ করিলে, বিশুদ্ধ পীত পাওয়া যায়, তার সঙ্গে অন্য রং কিছু থাকিতে পারে, তাহা পরিমাণে উল্লেখযোগ্য নহে। সোডিয়ম নামে যে ধাতু আছে, যে ধাতু সামুদ্রিক লবণে বর্ত্তমান ও লবণের সহকারে যাহা আমাদের উদরস্থ হয়, সেই ধাতুর বাষ্প যখন গরম হইয়া দীপ্তি দিতে থাকে, তখন ঐ বিশুদ্ধ পীত বর্ণের আলো দেয়। বায়ুতে সর্ব্বদাই নানা জাতীয় ধূলিকণা থাকে, তাহার মধ্যে উক্ত লবণসম্পর্কী দ্রব্য থাকায়, দীপশিখাও সেই কারণে পীত দেখায়।

দীপ্তিমান্ সোডিয়ম বাষ্প যেমন পীত বর্ণের আলো দেয় দীপ্তিমান্ পটাশিয়াম বাষ্প তেমনি শিম্বীর আভাযুক্ত আলো দেয়। বারুদে সোরা থাকে, সোরাতে এই ধাতু আছে। সোরা-সংযোগে দহনের সময় ঐ রং আসে। চূণের মধ্যে যে ধাতু আছে, উহা বাষ্পাবস্থায় রাঙা আলো দেয়। তাম্র বাষ্পাবস্থায় সবুজ আলো দেয়। এইরূপ বিবিধ ধাতু দ্রব্য উত্তপ্ত অবস্থায় বিবিধ বর্ণের আলো দিয়া থাকে। এই সকল বর্ণ প্রায় অবিশুদ্ধ বর্ণ; বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, কোন্ ধাতুর আলোতে কি কি বিশুদ্ধ বর্ণ আছে। এমন কি যৌগিক পদার্থের মধ্যে ধাতু লুকাইয়া আছে; এত কম মাত্রায় আছে যে রসায়নবিৎ নানা চেষ্টায় স্থির করিতে পারিতেছেন না; কি ধাতু আছে। ঐ পদার্থ দীপ-শিখাকে প্রদীপ্ত করিয়া, কাচের কলমে বিশ্লেষণে, কি কি রংএর আলোক পাওয়া গেল, তাহা দেখিয়া বলা যাইতে পারে ইহা অমুক ধাতুর আলো, অতএব ঐ ধাতু আছে। ঐরূপে প্রত্যেক ধাতুরই, কেবল ধাতু কেন, প্রত্যেক মূল পদার্থেরই বাঁধা আলো আছে। সেই আলোতে কোন্ কোন্ বর্ণ বিদ্যমান, তাহা বিশ্লেষণে জানা আছে। এবং আলোকে বিশ্লেষণ করিয়া অবলীলাক্রমে উহা কোন্ মূলপদার্থের

আলোক তাহা বলা যাইতে পারে। এইরূপে কেবল আলো পরীক্ষা করিয়া মূলপদার্থ অব্যর্থ সন্ধানে চেনা যায়। এমন কি, আলোক বিশ্লেষণ করিতে করিতে সহসা এমন একটা বর্ণের অস্তিত্ব দেখা যায়, তাহা কোন পরিচিত মূলপদার্থ নহে; তখন একটা এতাবৎকাল অজানা একটা মূলপদার্থের আবিষ্কার হইয়া পড়ে। এইরূপে অনেকগুলি মূলপদার্থের বস্তুতই আবিষ্কার হইয়াছে। সেই পদার্থগুলি পৃথিবীতে সুলভ নহে; রাসায়নিকেরা এত জিনিস লইয়া নাড়াচাড়া করেন, উহারা দুর্লভ বলিয়া রাসায়নিকদের চোখে কখনও পড়ে নাই। আলোক বিশ্লেষণ করিতে গিয়া সহসা তাহাঁদের অস্তিত্ব বাহির হইয়া পড়ে। বিজ্ঞান যে কেবল আনন্দ তাহা নহে; বিজ্ঞান মানুষের প্রধান বল। ইন্দ্রিয় যাহাদের কোন সংবাদ দেয় না, বিজ্ঞান তাহাদিগকে খুঁজিয়া আনিয়া ইন্দ্রিয়ের সম্মুখে ধরে। জ্ঞানের পরিধি এইরূপে প্রসার প্রাপ্ত হয়। এক শত বৎসর আগে মানুষের জ্ঞানের পরিধি যেখানে ছিল, আজ যে তাহা ছাড়িয়া কতদূরে গিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা করা কঠিন।

যাক্, ইহার মধ্যে এই কথাটি স্মরণ রাখিতে হইবে, যে প্রত্যেক মূলপদার্থের একটা নির্দ্দিষ্ট রকমের আলো দিবার ক্ষমতা আছে। একের আলোর সহিত অন্যের আলোর মিল নাই। প্রত্যেকের আলো উহার নিজস্ব সম্পত্তি বা নিদর্শন।

সূর্য্যের শুভ্র আলোকে শত সহস্র বিশুদ্ধ বর্ণের আলো আছে; সকলের নাম দিতে পারা যায় নাই; কিন্তু ঐ সকল মূলপদার্থের আলোকে শত সহস্র বর্ণের আলোক নাই; কোনটায় অল্প, কোনটায় অধিক বর্ণের আলোক আছে। সোডিয়মের আলোকে একটা (প্রকৃত পক্ষে দুইটা) বর্ণ; উদ্‌যানে গোটা চারি পাঁচ; লোহাতে

চারি পাঁচশত বর্ণ, বিশ্লেষ দ্বারা বেশ ধরা যায়। কিন্তু চারি পাঁচটাই হউক আর চারি পাঁচশই হউক, উহা নিজস্ব। একের বর্ণে অন্যের বর্ণে মিল নাই।

কোন ধাতু পদার্থ (বা মূলপদার্থ) যখন প্রভূত তাপ পাইয়া বাষ্প বা অনিল অবস্থা পাইয়া উষ্ণ দীপ্ত ও প্রভান্বিত হয় তখন উহা স্বয়ম্প্রভ হয় ও আপনার নিজস্ব আলোক বিতরণ করিতে থাকে; চারি-দিকে মুক্তহস্তে ছড়াইতে থাকে। কিন্তু যাঁহার এইরূপ মুক্তহস্তে দান-শীলতা, তাঁহারই আবার চুরি বিদ্যা আছে। সোডিয়ম পীতবর্ণের আলো দেয়, কিন্তু সোডিয়ম শিখার ভিতর দিয়া উজ্জ্বলতর শুভ্রবর্ণের আলোক লইয়া গেলে, সেই সোডিয়ম শুভ্র বর্ণের আলোকের মধ্য হইতে কিঞ্চিৎ চুরি করেন। কোন্ আলো চুরি করেন? নিজে যে বর্ণের আলো বিতরণ করেন, ঠিক সেই বর্ণের আলোকই চুরি করেন। উজ্জ্বল শুভ্র বর্ণের আলোকে কাচের কলমে বিশ্লেষণ করিলে তাহাতে রক্ত হইতে শিম্বী পর্য্যন্ত শত সহস্র বিশুদ্ধ বর্ণের আলোক দেখা যায়। কিন্তু সেই শুভ্র আলোকই যদি দীপ্ত সোডিয়ম শিখার ভিতর প্রবেশের পর তাহাকে বিশ্লেষণ করা যায়, তখন দেখা যায়, শুভ্র বর্ণের অন্তর্গত শত সহস্র বর্ণের সকল বর্ণই আছে, কেবল সেই পীতবর্ণটি নাই, যে পীতবর্ণ সোডিয়ম নিজে অকাতরে দিয়া থাকেন। এখানে সেই পীতালোক সোডিয়ম কর্ত্তৃক অপহৃত হইয়াছে। কাজেই, শত সহস্র বর্ণের সকল বর্ণই আছে, কেবল সেই পীতবর্ণটি নাই। তাহার স্থানে অন্ধকার, সেখানটা কৃষ্ণবর্ণ।

বুনসেন এবং কির্কক নামক দুই জর্ম্মণ বৈজ্ঞানিক প্রায় সত্তর বৎসর আগে সোডিয়মের এই চুরি বিদ্যা ধরেন ও প্রথমটা চমকিয়া উঠেন। পরে দেখেন, এই প্রবৃত্তি সোডিয়মের কেন, মূলপদার্থ মাত্রেরই আছে।

যিনি যে আলো দিয়া থাকেন, যে আলো তাঁহার নিজস্ব, শুভ্র আলো হইতে তিনি ঠিক সেই আলোটি চুরি করিয়া থাকেন। নিজের নির্দ্দিষ্ট আলোটিতেই তাঁহার লোভ। অন্য বর্ণের আলোতে দৃকপাত মাত্র নাই।

অনিলাবস্থ সোডিয়মের এই পীতালোক অপহরণের ক্ষমতা বাহির হইবামাত্র বৈজ্ঞানিকমণ্ডলী জয়ধ্বনি দিয়া উঠিলেন। জয়ধ্বনির বিশেষ একটু কারণ আছে।

সূর্য্যের শুভ্র আলোকের শুভ্রত্বে একটু বিশেষত্ব আছে। একখানা চূণ উত্তাপে অত্যন্ত উষ্ণ করিলে উহা হইতে ধপধপে শুভ্র আলোক বাহির হইতে থাকে। সূর্য্যের আলোকের সঙ্গে এই আলোকের একটু সূক্ষ্ম প্রভেদ আছে, চোখে তাহা ধরা যায় না; কিন্তু কাচের কলমে বিশ্লেষণে তাহা ধরা যায়। সূর্য্যের শুভ্র আলোকেও রক্ত হইতে শিম্বী পর্য্যন্ত শত সহস্র বর্ণের আলোক আছে বটে, কিন্তু মাঝে মাঝে গোটা-কতক বর্ণের আলোক নাই। যেখানে যেখানে যে যে বর্ণ নাই, সেই সেই স্থানে সেই সেই বর্ণের আলোকের পরিবর্ত্তে আঁধার দেখা যায়। সূর্য্যের আলোকে পীতবর্ণের আলোক আছে, কিন্তু পীতেরই আবার সহস্র প্রকার ভেদ, সকল পীতের পৃথক্ নাম দেওয়া গেল না। সোডিয়ম হইতে যে পীত আলোক বাহির হয়, সূর্য্যের আলোকে তাহার অভাব দেখা যায়। কাচের কলমে সূর্য্যালোক বিশ্লেষণ করিলে, যে পথে সেই পীত আলোক দেখিবার কথা ছিল, সেখানে আঁধার দেখা যায়। এইরূপ আরও অনেকগুলি বর্ণের আলোকের অভাব দেখা যায়। বিশ্লিষ্ট সূর্য্যালোক সাদা কাগজের উপর ফেলিলে রক্ত হইতে শিম্বী পর্য্যন্ত শত সহস্র বর্ণের আলোক সারি বাঁধিয়া গায়ে গায়ে স্পর্শ করিয়া সেই কাগজে পতিত দেখা যায়। কিন্তু মাঝে মাঝে ফাঁক—আলোকের

পরিবর্ত্তে আঁধার। কিন্তু গরম চূণ হইতে যে শুভ্র আলোক আসে তাহাতে সে রকম ফাঁক কুত্রাপি দেখা যায় না; উহাতে কোথাও আঁধার থাকে না; সূর্য্যের আলোকে যে এই অভাব আছে তাহা বৈজ্ঞানিকেরা সকলেই জানিতেন, কিন্তু এই অভাবের তাৎপর্য্য কেহই বুঝিতে পারেন নাই। সূর্য্যের মধ্যে ঐ ঐ বর্ণের আলোকগুলি কে চুরি করিল? বুনসেন ও কির্কফের আবিষ্কারে উহার উত্তর মিলিল। শুভ্র সূর্য্যালোক আসিবার সময় পথে কোথাও, অনিলাবস্থ সোডিয়মের ভিতর প্রবেশ করিয়াছে। সোডিয়ম তাহার নির্দ্দিষ্ট পীতবর্ণ চুরি করিয়াছে; তাহাতেই সূর্য্যালোকে ঐ পীতবর্ণের অভাব। এইরূপে অন্যান্য মূল পদার্থের ভিতর প্রবেশ করায় তাহারাও আপন আপন নির্দ্দিষ্ট বর্ণ অপহরণ করিয়া লইয়াছে। তাই সূর্য্যালোকে এতগুলি বর্ণের অভাব। এখন সেই সকল মূলপদার্থ আছে কোথায়? সূর্য্যালোক ত শূন্য পথে বহু যোজন পথ অতিক্রম করিয়া পৃথিবীতে আসে। পৃথিবীর বায়ু ভেদ করিয়া আসিতে হয় বটে, কিন্তু পৃথিবীর বায়ুতে ঐ. সকল পদার্থ ত নাই। তবে সূর্য্যালোকের পথে সোডিয়ম ধাতু অনিলাবস্থায় কোথায় থাকিল? অনুমান কঠিন নহে। সূর্য্য একটা বৃহৎ জ্যোতির্ম্ময় পিণ্ড। আয়তনে পৃথিবীর বার লক্ষ গুণ। পৃথিবীর পিণ্ডকে আবরণ করিয়া যেমন বায়ুর আচ্ছাদন আছে, সূর্য্যের পিণ্ডকে আবরণ করিয়াও সেইরূপ আচ্ছাদন রহিয়াছে। এবং সূর্য্যের যে ভীষণ উষ্ণতা, তাহাতে, সেই বায়ু মধ্যে সোডিয়ম কেন, লোহা পর্য্যন্ত অনিলাবস্থাতে থাকিবে তাহাতে আর বিস্ময় কি? বস্তুতঃ উত্তপ্ত বাষ্পাবস্থায় লোহ হইতে যে কয় বর্ণের আলোক বাহির হয়, সূর্য্যালোকে সেই বর্ণগুলির অভাব। কাজেই, সূর্য্যমণ্ডলের বায়ুতে লোহা পর্য্যন্ত বাষ্প বা অনিলাবস্থায় বিদ্যমান আছে। সূর্য্যালোকে কোন্

কোন্ বর্ণের অভাব, এবং সেই বর্ণ কোন্ কোন্ মূল পদার্থের নিজস্ব তাহা পরীক্ষাগারের টেবিলে বসিয়া নির্দ্ধারণ করিয়া এখন অক্লেশে বলা যাইতে পারে,সূর্য্যে সোডিয়ম আছে, লৌহ আছে, উদযান আছে—ইত্যাদি।

সূর্য্যের জ্যোতির্ম্ময় পিণ্ড হইতে অবশ্য সকল বর্ণেরই আলোক আসিতেছে; গরম চূণ হইতে যে যে বর্ণ আসে সবই আসিতেছে; কিন্তু সেই উত্তপ্ত পিণ্ড আচ্ছাদন করিয়া তদপেক্ষা শীতল বায়ুর আস্তরণ আছে। সেই বায়ুতে যে সকল অনিল ও বাষ্প বিদ্যমান, তাহারা আপন আপন বর্ণের আলোক আসিতে দেয় না, আট্‌কাইয়া ফেলে, কাজেই, আমরা পৃথিবীবাসী যে সূর্য্যালোক পাই, তাহা সেই অপহরণের অবশেষ মাত্র। তবু যাহা পাই তাহাই কি কম? যাহা পাই, তাহার তুলনায় যাহা পাই না, তাহার পরিমাণ এত সামান্য যে চোখের কাছে সূর্য্যালোক শুভ্রই থাকে; উহার শুভ্রতায় কলঙ্ক স্পর্শ হয় না।

সূর্য্যের বায়ুতে কি কি জিনিস আছে, কি কি নাই, তাহা এইরূপে বলা চলে। অবশ্য সূর্য্যপিণ্ড কোন্ পদার্থে নির্ম্মিত, তাহা নিরূপণের উপায় অদ্যাপি আবিষ্কৃত হয় নাই। সূর্য্যের বায়ুতে পার্থিব পদার্থ ভিন্ন অন্য পদার্থের অস্তিত্বের প্রমাণ বড় মিলে নাই। লকিয়ার বহুদিন হইল একটা জিনিসের অস্তিত্ব ধরিয়াছিলেন, সে জিনিসটা তখন পৃথিবীতে পাওয়া যাইত না। সূর্য্যের যাবনিক নাম হেলি। লকিয়ারের আবিষ্কৃত পদার্থ পৃথিবীতে পরিমিত ছিল না, সূর্য্যের ছিল বলিয়া লকিয়ার উহার নাম দিয়াছিলেন হেলিয়ম। সম্প্রতি কয় বৎসর হইল সার উইলিয়ম রামজে নামক ইংরেজ একটা আকর হইতে নির্গত বায়ু পরীক্ষা করিতে করিতে উহাতে হেলিয়ম বাহির

করিয়া ফেলিয়াছেন। এই হেলিয়মকেও অবশ্য এখন পার্থিব পদার্থ বলিতে হইবে। হেলিয়মের সম্বন্ধে আরও কথা পরে উঠিবে।

আকাশে যে সকল নক্ষত্র টিপি টিপি করিয়া জ্বলে, উহারাও সূর্য্যের মত বৃহৎ স্বয়ম্প্রভ পিণ্ড। গোটা কতকের দূরত্বের আন্দাজ হইয়াছে; দূরত্ব, সূর্য্যের দূরত্বের তুলনায় অনেক বেশী; ফলে উহাদের অনেকে সূর্য্যের চেয়েও বৃহৎ ও জ্যোতিষ্মান্। সূর্য্যের সমান দূরে থাকিলে সূর্য্যের চেয়েও বৃহৎ ও জ্যোতিষ্মান্ দেখাইত। তবে এত দূরে আছে যে, আমরা অতি ক্ষীণ আলো পাইয়া থাকি। ঐ ক্ষীণ আলোকের কিরণের বড় বড় গোছা কাচের পরকলা দিয়া সমাহৃত করিয়া উজ্জ্বলতর করা যাইতে পারে ও উহাকে কাচের কলম দ্বারা বিশ্লেষণ করিয়া কোন্ নক্ষত্রের আলোকে কোন্ কোন্ বর্ণের আলোক আছে বা নাই স্থির করা যাইতে পারে। দেখা গিয়াছে, নক্ষত্রের আলো সূর্য্যের আলোকেরই মত। রক্ত হইতে শিম্বী পর্য্যন্ত সকল বর্ণই আছে। তবে সূর্য্যের আলোকে যেমন কোন কোন বর্ণের অভাব, উহাদের আলোকেও তেমনি কোন কোন বর্ণের অভাব। এবং এই অভাব দেখিয়া কোন্ নক্ষত্রের বায়ুমণ্ডলে কোন্ কোন্ মূলপদার্থ বর্ত্তমান আছে তাহাও স্থির করা চলে। দেখা গিয়াছে, উদান আর সোডিয়ম প্রায় সকল নক্ষত্রেই বিদ্যমান; অন্যান্য মূলপদার্থ কোনটায় হয়ত আছে, কোনটায় নাই।

বৈজ্ঞানিক-মণ্ডলীর জয়ধ্বনির কারণ এখন বুঝা গেল। বুনসেন ও কির্কফ পরীক্ষাগারের টেবিলে দীপশিখা জ্বালিয়া যে তথ্য নিরূপণ করিলেন তাহার ফলে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কোথায় কি আছে তাহা জানা গেল।

আলোকের স্বরূপ

এখন আলোকের স্বরূপ-বিচারের সময় আসিয়াছে। স্বরূপ-বিচারের একটা পন্থা আমরা পূর্ব্বেই পাইয়াছি। কয়লা সকল বর্ণের আলোক চুরি করে। রঙিন জিনিস বর্ণবিশেষের আলোক চুরি করে। যে আলোকটা চুরি যায়, তাহার পরিণতি কি হয়? তাহা লোপ পায় কি? যে জিনিস আলোক হরণ করে, তাহা সঙ্গে সঙ্গে গরম হয়। যে যত হরণ করে সে তত গরম হয়। একটা তামার বাক্সে জল পূরিয়া বাক্সের পিঠে ভুষা মাখাইয়া রোদে ধরিয়া মিনিট দশেক রাখিলে, জলটা কয়েক ডিগ্রী গরম হইয়া উঠে। ভুষা কয়লা মাত্র, উহা সূর্য্যের আলোক সমস্তই চুরি করে। দশ মিনিটে প্রাপ্ত আলোকে কয় সের জল কয় ডিগ্রী গরম হইল দেখিয়া কতটা তাপের সৃষ্টি হইল, তাহা আন্দাজ করা যায়। তাপের স্বরূপ-বিচারে স্থির করা গিয়াছে, উহা শক্তির প্রকারভেদ। এ স্থলে দেখা যাইতেছে খানিকটা আলোকের অপহরণের ও অন্তর্দ্ধানের ফল, খানিকটা তাপের সৃষ্টি; উহাতে আলোককেও শক্তির প্রকারভেদ বলিতে হয়। পূর্ব্বে দেখিয়াছি, শক্তি নষ্ট হয় না, উহা কেবল রূপান্তর পরিগ্রহ করে। এখানেও আমরা মনে করিতে পারি, আলোক শক্তির এক রকম মূর্ত্তি; উহা কয়লা কর্ত্তৃক গৃহীত হইয়া অন্য মূর্ত্তিতে অর্থাৎ তাপে পরিণত হইল।

এইখানে বলা আবশ্যক, যে জিনিস আলোক হরণ করিতে পারে না, উহা গরমও হয় না। কাল জিনিস সকল বর্ণকেই হরণ করে, আর সাদা জিনিস সকল বর্ণকেই ছড়াইয়া দেয়।

সূর্য্যের রোদে সাদা কাপড়ের চেয়ে কাল কাপড় অধিক গরম হয়।

গ্রীষ্মকালে সাদা কাপড়ের এবং শীতকালে কাল কাপড়ের আদরের মূল এইখানে।

আলোক একটা জ্ঞানমাত্র, আলোককে শক্তি না বলিয়া যাহার আলোকে জ্ঞান জন্মায় তাহাকেই শক্তি বলা উচিত। তবে এত সাবধান হইয়া ভাষার ব্যবহার বড় কঠিন।

শক্তি না হয় হইল, কিন্তু কাহার শক্তি; শক্তি কোন একটা জড়পদার্থ আশ্রয় করিয়া থাকিবে। আলোকের শক্তি কাহার আশ্রয়ে আছে?

নিউটন অনুমান করিতেন, জ্যোতিষ্মান্ পদার্থ হইতে একরূপ অতি সূক্ষ্ম কণিকা বেগে বহির্গত হয়। সেই কণিকাগুলি এত সূক্ষ্ম যে চোখে প্রবেশ করিলে, চোখের বিশেষ হানি হয় না, তবে আলোকের জ্ঞান হয়। আর হানি হয় না-ই বা কিরূপে বলি? আলো খুব তীব্র হইলে হানি হয় বৈ কি? সূর্য্যের দিকে কে চাহিতে পারে? এই সূক্ষ্ম কণিকাগুলি স্থিতিস্থাপক; তাই পদার্থের পৃষ্ঠে পড়িয়া রবরের বলের মতন ছটকাইয়া পড়ে, ইহাই আলোকের প্রতিফলন ব্যাপার। কণাগুলি এত সূক্ষ্ম যে, জলের মত বা কাচের মত স্বচ্ছ পদার্থের ভিতর অবলীলাক্রমে প্রবেশ করে, এমন কি প্রবেশ কালে এক পাশে একটু ঝোঁক বাড়িয়াই যায় বলিয়া সেই পাশে গতির মুখ ফিরাইয়া লয়।

বিভিন্ন বর্ণের আলোকের কণা বিভিন্ন জাতীয় জলে বা কাচে প্রবেশ করিলে উহাদের ঝোঁক ভিন্ন ভিন্ন ভাবে বৃদ্ধি পায়, তাই জলে বা কাচে প্রবেশ করিয়া ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের আলো ভিন্ন ভিন্ন পথে চলে; তাহার ফল আলোক-বিশ্লেষণ।

নিউটনের এই অনুমানে আলোকের ব্যবহার অনেক দূর পর্য্যন্ত

বেশ বুঝা যায়। অতএব উহা বিজ্ঞানবিদের অনুমান নহে। এত অসংখ্য আলোক-কণিকা ছুটিয়া আসিয়া পদার্থে পতিত হইতেছে, অথচ উহাদের ওজনের কোন চিহ্ন পাওয়া যায় না বলিয়া আপত্তি চলে না; কেননা সকল জিনিসেরই ওজন থাকিতেই হইবে এমন কি কথা আছে?

আলোকের কণিকাগুলি বেগে ছুটিতেছে, সেই বেগের পরিমাণ মাপিবার কোন উপায় আছে কি? বেগ যতই অধিক হউক, অধিক দূর হইতে আসিতে একটু সময় লাগিবেই। কত সময়ে কতদূর আসে কোনরূপে ঘড়ি ধরিয়া মাপিতে পারিলে আলোকের বেগ বাহির হইতে পারে।

পৃথিবী সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে, উহা গ্রহ; সেইরূপ বৃহস্পতি আরও দূরে থাকিয়া সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে, বৃহস্পতিও গ্রহ। উভয় গ্রহ আপন আপন পথে আপনার নির্দ্দিষ্ট সময়ে সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে। বৃহস্পতি এক চক্র ঘুরিয়া আসিতে পৃথিবী প্রায় বার চক্র ঘুরিয়া আসে। ইহার ফল এই হয় যে, বৎসরের মধ্যে পৃথিবী একবার সূর্য্য ও বৃহস্পতির মাঝে আসে, তখন বৃহস্পতি খুব উজ্জ্বল দেখায়। আর ছয় মাস পরে পৃথিবী সূর্য্যের ওধারে চলিয়া যায়। সূর্য্য উভয়ের মাঝে পড়ে। বৃহস্পতি তখন পৃথিবী হইতে কম উজ্জ্বল দেখায়। অর্থাৎ বৎসরের মধ্যে বৃহস্পতি পৃথিবীর একবার কাছে আসে, একবার দূরে যায়। এখন বৃহস্পতিতে কোন ঘটনা ঘটিলে বৃহস্পতি হইতে আলো আসিয়া সেই সংবাদ দেয়। অতটা দূর হইতে বার্ত্তা আনিবার একমাত্র দূত আলোক। এখন পৃথিবীর যেমন উপগ্রহ আছে—চাঁদ, বৃহস্পতিরও তেমনি কয়েকটা উপগ্রহ আছে। গ্যালিলিও প্রথমে দূরবীণ দিয়া উহাদের অস্তিত্ব

আবিষ্কার করেন। তাহারা বৃহস্পতির উপগ্রহ; বৃহস্পতিকেই প্রদক্ষিণ করিতেছে। যখন বৃহস্পতির ওপিঠে অর্থাৎ আড়ালে পড়ে, তখন বৃহস্পতি তাহাদিগকে ঢাকিয়া ফেলে; তখন ঐ উপগ্রহের গ্রহণ হয়। পৃথিবী হইতে ঐ গ্রহণ—বৃহস্পতির চাঁদের গ্রহণ দেখা যায়। আলোক-দূতে সেই গ্রহণের খবর আনে। পৃথিবী যখন বৃহস্পতির কাছে থাকে, তখন সেই গ্রহণের খবর শীঘ্রই আসে। আর পৃথিবী যখন অর্দ্ধ বৎসর পরে বহু দূরে যায়, তখন গ্রহণের খবর আসিতেও কিছু বিলম্ব ঘটে। জ্যোতিষীরা ঘড়ি ধরিয়া দেখিয়াছেন, প্রায় ষোল মিনিট বিলম্ব ঘটে। পৃথিবীর ভ্রমণ-পথটা প্রায় গোলাকার, উহার ব্যাস আঠার কোটি মাইলের কিছু বেশী। পৃথিবী আজি সেই ব্যাসের এ-প্রান্তে থাকিলে ছয় মাস পরে ওপ্রান্তে যায়, কাজেই তখন দূরত্বও বাড়িয়া যায়, আঠার কোটি মাইল। আঠার কোটি মাইল দূরত্ব বাড়ায়, আলোকের খবর দিতে বিলম্ব হয় ষোল মিনিট। আঠার কোটি মাইল চলিতে যদি লাগে ষোল মিনিট তাহা হইলে এক সেকেণ্ডে এক লাখ সাতাশী হাজার মাইল লাগিবে। হিসাবে এই দাঁড়ায়। অতএব আলোকের বেগ সেকেণ্ডে এক লাখ সাতাশী হাজার মাইল, অর্থাৎ মোটা হিসাব প্রায় লক্ষ ক্রোশ।

সেকেণ্ডে লক্ষ ক্রোশ—ব্যাপার সহজ নয়। এত বড় ভূমণ্ডল ইহার বেড়টা পঁচিশ হাজার মাইল মাত্র। আলো সোজা রাস্তায় চলে। যদি উহাকে পৃথিবী ঘুরিতে হইত, তাহা হইলে এক সেকেণ্ডে পৃথিবীকে সাড়ে সাত পাক ঘুরিয়া আসিতে পারিত।

বিশ্বাস করা দায়, কিন্তু হিসাবের আঁককে বিশ্বাস না করিলেও চলে না।

ফিজো নামে ফরাসী বৈজ্ঞানিক অত জ্যোতিষের কাণ্ড ছাড়িয়া

দিয়া, খোলা মাঠে আলো আসিতে কত সময় লাগে, মাপিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। একখানা দাঁতাল চাকা, ঘড়ির কলে যেমন পিতলের চাকা থাকে সেইরূপ একখানি দাঁতাল চাকা একটা উজ্জ্বল দীপের নিকট রাখা হইল। দীপের আলোক দুই দাঁতের মাঝ দিয়া বাহির হইয়া দূরে খোলা মাঠে একখানা আরশীতে পড়িল ও সেখানে প্রতিফলিত হইয়া যে পথে গিয়াছিল ঠিক সেই পথেই ফিরিয়া আবার দুই দাঁতের ফাঁকে উপস্থিত হইল। দাঁতের পিছনে চোখ রাখিলে আলো চোখে পড়িবে ও দূরস্থ আরশীতে দীপশিখার প্রতিবিম্ব দেখা যাইবে। কেননা, মনে হইবে আলোটা সেই দূর হইতেই আসিতেছে। এখন এই আলো চাকা হইতে আরশী ও আরশী হইতে চাকা পর্য্যন্ত যাতায়াতে অতি অল্প একটু সময় লয়। সেই সময়টুকুর মধ্যে যদি চাকাখানিকে এরূপ বেগে ঘুরাইয়া দেওয়া হয় যে, যেখানে ছিল দাঁতের মাঝের ফাঁক, সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইল; পরবর্ত্তী দাঁত, তাহা হইলে কি হইবে? আলো ফাঁক দিয়া বাহির হইয়া আরশীতে গেল, সেখান হইতে ফিরিয়া আসিয়া দেখিল আর ফাঁক নাই; তার স্থান আছে দাঁতের আড়াল। অবশ্য, এবার আর চোখে আলো পড়িল না, প্রতিবিম্বও দেখা গেল না। যাতায়াতের রাস্তাটার দূরত্ব জানা আছে; আর চাকার বেগও জানা আছে অর্থাৎ ফাঁকের যায়গায় দাঁত আসিতে কতটুকু সময় লাগিয়াছে, তাহাও জানা আছে। কাজেই, আলো কত সময়ে কতটুকু পথ অতিক্রম করিল, তাহাও পাওয়া গেল। বৃহস্পতির চাঁদের গ্রহণ দেখিয়া আলোকের যে বেগ হিসাবে পাওয়া গিয়াছিল, ইহাতেও সেই সেকেণ্ডে এক লাখ সাতাশী হাজার মাইলই পাওয়া যায়। অতএব জ্যোতিষীয় হিসাবে সংশয়ের আর কারণ থাকে না।

ইহা খোলা মাঠের কয়েক মাইলের কথা। ফিজোর কিছুদিন পরে ফুকো ঘরের ভিতর আলোক যাতায়াতের সময় মাপিয়াও ঠিক সেই একই উত্তর পাইয়াছিলেন।

ফ্‌কো কিন্তু আরও একটি উত্তর পাইলেন। তিনি দেখিলেন, জলের মধ্যে আলোকের বেগ কমিয়া যায়। নিউটন নিবিড় পদার্থে প্রবেশ কালে আলোকের মুখ-ফিরানোর কারণ অনুমান করিতে গিয়া স্থির করিয়াছিলেন যে, জলের ভিতরে আলোক-কণিকার ঝোঁক বাড়ে, অতএব বেগ বাড়ে। উহা নিউটনের অনুমান। ঐরূপ অনুমান ব্যতীত আলোক-কণিকার মুখ-পরিবর্ত্তন বুঝা যায় না। কিন্তু ফূকো প্রত্যক্ষ প্রমাণে দেখিলেন, জলের ভিতর আলোকের বেগ কমে, বাড়ে না।

এই এক আঘাতে নিউটনের অনুমান চূর্ণ হইয়া গেল। আগে বলিয়াছি, নিউটনের অনুমান অসঙ্গত বা বিজ্ঞান-বিরুদ্ধ ছিল না; কিন্তু যেখানে প্রত্যক্ষ প্রমাণ অনুমানের বিরোধী হয়, সেখানে সে অনুমান দাঁড়ায় না।

ফূকোর উত্তরের পূর্ব্ব হইতেই নিউটনের অনুমানের ভিত্তিমূল শিথিল হইতেছিল। আলোকে আলোকে যোগ হইয়া স্থলবিশেষে আঁধার হয়। ইহা প্রত্যক্ষ ঘটনা। ইহা নিউটনের অজ্ঞাত ছিল না। আলোক-কণিকার আঘাতেই যদি আলোক উৎপন্ন হয়, তবে আলোকে আলোকে আঁধার কিরূপে হইবে ইহা বুঝান কিছু কঠিন। নিউটন ইহার ব্যাখ্যার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু ব্যাখ্যাটা জবড়-জং হইয়াছিল। আলোকে আলোকে আঁধার, আর শব্দে শব্দে নিঃশব্দতা ব্যাপার একই শ্রেণীর। শব্দের বেলায় যে ব্যাখ্যা, আলোকের বেলাতেও ঠিক সেই ব্যাখ্যাই সঙ্গত। যাঁহারা এই ব্যাখ্যা দিতেছিলেন, তাঁহারাই নিউটনের

আনুমানিক সিদ্ধান্তের মূলে আঘাত করিতেছিলেন। ভিত্তিমূল শিথিল হইয়াছিল, ফুকো অট্টালিকা চূর্ণ করিয়া দিলেন।

সেই ব্যাখ্যা কি? তরঙ্গগতির উহা বিশিষ্ট লক্ষণ। একটা ঊর্ম্মির মাথায় অন্য ঊর্ম্মির কোল পড়িলে মাথা কোল উভয়ই বিলুপ্ত হইয়া একটা ঢেউ অন্য ঢেউকে কাটিয়া লুপ্ত করে। জলের ঢেউ বা জোয়ারের ঢেউতে এই ব্যাপার; আবার বায়ুর ঢেউতেও এই ব্যাপার। তবে আলোকের বেলায় অন্য ব্যাখ্যার প্রয়োজন কি? মনে করিলেই হইল, আলোক কোন পদার্থের ঢেউ মাত্র।

তন্ত্রী কাঁপিলে তাহার কম্পন পার্শ্বস্থ বায়ুরাশিতে সংক্রান্ত হইয়া বায়ুতে ঢেউয়ের পর ঢেউ উৎপন্ন করে। বায়ুতে সেই ঢেউগুলি নির্দ্দিষ্ট বেগে চলিয়া যায়, সেকেণ্ডে ১১০০ ফুট বেগে চলিয়া যায়; বায়ুকে আশ্রয় করিয়া ঢেউগুলি পর পর চলে, বায়ু নিজে চলে না; স্বস্থানে কাঁপে মাত্র। মনে করিলেই হইল, জ্যোতির্ম্ময় পদার্থের অণুগুলি বা পরমাণুগুলি কাঁপিতেছে, আর সেই কম্পনে চতুঃপার্শ্বস্থ কোন পদার্থের মধ্যে ঢেউ জন্মিতেছে; সেই ঢেউগুলি আসিয়া চোখে ধাক্কা দিলে আলোকের জ্ঞান জন্মিতেছে। বায়ুর ঢেউ কাণে ধাক্কা দিলে শব্দজ্ঞান জন্মে; আর সেই পদার্থের ঢেউ চোখে আঘাত করিলে আলোক-জ্ঞান জন্মায়।

এইরূপ অনুমানে কোন বাধা নাই। বিশেষ যখন দেখা যাইতেছে, শব্দের ঢেউ ও আলোকের ঢেউ অনেক বিষয়ে সদৃশধর্ম্ম-বিশিষ্ট। শব্দের ঢেউ প্রতিহত হইয়া, ফিরিয়া আসিলে প্রতিধ্বনি জন্মে, আলোকের ঢেউ কোন পদার্থের গায়ে প্রতিহত হইয়া প্রতিফলিত হয়। প্রতিধ্বনির ফলে উত্তরে ঢাক বাজাইলে মনে হয় দক্ষিণে বাজিতেছে; প্রতিফলনের ফলে আরশীর উত্তরে প্রদীপ থাকিলে

দক্ষিণে তাহার প্রতিবিম্ব দেখা যায়। নিবিড় পদার্থের মধ্যে গিয়া আলোকের পথ ঘুরিয়া যায়, পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে শব্দের পথও ঘুরিয়া যায়। শব্দের ঢেউ কম্পসংখ্যা ভেদে ছোট বড় হয়; ভিন্ন ভিন্ন দৈর্ঘ্যের ঢেউ কানে লাগিলে, ভিন্ন ভিন্ন স্বরজ্ঞান জন্মে। সেইরূপ মনে করা যাইতে পারে, আলোকের ঢেউ কম্পসংখ্যা-ভেদে ছোট-বড় আছে; ভিন্ন ভিন্ন দৈর্ঘ্যের ঢেউ চোখে লাগিলে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের আলো দেখা যাইবে। এইরূপে আলোকের ঢেউয়ের সঙ্গে শব্দের ঢেউয়ের নানা বিষয়ে সাদৃশ্য কল্পনা চলিবে। সব চেয়ে মিল ঐ উর্ম্মিতে উর্ম্মিতে যোগের ফলে। শব্দে শব্দে নিঃশব্দতা যেমন প্রত্যক্ষ ঘটনা, আলোকে আলোকে অন্ধকারও তেমনি প্রত্যক্ষ ঘটনা। কাজেই, উভয়েই যে উর্ম্মিগত ব্যাপার তাহা মনে করাই সঙ্গত।

পাঠক মহাশয়ের অবশ্য এখনও সংশয় আছে। আলোকে আলোকে অন্ধকার এ আবার কি? ইহা ত কখনও প্রত্যক্ষ করা যায় নাই? প্রত্যক্ষ করা গিয়াছে বৈকি? ইয়ং নামক ইংরেজ ও ফ্রেনেল নামক ফরাসী বৈজ্ঞানিক প্রায় একই সময়, ঊনবিংশ শতাব্দীর আরম্ভেই, আলোক-সম্বন্ধে এই উর্ম্মিতত্ত্বের পুনরালোচনা আরম্ভ করেন। পুনরালোচনা বলিলাম, কেন না, ইংরেজ নিউটনের সময়েই ফরাসী হাইগেন্‌স নামক মনীষী ছিলেন, তিনিও আলোক-ব্যাখ্যার জন্য উর্ম্মিতত্ত্বেরই অবতারণা করিয়াছিলেন। হাইগেন্‌স বড় কম ব্যক্তি ছিলেন না; তবে নিউটনের নামের তীব্র দীপ্তিতে তাঁহার নামের দীপ্তি শতাধিক বৎসর ডুবিয়া ছিল। এমন কি হাইগেন্‌সের স্বদেশী মহারথ বৈজ্ঞানিকগণ, নিউটনের শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়া হাইগেন্‌সের মতকে অগ্রাহ্য করিয়া রাখিয়াছিলেন। যাহা হউক, আবার সেই মতের পুনরালোচনা করিলেন। ইয়ং ও ফ্রেনেল

উভয়েই পরীক্ষা দ্বারা দেখাইলেন, আলোকে আলোকে অন্ধকার হয়। ইয়ংএর উদ্ভাবিত পরীক্ষা-প্রণালী বুঝান সহজ হইবে। সূর্য্যরশ্মি কাচের পরকলা বা একটা কিছুতে কেন্দ্রীভূত করা হইল। দুইখানি আরশী সেই কেন্দ্রে সমাহৃত কিরণচয়ের সম্মুখে রাখা হইল। কিরণগুলি প্রথম আরশীতে প্রতিহত ও প্রতিফলিত হইয়া সম্মুখের একখানা কাগজে পড়িল, আবার দ্বিতীয় আরশীতে প্রতিহত ও প্রতিফলিত হইয়া সেই কাগজে পড়িল। দেখা গেল, কাগজের উপর আলো-আঁধার, আলো-আঁধার, আলো-আঁধার রেখা পড়িয়াছে। যেখানে দুইখানা আরশী হইতে দুই সারি ঢেউ আসিয়া কাগজের একই স্থানে মিলিত হইতেছে। যেখানে উর্ম্মিমালাদ্বয়ে মাথায় মাথায়, কোলে কোলে মিলন, সেখানে উজ্জ্বল আলোক, যেখানে মাথায় কোলে বা কোলে মাথায় মিলন সেখানে আলোকে আলোকে আঁধার; ইহা প্রত্যক্ষ ঘটনা।

অনেক পরিচিত ঘটনা সর্ব্বদাই প্রত্যক্ষগোচর হয়, আমরা তাহার তাৎপর্য্য বুঝি না। জলের উপর এক ফোঁটা তেল ফেলিলে তেল ফোঁটা একবারে জলের উপর বিছাইয়া পড়ে; ক্রমে বিস্তৃত হয় ও অতি সূক্ষ্ম আস্তরণ বা পর্দ্দার মত হইয়া জলের পিঠে ভাসে। তখন সেই তেলে কত হরেক রকম বর্ণের বিকাশ দেখা যায়। ইহা সকলেই দেখিয়াছেন। যিনি চোখ থাকিতেও দেখেন নাই, তিনি এক গামলা জলে এক ফোঁটা তেল ফেলিয়া এখনই দেখিতে পারেন। রৌদ্রে ধরিলে বর্ণবিকাশ আরও উজ্জ্বল হইবে। সাবানের ফেনার বুদ্‌বুদের গায়ে বর্ণবিকাশও পরিচিত ব্যাপার। এখানেও ঐ ব্যাখ্যা। সূর্য্যের শুভ্র আলোক তেলের পর্দ্দার উপর পড়ে, কতকটা আলো তেলের পিঠ হইতে প্রতিফলিত হইয়া ফিরিয়া আসে; কতকটা

আলো তেলের ভিতর প্রবেশ করে, কেননা তেল স্বচ্ছ। তেলে প্রবেশ করে, কিন্তু জলের পিঠ হইতে আবার প্রতিহত ও প্রতিফলিত হইয়া ফিরিয়া আসে। ঐ তেলের পর্দ্দার বেধ অতি সূক্ষ্ম, আলোর ঢেউগুলিও অত্যন্ত ছোট। এত ছোট যে, ঐ পর্দ্দাটুকু পার হইয়া ফিরিয়া আসিতেই উহার একটু সময় লাগে। ফলে, একটা ঢেউ তেলের এ-পিঠ হইতে ফিরিল, আর একটা ঢেউ ও-পিঠ হইতে ফিরিল। কিন্তু এই দ্বিতীয় ঢেউ, ঐ তেলের ভিতর যাতায়াতে একটু পিছাইয়া পড়িল, কাজেই, প্রথম ঢেউয়ের মাথা পশ্চাদ্গামী দ্বিতীয় ঢেউয়ের কোলে মিলিত হইয়া গেল। ফলে উভয়েই লোপ! আলোতে আলোতে আঁধার।

মাথা হইতে কোলের ব্যবধান ঊর্ম্মির অর্দ্ধেক। তেলের পর্দ্দার বেধটুকু যদি এমন হয়, যে প্রথম ঢেউটির তুলনায় পশ্চাদ্গামী দ্বিতীয় ঢেউ, আধ ঢেউ প্রমাণ পিছু পড়িয়াছে, তাহা হইলে একের মাথায় অন্যের কোল ও একের কোলে অন্যের মাথা পড়িয়াছে। ফলে, উভয় ঢেউ লোপ পাইয়াছে। সূর্য্যের শুভ্রালোকে নানা বর্ণের আলোক-ঢেউ; সকল বর্ণের ঢেউ সমান দীর্ঘ নহে। লাল আলোর ঢেউগুলি উহারই মধ্যে বড় বড়, অরুণের তার চেয়ে ছোট, পীতের আরও ছোট, শিম্বীর সব চেয়ে ছোট। কাজেই, সকল বর্ণের ঢেউ এক সঙ্গে লোপ পাওয়া সম্ভব ঘটে না। আলো যদি শুভ্র না হইয়া একরঙা হইত, তাহা হইলে তাহার ঢেউগুলির একবারে লোপ সম্ভব হইত। নানা রঙে নানা ঢেউ আছে, তার মধ্যে একটা রঙের ঢেউ লোপ পায়। হয়ত পীত বর্ণের ঢেউ লোপ পাইল। অন্য বর্ণের ঢেউগুলি লোপ পাইল না। তাহারা ফিরিয়া আসিয়া চোখে পড়িল। চোখ যে আলো দেখিবে তাহা শুভ্র হইবে না, তাহা রঙিল

হইবে। কেননা শুভ্র আলোক হইতে পীত আলো বাদ দিলে যে রঙ্ থাকে, তাহা শুভ্র নহে, তাহা বরং নীলের কাছাকাছি। কাজেই, এখন তেলের পর্দ্দাটা নীল রঙ্য়ের বোধ হইবে।

তেলের পর্দ্দা যতই বিছাইয়া পড়ে, ততই উহার স্থূলতা কমে, ততই বিভিন্ন বর্ণের ঢেউ কাটাকাটি করিয়া লোপ পায়, ততই বিচিত্র বর্ণের বিকাশ হয়।

ঢেউয়ে ঢেউয়ে এইরূপ কাটাকাটি হইয়া উভয়েরই লোপে শুভ্র আলোক রঙিল হইয়া যায়, ইহা একরূপ সুপরিচিত ঘটনা। বিস্তর পরিচিত উদাহরণ আছে। মশা, মাছি, ফড়িং প্রভৃতির পালকে অনেক সময় বিচিত্র বর্ণের বিকাশ দেখা যায়। ঝিনুকের গায়ে কত রকম রঙ্ দেখা যায়। এই সকল স্থলে বর্ণবৈচিত্র্য ঐ উর্ম্মিতে উর্ম্মিতে কাটাকাটির ফল। প্রত্যেক ক্ষেত্রে ব্যাখ্যার অবসর নাই। তবে এই পর্য্যন্ত বলা গেল, আলোকে আলোকে আঁধার হয় তাহা অপরিচিত ঘটনা নহে, উহা অহর্নিশ প্রত্যক্ষগোচর হইতেছে। শুভ্র আলোকের অন্তর্গত কোন একটা বর্ণ আঁধারে পরিণত হইলে বাকি যাহা থাকে তাহা রঙিল দেখায়। তাই পূর্ণ অন্ধকার না হইয়া রঙিল আলো দেখা যায়।

আলোকে আলোকে সম্মিলনে পূর্ণ অন্ধকারই যে বিশেষ অপরিচিত ঘটনা তাহাই বা কিরূপে বলি? বরং ইহার চেয়ে পরিচিত ঘটনাই আর নাই। ভাবিয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে, অন্ধকার মাত্রই, ছায়া মাত্রই এই আলোকে আলোকে সম্মিলনের ফল। কিরূপে দেখা যাউক।

শব্দের ঢেউ আছে স্বীকার করিয়াও যাঁহারা আলোকের ঢেউ সম্বন্ধে আপত্তি করিতেন, তাঁহাদের একটা সংশয় ছিল। একটা

প্রদীপ হাতের আড়ালে ঢাকা পড়ে। প্রদীপ কেন ঐ প্রকাণ্ড সূর্য্য, চোখের সামনে হাতখানা রাখিলেই ঢাকা পড়ে। ইহার অর্থ এই যে, আলো সোজা পথে চলে, পাশ কাটিয়া যায় না। শব্দ কিন্তু হাতের আড়ালে ঢাকা যায় না। সম্মুখে সেতার বাজিতেছে হাতের আড়ালে, এমন কি বৃহৎ প্রাচীরের আড়ালে, সেই শব্দকে কাণের অগোচর করা অসাধ্য। শব্দের ঢেউগুলি প্রাচীর লঙ্ঘন করিয়া ঘুরিয়া কাণে আসে। শব্দ সোজা পথে চলে না; উহা অক্লেশে পাশ কাটিয়া চলে। ঘরের বাহিরে প্রদীপের আলো দরজা দিয়া আসিয়া ঘরের কিয়দংশ আলোকিত করে, বাকি অংশ আঁধারে থাকে। কিন্তু বাহিরে বাজনা বাজিলে ঘরের ভিতরে সকল স্থান হইতেই শুনা যায়। আলোকের ছায়া পড়ে, শব্দের ছায়া পড়ে না।

ঢেউয়ের ক্ষমতাই হইতেছে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়া। উহা একদিকে না গিয়া চারিদিকেই যাইতে চায়, কাজেই, শব্দের ব্যবহার বুঝা যায়, কিন্তু আলোকের ব্যবহারে সংশয় জন্মে।

কিন্তু এই সংশয় অমূলক। ইয়ং এবং ফ্রেনেল নূতন করিয়া ঊর্ম্মিতত্ত্বের আলোচনা আরম্ভ করিলে হিসাবে দেখা গেল, শব্দের ব্যবহারে ও আলোকের ব্যবহারে তফাৎ নাই। বহুস্থান হইতে আলোকের ঢেউ আসিলে ঊর্ম্মিতে ঊর্ম্মিতে কাটাকাটির সম্ভাবনা বাড়িয়া যায়। খুব ছোট ছিদ্র দিয়া আলোক আনিয়া দেখা গিয়াছে, আলোক যে সরল পথেই চলে তাহা নহে; পাশ কাটিয়া আশে পাশেও কিছুদূর পর্য্যন্ত আলো দেখা যায়। ছিদ্র যত সরু করা যায়, ততই সেই ছিদ্রকে আড়াল দিয়া ঢাকা কঠিন হইয়া পড়ে। সেই সরু ছিদ্র দিয়া যে ঢেউগুলি আসে, তাহারা যেমন সম্মুখে অগ্রসর হয়, তেমনি ডাহিনে বামে উপরে নীচেও অগ্রসর হয়। আড়াল দিয়া তাহাদের রোধ

করা চলে না। একটা সরু ছিদ্রের বদলে বহু সরু ছিদ্র থাকিলে, অথবা একটা বৃহৎ ছিদ্র থাকিলে এত স্থান হইতে এত ঢেউ আসে যে, তখন উর্ম্মিতে উর্ম্মিতে কাটাকাটিরই ধূম পড়িয়া যায়। তখন কেবল সম্মুখ ভাগের উর্ম্মিগুলিই কোন রকমে কায়ক্লেশে পরিত্রাণ পায়, কিন্তু আশে-পাশে ডাহিনে-বামে উপরে-নীচে যত ঢেউ সব কাটাকাটিতে লোপ পায়। ব্যাপারটা মোটামুটি ভিন্ন সূক্ষ্মভাবে বুঝাইবার এস্থলে উপায় নাই। বস্তুতঃ খড়ি পাতিয়া হিসাব করিলে দেখা যাইবে, বহু ছিদ্রের বা বড় ছিদ্রের অনর্থই এই। আলোকের ঢেউ এত ছোট ও আমাদের দরজা জানালা প্রভৃতির ছিদ্র তাহার তুলনায় এত বড় যে, এই কাটাকাটির ধূমে সম্মুখটা ব্যতীত পাশ দিয়া ঢেউগুলির অস্তিত্ব থাকে না। জানালার সম্মুখটায় খুব উজ্জ্বল আলোক আছে, কিন্তু তৎপার্শ্বেই ছায়া বা আঁধার। আলোকের ঢেউগুলি যদি খুব বড় হইত, অথবা জানালার ছিদ্র খুব ছোট হইত, তাহা হইলে কেবল সম্মুখে কেন সর্ব্বত্রই আলোকের ঢেউ খেলিত। জানালার বাহিরে প্রদীপ থাকিলে ঘরের কোণটুকু পর্য্যন্ত আঁধার হইত না।

শব্দের ঢেউগুলি বৃহৎ; আগে বলিয়াছি, কম্পসংখ্যা ত্রিশের কম হইলে অনেকেরই কাণে শব্দজ্ঞান হয় না। ঐ কম্পে সেকেণ্ডে ১১০০ ফুট মধ্যে ত্রিশটা ঢেউ জন্মায়, এক এক ঢেউএর দৈর্ঘ্য হইল প্রায় ৩৭ ফুট। আবার বলিয়াছি কম্পসংখ্যা ত্রিশ হাজারের বড় বেশী হইলে আর শব্দ কর্ণগোচর হয় না। ঐ কম্পে সেকেণ্ডে ১১০০ ফুট মধ্যে ৩০০০০ ঢেউ জন্মিলে, এক ফুটের মধ্যে ২৭টা ঢেউ থাকে, প্রত্যেক ঢেউয়ের দৈর্ঘ্য আধ ইঞ্চির কিছু কম হয়। তবেই দেখা গেল, শব্দের ঢেউয়ের মধ্যে যাহা সর্ব্বাপেক্ষা ছোট তাহাও আধ ইঞ্চির কাছাকাছি। যাহা খুব বড় তাহার এক এক ঢেউ ৩৭ ফুট বা বার গজের অধিক

লম্বা! আলোকের ঢেউ উহাদের তুলনায় নগণ্য; সমুদ্রের কল্লোলের তুলনায় যেমন জলাশয়ের হিল্লোল, তাহা অপেক্ষাও নগণ্য। আলোকের ঢেউগুলির দৈর্ঘ্য মাপা গিয়াছে। বিস্ময়ের কারণ নাই।

জলের পিঠে তেলের পর্দ্দার বা সাবানের বুদ্‌বুদের স্থূলত্ব কোনরূপে মাপিতে পারিলেই যে ঢেউগুলি ঐ পর্দ্দায় ঠেকিয়া লোপ পায়, তাহাদের দৈর্ঘ্য পাওয়া যাইবে। যদি বল, অত সূক্ষ্ম তেলের আবরণের স্থূলত্বই বা মাপিব কিরূপে? তেলের যে ফোঁটাটা ফেলিয়াছি তাহার আয়তন মাপা কিছু অসাধ্য নহে। এখন সেই আয়তনের তেল জলের উপর কতটা জায়গায় বিস্তৃত হইয়াছে মাপিলেই হিসাবের অঙ্কে তেলের স্থূলত্ব ধরা পড়িবে। অবশ্য এইরূপেই যে আলোর ঢেউগুলির দৈর্ঘ্য নিরূপিত হইয়াছে তাহা নহে। সূক্ষ্মভাবে ঢেউগুলি মাপিবার জন্য নানা সূক্ষ্ম কৌশলের উদ্ভাবনা হইয়াছে। অন্ততঃ মোটামুটি একটা ফল পাওয়া যে সহজেই চলিতে পারে, তাহা সহজে বুঝাইবার জন্য ওকথা বলিলাম। আলোকের ঢেউ সূক্ষ্ম মাপে দেখা গিয়াছে. রক্তবর্ণের আলোর ঢেউ যাহা সব চেয়ে লম্বা তাহা এক ইঞ্চির মধ্যে সাঁইত্রিশ হাজার ও শিম্বী বর্ণের আলোর ঢেউ যাহা সব চেয়ে ছোট তাহা এক ইঞ্চির মধ্যে আরো বেশি স্থান পায়। তবেই দেখ, শব্দের ক্ষুদ্রতম ঢেউগুলির তুলনায় আলোকের ঢেউ কত ছোট। কাজেই, আলোকের নিকট যে সকল ছিদ্র অতি বৃহৎ, শব্দের কাছে সে সকল ছিদ্র ক্ষুদ্র, কাজেই, আলোকের ঢেউ কাটাকাটির যত সুযোগ, শব্দের ঢেউয়ের বেলা তেমন নাই সুযোগ নাই। তাহাতেই আলোকের ছায়া পড়ে, শব্দের ছায়া পড়ে না।

শব্দের ছায়া যে, একেবারে পড়ে না এমন নহে। বৃহৎ দ্বার হইলেই পড়ে। কলিকাতার বড় বড় গলির মোড় দিয়া বিবাহের

রাজনা বাজিয়া গেলে, গলির অধিবাসীরা শব্দের আকস্মিক বিপুলতা বেশ বুঝিতে পারেন। জমকাল শব্দ পরক্ষণেই সহসা যেন থামিয়া যায়। কাজেই, আলোকে আলোকে অন্ধকার অসাধারণ ঘটনা নহে, উহার মত সাধারণ ঘটনা আর নাই। যেখানে ছায়া, যেখানে আঁধার, সেখানেই এই ঘটনা। আলোকের ঢেউগুলি খুব বড় বড় হইলে আমরা অমাবস্যা রাত্রিতেও সূর্য্যালোক পাইতাম। ইহার কল্পনা অযৌক্তিক নহে।

আকাশ

শব্দের ঢেউ ত বায়ু আশ্রয় করিয়া চলে; বায়ু ছাড়া অন্যান্য অনিল তরল কঠিন পদার্থকেও আশ্রয় করিয়া চলে। আলোকের ঢেউ কোন্ পদার্থের আশ্রয়ে চলে? সূর্য্য, পৃথিবী হইতে নয় কোটি মাইলের অধিক দূরে আছেন। নক্ষত্রগুলি আরও দূরে। আলোকের যে এত প্রচণ্ড বেগ, সেকেণ্ডে প্রায় দুই লক্ষ মাইল, ঐ প্রচণ্ড বেগ সত্ত্বেও সূর্য্যের আলো পৃথিবীতে পৌছিতে আট মিনিট সময় লাগে। অধিকাংশ নক্ষত্রের দূরত্ব আমরা জানি না। যে কয়টির দূরত্ব স্থূলতঃ মাপিয়া দেখা হইয়াছে, তাহা কল্পনা করিলে লোমহর্ষ হয়! তন্মধ্যে যেটি সব চেয়ে কাছে সেটি হইতে আলোক আসিতে সাড়ে চারি বৎসর লাগে। যে আলো সেকেণ্ডে প্রায় দুই লক্ষ মাইল বেগে চলে, সেই আলো সাড়ে চারি বৎসরে আসে। এই লোমহর্ষকর পথে এমন কি জিনিস আছে যাহার আশ্রয়ে আলোকের এই ঢেউগুলি এই প্রচণ্ড বেগে ধাবিত হয়?

এই যে ভীষণ পথ ইহাকে আমরা ত শূন্য বলিয়াই থাকি।

আলোক শূন্যপথে চলে, অর্থাৎ যে পথে চলে, সে পথে কিছুই নাই। অথচ এখন দেখিতেছি সেই পথে ঢেউ চলিতেছে, ঢেউ অবশ্য কোন পদার্থকে আশ্রয় করিয়াই ত চলিবে। আলোক যে শক্তির রূপান্তর মাত্র তাহাও পূর্ব্বে দেখা গিয়াছে। সূর্য্য হইতে আলোক বাহির হইয়া কিয়দংশ পৃথিবীতে পড়িতেছে। ইহার অর্থ এই যে, সূর্য্য যে শক্তির রাশি বিতরণ ও বিকিরণ করিতেছেন, তাহার কিয়দংশ আমরা পাইতেছি। এই শক্তি বহন করিতেছে কে! একটা পদার্থ কল্পনা করিতে হইবে। নিউটন সূক্ষ্ম কণিকার কল্পনা করিয়াছিলেন। ঐ কণিকাগুলি ঐ বেগে সূর্য্য হইতে ছুটিয়া আসিতেছে, ইহা বেশ বুঝা যায়। কিন্তু সে অনুমান ত টিকিল না! এখন উপায়?

এখন বৈজ্ঞানিককে কল্পনা করিতে হয় যে, যাহাকে আমরা শূন্য বলিতেছি, তাহা শূন্য নহে। সেই শূন্য ব্যাপিয়া এমন একটা পদার্থ আছে, যাহা এই আলোকের ঢেউ বহন ও সঞ্চালন করিতে পারে। যাহার আশ্রয়ে এই শক্তিরাশি ঊর্ম্মির পর ঊর্ম্মির আকার ধরিয়া চারিদিকে বিকীর্ণ হইতেছে! একটা পদার্থের অস্তিত্ব অনুমান করিতেই হইবে।

আমাদের প্রাচীন দার্শনিকেরা বিশ্বব্যাপী আকাশ বা ব্যোম নামক একটা পদার্থ কল্পনা করিয়াছিলেন। শব্দের ঢেউগুলি ঐ আকাশ বাহিয়া চলে! অনুমান অসঙ্গত বা বিজ্ঞানবিরুদ্ধ ছিল না। কিন্তু সে অনুমান শেষে প্রত্যক্ষবিরুদ্ধ প্রতিপন্ন হইল। বায়ুহীন স্থানে আকাশ আছে, অথচ সে আকাশ দিয়া শব্দ চলে না। আলোকের ঢেউ বুঝাইতেও বিশ্বব্যাপী—বিশ্বব্যাপী না হউক, অন্ততঃ যত দূরের নক্ষত্র আমরা চর্ম্মচক্ষে বা দূরবীণের সাহায্যে দেখিতে পাইতেছি বিশ্বজগতের অন্ততঃ ততদূরব্যাপী একটা পদার্থের কল্পনা আবশ্যক,

এবং সেই পদার্থকে সেই পুরাতন "আকাশ" নামে অভিহিত করিতেও হানি নাই। তবে বুঝিতে হইবে, এই আকাশ শব্দের ঢেউ বহন করে না, উহা আলোকের ঊর্ম্মি বহন করে।

এই আকাশ-পদার্থ অবশ্য অনুমানলব্ধ। এই অনুমান যদি কখনও প্রত্যক্ষ ঘটনায় বিরোধী প্রতিপন্ন হয় তখন উহাকে নির্ম্মমভাবে ত্যাগ করিতেই হইবে। কিন্তু যতক্ষণ তাহা না হইতেছে বৈজ্ঞানিক উহাকে ছাড়িবেন না। নহিলে আলোকের গতিবিধি ব্যবহার বুঝা যায় না। উহাতে নানাবিধ অদ্ভুত অসাধারণ ধর্ম্ম আরোপ করিতে হয়। বৈজ্ঞানিকের তাহাতে কিছুমাত্র আপত্তি নাই। কেন না জগতে এটা সম্ভব ওটা অসম্ভব ইহা বলিবার অধিকার কাহারও নাই। যতই অসাধারণ হউক, উহা অঙ্গীকার করিতে বৈজ্ঞানিক কিছুমাত্র দ্বিধা বা সঙ্কোচ করেন না। এককালে নিউটনের অনুমিত সূক্ষ্ম কণিকা যাহার ওজন নাই অথচ যাহা মহাবেগে চলে, তাহা বৈজ্ঞানিক মানিয়া লইতেন। উহা এখন প্রত্যক্ষবিরুদ্ধ হওয়ায় ঐ অনুমান ত্যাগ করিয়া এই আকাশ-পদার্থের আশ্রয় লইয়াছেন।

এই অনুমানলব্ধ আকাশ-পদার্থটা বস্তুতঃই কিম্ভূতকিমাকার পদার্থ। ইহা মহাশূন্য ব্যাপিয়া বর্ত্তমান। অনিলে তরলে কঠিনে সর্ব্বত্রই "ওতপ্রোত" ভাবে বর্ত্তমান। অন্ততঃ স্বচ্ছ পদার্থ মাত্রেই, যাহার ভিতর দিয়া আলোক অক্লেশে সঞ্চরণ করে তাহাদের সকলের অভ্যন্তরেই বর্ত্তমান। বায়ু জল কাচ হীরার ত কথাই নাই। সোনা রূপা তামার ভিতরেও আছে, কেন না সোনারূপার সূক্ষ্ম পাতের মধ্য দিয়া আলোক না চলিতে পারে এমন নহে। মনে করা যাইতে পারে যে, অণু ও পরমাণু সকলের মধ্যে যে ফাঁক আছে, সেই ফাঁকের মধ্যে এই আকাশ আছে, তবে অণু-পরমাণুর মধ্যেও আছে কিনা তাহা বলা

কঠিন। তবে অণু-পরমাণুগুলি এই আকাশে হয়ত কোনরূপ বিকার উৎপাদন করে; নতুবা নিবিড় পদার্থের মধ্যে গিয়া আলোকের গতির মুখ ফিরিয়া যাইবে কেন। আকাশ ত বিশ্বব্যাপী হইল। কিন্তু উহা অনিল তরল কঠিন এই তিন অবস্থার মধ্যে কোন অবস্থাতেই নাই। যে সকল জিনিসের স্থিতিস্থাপকতা খুব বেশী, উর্ম্মির বেগ তাহার ভিতরেই বেশী হয়। অনিলের চেয়ে তরলের, তরলের চেয়ে কঠিনের স্থিতিস্থাপকতা অধিক, তাই শব্দের ঢেউ অনিল অপেক্ষা তরলে, তরল অপেক্ষা কঠিনে অধিক বেগে চলে ইহা প্রত্যক্ষ ঘটনা। আকাশ-পদার্থে ঢেউগুলি অতি ভীমবেগে চলে, ইহাতে ইহার স্থিতিস্থাপকতা যে অত্যন্ত অধিক তাহাই অনুমান হয়। কাজেই, আকাশকে বরং কঠিন পদার্থের সদৃশ মনে করা চলে, উহা তরল বা অনিল পদার্থ মনে করা চলে না। আকাশকে কঠিন পদার্থ মনে করিবার আরও একটি হেতু আছে, সেটি সহজ বুঝাইতে পারিব না বলিয়া এখানে তুলিলাম না। সেই হেতু-দৃষ্টে পদার্থবিৎ পণ্ডিতেরা উহাকে অনেক বিষয়ে কঠিন পদার্থের সদৃশই ধরিয়াছেন। অথচ এই মহা কঠিন নিরেট পদার্থ ভেদ করিয়া গ্রহ-উপগ্রহ হইতে জলবায়ু পর্য্যন্ত অবাধে চলিয়া যাইতেছে; কোনরূপ বাধার প্রমাণ এ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই, ইহাই বিস্ময়কর। বিস্ময়কর, কেন না কাঠ পাথর লোহা ভেদ করিয়া চলা যায় না; অথচ উহাদের চেয়েও কঠিন আকাশ ভেদ করিয়া সকলেই চলিতেছে। বিস্ময়কর হইলেও উহা মানিতে হইবে, কেননা, বৈজ্ঞানিক অনুমানে সকলই সম্ভব। যেটুকু দরকার সেই টুকুই অনুমান করিতে হইবে। লোহার জাল জলের মধ্য দিয়া ঠেলিয়া চালাইলে জল ঐ জালের ফাঁক দিয়া গলিয়া যায়; কিন্তু লোহার পাত ঐরূপে ঠেলিলে জল সমেত ঠেলিয়া চলে। হয়ত

সাধারণ জড়পদার্থ আকাশ-মধ্যে চলিবার সময়, আকাশকে ঠেলিয়া চলে না; আকাশ উহার অণু-সমূহের মধ্যে ফাঁক দিয়া গলিয়া যায়। কঠিন পদার্থের অণু-সমূহের মধ্যেও ব্যবধান আমাদের চর্ম্মচক্ষুর অগোচর হইলেও উহা আকাশের মত বিশ্বব্যাপী পদার্থের নিকট অগ্রাহ্য নহে, কাজেই, নিরেট লোহাও আকাশের নিকট লোহার জালের মত। বস্তুতঃ জড়পদার্থ আকাশকে ঠেলিয়া সঙ্গে লইয়া চলে অথবা জালের মত উহাকে ফেলিয়া দিয়া চলে, তাহার প্রমাণ সংগ্রহের অনেক চেষ্টা হইয়াছে, কিন্তু শেষ উত্তর আজিও মেলে নাই। বস্তুতঃ এই কিম্ভূতকিমাকার আনুমানিক পদার্থকে জড়পদার্থ বলিব কি না, তাহা লইয়া ঘোর তর্ক চলিতে পারে। খুব সম্ভব ইহার ওজন নাই। অন্ততঃ ওজন আছে মনে করিবার কোন হেতু পাওয়া যায় নাই। কিন্তু ওজন না থাকিলেও জড়ত্ব থাকিতে পারে। পূর্ব্বে দেখিয়াছি, এক দ্রব্যের ওজন অন্য দ্রব্যের অবস্থিতি ও দূরত্ব-সাপেক্ষ। পার্থিব দ্রব্যের ওজন পৃথিবীর কেন্দ্র হইতে দূরত্ব-সাপেক্ষ। দূরত্ব-বৃদ্ধিতে ওজন কমিয়া যায়। কাজেই, ওজন-বর্জ্জিত জড়পদার্থের কল্পনা কিছু অসাধ্য নহে। কিন্তু জড়পদার্থের যে ধর্ম্মটাকে বস্তু আখ্যা দেওয়া গিয়াছে ও যাহাকে জড়ের জড়ত্ব বলা গিয়াছে, আকাশের সেই বস্তু বা জড়ত্ব আছে কি না তাহা লইয়াও তর্ক উঠিতে পারে। ফ্রেনেলের নাম পূর্ব্বে করিয়াছি, তিনি আকাশ মধ্যে ঊর্ম্মির উৎপত্তি বুঝাইতে আপন অসামান্য ধীশক্তি প্রয়োগ করিয়াছিলেন। তিনি ধরিয়া লইয়াছেন যে, আকাশের বস্তু আছে, অর্থাৎ গণিতের ভাষায় অন্যান্য জড়পদার্থ যেমন গতিশীল হইলে উহার গতির বেগকে বস্তুর মাত্রা দিয়া গুণ করিলে উহার ঝোঁক পাওয়া যায়, ও ঝোঁকের মাত্রাকে বেগের মাত্রা দিয়া আবার গুণ করিয়া তাহার অর্দ্ধেক লইলে

তাহার ব্যক্ত-শক্তির পরিমাণ পাওয়া যায়, সেইরূপে আকাশের বস্তু আছে মনে করিয়া ও উহার কণিকাগুলিকে গতিবিশিষ্ট মনে করিয়া উহার ঝোঁক ও উহার অন্তর্নিহিত ব্যক্ত-শক্তির পরিমাণ নির্ণীত হইতে পারে। সেই ব্যক্ত-শক্তিই আবার জড়পদার্থে সংক্রান্ত হইলে জড়পদার্থে তাপের উৎপত্তি হয়। ইহা বেশ সঙ্গত অনুমান। কিন্তু ইদানীন্তন কালে ক্লার্ক নামক অন্যতর মনীষী দেখাইয়াছেন, আকাশ পদার্থের বস্তুর মাত্রা স্বীকার না করিয়াও অন্য কোন একটা ধর্ম্মের আরোপ দ্বারা উহার ব্যক্ত-শক্তির পরিমাণ চলিতে পারে। তাহাই যদি হয় তবে যে বস্তু-ধর্ম্মকে আমরা জড়ের জড়ত্ব বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি, আকাশ পদার্থের সেই জড়ত্ব-স্বীকারও নিতান্ত আবশ্যক নহে। তবে যাঁহারা বলেন, যাহা শক্তির বহনে সমর্থ, ও যাহার দেশ-ব্যাপকতা আছে, তাহাকেই আমরা জড়পদার্থ বলিব; উহাতে বস্তু থাক আর নাই থাক। তাহা হইলে আকাশকে জড়পদার্থ বলা না চলিবে এমন নহে। অর্থাৎ জড়পদার্থের প্রচলিত পারিভাষিক অর্থটাকে পরিবর্ত্তন করিয়া উহার আরও ব্যাপক অর্থ দিলে আকাশকে জড়পদার্থ বলা যাইতে পারে। অবশ্য এইরূপে শব্দের অর্থ পরিবর্ত্তন করিয়া লইয়া যে কোন অজড়কে আমরা জড়ের পর্য্যায়ে ফেলিতে পারি। উহা লইয়া তর্কে প্রবৃত্ত হইলে কেবল বাগ্‌বিতণ্ডা ও অনর্থক কথা-কাটাকাটি জন্মে মাত্র। কাজেই, জোর করিয়া জড় শব্দটিকে খুব ব্যাপক অর্থে প্রয়োগ করিয়া আকাশকে জড়পদার্থ মনে করিতে কোন আপত্তি নাই। কিন্তু উহা কিম্ভূত-কিমাকার জড়পদার্থ, অন্য পরিচিত জড়ের সহিত উহার নানা লক্ষণে বৈসাদৃশ্য আছে, তাহা মানিতেই হইবে। আকাশ জড় কিন্তু কিম্ভূতকিমাকার জড়।

অদৃশ্য আলোক

কম্পমান তন্ত্রী বা পটহ্ হইতে যেমন উর্মিমালা নির্গত হইয়া পার্শ্বস্থ বায়ুরাশি আশ্রয় করিয়া কাণে আঘাত করে, তাহার ফল শব্দজ্ঞান। সেইরূপ অনিল, তরল, কঠিনের কম্পমান অণু হইতে উর্মিমালা নির্গত হইয়া আকাশ নামক কিম্ভূতকিমাকার জড়পদার্থে উর্মিমালার উৎপাদন করে ও তাহা চোখে আঘাত করিলে ফল হয় আলোকের জ্ঞান। শব্দের উর্মি বায়ুমধ্যে সেকেণ্ডে ১১০০ ফুট বেগে চলে, আলোকের উর্মি আকাশমধ্যে ১৮৭০০০ মাইল বেগে চলে। শব্দের ঢেউগুলি ছোট-বড় আছে। খুব বড় ঢেউগুলির দৈর্ঘ্য ৩৭ ফুট। আলোকেরও ছোট-বড় ঢেউ আছে। বড় ঢেউগুলির দৈর্ঘ্য $\frac{২৭১}{১০০০০০০০}$ ইঞ্চি। সেকেণ্ডে কত ঢেউ চোখে আঘাত করিলে আলোকের জ্ঞান হয়, একটা হিসাব করা যাক। দীপশিখার পীতবর্ণের আলোকের ঢেউগুলির দৈর্ঘ্য $\frac{২৩২}{১০০০০০০০}$ ইঞ্চি। এক সেকেণ্ডে যত ঢেউ জন্মে উহারা সারি বাঁধিয়া দাঁড়াইলে ১৮৭০০০ মাইল জায়গা হয়। ঐ স্থান মধ্যে প্রায় ৪৪০০০ ঢেউ দাঁড়াইবে। কি ভীষণ! দীপশিখা হইতে আলোকের ঢেউ সেকেণ্ডে ৪৪০০০ বার আসিয়া চোখে ধাক্কা দিতেছে, যাহার ফলে পীতবর্ণের জ্ঞান। ঐরূপ ৪৪ হাজারের কিছু কম ধাক্কায় রক্তবর্ণের ও তাহারই কিছু বেশি ধাক্কায় শিম্বীবর্ণের জ্ঞান হয়। বিশ্বাস করা কঠিন, কিন্তু আলোককে উর্মিপ্রবাহ বলিয়া মানিয়া লইলে, উহা না মানিলে উপায় নাই।

এখন প্রশ্ন উঠিতে পারে, অদৃশ্য আলোক আছে কি না। শ্রবণাগোচর শব্দের কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। তন্ত্রীর কম্পসংখ্যা সেকেণ্ডে ত্রিশের কম বা ত্রিশ হাজারের অধিক হইলে বায়ুতে উর্মি জন্মে সন্দেহ নাই, কিন্তু সেই উর্মির আঘাতে শ্রবণেন্দ্রিয়ে শব্দজ্ঞান জন্মে

না। উহা শ্রবণেন্দ্রিয়ের অতীত। যাহা শোনা যায় না তাহাকে শব্দ বলা চলে না; কাজেই, শ্রবণের অগোচর শব্দ প্রলাপোক্তি। উহা বন্ধ্যাপুত্রের মত নিরর্থক শব্দ; তবে বায়ুর মধ্যে উর্ম্মি আছে —যাহা শব্দজ্ঞান জন্মায় না ইহা সত্য কথা। সেইরূপ, যাহা দেখা যায় না তাহাকে আলোক বলিতে পারি না, কাজেই, অদৃশ্য আলোক বন্ধ্যাপুত্রের মত প্রলাপবাক্য। তবে আকাশের মধ্যে এত ছোট বা এত বড় উর্ম্মি আছে কি না, যাহা অন্যান্য উর্ম্মির মতই বেগে ছুটিয়া থাকে, কিন্তু চক্ষুতে আঘাত করিলে আলোকের জ্ঞান জন্মায় না? এই প্রশ্ন নিরর্থক নহে। বস্তুতই এইরূপ আকাশোর্ম্মি রহিয়াছে। সূর্য্যালোকের আকাশে ছোট-বড় নানা ঢেউ, কেহ বা রক্তবর্ণের, কেহ বা নীলবর্ণের, কেহ বা শিম্বীবর্ণের আলোক-জ্ঞান জন্মায়। সেইরূপ উহাদের সঙ্গে সঙ্গে আরও ছোট এবং আরও বড় ঢেউ থাকে —যাহারা কোন বর্ণেরই জ্ঞান জন্মায় না, ঐ-সকল ঢেউ দর্শনেন্দ্রিয়ের অবিষয়, কিন্তু অন্যরূপে উহাদিগকে প্রত্যক্ষ ফল দিতে দেখা যায়। কয়লাতে বা অন্য দ্রব্যে পতিত হইলে ইহাদের শক্তি তাপে পরিণত হয়। এমন কি, যে সকল উর্ম্মি রক্তবর্ণপ্রদ উর্ম্মির চেয়ে বড়, তাহারা দৃষ্টির সহায় নহে, কিন্তু তাহাদের তাপজনকতা বরং অধিক। আবার যে সব উর্ম্মি শিম্বীবর্ণপ্রদ উর্ম্মির চেয়ে ছোট, তাহারাও দৃষ্টির সহায় নহে, কিন্তু তাহাদেরও তাপজনন-ক্ষমতা আছে, তবে অপেক্ষাকৃত অল্প। তাপজনন-ক্ষমতা অল্প বটে, কিন্তু আর একটি ক্ষমতা উহাদের বেশী। রূপাঘটিত যৌগিক পদার্থ আলোকের শক্তিতে বিশ্লিষ্ট হয় ও বিকৃত হয়, আলোকের এই শক্তি আছে বলিয়াই ফটোগ্রাফী বা আলোকচিত্র; রূপা-ঘটিত পদার্থকে বিকৃত করিবার ক্ষমতা বরং ঐ ছোট ছোট উর্ম্মিগুলিরই বেশী। কাজেই, ফটোগ্রাফের পক্ষে উহাদের

উপযোগিতাই অধিক। সূর্য্যের আলোকের কিরণগুচ্ছ কাচের কলমে বিশ্লিষ্ট করিলে রক্ত-আলোকের ঊর্ম্মির পাশ দিয়া তার চেয়ে বড় বড় ঊর্ম্মি যায়। চোখের সঙ্গে তাহাদের সম্পর্ক নাই, কিন্তু তাপমান যন্ত্রে তাহাদের তাপজনকতা প্রকাশ পায়। আবার শিম্বী আলোকের ঊর্ম্মির পাশ দিয়া আরও ছোট ছোট ঊর্ম্মি চলে, তাহারাও দর্শনসহায় নহে, কিন্তু রূপা-ঘটিত পদার্থের বিকার-উৎপাদনে তাহারা ধরা পড়ে।

আলোকের ঊর্ম্মির চেয়েও ছোট এবং বড় ঊর্ম্মি আকাশে চলে। ঊর্ম্মি কত ছোট হইতে পারে ও কত বড় হইতে পারে, তাহার সীমা-নির্দ্দেশ দুরূহ। সূর্য্যের আলোক, তপ্ত চূর্ণের শুভ্র আলোক, বৈদ্যুতিক আলোক বিশ্লেষণ করিয়া দেখা গিয়াছে, সর্ব্বত্রই এইরূপ দৃষ্টির অসহায় ছোট-বড় ঊর্ম্মি, দৃষ্টির সহায় ছোট-বড় ঊর্ম্মির সঙ্গে থাকে। উহাদের অস্তিত্বে সন্দেহ নাই, তবে উহাদের ক্ষুদ্রত্বের বা বৃহত্ত্বের সীমা-নির্দ্দেশ এখনও হয় নাই। আমরা এখনও বলিতে পারি না যে, আকাশের ঊর্ম্মি ইহার চেয়ে ছোট আর নাই, বা ইহার চেয়ে বড় আর নাই। পরের অধ্যায়ে দেখা যাইবে, আকাশের মধ্যে দুই দশ ইঞ্চি হইতে দুই পাঁচ গজ দীর্ঘ ঊর্ম্মি অক্লেশে উৎপাদন করা চলে।

একটা লৌহপিণ্ড তাপযোগে ক্রমশঃ উষ্ণ হয়। উষ্ণ হয়, কিন্তু আলোক দেয় না। উষ্ণতার বৃদ্ধিসহকারে শেষে আলোক দিতে আরম্ভ করে। প্রথমটা গরম হইয়া রাঙা হয়, আরও গরম হইলে রাঙা আলো পীতাভ, এবং আরও অধিক উষ্ণ হইলে শেষ পর্য্যন্ত ধপ্‌ধপে শুভ্র দেখায়। কেবল লৌহপিণ্ড কেন? ইহাই সাধারণ নিয়ম।

উষ্ণদ্রব্য মাত্রই চারিদিকের আকাশে ঊর্ম্মির সৃষ্টি করে। ঐ ঊর্ম্মি সকল সারি ধরিয়া সেকেণ্ডে ১৮৭০০০ মাইল বেগে আকাশ বাহিয়া

ধাবিত হয়। কোন জড়পদার্থে পতিত হইলে কতক সেই পদার্থের পৃষ্ঠ হইতে প্রতিহত হইয়া প্রতিফলিত বা বিক্ষিপ্ত হয়, কতক উহার মধ্যে প্রবেশ করে। প্রবেশ করিয়া হয় উহাকে ভেদ করিয়া ওধারে বাহির হইয়া যায়, নতুবা ঐ জড়পদার্থে আটকান পড়ে। যেগুলি আটকান পড়ে, তাহাদের শক্তি তাপে পরিণত হয়, সেই জড়পদার্থটাও উত্তপ্ত ও উষ্ণ হইয়া উঠে। উষ্ণ দ্রব্য হইতে এইরূপে উর্ম্মি ক্রমাগতই বাহির হইতে থাকে, প্রত্যেক উর্ম্মির সহিত কিঞ্চিৎ শক্তি বাহির হইয়া যায়, উষ্ণ দ্রব্যের তাপও এইজন্য কমিতে থাকে। যে কোন গরম জিনিস সম্পূর্ণ বায়ুহীন দেশে থাকিলেও ক্রমশঃ শীতল হয়; উহার কারণই এই। উহার শক্তি ক্রমাগত বাহির হইয়া যাইতেছে, কাজেই, উহার তাপের ক্ষয় দেখা যায়।

এখন একবার গোড়ার দিকে হঠিয়া যাইতে হইবে। আমরা দেখিয়াছি তাপকে কোন পদার্থে আবদ্ধ করিয়া রাখা চলে না; উহাকে আট্‌কাইয়া রাখা দায়। গরম জিনিসকে গরম রাখা কঠিন। উহা কেবলই ঠাণ্ডা হইবার চেষ্টা করিতেছে। তাপ কেবলই উহা হইতে বাহির হইয়া পলাইতেছে। তাপের নির্গমের প্রকার-ভেদ আছে। ধাতু পদার্থের একটা দিক তপ্ত করিলে অন্য দিক ক্রমে তপ্ত হয়। এখানে তাপ সেই ধাতুর গা বাহিয়া উষ্ণ স্থান হইতে শীতল স্থানে চলে। এই প্রক্রিয়ার নাম দেওয়া গিয়াছে **তাপের পরিচালন**। কঠিন, তরল, অনিল যাবতীয় পদার্থেরই তাপ-পরিচালনের ক্ষমতা আছে; কাহারও কম, কাহারও বেশী; ধাতু পদার্থের খুব বেশী। কাঠ, কাগজ, রেশম, পশম, জল, বায়ুর তদপেক্ষা কম। জল-বায়ুর তাপ-পরিচালন ক্ষমতা অল্প বটে, কিন্তু উহারা আবার অন্য উপায়ে তাপ

সঞ্চালন করে। অন্য দ্রব্যের তাপ লইয়া জল ও বায়ু নিজে উষ্ণ হয়। উষ্ণ হয়, আর হাল্‌কা হয়, আর উপরে উঠে। সেই তাপ নিজের কাঁধে চাপাইয়া উপরে উঠে। তাহার স্থানে শীতল জল বা শীতল বায়ু আসে; সেও আবার তাপ গ্রহণ করিয়া উষ্ণ হয় ও হাল্‌কা হয় ও উপরে উঠে। তরল ও অনিল পদার্থ পরিচালনের ক্ষমতার অল্পতা সত্ত্বেও এইরূপে তাপ গ্রহণ করিয়া সরিয়া যায়, তজ্জন্য যে সকল উষ্ণ দ্রব্য তরলপদার্থে বা অনিলে মগ্ন থাকে, তাহারা শীঘ্র শীতল হইয়া পড়ে। তাপক্ষয়ের এই দ্বিবিধ উপায়ের সবিস্তার বিবরণ আগে দিয়াছি। কিন্তু আর একটা উপায় আছে তাহা পূর্ব্বে কেবল উল্লেখ করিয়া রাখিয়াছি মাত্র। সম্পূর্ণ শূন্য দেশের মধ্য দিয়াও তাপ সঞ্চালিত হইতে দেখা যায়। বায়ু-নিষ্কাশন যন্ত্র দ্বারা কোন পাত্রের অভ্যন্তর বায়ু-শূন্য করা গেল। এই শূন্য প্রদেশে গরম জিনিস রাখিলে উহাও ক্রমশঃ শীতল হয়। উহার তাপ বাহির হইয়া যায়। কোন্ পদার্থকে আশ্রয় করিয়া বাহির হয়? এখানে পরিচালনের দ্বারা ঠাণ্ডা হইবার চেষ্টা করিতেছে। তাপ কেবলই উহা হইতে বাহির হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। কোন তরল বা অনিলও পার্শ্বে নাই যে তাহার আশ্রয়ে তাপ নির্গত হইবে। অথচ তাপ নির্গত হয়। এই শূন্য প্রদেশে কিছুই নাই—গোটাকতক বায়ুর অণু অবশিষ্ট থাকিতে পারে, কিন্তু তাহারা আর কতটুকু তাপ লইয়া যাইবে। ওখানে আছে কেবল আকাশ; ঐ আকাশের আশ্রয়েই অবশ্য তাপ বাহির হয়। আকাশে ঊর্ম্মি উৎপাদন করিয়া বাহির হয়। তপ্ত দ্রব্যে যে তাপ আছে উহা তাপ, উষ্ণতা উহার লক্ষণ, উহা শক্তির মূর্ত্তিভেদ। মনে করিয়া লইতে হয় উষ্ণ পদার্থের অণুগুলি কম্পনশীল। প্রত্যেক অণু সেকেণ্ডে কোটি কোটি বার কাঁপিতেছে। প্রত্যেক কম্পে পার্শ্ববর্ত্তী

আকাশে একটি করিয়া উর্ম্মি জন্মিতেছে; এক সেকেণ্ডে বহু কোটি উর্ম্মি জন্মিতেছে, সেই উর্ম্মিগুলি আকাশকে আশ্রয় করিয়া মহাবেগে, সেকেণ্ডে ১৮৭০০০ মাইল বেগে ধাবিত হইতেছে। প্রত্যেক উর্ম্মি তপ্ত জড়পদার্থের কিঞ্চিৎ শক্তি বহন করিয়া লইয়া যাইতেছে। এইরূপে প্রত্যেক সেকেণ্ডে বহু কোটি উর্ম্মির সহিত খানিকটা শক্তি বাহির হইয়া যাইতেছে। শক্তি যখন তপ্ত দ্রব্যে নিহিত ছিল, তখন উহার লক্ষণ ছিল উষ্ণতা, তপ্ত দ্রব্য মাত্রই উষ্ণ। প্রত্যেক অণু কম্পমান, কাজেই, উহা শক্তিমানও বটে। এই শক্তি আকাশে সঞ্চারিত হয়। আকাশ জড়পদার্থ নহে, অন্ততঃ পরিচিত অন্যান্য জড় পদার্থের সহিত উহার বিশেষ কোন সাদৃশ্য নাই। আকাশের অণু পরমাণু কল্পনার প্রয়োজন নাই। আকাশ দিয়া কেবল উর্ম্মি চলে মাত্র। প্রত্যেক উর্ম্মি খানিকটা করিয়া শক্তি লইয়া যায়। ঐ শক্তি কিন্তু তাপ নহে। তাপের প্রধান লক্ষণই উষ্ণতা। তপ্ত দ্রব্য উষ্ণ; উহার তাপও শক্তি। কিন্তু আকাশ-বাহিত উর্ম্মিতে যে শক্তি আছে সে শক্তি তাপ নহে; উহার লক্ষণ উষ্ণতা নহে। তপ্ত দ্রব্য উষ্ণ: কিন্তু যে আকাশ বাহিয়া উর্ম্মি চলিতেছে সেই আকাশ উষ্ণ হয় না। আকাশের উষ্ণতার কোন প্রমাণ নাই। তবে সেই উর্ম্মিসমূহ আকাশ কর্ত্তৃক বাহিত ও সঞ্চালিত হইয়া যখন অন্য কোন জড় পদার্থে কঠিন, তরল বা অনিল পদার্থে পতিত হয়, তখন সেই পদার্থের অণুগুলি সেই আকাশোর্ম্মিগুলির শক্তি চুরি করে, হরণ করে। সেই আকাশোর্ম্মিসমূহে নিহিত শক্তি গ্রহণ করিয়া আপন অণুগুলিকে কাঁপাইতে থাকে। অণুগুলি কাঁপিতে আরম্ভ করিলে এই জড় পদার্থই তখন উষ্ণ হয়। উভয়ের শক্তি তখন তাপে পরিণত হয়, কেননা তাপের লক্ষণ উষ্ণতা।

আর একবার আবৃত্তি করা যাউক। এই সকল সূক্ষ্ম কথা পুনঃপুনঃ আবৃত্তি ব্যতীত স্পষ্ট হয় না। উষ্ণ দ্রব্যের অণু সকল কম্পনশীল, কম্পমান অণুতে নিহিত শক্তির নাম তাপ, উহার লক্ষণ উষ্ণতা। কম্পনশীল তন্ত্রী বা পটহ যেমন বায়ুতে উর্ম্মির সৃষ্টি করে, কম্পমান অণু সকল তেমনি আকাশে উর্ম্মির উৎপাদন করে। কিন্তু আকাশ উষ্ণ হয় না। আকাশ শক্তি বহন করে বটে; উর্ম্মি দ্বারা শক্তি বহন করে, কিন্তু উহা স্বয়ং উষ্ণ হয় না। কাজেই, আকাশের উর্ম্মিতে যে শক্তি নিহিত, তাহাকে তাপ বলা চলে না। উহা শক্তির অন্যবিধ রূপ। শক্তির নানা রূপ, উষ্ণ দ্রব্যের তাপ একটা রূপ। আকাশবাহিত উর্ম্মিচালিত শক্তি অন্য একটা রূপ। এই উর্ম্মি মহাবেগে আকাশ বাহিয়া চলে। অন্য যতক্ষণ কোন জড় দ্রব্য সম্মুখে না পড়ে, ততক্ষণ কেবল চলে আর চলে, জড় দ্রব্য সম্মুখে পড়িলে তাহার পৃষ্ঠে লাগিয়া প্রতিহত বা প্রতিফলিত হইতে পারে। প্রতিহত হইলে আর সেই জড় দ্রব্য সেই শক্তি হরণ করিবার অবসর পায় না। কিন্তু যদি প্রতিহত না হয়, উর্ম্মিগুলি জড় দ্রব্যের অভ্যন্তরে, অর্থাৎ উহার অভ্যন্তরস্থ আকাশে প্রবেশ করে তখন জড় দ্রব্যের অণুগুলি সেই আকাশোর্ম্মিবাহিত শক্তি হরণ করিবার সুবিধা পায়। প্রত্যেক অণু কিঞ্চিৎ শক্তি চুরি করে বা হরণ করে। কয়লার মত জিনিস সমুদায় শক্তিটাই হরণ করে। কাচের মত বা জলের মত জিনিস কতকটা করে। শক্তি হরণ করিয়া অণুগুলি কাঁপিতে থাকে, অণু কম্পিত হইলেই তখন সেই জড় দ্রব্য উষ্ণ হয়, আর তখন আবার বলা হয় সেই উর্ম্মিচালিত শক্তি পুনশ্চ তাপে পরিণত হইয়াছে। শক্তি ছিল একটা দ্রব্যে তাপরূপে। সেই শক্তি সেই দ্রব্য ত্যাগ করিয়া আকাশে সংক্রান্ত হইল, তখন উহা আর তাপ রহিল না, তার

পর আবার কয়লার মত জড় দ্রব্যে পতিত হইয়া আবার তাপে পরিণত হইল। বৈজ্ঞানিক বলেন, শক্তির ধ্বংস হয় না, নাশ হয় না, উহা কেবল মূর্ত্তি পরিবর্ত্তন করে মাত্র।

এখন দেখা গেল, তাপ ক্ষয়ের তিনটা উপায় আছে। পরিচালক জড়পদার্থের মধ্য দিয়া তাপ পরিচালিত হয়; তাপ, তাপরূপেই উষ্ণ স্থান হইতে অনুষ্ণ স্থানে চলে। তরল ও অনিল পদার্থের প্রবাহ বা স্রোত জন্মাইয়া তাপ সেই স্রোতের সঙ্গে চলে, কেহ কেহ এই ঘটনার নাম দিয়াছেন **পরিবাহ**। স্রোত আর ঢেউ এক নহে, ইহা যেন স্মরণ থাকে। তাপক্ষয়ের তৃতীয় উপায় আকাশে উর্ম্মি-উৎপাদন। তার পর শক্তি আকাশ কর্ত্তৃক বাহিত হইয়া ও মহাবেগে ধাবিত হইয়া অন্য জড়পদার্থে আবার তাপে পরিণত হয়।

আকাশ-পথে যে উর্ম্মি চলে তাহার সকলেরই বেগ সমান, কিন্তু সকলে সমান দীর্ঘ নহে। কম্প-সংখ্যা অনুসারে কোন উর্ম্মি ছোটা, কোন উর্ম্মি বড়। যেগুলি উহারই মধ্যে অপেক্ষাকৃত বড়, সেগুলি চোখে পড়িলে আলোক-জ্ঞান জন্মায় না, যেগুলি আবার খুব ছোট সেগুলিও চোখে পড়িলে আলোক-জ্ঞান জন্মায় না। মাঝারি উর্ম্মি-গুলি চোখে পড়িয়া আলোক-জ্ঞান জন্মায়, ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের আলোকের জ্ঞান জন্মায়। কেহ রক্ত, কেহ পীত, কেহ হরিৎ ইত্যাদি। রক্ত পীত হরিৎ ইত্যাদি সকল বর্ণের উৎপাদক উর্ম্মি এক সঙ্গে চোখে পড়িলে শুভ্র বর্ণের জ্ঞান জন্মায়। রক্ত হইতে শিম্বী পর্য্যন্ত সকল উর্ম্মি এক সঙ্গে পড়িলে শুভ্র বর্ণের জ্ঞান জন্মায়। কতিপয় বর্ণের অভাব ও অবশিষ্ট বর্ণের সদ্ভাব হইলে পাটল, কপিশ, ধূমল প্রভৃতি নানা অবিশুদ্ধ বর্ণের জ্ঞান জন্মায়।

আকাশের সকল উর্ম্মি আলোকের জ্ঞান জন্মাইতে পারে না।

যেমন বায়ুচালিত সকল ঊর্ম্মি শব্দজ্ঞান জন্মায় না, সেইরূপ। তবে জড় দ্রব্যে পতিত ও তৎকর্ত্তৃক অপহৃত হইয়া তাপের উৎপাদন সকলেই করিতে পারে। এই জন্য আলোক-জননের ক্ষমতা না থাকিলেও ঐ সকল দর্শনের অসহায় ঊর্ম্মির অস্তিত্ব আমরা ধরিতে পারি। আবার রৌপ্যজ যৌগিক পদার্থে বিকারোৎপাদনের শক্তিও অল্প-বিস্তর মাত্রায় থাকাতে ঐ সকল ঊর্ম্মির অস্তিত্ব তদ্দ্বারাও ধরিতে পারা যায়।

লোহার. পিণ্ড তপ্ত করিলে ক্রমে উষ্ণ হয়। উষ্ণ হয় কিন্তু দৃষ্টি-গোচর হয় না। আঁধার ঘরে তপ্ত লোহা দেখা যায় না, অথচ উহার অণুসকল কম্পনশীল ও সেই কম্পমান অণু পার্শ্বের আকাশে অবিরত ঊর্ম্মির সৃষ্টি করিতেছে। সেই ঊর্ম্মি আমাদের চোখেও পড়িতেছে অথচ দর্শনজ্ঞান জন্মাইতেছে না। গায়ের চর্ম্মে পড়িতেছে, পড়িয়া তাপের উৎপাদন করিয়া উষ্ণতা জন্মাইতেছে; তাই আমরা আঁধার ঘরে তপ্ত লোহা চোখে না দেখিলেও আমাদের ত্বগিন্দ্রিয়ের সাহায্যে কতকটা টের পাই। উষ্ণতা বৃদ্ধি সহকারে তখন আরও নূতন নূতন, আরও ছোট ছোট ঊর্ম্মি উৎপাদন করিতে থাকে, সেই নূতন ছোট ঊর্ম্মিগুলি চোখে পড়িয়া আলোক-জ্ঞান জন্মাইতে থাকে। তখন তপ্ত লোহা রাঙা দেখায়। আরও উষ্ণতা বৃদ্ধির সহিত আরও ছোট ছোট ঊর্ম্মি যাহাতে পীত হরিৎ নীল বর্ণের জ্ঞান জন্মায় সেই সকল ঊর্ম্মির সৃষ্টি করিতে থাকে। তখন লোহা আর রাঙা থাকে না। উহা অরুণাভ পীতাভ হইয়া শেষ পর্য্যন্ত ধপধপে সাদা হইয়া জ্বলিতে থাকে। তখন রক্ত হইতে শিম্বী পর্য্যন্ত সকল বর্ণের উৎপাদক ঊর্ম্মিই বাহির হইতেছে বুঝিতে হইবে। আরও উষ্ণতা বাড়িলে আরও ছোট ছোট ঊর্ম্মি বাহির হইতে থাকে কিন্তু ইহারা আলোক-জ্ঞান জন্মায় না। কাজেই, রঙ্ সেই শুভ্র থাকে।

সোনা রূপা লোহা উষ্ণতাবৃদ্ধির সহিত ছোট ছোট আকাশোর্ম্মির সৃষ্টি করিয়া ক্রমে দৃষ্টি-গোচর হয়; যতক্ষণ দৃষ্টি-গোচর ছিল না তখনও উর্ম্মি সৃষ্টি করিতেছিল, কিন্তু আলোক দেয় নাই, নিষ্প্রভ, দীপ্তিহীন ছিল। যখন রাঙা আলো, পীত আলোর উর্ম্মি উৎপাদন করিতে থাকে তখন দীপ্তিমান হয়—স্বয়ম্প্রভ হয়। তখন হয়ত উহার আর কাঠিন্য নাই। উষ্ণতা বৃদ্ধিতে কঠিন পদার্থ তরলে পরিণত হইয়াছে। সেই তরল পদার্থের অণুগুলিও থরথর কাঁপিতেছে, ছটফট করিয়া কাঁপিতেছে, আর আকাশে উর্ম্মির সৃষ্টি করিতেছে। সেই সকল চোখে পড়িয়া আলোক-জ্ঞান জন্মাইতেছে। তখন সোনা রূপা দীপ্তিমান হইয়া টলটল ঢলঢল করিতেছে।

জড়পদার্থের গঠন-প্রণালী

বহুপূর্ব্বে আমরা জড়পদার্থের গঠন-প্রণালী বুঝাইতেছিলাম। অনিলের তরলের গঠন-প্রণালী বুঝাইয়া কঠিনে আসিয়া থামিতে হইয়াছিল। সহসা গঠন-প্রণালীর আলোচনা ত্যাগ করিয়া কম্পগতির আলোচনায় ঝম্প দিয়াছিলাম। কম্পগতির আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া নানা কথা আসিয়াছে। জোয়ার-ভাটা আসিয়াছে, শব্দ আসিয়াছে, আলোক আসিয়াছে। আলোকের আলোচনা করিতে গিয়া একটা কিম্ভূত-কিমাকার জড়পদার্থের সন্ধান পাইয়াছি, তাহার নাম দিয়াছি আকাশ। আকাশে উর্ম্মি চালনা করে। সেই উর্ম্মি আলোকের জ্ঞান জন্মায়। আলোকে আলোকে আঁধার হয়, এই প্রত্যক্ষ ঘটনা বুঝিতে গিয়া উর্ম্মির কল্পনা করিতে হইয়াছে। আবার উর্ম্মির আশ্রয় কল্পনা করিতে গিয়া কিম্ভূত-কিমাকার

আকাশের কল্পনা করিতে হইয়াছে। আকাশে ঊর্ম্মি জন্মিবে কিরূপে? কম্পগতি ভিন্ন অন্যগতিতে ঊর্ম্মি জন্মাইতে পারে না; কাজেই, মনে করিতে হইয়াছে উষ্ণ দ্রব্যের অণুসকল কম্পনশীল। উষ্ণদ্রব্য অত্যুষ্ণ হইলেই যখন দীপ্ত হয়, যখন আলো দেয়, যখন দৃষ্টি-গোচর হয়, আর সেই আলোর যখন ঊর্ম্মির সহিত এমন সম্বন্ধ, আর কম্পগতি ভিন্ন অন্য গতি উৎপাদনে অশক্ত, তখন উষ্ণদ্রব্যের অণুগুলিকে কম্পনশীল স্বীকার করিতে হইয়াছে। কেবলই বুদ্ধির খেলা। এক অনুমান হইতে অন্য অনুমানে ঝাঁপ দিতে হইয়াছে। প্রত্যক্ষ ঘটনা বুঝাইবার জন্য একটা অনুমানের আশ্রয়; সেই অনুমান বজায় করিতে অন্য অনুমানের আশ্রয়। এইরূপে ক্রমে গিয়া আমরা এই তত্ত্বে উপনীত হইয়াছি যে, দীপ্তিমানই হউক আর অদীপ্তই হউক, স্বয়ম্প্রভ হউক আর নিষ্প্রভই হউক, উষ্ণদ্রব্যমাত্রেরই অণুসকল কম্পনশীল। আর সেই কম্পন-সংখ্যা বড় সামান্য নহে। সেকেণ্ডে কোটি কোটি বার কম্পন ব্যতীত ঐ সকল ক্ষুদ্র ঊর্ম্মির ঐ মহাবেগে সঞ্চলন বুঝা যায় না। তন্ত্রী বা পটহের শরীর কম্পিত হইলে শব্দ শুনা যায়, ঐ স্থলে কম্পগতি এক রকম প্রত্যক্ষ ঘটনা। কিন্তু জড় পদার্থের অণুগুলিই প্রত্যক্ষ-গোচর নহে, উহারা নিজেই অনুমানের বিষয়। উহাদের কম্পগতিও প্রত্যক্ষ বিষয় হইতে পারে না; সেই কম্পনও অনুমানের বিষয়। অনুমানলব্ধ অণুসমূহে কম্পনগতি অনুমান করিয়া আমরা আলোকতত্ত্ব বুঝিয়াছি। নিউটনের অনুমান আলোকের সকল তত্ত্ব বুঝাইতে পারে নাই। কঠিন, তরল, অনিল সকল পদার্থই উষ্ণ ও উষ্ণতা বৃদ্ধিতে সকল পদার্থই প্রদীপ্ত, স্বয়ম্প্রভ হয়। অতএব সকলেরই অণু কম্পনশীল মনে করিতে হইবে। অণু কম্পনশীল, না পরমাণু কম্পনশীল? মনে রাখিতে হইবে অণু আর পরমাণু এক নহে। রাসায়নিক

পণ্ডিতেরা এ বিষয়ে একটা সিদ্ধান্ত খাড়া করিয়া রাখিয়াছেন। তাহার বিরোধে গেলে চলিবে না। গোটাকতক পরমাণু একত্র করিয়া অণু হয়। একটা অণুর মধ্যে দু-দশটা পরমাণু থাকিতে পারে। দু-দশটা কেন, জৈব পদার্থের এক এক অণুর মধ্যে বিশ পঞ্চাশ হইতে দুই চারি শত পরমাণু থাকাও অসম্ভব নহে। কাজেই, অণু আর পরমাণু এক নহে। এখন জিজ্ঞাস্য এই, তপ্ত দ্রব্যের অণু কাঁপে, না পরমাণু কাঁপে? ইহার সূক্ষ্ম উত্তর দেওয়া কঠিন। হয়ত অণু পরমাণু দুই-ই কাঁপে। কঠিন তরল অনিল সকল পদার্থই অণুর সমষ্টি, প্রত্যেক অণু কতিপয় পরমাণুর সমষ্টি। অণু কাঁপিতেছে কি পরমাণু কাঁপিতেছে, নিশ্চয় বলা কঠিন। তবে অনিল পদার্থে কতকটা স্পষ্ট উত্তর দেওয়া চলে।

নুন বা সামুদ্রিক লবণ যৌগিক পদার্থ। উহাতে সোডিয়ম ধাতু ক্লোরিণে মিলিত হইয়া আছে। প্রত্যেক অণুতে সোডিয়মের এক পরমাণু, ক্লোরিণের এক পরমাণু আছে, এইরূপ অনুমান করা হয়। আর সাজিমাটি কিম্বা সোডা আর একটি যৌগিক পদার্থ; উহাতেও সোডিয়ম ধাতু আছে, কয়লা ও অম্লানের সহিত মিলিত হইয়া আছে। প্রত্যেক অণুতে সোডিয়মের পরমাণু আছে। নুন আর সাজিমাটি উভয়েরই সাধারণ উপাদান সোডিয়ম ধাতু। উভয় দ্রব্যই কঠিন পদার্থ; উভয় দ্রব্যেরই কঠিনাবস্থায় দানা বাঁধিবার ক্ষমতা আছে; উভয় দ্রব্যই জলে দ্রব হয়; উত্তাপে তরল হয়; আর দীপ-শিখায় ধরিলে বাষ্পীভূত বা অনিলাবস্থ হয়। কিন্তু দীপশিখাতে নুনই ধর আর সাজিমাটিই ধর, দীপশিখা সঙ্গে সঙ্গে উজ্জ্বল পীত বর্ণের আলো দিতে থাকে। এই পীত বর্ণের আলোক সোডিয়ম ধাতুর নিজস্ব আলোক। উহার সহিত নুনের ক্লোরিণের

সম্পর্ক নাই বা সাজিমাটির অন্তর্গত কয়লা বা অম্লানের কোন সম্পর্ক নাই। কিন্তু নুন বা সাজিমাটি উভয় দ্রব্যই দীপশিখাকে পীতাভ করে। এই আলোক সোডিয়মের আলোক। বুঝিতে হইবে, সোডিয়মের পরমাণুগুলি স্বাধীন ভাবে নিজস্ব আলোক দিতেছে; ক্লোরিণের আলোকও তার সঙ্গে থাকিতে পারে; কিন্তু উহা উজ্জ্বলতায় পরাস্ত হইয়াছে। এখানে এক রকম বাধ্য হইয়া মনে করিতে হয়, অণুগুলি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। পরমাণু পৃথক্ হইয়া বাহিরে আসিয়া নিজস্ব আলোক বিকীর্ণ করিতেছে। অণুগুলি না ভাঙ্গিয়া থাকিলেও পরমাণু যে স্বতন্ত্র ভাবে আলোক দিতেছে, তাহার সন্দেহ নাই। নুনের অণুর সহিত সাজিমাটির অণুর মিল নাই। কাজেই, নুনের আলোর সহিত সাজিমাটির আলোর সাদৃশ্য সম্ভবে না। কিন্তু সোডিয়মের পরমাণু উভয় পদার্থেই আছে। আর উভয় স্থলেই সোডিয়ম পরমাণু স্বাধীন ভাবে কাঁপিতেছে ও আকাশে ঊর্ম্মি উৎপাদন করিতেছে বলিয়াই উভয়েই একই পীতবর্ণের আলো দেখা যাইতেছে।

এখানে একটা স্পষ্ট উত্তর পাওয়া গেল। দীপশিখার উষ্ণতায় নুন আর সাজিমাটি উভয়েই অনিলাবস্থায় রহিয়াছে। অনিলাবস্থাতে অণুগুলি স্বতন্ত্র ভাবে স্বাধীন ভাবে ছুটিয়া বেড়ায় ও ছুটিতে ছুটিতে ঠোকাঠুকি করে। যত উষ্ণ হয় ততই বেগে ছুটে ও ততই ঝোঁকের সহিত ঠোকাঠুকি করে। এই ঠোকাঠুকির ফলে, অণুতে অণুতে ধাক্কা লাগিয়া হয়ত অণুগুলি ভাঙ্গিয়া যায়। বস্তুতই উষ্ণতা বৃদ্ধিতে যৌগিক পদার্থের রাসায়নিক বিশ্লেষণ ঘটে। অত্যধিক উষ্ণ হইলে জলের বাষ্পও বিশ্লিষ্ট হইয়া উদান অম্লান পৃথক হইয়া যায়। রাসায়নিক বিশ্লেষণের অর্থ অণুগুলির ধ্বংস। অণু ভাঙ্গিয়া পরমাণু

পৃথক্ হইলেই রাসায়নিক বিশ্লেষণ বুঝিতে হইবে। উষ্ণতা বৃদ্ধিতে যৌগিক পদার্থের অণুগুলি ভাঙ্গিয়া যায়। পরমাণু স্বাধীন স্বতন্ত্র হইয়া পড়ে। স্বাধীন হইয়া স্বাধীন ভাবে কাঁপিতে থাকে। তখন উহার স্বাধীন কম্পের ফলে উহার নিজস্ব আলোক নির্গত হইতে থাকে।

মূল পদার্থ মাত্রেরই নিজস্ব আলো আছে আগে বলিয়াছি। ঐ নিজস্ব আলোক দেখিয়া উহাদিগকে চেনা যায়। প্রত্যেক মূল পদার্থ আলো দিবার সময় নিজস্ব আলো দেয়। আর চুরি করিবার সময় সেই নিজস্ব আলো চুরি করে। এই নিজস্ব আলো চুরি করে বলিয়াই সূর্য্যে নক্ষত্রে কোন্ মূল পদার্থ আছে আমরা ঘরে বসিয়া বলিতে পারি। অসঙ্কোচে বলিতেছি সূর্য্যমণ্ডলে উদান আছে, সোডিয়ম আছে, লোহা আছে। তবেই প্রত্যেক মূল পদার্থ নিজস্ব আলো দেয়। কোন্ অবস্থায় দেয়? কঠিন অবস্থায় কি? না। তরল অবস্থায় কি? না। কেননা তপ্ত-দীপ্ত স্বর্ণখণ্ড ও তপ্ত-দীপ্ত রৌপ্যখণ্ড বা তপ্ত-দীপ্ত লৌহখণ্ড, কঠিনই হউক আর তরলই হউক, একই রঙের আলো দেয়। সেই আলোক কাচের কলমে বিশ্লেষণ করিলে তাহাতে শত সহস্র বর্ণের আলোক দেখা যায়; কিন্তু স্বর্ণে, রৌপ্যে, লৌহে কোন প্রভেদ দেখা যায় না। কিন্তু সেই সোনা, সেই রূপা, সেই লোহা যখন তড়িৎ স্ফুলিঙ্গের ভীষণ উষ্ণতায় অনিলাবস্থ হইয়া পড়ে, তখন উহা আপন আপন আলোকে দীপ্তি পায়। তখন উহাদের আলো কাচের কলমে বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, সোনার আলো আর রূপার আলো আর লোহার আলো স্বতন্ত্র। এখন আর শত সহস্র বর্ণের আলো দিতেছে না; এখন কতিপয় বর্ণের আলো দিতেছে। সেই বর্ণগুলি চিনিয়া রাখা চলে। উহা উহাদের

নিজস্ব বর্ণ; এই নিজস্ব বর্ণ দেখিয়া তড়িৎস্ফুলিঙ্গে লোহা আছে, কি সোনা আছে, কি রূপা আছে, তাহা অক্লেশে বলা যাইতে পারে।

এখানে সাহসের সহিত বলা যাইতে পারে, এই আলো অণুর আলো নহে, উহা পরমাণুর আলো। পরমাণুগুলি স্বাধীনভাবে কাঁপিতেছে, উহাদের নির্দ্দিষ্ট কম্পসংখ্যা আছে। লোহার পরমাণুর কম্পসংখ্যা সোনার পরমাণুর কম্পসংখ্যার সমান নহে। আবার উদানের পরমাণুর কম্পসংখ্যা সোডিয়মের পরমাণুর কম্পসংখ্যার সমান নহে। কাজেই, উদানের পরমাণু আকাশে যে বর্ণের উর্ম্মি উৎপন্ন করে, সোডিয়মের পরমাণু আকাশে সেই সেই বর্ণের উর্ম্মি উৎপাদন করে না। বর্ণ দেখিয়া পরমাণুর স্বরূপ চিনিতে পারি।

এখন বলা যাইতে পারে, কঠিনে ও তরলে হয়ত অণুগুলিই কাঁপে। উহাদের কোন নির্দ্দিষ্ট কম্পসংখ্যা নাই। সকল রকমের অণুই সকল রকমে কাঁপে। রক্ত, পীত, নীল সকল বর্ণের উর্ম্মিরই সৃষ্টি করে। কিন্তু অনিল পদার্থে অণু কাঁপে না, পরমাণু কাঁপে। অন্ততঃ অনিল পদার্থ যখন উষ্ণতা বৃদ্ধিতে বিশ্লিষ্ট হইয়া যায়, যখন উহাদের অণুগুলি ভাঙ্গিয়া পরমাণুতে পরিণত হয়, তখন পরমাণুগুলিই স্বতন্ত্র ভাবে কাঁপিতে থাকে। প্রত্যেক পরমাণুর কম্পবিধি, কম্পসংখ্যা স্বতন্ত্র। তাহাই সকল বর্ণের আলো না দিয়া কতিপয় বর্ণের, নিজস্ব বর্ণের আলো দিতে থাকে।

স্বাধীন ভাবে কম্পনের মর্ম্মই এই। শব্দোৎপাদক কম্পেও আমরা তাহাই দেখিয়াছি। টেবিলে ঠক্ করিয়া ঘা দিলে "ঠক্" শব্দ হয়। আঘাতের অধীনে টেবিলের বিভিন্ন অংশ বিভিন্নভাবে এলোমেলো-ভাবে কাঁপিতে আরম্ভ করে। নানা সংখ্যার নানা কম্প উৎপন্ন হইয়া নানা ধরণের উর্ম্মির সৃষ্টি করে। উহাদের মধ্যে কোন শৃঙ্খলা নাই,

সকলে একযোগে একটা শ্রুতিকটু কর্কশ শব্দের সৃষ্টি করে মাত্র। কিন্তু তন্ত্রীযন্ত্রের তারে ঘা দিলে উহা আপন সুরে মধুর ভাবে বাজিতে থাকে। উহার নির্দ্দিষ্ট কম্পসংখ্যা আছে। সেই কম্পসংখ্যার অনুযায়ী ঊর্ম্মিমালা উৎপন্ন হইয়া কানে ধাক্কা দেয়। ইহাতে শ্রুতিমধুর স্বরের উপলব্ধি হয়। প্রত্যেক তারের নিজস্ব কম্পসংখ্যা ও নিজস্ব সুর। লম্বা তারে কোমল সুর, খাট তারে তীব্র সুর। তার স্বাধীনভাবে আপনার দৈর্ঘ্য, আপনার টানের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া কাঁপিতে থাকে ও নিজস্ব ঊর্ম্মির ও নিজস্ব সুরের সৃষ্টি করে। কিন্তু টেবিলের তেমন নিজস্ব শব্দ নাই। ছোট টেবিলে আঘাতেও ঠক্, বড় টেবিলেও ঠক্। ছোট ঘড়ি পিটিলেও ঢং, বড় ঘড়ি পিটিলেও ঢং। কিন্তু তন্ত্রীর বেলায় তাহা নহে।

পরমাণু স্বতন্ত্র, উহা অণুর মধ্যে আবদ্ধ নহে। যতক্ষণ উহা অণুর মধ্যে আবদ্ধ থাকে, ততক্ষণ উহাকে সেই অণুর অধীন হইয়া চলিতে হয়, উহার সহায় অন্যান্য পরমাণুর অধীন হইয়া চলিতে হয়। কিন্তু একবার স্বাধীনতা পাইয়া অণু হইতে বাহির হইয়া আসিলে উহারা স্বাধীনভাবে কাঁপিতে থাকে ও নিজস্ব কম্পের, নিজস্ব ঊর্ম্মির, নিজস্ব বর্ণের সৃষ্টি করে।

প্রশ্ন উঠিতে পারে, প্রত্যেক পরমাণুর যদি নিজস্ব নির্দ্দিষ্ট কম্পসংখ্যাই থাকে, যদি নিজস্ব ঊর্ম্মি উৎপাদনেরই ক্ষমতা থাকে, তবে উহাদের একরঙা আলো হয় না কেন? নির্দ্দিষ্ট কম্পসংখ্যায় যে নির্দ্দিষ্ট আকারের ঊর্ম্মি সৃষ্টি করে, উহাতে নির্দ্দিষ্ট বিশুদ্ধ বর্ণই উৎপাদন করিবে। কিন্তু পরমাণুরা ত একরঙা আলো দেয় না। দুই চারিটা মূল পদার্থ আছে বটে, যাহাদের আলো একরঙা; যথা—থালিয়ম্, ইণ্ডিয়ম্, সোডিয়ম্। কিন্তু অধিকাংশ মূল পদার্থই একাধিক রঙের আলো

দেয়। সোডিয়মের পীতবর্ণের আলোই বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়। কিন্তু উহা ঠিক একবর্ণের আলো নহে। উহাতে অন্ততঃ দুইটা ঈষৎ বিভিন্ন পীতবর্ণ আছে; একটার ঊর্ম্মি অপেক্ষাকৃত কিঞ্চিৎ বড়, অন্যের ঊর্ম্মি অপেক্ষাকৃত কিঞ্চিৎ ছোট। অন্যান্য মূল পদার্থ পাঁচ, সাত এমন কি দুশ চারিশ নির্দ্দিষ্ট বর্ণের আলো দেয়। লৌহের পরমাণু যে আলো দেয়, বিশ্লেষণে দেখা গিয়াছে তাহাতে কয়েক শত নির্দ্দিষ্ট বর্ণের আলো আছে। ইহার উত্তর কি? ইহার উত্তরও শব্দ-কম্পেই পাওয়া যায়। আগে দেখিয়াছি, তন্ত্রী বা পটহ কম্পিত হইয়া শ্রুতিমধুর স্বর দেয় বটে, কিন্তু কোন স্বরই সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ নহে। হেলম্‌হোজ শব্দ বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন একটা মূল স্বরের সঙ্গে সঙ্গে গোটাকতক উপরের চড়া স্বরও থাকে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, কম্পমান তার বা কম্পমান পটহ সশরীরে স্বাধীনভাবে নির্দ্দিষ্ট সংখ্যায় কাঁপে বটে, কিন্তু সেই মূল ও প্রধান কম্পের সঙ্গে আরও গোটাকতক কম্প থাকে। উহা সশরীরে কাঁপে, সমস্ত শরীরটাকে দোলায়, আর শরীরটাকে কয়েক খণ্ডে বিভক্ত করিয়া আরও কতিপয় কম্পের উৎপাদন করে। কাজেই, মূল স্বরের সঙ্গে অন্য কয়টা স্বরও থাকে। পরমাণুর কম্পন-প্রণালীও কতকটা এইরূপে বুঝা যাইতে পারে। প্রত্যেকের মূল ও প্রধান কম্পের সহিত আরও কয়েকটা অপ্রধান কম্প থাকিতে পারে। কিন্তু প্রত্যেক কম্পেরই সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট, এক এক প্রকার কম্পে এক এক বর্ণের উৎপত্তি। কাজেই, পরমাণুর কম্পের এই জটিলতায় একাধিক বর্ণের উৎপত্তি।

তন্ত্রীর বেলায় বা পটহের বেলায় গণিতজ্ঞ পণ্ডিতেরা গণিয়া বলিতে পারেন, মূল কম্পের সহিত কোন কোন্ উপরের কম্প থাকিবে।

তন্ত্রীর আকার, আয়তন, উহার টান সমস্তই জ্ঞানগোচর। আর পরমাণুর আকার, আয়তন সমস্ত অজ্ঞান-তিমিরে। উহার বেলায় ঐরূপ গণিয়া বলা চলে না। তবে মোটামুটি এক রকমের ব্যাখ্যা দেওয়া চলে মাত্র। এই কম্পনের কথাটা নূতন কথা। জড়পদার্থের গঠন-প্রণালী আলোচনার সময় আমরা একথা পাই নাই। তখন দেখিয়াছিলাম, অনিল পদার্থের অণুগুলি ছুটাছুটি করিয়া বেড়ায়, বেগে ছুটিয়া বেড়ায় ও পরস্পর ঠোকাঠুকি করে। তরল পদার্থের অণুগুলিও ছুটিয়া বেড়ায় বটে, কিন্তু উহাদিগকে ভিড় ঠেলিয়া ছুটিতে হয়, কেবলই ঠক্কর খাইতে হয়, তাইতে বেগে অগ্রসর হওয়া চলে না। কঠিনের অণুসকল ছুটিবার বড় অবসর পায় না; উহারা স্বস্থানে আবদ্ধ থাকে। স্বস্থানে দল বাঁধিয়া শৃঙ্খলামত দাঁড়ায় বলিয়া ইহার দানা বাঁধিবার প্রকৃতি। কিন্তু এইখানে একটা গোলে পড়া গিয়াছিল। কঠিন পদার্থও তাপযোগে উষ্ণ হয়; আর তাপ শক্তি। উহার অণুগুলি যদি নিশ্চল হয়, তবে সেই শক্তির ব্যাপারটা কিরূপে বুঝিব। তরলের ও অনিলের অণু বেগে ছুটে; উহাদের ঝোঁক আছে, কাজেই, শক্তিও আছে। তাপই সেই শক্তি। কিন্তু কঠিনের অণু যদি নিশ্চল হয়, তবে সেই শক্তি কি ভাবে থাকিল? লৌহ-পিণ্ডে তাপ দিলাম, উহা উষ্ণ ছিল উষ্ণতর হইল; কিন্তু এখনও তারল্য পায় নাই। শক্তিটা কোথায় কিরূপে নিহিত হইল?

এখন দেখিতেছি, উষ্ণদ্রব্য মাত্রেরই অণুসমূহ কম্পনশীল। অণুগুলি ছোটে না, কিন্তু ছটফট্ করে। এই ছট্ফটানিও ত একটা গতি। আর গতিশীল পদার্থই শক্তিমান। প্রত্যেক অণু কাঁপিতেছে, আর যেমন-তেমন কাঁপুনি নহে, সেকেণ্ডে কোটি কোটি বার কাঁপুনি; কাজেই, প্রত্যেক অণুর একটু শক্তি আছে। তাপযোগে উষ্ণতা

বৃদ্ধির সহিত কম্পের উপর আরও কম্প বাড়ে। অণুতে নিহিত শক্তিও বৃদ্ধি পায়।

ছটফটানি চাঞ্চল্য ক্রমেই বাড়ে, শেষে পাশের অণুগুলিকে ঠেলিয়া চলিতে আরম্ভ করে। তখন কঠিন পদার্থ তরল হয়। তরলের অণুগুলি পাশের সহচরদিগের ভিড় ঠেলিয়া চলে, ধাক্কা দিতে দিতে ও ধাক্কা খাইতে খাইতে চলে; কিন্তু কেবলই চলে তাহা নহে, কাঁপিতে কাঁপিতে চলে। তরল পদার্থের অণুরও কম্পগতি আছে। নহিলে দ্রব সুবর্ণ দীপ্ত হইয়া টলটল ঢলঢল করিবে কেন? গরম জল দীপ্তি পায় না বটে, কিন্তু গরম জল আকাশে ঊর্ম্মি উৎপাদন করে, সেই ঊর্ম্মি আলোক জন্মায় না, তবে অন্যত্র গিয়া তাপ জন্মায়। কাজেই, তরল পদার্থের অণুগুলি ভিড় ঠেলিয়া ধাক্কা দিতে দিতে কাঁপিতে কাঁপিতে চলে, স্বস্থান ছাড়িয়া চলে; কঠিনের অণুর মত স্বস্থানে থাকিয়া ছট্‌ফট্‌ করে না, ছট্‌ফট্‌ করিতে করিতে ছুটিবার চেষ্টা করে, কিন্তু ভিড়ের গতিকে বেশী দুর অগ্রসর হইতে পারে না। কেবলই ধাক্কা খাইয়া এদিক্ ওদিক্ সঞ্চরণ করিয়া বেড়ায়। পৃষ্ঠদেশের কাছে আসিবা-মাত্র ফাঁকা জায়গা পাইয়া অমনি বাহিরে ছুট দেয়। তখন উহা বাষ্প হয়। বাষ্পের অণু ছুটাছুটি করে; বেগে ছুটিতে থাকে; কিন্তু কাঁপিতে কাঁপিতেই ছুটিতে থাকে। এবার ফাঁকা জায়গা যথেষ্ট; কাজেই, মাঝে মাঝে ঠোকাঠুকি হইলেও অনেকটা অগ্রসর হইতে অবকাশ পায়। এদিকে ওদিকে চারিদিকে কাঁপিতে কাঁপিতে ছুটে। তরল পদার্থের পিঠের কাছে আসিলে হয়ত পাকড়া পড়িয়া আবার ভিড়ের মধ্যে প্রবেশ করে। নতুবা ফাঁকা জায়গাতেই ছুটিয়া বেড়ায়। ফাঁকা জায়গা কম হইয়া থাকিলে অণুগুলিকেও বাধ্য হইয়া পরস্পর কাছে আসিতে হয়, আয়তন হ্রাসের সঙ্গে হয়ত শেষে এমন অবস্থা

হয় তখন আবার ভিড় উপস্থিত হয়, বাষ্প তখন তরল হয়। তখন আবার পরস্পরকে ঠেলিয়া খাতির করিয়া চলিতে হয়। কিন্তু উষ্ণতার আধিক্যে বাষ্পের আর তরলতা-প্রাপ্তির সম্ভাবনা থাকে না। তখন এত বেগে ছুটিতে আরম্ভ করিয়াছে যে, আর ভিড়ের মধ্যে ধরা দেয় না। যতই চাপিয়া ভিড়ে প্রবেশ করাইবার চেষ্টা কর, সে ভিড় ঠেলিয়া বাহির হইয়া আসে। তখন আর উহা বাষ্প নাই, উহা অনিল হইয়াছে। অনিলের অণুগুলিও বেগে ছুটিতেছে, কাঁপিতে কাঁপিতে ছট্‌ফট্ করিতে করিতে বেগে ছুটিতেছে; মাঝে মাঝে ঠোকাঠুকি হইতেছে। যত বেগ ততই ঠোকাঠুকির আঘাত প্রবল, শেষে উষ্ণতা বৃদ্ধি সহকারে এমন ঘটে যে, অণুতে অণুতে ঠোকাঠুকিতে অণু ভাঙ্গিতে লাগে। পরমাণুগুলি ছুটিয়া বাহির হইয়া পড়ে। তখন যৌগিক পদার্থ বিশ্লিষ্ট হইয়া উহার মূল উপাদান বাহির হইয়া যায়। পরমাণুগুলি বাহির হয় আর কাঁপিতে কাঁপিতে ছোটে। কিন্তু কাঁপিবার সময় সম্পূর্ণ স্বাধীনতার সহিত কাঁপে। উহার ছট্‌ফটানি নিজের ছট্‌ফটানি; পরের খাতিরে নহে। তখন উহার কম্পসংখ্যাও নির্দ্দিষ্ট। কাহারও বা কম্প একবিধ, কাহারও বা বহুবিধ। কিন্তু কোন কম্পই অন্য জাতীয় পরমাণুর অধীন নহে। এই অবস্থায় অনিল উজ্জ্বল বর্ণে জ্বলিতে থাকে। আপন আপন বর্ণে দীপ্তিমান হয়। চারিদিকের আকাশ তরঙ্গাকুল হয়। ঊর্ম্মির মালা সারি সারি আকাশ বাহিয়া আগেও চলিতেছিল, এখনও চলে; আগে তাহাদের মধ্যে কোন সঙ্গতি ছিল না, যখন নির্দ্দিষ্ট দৈর্ঘ্যের ঊর্ম্মিমালা চলিতে থাকে দূরে দর্শক তাহার ফলে বিচিত্র বর্ণের বিকাশ দেখেন। বর্ণ দেখিয়া ধরিয়া ফেলেন, কোন্ পরমাণু কাঁপিতেছে? উদান, না অম্লান, না সোডিয়ম, না লৌহ?

অণুগুলি বেগে ছুটিতে ছুটিতে ধাক্কা খাইয়া ভাঙ্গিয়া পরমাণু ছাড়িয়া দেয়। পরমাণু পরস্পর আঘাতে ভাঙ্গে কি? রাসায়নিক পণ্ডিত এইখানে জোরের সহিত বলেন, পরমাণু আর ভাঙ্গে না। উহা অবিভাজ্য। উহার আর ভগ্নাংশ হয় না। উহাকে ভাঙ্গিতে পারে এমন শক্তি নাই। যত শক্তি দেও উহা বহন করিবে, কিন্তু ভাঙ্গিবে না। পরমাণুর ভগ্নাংশ সম্ভব হইলে রাসায়নিক সম্মিলনের এমন বাঁধাবাঁধি থাকিত না। অম্লানের পরমাণু যেখানেই দেখি, উহার ওজন উদানের পরমাণুর ষোল গুণ। কয়লার পরমাণু উদানের পরমাণুর বার গুণ। অম্লানের পরমাণু ভাঙ্গিয়া দ্বিখণ্ড হইলে সর্ব্বদা ষোল গুণ হইত না। দুই খণ্ড হইলে এক এক খণ্ড আট গুণ হইত। চারি খণ্ড হইলে এক এক খণ্ড চারিগুণ হইত। কিন্তু ঐ সকল ভগ্নাংশের অস্তিত্ব কই, রাসায়নিকেরা কোথাও দেখেন নাই।

রাসায়নিকেরা দেখেন নাই; কিন্তু বেঞ্জামিন ব্রডি বলিতেন, সার নর্ম্যান লকিয়ার বলিতেন, আমরা যেন পরমাণুর ভগ্নাংশের প্রমাণ পাইয়াছি। সূর্য্যমণ্ডলের ভীষণ উষ্ণতায়, তাড়িতস্ফুলিঙ্গের ভীষণ উষ্ণতায় কোন কোন পরমাণু ভাঙ্গিয়া উহার ভগ্ন খণ্ডের অস্তিত্বের প্রমাণ পাইয়াছি, আলোক বিশ্লেষণ করিয়া প্রমাণ পাইয়াছি। কিন্তু সে প্রমাণে রাসায়নিক পণ্ডিতেরা ঘাড় পাতেন নাই। শেষে এত দিনে এমন এক প্রমাণ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, যে, রাসায়নিক পণ্ডিতকেও ঘাড় পাতিয়া মানিতে হইয়াছে, পরমাণুও বুঝি ভাঙ্গে; দ্বিখণ্ড, চতুর্খণ্ড নহে, ভাঙ্গিয়া সহস্রখণ্ড হয়। কিন্তু এ বৃহৎ কাহিনী; ইহা পরে বলিব। এখন সময় আসে নাই।

গণা ও মাপা

গণা আর মাপা এই দুইটা সম্পূর্ণ পৃথক্ ব্যাপার। গোয়ালঘরের গরু কত আছে, ঠিক করিতে হইলে গণিতে হয়; গণার অন্য নাম সংখ্যা করা। কিন্তু গামলায় কতটা জল আছে, তাহা মাপিতে হয়; তাহার নামান্তর পরিমাণ করা। আমরা বলি পনেরটা গরু; আর পনের সের জল। সাড়ে পনেরটা গরু বলিলে লোকে হাসিবে; কিন্তু সাড়ে পনের সের জল বলিলে লোকে হাসিবে না। অতএব দুইয়ে তফাৎ আছে। কোথায় তফাৎ?

গরুকে দুই ভাগ করা হিন্দুর কাজ নহে; অন্যে করিলেও যে দুই খণ্ড পাওয়া যায়, তাহার গোত্ব থাকে না। একটা আস্ত গরুর শিং লেজ ও চারিখানা পা থাকা দরকার; দুই ভাগ করিলে প্রত্যেক ভাগে শিং লেজ ও পাগুলি বাহাল রাখা চলে না; কাজেই, দুই ভাগ করা চলে না; কাজেও চলেনা; কল্পনাতেও চলে না। কিন্তু এক গামলা জলকে অক্লেশে দুই ভাগ করা চলিতে পারে; এবং প্রত্যেক ভাগেরই জলত্ব ষোল আনা বজায় থাকে।

যে সকল জিনিসকে খণ্ডিত করিলে উহা আর সে জিনিসই থাকে না, তাহা মাপিতে হয় না, গণিতে হয়। যেমন গরু, আলমারি, বহি, ইট। কিন্তু গরুর দুধ, আলমারির কাঠ, বহির কাগজ ও ইটের মাটি, যত ভাগই কর না কেন, উহাদের দুগ্ধত্ব, কাষ্ঠত্ব ইত্যাদি নষ্ট হয় না। উহাদের বেলা না গণিয়া মাপাই বিধি।

ভাবিলে বুঝা যাইবে, গণা কর্ম্মটা সহজ; উহাতে ভুল-ভ্রান্তির বড় আশঙ্কা থাকে না। গোয়ালের গরু তেরটা কি চৌদ্দটা অক্লেশে ঠিক হইবে, উহার মাঝামাঝি হইবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু গরুর

দুধ তের সের ও চৌদ্দ সেরের মাঝামাঝি সহস্র রকম হইতে পারে। তাহার অর্থ এই যে, দুধ যত অল্পই লওয়া যাক না কেন, উহা দুধই। কিন্তু গরুর শিং কি লেজ, কি খুর ইহা গরু নহে। এই মাঝামাঝি সহস্র পরিমাণের সম্ভাবনা থাকাতেই মাপ কর্ম্মটা কঠিন।

মাপিতে প্রবৃত্ত হইয়া আমাদিগকে গণিবারই চেষ্টা প্রথমে করিতে হয়। একটা বাটি আনিয়া বলি, এই বাটির এক বাটি দুধের নাম এক সের দুধ। তার পর গামলার দুধ এক বাটি এক বাটি করিয়া তুলিয়া এক, দুই, তিন ক্রমে তের বাটি পর্য্যন্ত তুলিলে তের সের হইল; এ পর্য্যন্ত বেশ গণা চলিল। কিন্তু তের বাটি তুলিয়া দেখা গেল, যে আরও খানিকটা গামলায় রহিয়াছে, তাহাতে বাটি পূর্ণ হয় না, উহা এক বাটি নহে। সেই টুকুকে মাপিতে হইলে আর একটা ছোট বাটি আনিতে হয়, ও সেই ছোট বাটির এক বাটি দুধকে বলা হয় এক ছটাক। তার পর বাকি দুধটুকুতে ছোট বাটি ডুবাইয়া আবার এক, দুই, তিন ছটাক ক্রমে গণিতে হয়। দেখা গেল নয় ছটাক পর্য্যন্ত তুলিয়া একটুকু অবশিষ্ট থাকে, তাহাতে আর সে ছোট বাটিও পূরে না। তখন আরও ছোট বাটি আনিয়া তাহার কাঁচ্চা নাম দিয়া দেখা যায় তিন কাঁচ্চা হইয়া যেটুকু থাকে, সেটুকু আবার এক কাঁচ্চার কম। কি বিপদ! সেটুকু মাপিতে হইলে আবার আরও ছোট বাটির দরকার হইবে। আবার ছোট বাটি এখন কোথা পাওয়া যায়। তখন গৃহস্থও বিরক্ত, আর গোয়ালাও বিরক্ত। উভয়েই বলে, আর ঐ দুধটুকু লইয়া ঝগড়া করিতে পারি না। গোয়ালা বলে, বাবু ওটুকুর তুমি দাম দিও না, উহা আমি দান করিলাম। অতএব উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে স্থির হইল দুধের

পরিমাণ তের সের নয় ছটাক তিন কাঁচ্চা, উভয়পক্ষে মিটমাট হইয়া গেল, ভাল কথা, কিন্তু দুধটার ত সূক্ষ্ম মাপ হইল না।

সূক্ষ্ম মাপ হইবার উপায়ও দেখি না। আরও ছোট বাটি আনিয়া না হয় কাঁচ্চারও ভগ্নাংশ গণা হইল, কিন্তু তাহাতেও যে একটু দুধ অবশিষ্ট থাকিবে না কে বলিল। যত ছোট বাটিই লও না কেন, দুধ ত তার চেয়ে কম হইতে পারে; তখন আবার আরও ছোট বাটির সন্ধান করিতে হইবে। কাজেই, এক সময়ে না এক সময়ে বিরক্ত হইয়া বাকিটুকুকে ত্যাগ করিতে হইবে। মাপ কর্ম্মটা কিন্তু সমাপ্ত হইবে না। তাহা হইলে কোন্ জিনিস গণা চলে, আর কোন্ জিনিস না গণিয়া মাপিতে হয়? যাহার ভগ্নাংশ হয় না, তাহা গণিতে হয়, আর যাহার ভগ্নাংশ পাওয়া যায় তাহা মাপিতে হয়। কিন্তু গণা ও মাপা দুই কর্ম্মে এই তফাৎ, যে সাবধানে গণিলে ভুলের সম্ভাবনা থাকে না। আর যতই সাবধানে মাপ, শেষ পর্য্যন্ত একটু ভুলের সম্ভাবনা থাকেই। ইহার কারণ এই যে, মাপ-কাঠি যতই ছোট কর, মাপের জিনিস তার চেয়েও ছোট হইতে পারে। গরু অবিভাজ্য তাই গণা চলে; অবিভাজ্য এই হিসাবে, যে ভাগ করিলে গরুত্ব থাকে না; আর দুধ বিভাজ্য; যত ছোট ভাগ কর, উহা দুধই থাকে।

এখন একটা গোলের দৃষ্টান্ত লইব। বাজারে ধান কিনিব। ধান গণা উচিত, না মাপা উচিত? বলা বাহুল্য, ধান অবিভাজ্য; অর্থাৎ একটি ধানকে ভাঙিলে যে খণ্ড পাওয়া যাইবে, উহাকে ধান বলা চলে না। অতএব ধান গণাই উচিত। এবং যদি সাবধানে গণা যায় তাহা হইলে কাহার সাধ্য ক্রেতাকে ঠকায়।

কিন্তু আমরা ত ধান গণিয়া লই না। উহা আমরা ওজন করিয়া

লই বা মাপিয়া লই। মণ হিসাবে ওজন করি, অথবা আড়ি ধরিয়া মাপ করি। ফলে, বিক্রেতা ক্রেতাকে সাধ্যমত ঠকাইয়া দিতে ত্রুটি করে না। ক্রেতা উপায় থাকিতে ঠকে কেন? গণিলে ঠকিতে হইত না বটে, কিন্তু ধানের মত ক্ষুদ্র দ্রব্য, একটি একটি করিয়া গণিতে বসিলে মাসের খোরাক সংগ্রহ করিতে পরমায়ু ফুরাইত। ধানকে চাউলে ও চাউলকে ভাতে পরিণত করিয়া উদরস্থ করিবার অবসর ঘটিত না। কাজেই, ঠকিবার সম্ভাবনা, ভুলের আশঙ্কা থাকিতেও আমরা ধান মাপিতে বসি, এবং পঞ্চাশ মণ পোনের সের সাত ছটাক পর্য্যন্ত মাপিয়া যে কয়টা অবশিষ্ট থাকে, উহা অগ্রাহ্য করি। জোর করিয়া মনকে বুঝাই, ধান যেন জলের মত, বা দুধের মত বিভাজ্য পদার্থ; যেন উহা ভাগ করিতে গিয়া খণ্ড পাওয়া যাইবে না। অথচ যে কয়টা ধান বাকি থাকিল, তাহা সচ্ছন্দে গণা চলিত।

দাঁড়াইল এই। জলের মত বা দুধের মত জিনিস গণা চলে না, কিন্তু ধানের মত জিনিস গণা চলে ও গণাই উচিত। তবে ধান অতি ক্ষুদ্র ও গোটাকতক ধানের মূল্য অগ্রাহ্য বলিয়া আমরা উহা না গণিয়া মাপিয়াই থাকি। গোটাকতক ধানকে আমরা অবহেলা করিয়া গণিতে চাহি না।

এখন সংশয় দাঁড়ায়, আচ্ছা ধান যেমন অবহেলা করিয়াই হউক বা পরিশ্রমের ভয়েই হউক, আমরা গণি না, সেইরূপ জলও হয়ত সেইরূপ কোন কারণে আমরা গণিতে চাহি না, মাপিয়া থাকি।

জড়পদার্থের গঠন সম্বন্ধে যে সকল অনুমানের কথা বলা গিয়াছে, তাহা যদি সমূলক হয়, তাহা হইলে সেই সংশয়ই ত প্রকৃত হইয়া দাঁড়ায়। অনুমান করা গিয়াছে, জলের অণুগুলি খুব ছোট; এত ছোট যে

চোখেরও অগোচর। কিন্তু ঐ অণু অবিভাজ্য। এই হিসাবে অবিভাজ্য, যে, ঐ অণু ভাঙিলে যাহা পাওয়া যাইবে তাহার আর জলত্ব থাকে না। গরুর ভগ্নাংশে যেমন গরুত্ব নাই, ধানের ভগ্নাংশে যেমন ধানত্ব নাই, জলের অণুর ভগ্নাংশে তেমনি জলত্ব নাই। সেই অণুগুলি যদি দর্শন-গোচর হইত, তাহা হইলে এক গামলায় কতগুলি জলের অণু আছে তাহা আমরা নিশ্চয় গণিয়া বলিতে পারিতাম, ও সাবধানে গণিলে ভুলের সম্ভাবনা থাকিত না।

ফলে, দর্শনগোচর হইলেও জলের অণু এত ছোট, যে এক ফোঁটা জলের অণু গণিতে পরমায়ু ফুরাইত! সেইরূপ দুধের অণু গণিয়া দুধ কিনিতে হইলে গোয়ালা জব্দ হইত বটে, কিন্তু দুধের পিপাসা ইহ জন্মে মিটিত না। কাজেই, যেমন ধান গণনাযোগ্য হইলেও আমরা গণি না, জলের অণু গণনাযোগ্য হইলেও তেমনি গণি না। না গণিয়া মাপিয়া থাকি। অণু যদি অবিভাজ্য না হইত, তাহা হইলে অবশ্য গণিবার উপায়ই থাকিত না।

পদার্থবিদের অনুমান যদি সত্য হয়, তাহা হইলে কঠিন তরল মরুৎ সকল পদার্থই গণনাযোগ্য বটে; তবে অণুগুলি খুব ছোট বলিয়া গণনার মেহনত পোষায় না এবং সম্প্রতি ইন্দ্রিয়গোচর নহে বলিয়া গণিবার উপায়ও নাই। গণি, আর নাই গণি, একালের পণ্ডিতদের অনুমানে জল জলের মত জিনিস আদৌ নহে, উহা ধানের মত জিনিস। সিদ্ধান্তটা কিরূপ?

আমাদের মত সাধারণ লোক, যাহারা উদরপূরণেই সন্তুষ্ট, তাহারা একমণ ধানে কতগুলি ধান আছে তাহার হিসাব জন্য আদৌ ব্যস্ত নহে। কিন্তু আর এক শ্রেণীর মানুষ আছেন, তাঁহাদের এইরূপ অগ্রাহ্য বিষয়েও অন্ততঃ একটা মোটামুটি হিসাব করিতে না পাইলে

কিছুতেই মনের তৃপ্তি হয় না। এক মণ ধানে কয় লক্ষ কয় হাজার কয় শ কয়টা ধান আছে, এতদূর সূক্ষ্ম হিসাব না হইলেও এত লক্ষ এত হাজার, অথবা অন্ততঃ এত লক্ষ ধান আছে জানিতে পারিলেও তাঁহাদের মনটা যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচে। এই শ্রেণীর লোকের ধাতুই স্বতন্ত্র। আমরা তাঁহাদিগকে পাগল বলিব; কিন্তু আমাদের পরে যারা ধরাতলে ভূমিষ্ঠ হইবে, তাহারা হয়ত বলিবে, তাঁহারাই মানবকুলের শিরোমণি।

ঐরূপ মানবকুলের শিরোমণি একজন অশীতি শরৎ অতিক্রম করিয়া অদ্যাপি ভূপৃষ্ঠে বিচরণ করিতেছেন, অথবা ভূপৃষ্ঠকে গৌরবান্বিত করিতেছেন। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ইহার নাম লোকে জানিত সার উইলিয়ম টমসন। এখন দেশের রাজা খাতির করিয়া নাম দিয়াছেন লর্ড কেলবিন। ভবিষ্যতের মানববংশ-পরম্পরা যাঁহার স্মৃতির সম্যক্ সম্মানে অক্ষমতা স্বীকার করিবে, রাজা কি না তাঁহার নাম বদ্‌লাইয়া খাতির করিতে চাহেন! হা হতোঽস্মি!

এই লর্ড কেলবিন এক ফোঁটা জলে কতগুলি অণু আছে তাহা গণিবার জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল। নতুবা তাঁহার মনে তৃপ্তি হয় না। অণু ত আনুমানিক পদার্থ; তথাপি তিনি নানা রকমে মাথা ঘামাইয়া তাহা গণিবার চেষ্টা করিয়াছেন ও মোটা হিসাবও দিয়াছেন। অনুমানটা মূলে যদি সমূলক হয়, তবে সেই হিসাবে বিশেষ অবিশ্বাসের হেতু নাই।

অণুগুলি অবিভাজ্য, অর্থাৎ জলের অণুকে ভাঙ্গিলে উহাতে জলত্ব থাকে না। কিন্তু রসায়নবেত্তা পণ্ডিতের অনুমানে উহা হইতে গোটাকতক পরমাণু বাহির হয়। তিনি অনুমান করেন, গোটাকতক এক জাতীয় বা ভিন্নজাতীয় পরমাণু জোট বাঁধিয়া যে ছোট বড় দল

হয়, সেই এক একটা দল এক একটা অণু। এক জাতীয় পরমাণুর জোটে মৌলিক পদার্থের অণু, আর বিভিন্নজাতীয় পরমাণুর জোটে যৌগিক পদার্থের অণু। অবশ্য, পরমাণুগুলির কোনরূপ একটা বন্ধন আছে, যাহাতে তাহারা সহজে জোট ছাড়িতে চাহে না; শক্তিপ্রয়োগে উহাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিতে হয়। স্থলবিশেষে বন্ধন দৃঢ় বন্ধন; তখন প্রচুর শক্তি ব্যতীত বাঁধন ছেঁড়ে না; স্থলবিশেষে শিথিল বন্ধন; তখন সামান্য কারণেই বাঁধন ছিড়িয়া যায় ও যৌগিক পদার্থ বিশ্লিষ্ট হয়। এই বন্ধনটা কিরূপ, তাহার স্পষ্ট ছবি রাসায়নিক পণ্ডিত মনে আঁকিতে পারেন না। তবে অম্লানের পরমাণু উদানের দুইটা। অঙ্গারের পরমাণু উদানের চারিটা পরমাণুর সহিত জোট বাঁধে দেখিয়া ভিন্ন ভিন্ন জাতির পরমাণুর ভিন্ন ভিন্ন 'বন্ধন-ক্ষমতা অনুমান করেন, ও রূপকের ভাষায় বলেন, উদানের পরমাণু একভুজ, অম্লানের পরমাণু দ্বিভুজ, অঙ্গারের চতুর্ভুজ ইত্যাদি। যেন পরমাণুগুলি পরস্পর হাত বাড়াইয়া জড়াজড়ি করিয়া পরস্পরকে ধরিয়া আছে।

এক একটা অণুতে গোটা কতক মাত্র পরমাণু দল বাঁধিয়া থাকে; উহাদের সংখ্যা বহুস্থলেই অনুমান করিতে হয়। কাজেই, এক ফোঁটা জলে কতগুলি অণু আছে তাহার মোটা হিসাব পাইলে উহাতে কতগুলি উদানের পরমাণু ও কতগুলি অম্লানের পরমাণু আছে তাহার হিসাবের জন্য বড় ভাবিতে হয় না।

তারপর কথা আছে পরমাণুগুলি বিভাজ্য কিনা? পরমাণুর আবার ভগ্নাংশ আছে কি না? এ প্রশ্নের উত্তর এখন নহে।

তড়িৎ

তড়িৎঘটিত ব্যাপার বুঝান দায়। আমরা স্পর্শেন্দ্রিয় দ্বারা তাপের উষ্ণতা, শ্রবণেন্দ্রিয় দ্বারা শব্দের স্বর আর দর্শনেন্দ্রিয় দ্বারা আলোকের দীপ্তি প্রত্যয়গোচর করিয়া থাকি। কিন্তু তড়িতের কার্য্যকলাপ প্রত্যক্ষগোচর করিবার জন্য পৃথক্ ইন্দ্রিয় নাই। তড়িতের ক্রিয়া-ফলে যখন আলোক বা উষ্ণতা বা শব্দ জন্মে, তখন আমরা তাহার খবর পাই; কিন্তু তড়িতের সহিত আমাদের প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎকার ঘটে না। এই হেতু দেড় শত বৎসর আগে আমরা তড়িতের সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানিতাম না। শত বৎসর পূর্ব্বে জ্ঞানের সীমা বেশী অগ্রসর হয় নাই। কিন্তু আজি আর তাহা বলা চলে না। তাড়িৎ-শক্তির উপলব্ধির জন্য স্বতন্ত্র ইন্দ্রিয় না থাকিলেও উহার মত পরিচিত শক্তি আজকাল বোধ করি আর নাই। তাড়িৎ-শক্তি আজ মনুষ্যের অনুগত বশংবদ ভৃত্য। আর কোন শক্তির উপর ততটা প্রভুত্ব নাই। চিরপরিচিত তাপের ও আলোকের অপেক্ষাও আমাদের তড়িতের সহিত পরিচয় ঘনিষ্ঠ হইয়াছে, সন্দেহ নাই।

বৈজ্ঞানিকেরা তাড়িৎ-শক্তিকে খেলার সামগ্রী করিয়াছেন, কিন্তু সাধারণ পাঠকের নিকট উহার স্বভাব এখনও সমস্যাপূর্ণ রহিয়াছে। সাধারণ পাঠক কেবল ইন্দ্রিয় সহায়ে অবেক্ষণ মাত্র করিয়া থাকেন। তাই শব্দের, আলোকের, তাপের ক্রিয়াকলাপের সহিত অল্প-বিস্তর পরিচয় আছে। কিন্তু তাড়িৎ-শক্তি তাঁহাদের ইন্দ্রিয়গোচর নহে। উহাকে কৌশলক্রমে অন্য শক্তিতে পরিণত করিয়া ইন্দ্রিয়গোচর করিতে হয়। এই সকল কৌশল উদ্ভাবনের নাম পরীক্ষা। কাজেই,

বিনা পরীক্ষায় তাড়িৎ-শক্তির ক্রিয়াকলাপ সাধারণ পাঠককে বুঝান কঠিন। যাহার সহিত পরিচয় নাই, তাহাকে কেবল কল্পনার সম্মুখে রাখিয়া বুঝাইবার চেষ্টা কিছুতেই সফল হইতে পারে না। অথচ তাড়িতের কথা না বলিলে আধুনিক বিজ্ঞান-শাস্ত্রের প্রধান কথাই বলা হইল না। কাজেই, কেবলমাত্র স্থূল কথাগুলির অবতারণ করিয়া তাড়িৎ-তত্ত্বের যথাসম্ভব আলোচনা করা যাইবে।

রবারের চিরুণি চুলে ঘষিলে উহা একটা নূতন ধর্ম্ম প্রাপ্ত হয়। উহা চুলকে টানিতে থাকে। ছোট ছোট হাল্‌কা কাগজের বা শোলার টুক্‌রা টানিতে থাকে। উহার যে ক্ষমতা পূর্ব্বে ছিল না, চুলে ঘষায় সেই ক্ষমতা উহাতে আসে। একটা কিছু আগে উহাতে ছিল না, এখন তাহা আবির্ভূত হইয়াছে। এই একটা-কিছুর নাম দেওয়া হয় তাড়িত ধর্ম্ম। এই নবার্জ্জিত তাড়িত ধর্ম্ম বুঝাইবার জন্য বৈজ্ঞানিকেরা একটা পদার্থ কল্পনা করেন, তাহার নাম দেন তড়িৎ। তড়িৎ নামা কোন পদার্থ সহসা আবির্ভূত হইয়াছে, উহারই আবির্ভাবে চিরুণি লঘুদ্রব্য আকর্ষণে সমর্থ হইয়াছে। অবশ্য এই পদার্থটা বৈজ্ঞানিকের অনুমান মাত্র।

রেশমী রুমালে কাচ ঘষিলে বা পশমী ফ্লানেলে গালা ঘষিলে ঐ কাচ আর গালাও ঐরূপ লঘু দ্রব্য আকর্ষণের ক্ষমতা উপার্জ্জন করে। কাজেই বলিতে হয়, ঐ-স্থলে ঐ তাড়িতের আবির্ভাব হইয়াছে। কাচেও আবির্ভাব হইয়াছে, গালাতেও আবির্ভাব হইয়াছে।

কাচে আবির্ভূত তাড়িতের সহিত গালায় আবির্ভূত তাড়িতের একটা মস্ত প্রভেদ দেখা যায়। উভয়ই লঘু বস্তুর আকর্ষণক্ষম, কিন্তু উভয়ে একটা বিষম প্রভেদ। কাচে কাগজের টুক্‌রা আকর্ষণ

করিতেছে, এমন অবস্থায় যদি সেই গালাকে নিকটে আনা যায়, তাহা হইলে আকর্ষণ কমিয়া যায়, আবার গালায় কাগজের টুকরা আকর্ষণ করিতেছে, এমন অবস্থায় কাচকে নিকটে আনিলেও আকর্ষণ কমিয়া যায়। কাচের তাড়িতের সহিত গালার তাড়িতের যেন বিরোধ; কাচও কাগজ টানিতে চায়, গালাও টানিতে চায়, কিন্তু কাচ ও গালা উভয়ে একত্র উপস্থিত থাকিলে পরস্পরের বিরোধে আকর্ষণই ঘটে না। এই বিরোধের তাৎপর্য্য বুঝিতে হইলে কাচের প্রতি গালার ব্যবহার কিরূপ পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত।

রেশমে ঘষিলে কাচে তড়িৎ আসে; পশমে ঘষিলে গালায় তড়িৎ আসে। ঐ কাচ আর ঐ গালা কিন্তু পরস্পরকে আকর্ষণ করে। তড়িৎ আমরা চোখে দেখিতে পাই না; মনে করি, তড়িতের আবির্ভাব হেতু কাচ গালাকে ও গালা কাচকে আকর্ষণে সমর্থ হইয়াছে। এই আকর্ষণ-ক্ষমতা কাহার? কাচের, না গালার, না তড়িতের? কাচের ও গালার ত পরস্পর এরূপ আকর্ষণের প্রকৃতি ছিল না; তড়িতের আবির্ভাবেই ইহার উৎপত্তি হইয়াছে। অতএব বলিতে হইবে যে, কাচের তড়িৎ গালার তড়িৎকে আকর্ষণ করে। তাহার ফলে কাচ গালার কাছে ও গালা কাচের কাছে যাইতে যায়। অথবা বলিতে পার, এই নূতন ধর্ম্মের উৎপত্তিতে নব-ধর্ম্মাক্রান্ত কাচ নব-ধর্ম্মাক্রান্ত গালাকে আকর্ষণ করে। এরূপ বলিলেও দোষ নাই। ইহা লইয়া কথা-কাটাকাটিতে ফল নাই।

বলা যাইতে পারে, তড়িৎ তড়িৎকে আকর্ষণ করে। তাহার ফলে যে যে দ্রব্যে তড়িতের আবির্ভাব হয়, সেই সেই দ্রব্য পরস্পর সন্নিকৃষ্ট হইবার চেষ্টা করে।

দুই টুকরা কাচে রেশম ঘষিলে উহারাও কি আকর্ষণ করিতে

থাকে ? না। এখানে আকর্ষণ না ঘটিয়া বিকর্ষণ ঘটে। একখানা কাচ অন্য কাচ হইতে দূরে যাইতে চাহে। এখানে তড়িতে তড়িতে আকর্ষণ নাই; তৎপরিবর্ত্তে বিকর্ষণ। আবার দুই টুক্‌রা গালা পশমে ঘর্ষণের পর পরস্পরকে আকর্ষণ না করিয়া বিকর্ষণ করে। এখানেও তড়িতে তড়িতে বিকর্ষণ।

কাচের প্রতি কাচের যে ব্যবহার, কাচের প্রতি গালার ব্যবহার তাহার বিপরীত, আবার গালার প্রতি গালার যে ব্যবহার, কাচের প্রতি গালার ব্যবহারও তাহার বিপরীত। এই ব্যবহার তড়িতের আবির্ভাবজাত। অতএব স্বীকার করিতে হইবে যে, কাচের তড়িৎ আর গালার তড়িৎ ঠিক্ এক রকমের তড়িৎ নহে। উভয়ের ব্যবহার পরস্পর বিপরীত।

উভয়ের স্বভাবের ও ব্যবহারের এই বৈপরীত্য দেখিয়া দুইরকমের তড়িতের অনুমান করিতে হয়। কাচের তড়িৎ এক রকম; গালার তড়িৎ অন্য রকম। আর উভয়ের সম্বন্ধ বিপরীত।

কিরূপ বিপরীত। এ যেখানে টান দেয়, ও সেখানে ঠেলা দেয়। এ যেখানে উত্তরে টানে, ও সেখানে দক্ষিণে ঠেলে।

উত্তরে যাওয়ার সঙ্গে দক্ষিণে যাওয়ার যেরূপ সম্বন্ধ, একের সহিত অন্যের সেইরূপ সম্বন্ধ। যাঁহারা গণিত শাস্ত্রের আলোচনা করেন, তাঁহারা বলেন, ধনরাশির সহিত ঋণরাশির সেইরূপ সম্বন্ধ।

আয় অপেক্ষা ব্যয় কম হইলে হিসাবে যাহা মজুত থাকে, তাহার নাম ধনরাশি। উহা লাভের অঙ্ক। আয় অপেক্ষা ব্যয় অধিক হইলে হিসাবে যাহা থাকে, তাহা ফাজিল; তাহার নাম ঋণরাশি, উহা ক্ষতির অঙ্ক। এক দিন দশ টাকা মজুত, পর দিন দশ টাকা ফাজিল হইলে, মোটের উপর লাভও থাকে না, ক্ষতিও হয় না।

আর একদিন দশ টাকা মজুত, পরদিন সাত টাকা কাজিল হইলে মোটের উপর তিনটাকা মাত্র মজুত থাকে। পরের কাছে যাহা পাওনা, সেইটাই ধন; আর পরের কাছে যাহা দেনা, তাহাই ঋণ। দেনা পাওনা সমান হইলে ধন আর ঋণ সমান হয়, ফলে ধনও থাকে না, ঋণও থাকে না। ঋন চেয়ে ধন বেশি হইলে কিছু ধন অবশিষ্ট থাকে, আর ধন চেয়ে ঋণ বেশী হইলে মোটের উপর ঋণই থাকে। কাজেই, ধনের সহিত ঋণের বিপরীত সম্বন্ধ; এ উহাকে নষ্ট করে।

কাল দশ ক্রোশ দক্ষিণে গিয়া আজ যদি দশ ক্রোশ উত্তরে আসি তাহা হইলে যথাস্থানে পৌছিব, যাতায়াতের পরিশ্রমই সার হইবে; যাওয়া না যাওয়া সমানই হইবে। দশ ক্রোশ দক্ষিণে গিয়া সাত ক্রোশ উত্তরে আসার ফলে তিন ক্রোশ দক্ষিণে যাওয়া সমান। কাজেই, গণিত শাস্ত্রের নিকট ধনরাশির সহিত ঋণরাশির যে সম্বন্ধ উত্তরে যাওয়ার সহিত দক্ষিণে যাওয়ার সেই সম্বন্ধ।

কাচের তড়িতের সহিত গালার তড়িতেরও সেইরূপ বিপরীত সম্বন্ধ। কাচের তড়িৎ স্বজাতীয় কাচের তড়িৎকে যদি দক্ষিণে ঠেলে তবে বিজাতীয় গালার তড়িৎকে উত্তরে টানিবে। আবার গালার তড়িৎ গালার তড়িৎকে দক্ষিণে ঠেলিলে কাচের তড়িৎকে উত্তরে টানিবে। আবার কাচের তড়িৎ কাগজ টানে; গালার তড়িৎও কাগজ টানে, কিন্তু উভয়ে একত্র অবস্থিত হইলে পরস্পরের ক্রিয়া নাশ করে। কাজেই, গণিতজ্ঞের কাছে কাচের তড়িতের সঙ্গে গালার তড়িতের সম্পর্ক ধনরাশির সহিত ঋণরাশির সম্পর্কের সমান।

এই ব্যবহার-ভেদ দেখিয়া রেশমে ঘষিলে কাচে যে তড়িতের আবির্ভাব অনুমিত হয়, তাহার নাম দেওয়া হইয়াছে ধনতড়িৎ, আর পশমে ঘষিলে গালায় যে তড়িতের আবির্ভাব অনুমিত হয়, তাহার

নাম দেওয়া হইয়াছে ঋণতড়িৎ। নাম দুইটা উল্টা পাল্টা করিলে কিছুমাত্র ক্ষতি নাই। পরে দেখা যাইবে, উল্টা পাল্টা করিলেই বরং ভাল হইবে। কিন্তু ঐ নামই পণ্ডিতেরা দিয়া ফেলিয়াছেন, আর নাম বদলান চলে না।

তড়িতের আবির্ভাব অনুমান মাত্র, উহার ক্রিয়াকলাপ প্রত্যক্ষ-গোচর বটে, কিন্তু যাহার আবির্ভাবে আকর্ষণ বা বিকর্ষণ প্রত্যক্ষগোচর হয়, তাহা সম্পূর্ণ আনুমানিক বা কাল্পনিক পদার্থ। কিন্তু এই কল্পনা ব্যাপারে পণ্ডিতে পণ্ডিতে একটু মতভেদ আছে। তাহার উল্লেখের দরকার।

একজন পণ্ডিত বলেন, বাস্তবিকই দুই রকমের তড়িৎ আছে, তাহাদের ধর্ম্ম পরস্পর বিরুদ্ধ। আর একজন বলেন, না, দুই রকমের তড়িৎ কল্পনার দরকার নাই, এক রকমেরই তড়িৎ আছে; তাহার বৃদ্ধি হইলে আমরা বলি ধনতড়িতের আবির্ভাব; আর হ্রাস হইলে বলি ঋণতড়িতের আবির্ভাব।

যেমন একই টাকা পরের বাক্স হইতে নিজের বাক্সে আসিলে হয় ধন, আর নিজের বাক্স হইতে পরের বাক্সে গেলে হয় ঋণ, সেইরূপ একই তড়িৎ কাচে আসিলে উহাকে বলা যায় ধনতড়িৎ, আর গালা হইতে বাহির হইয়া গেলে বলা যায় ঋণতড়িৎ।

দুই দলের পণ্ডিত দুই রকম অনুমান করেন। কোন্‌টা গ্রহণ করিব? যেটা ইচ্ছা সেইটা গ্রহণ করা যাইতে পারে। কেননা, তড়িৎ পদার্থটাই অনুমান মাত্র, উহার ফলই প্রত্যক্ষ-গোচর। আর উভয় অনুমানে যদি একই ফল পাওয়া যায়, তবে উভয়ের মধ্যে যেটা ইচ্ছা সেইটা গ্রহণ করা যাইতে পারে।

ধনের বৃদ্ধিতে যে ফল, ঋণের হ্রাসে সেই ফল, আবার ধনের

হ্রাসে যে ফল, ঋণের বৃদ্ধিতেও সেই ফল। যেখানে আমরা ফল লইয়া কারবার করি, মূলের খোঁজ-খবরই রাখি না, সেখানে অকারণ গণ্ডগোলে কোন দরকারই নাই।

যাঁহার ইচ্ছা হয়, তিনি মনে করুন, তড়িৎ দ্বিবিধ; ধনতড়িৎ আর ঋণতড়িৎ। আর যাঁহার ইচ্ছা হয় মনে করুন তড়িৎ একবিধ, উহার বৃদ্ধি ধনতড়িৎ, ক্ষয় ঋণতড়িৎ, অথবা উহার আবির্ভাব ধনতড়িৎ, তিরোভাব ঋণতড়িৎ। গালায় ঋণতড়িতের আবির্ভাব হইয়াছে বলিলে যে ফল, গালা হইতে খানিকটা ধনতড়িতের তিরোভাব হইয়াছে বলিলেও ঠিক্ সেই ফল।

যদি কাহারও ইচ্ছা হয় বলিতে পারেন, ঋণতড়িৎই তড়িৎ, অর্থাৎ পশমে ঘষিলে গালায় যে তড়িতের আবির্ভাব হয়, তাহাই তড়িৎ; রেশমে কাচ ঘষিলে কাচে কোন তড়িতের আবির্ভাব হয় না, কাচ হইতে ঋণতড়িৎ বাহির হইয়া যায়, ফলে কাচে ধনতড়িতের আবির্ভাব অনুমান করি। পরে দেখা যাইবে, আজি-কালি এই অনুমানটাই অনেকে সঙ্গত মনে করিতেছেন।

আমরা সম্প্রতি এই কথা-কাটাকাটি ছাড়িয়া দিয়া ধনতড়িৎ ও ঋণতড়িৎ উভয় শব্দই যদৃচ্ছাক্রমে ব্যবহার করিব। তবে মনে করিতে হইবে, ধনতড়িতের আবির্ভাব ও ঋণতড়িতের তিরোভাব সমানই কথা; আর ধনতড়িতের দক্ষিণে গমন আর ঋণতড়িতের উত্তরে গমন উভয়েরই সমান ফল ও সমান অর্থ। তামা হইতে দস্তায় ধনতড়িৎ চলিল বলিলে যে ফল, দস্তা হইতে তামায় ঋণতড়িৎ চলিল বলিলেও সেই ফল।

এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, কাচের ধনতড়িৎ আসে কোথা হইতে? রেশমে ঘষিবার সময়ে উহার সৃষ্টি হয়, না অন্য কোন স্থান হইতে

উহা স্থানান্তরিত হয়? এই প্রশ্নের উত্তর না দেওয়া চলে এমন নহে। প্রকৃতই দেখা যায়, কাচে রেশমে ঘর্ষণের ফলে কাচে যেমন ধনতড়িতের আবির্ভাব হয়, রেশমেও সঙ্গে সঙ্গে ঋণতড়িতের আবির্ভাব হইয়া থাকে। ঐ কাচ আর ঐ রেশম উভয়কে একত্র আনিলে উহাদের লঘু বস্তু আকর্ষণের ক্ষমতা লোপ পায়। কাচের ধনতড়িতের মাত্রা রেশমের ঋণতড়িতের মাত্রার ঠিক সমান দেখা যায়। ঠিক সমান না হইলে আকর্ষণের ক্ষমতা সম্পূর্ণভাবে লোপ পাইত না—একটু না একটু থাকিয়া যাইত। দেনা-পাওনা দুই সমান হইলে দুইই সম্পূর্ণভাবে লোপ পায়। সমান না হইলে হয় কিছু দেনা, কিংবা কিছু পাওনা দাঁড়ায়। এখানে আকর্ষণের সম্পূর্ণ লোপাপত্তি দেখিয়া বুঝিতে হইবে কাচে ধনতড়িতের পরিমাণ রেশমে আবির্ভূত ঋণতড়িতের পরিমাণের ঠিক্ সমান।

রেশমে ঋণতড়িতের আবির্ভাব হইয়াছে বলিলে যে ফল, ধনতড়িৎ রেশম হইতে বাহির হইয়া গিয়াছে বলিলেও সেই ফল। অতএব এস্থলে আমরা বলিতে পারি, খানিকটা ধনতড়িৎ রেশমের ভিতর হইতে বাহির হইয়া কাচে প্রবেশ করিয়াছে, অথবা খানিকটা ঋণতড়িৎ কাচ হইতে বাহির হইয়া রেশমে গিয়াছে। অর্থাৎ তড়িতের সৃষ্টি হয় নাই, তড়িৎ কেবল একটা দ্রব্য হইতে অন্য দ্রব্যে স্থানান্তরিত হইয়াছে মাত্র।

যাঁহারা দ্বিবিধ তড়িতের অস্তিত্ব অনুমান করেন, তাঁহারা বলিবেন, উভয় তড়িৎ সমান ভাগে মিশ্রিত অবস্থায় ছিল, কাজেই, ঘর্ষণের পূর্ব্বে কাহারও অস্তিত্ব টের পাওয়া যায় নাই। ঘর্ষণের ফলে উহারা বিশ্লিষ্ট হইয়া ধনটা গিয়াছে কাচে, আর ঋণটা গিয়াছে রেশমে, যতটা ধন কাচে গিয়াছে, ততটা ঋণ রেশমে গিয়াছে।

ফলে কেবল ভাষার মার-প্যাচ। ও গোল না তোলাই ভাল। আসল কথাটা এই, কোন দ্রব্যে খানিকটা ধনতড়িতের আবির্ভাব দেখিলেই বুঝিতে হইবে অন্য কোন দ্রব্যে ঠিক্ ততটা ধনতড়িতের তিরোভাব হইয়াছে, অথবা (ভিন্ন ভাষায়) ঠিক্ ততটা ঋণতড়িতের আবির্ভাব হইয়াছে। এই "ঠিক ততটা" কথাটাই মূল্যবান্। কেননা, যেখানেই তড়িতের আবির্ভাব দেখা গিয়াছে, ঐ "ঠিক ততটার" ব্যতিক্রম কোথাও দেখা যায় নাই। গালায় পশম ঘষিলে গালাতে যতটা ঋণতড়িতের আবির্ভাব হয়, পশমেও ঠিক ততটা ধনতড়িতের আবির্ভাব ঘটিয়া থাকে।

গালা আর পশম, কাচ আর রেশম কেবল উদাহরণ স্বরূপে লওয়া গিয়াছে মাত্র। ফলতঃ যে কোন দুইটা দ্রব্য পরস্পর ঘর্ষণ করিলেই একটায় ধনতড়িতের আর অন্যটায় ঠিক ততটা ঋণতড়িতের আবির্ভাব দেখা যায়। দুইটা দ্রব্য বিভিন্ন প্রকৃতির হওয়া আবশ্যক। কাচে কাচে বা গালায় গালায় ঘর্ষণে তড়িতের আবির্ভাব হয় না।

কাচ, গালা, গন্ধক, রবার প্রভৃতি দ্রব্যে পশম, রেশম, বিড়ালের চামড়া, বাঘের চামড়া প্রভৃতি যে কোন দ্রব্য ঘষিলেই একটাতে ধন-তড়িতের, একটায় ঋণতড়িতের আবির্ভাব দেখান খুব সহজ। কোন্ জিনিষটায় ধনের আর কোনটায় ঋণের আবির্ভাব হইবে, তাহা অবশ্য পরীক্ষা দ্বারা স্থির করিয়া লইতে হইবে। তড়িতের আবির্ভাব হইয়াছে কিনা জানিবার সহজ উপায় একই; এক টুকরা শোলাকে রেশমী সুতায় ঝুলাইয়া রাখ, উহার কাছে লইয়া গেলে যদি আকর্ষণ দেখা যায়, তবেই বুঝিব, তড়িতের আবির্ভাব হইয়াছে। ধনের আবির্ভাব হইয়াছে কি ঋণের আবির্ভাব হইয়াছে, তাহা কেবল আকর্ষণ দেখিলে বুঝা যাইবে না। সেখানে তুলনা আবশ্যক হইবে।

রেশমে-ঘষা কাচের অথবা পশমে-ঘষা গালার সহিত মিলাইয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে, ধনতড়িতের, না ঋণতড়িতের বিকাশ হইয়াছে।

তবে সকল দ্রব্যে তড়িতের আবির্ভাব বুঝা সহজ নহে। ধাতু দ্রব্যে অন্য দ্রব্য ঘর্ষণ করিলে উহাতেও তড়িতের আবির্ভাব হয়, কিন্তু উহা সকল সময়ে টের পাওয়া যায় না। ধাতু দ্রব্য তড়িৎকে আটকাইয়া রাখিতে পারে না। কাচ, গালা, রেশম, পশম প্রভৃতি যে সকল দ্রব্য ধাতুনির্ম্মিত নহে, তাহারা আবির্ভূত তড়িৎকে আট্কাইয়া রাখে। যে প্রদেশটাতে ঘর্ষণ হয়, তড়িৎটাও যেন সেই প্রদেশেই আবদ্ধ থাকে, অন্যত্র সরিয়া যায় না। আর ধাতুদ্রব্যের এক জায়গায় ঘষিলে সেই তড়িৎ তৎক্ষণাৎ অন্যত্র সরিয়া যায়, খুঁজিয়া তাহার সন্ধান পাওয়া দায়। ধাতুমাত্রেরই এই দোষ।

কোন দ্রব্য তড়িৎকে ধরিয়া রাখে, কোন দ্রব্য রাখে না, এই জন্য দ্রব্যমাত্রকে দুই থাকে ফেলা হয়। ধাতু দ্রব্যকে বলা হয় তড়িতের পরিচালক; তড়িৎ উহার ভিতর দিয়া অবাধে সঞ্চলন করে, উহা তড়িৎকে আট্কায় না। আর কাচ, গালা, রবার, রেশম, পশম, গন্ধকের মত জিনিষ অপরিচালক, উহারা তড়িৎকে পলাইতে দেয় না। আট্কাইয়া রাখে।

মনুষ্যদেহ পরিচালক, মাটিও পরিচালক। ধাতু দ্রব্য হাতে ধরা থাকিলে, উহাতে আবির্ভূত তড়িৎ তৎক্ষণাৎ মনুষ্যদেহ আশ্রয় করিয়া ভূমিতে সঞ্চালিত হয়। বসুন্ধরায় প্রবেশ করিলে তখন আর তাহাকে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

কাজেই, ধাতুদ্রব্যে তড়িতের আবির্ভাব দেখিতে হইলে উহাকে হাতে ধরিলে চলিবে না; কোন অপরিচালক দ্রব্যের সাহায্যে ধরিতে হইবে। রেশমের সূতায় ঝুলাও, অথবা কাচের হাতল বা গালার

হাতল দিয়া ধর। টেবিলের উপর রাখা চলে না, কেননা কাঠ পরিচালক, তবে টেবিলের পায়া যদি কাচের হয়, তবে চলিতে পারে। আবার সেই কাচের পায়াতে যদি ময়লা থাকে, কিংবা জল থাকে, তবে তাহারই আশ্রয়ে তড়িৎ পলাইয়া যাইবে। কেননা, ময়লা বা জল পরিচালক। বায়ু অপরিচালক, বাষ্পও অপরিচালক, কিন্তু বায়ুতে জলীয় বাষ্পের ভাগ অধিক থাকিলে, বাষ্প কিঞ্চিৎ ঘনীভূত হইয়া তরল জলে পরিণত হইয়া কাচের গায়ে লগ্ন থাকিতে পারে; তড়িৎ পরিচালনার পক্ষে তাহাই যথেষ্ট।

এই সকল কারণে ধাতু দ্রব্যে তড়িতের বিকাশ দেখাইতে হইলে বিশেষ সাবধানতা আবশ্যক। কাচ গালা রবারের মত দ্রব্যের বেলায় তত হাঙ্গামার দরকার নাই। একখানা কাচের একদেশে তড়িৎ অবস্থান করিতে পারে; কিন্তু একটা পিতলের জিনিষের একদেশে অবস্থান করিবে না। কাচের খুঁটির উপর একটা পিতলের জিনিষ বসাইয়া উহার কোন একদেশে তড়িতের আবির্ভাব করিবা মাত্র সেই তড়িৎটা উহার সর্ব্বদেশে ক্ষণমাত্রে ছড়াইয়া পড়ে। চারিদিকে বায়ু অপরিচালক; আধারস্বরূপ যে কাচের খুঁটি, তাহাও অপরিচালক, কাজেই, পিতল ছাড়িয়া পলাইতে পারে না বটে, কিন্তু পিতলের সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে।

"সর্ব্বত্র" বলিলে ঠিক হয় না। পিতলের যদি একটা বাটি লওয়া যায়, তাহা হইলে দেখা যায়, ঐ বাটির পিঠের সর্ব্বত্র তড়িৎ রহিয়াছে; কিন্তু উহার পেটে তড়িৎ নাই। ফাঁপা বর্তুল লইলে সমস্ত তড়িৎটা পিঠের উপর ছড়াইয়া থাকে, ভিতরে এক কণিকাও থাকে না।

জলের উপর দুই ফোঁটা তেল ঢালিলে তেলটা যেমন জলের পিঠের উপরই ছড়াইয়া পড়ে, জলের ভিতরে কিছুতেই প্রবেশ করিতে

চায় না ; তড়িৎ—ধনই হউক আর ঋণই হউক—কিছুতেই ধাতু দ্রব্যের পিঠ ছাড়িয়া ভিতরে প্রবেশ করিতে চাহে না।

পিঠের উপরেই থাকে ; তাহাতেও আবার একটু বিশেষত্ব আছে ; পিঠের যে স্থানটা উঁচু বা কুব্জাকৃতি, সেইখানটাতেই অধিক মাত্রায় থাকে, আর যে স্থানটা নীচু, খাল, গভীর, সেখানটায় হয় থাকে না, বা খুব অল্প মাত্রায় থাকে।

পিতলের বর্তুলের পিঠ কুব্জ বটে ; কিন্তু উহার কুব্জতা সর্ব্বত্র সমান, তাই বর্তুলের পিঠে সর্ব্বত্র সমান ভাবে ছড়াইয়া পড়ে ; কিন্তু ঐ পিঠের উপর আবার উঁচু নীচু থাকিলে তখনি খানিকটা তড়িৎ নীচু স্থানটা হইতে সরিয়া গিয়া উঁচু ঢিপিটার উপর জমা হইবে।

পৃথিবী একটা বৃহৎ বর্তুল। উহার ব্যাস প্রায় আট হাজার মাইল। অর্থাৎ পৃথিবীর কেন্দ্র হইতে চারি হাজার মাইল দূরে উহার পিঠ। পৃথিবী বর্তুলাকার বটে, কিন্তু উহার পিঠ বন্ধুর, উঁচু-নীচু। যেখানে পাহাড়-পর্ব্বত সেইখানটা উঁচু ; হিমালয় পর্ব্বতেরই এক একটা চূড়া বাঙ্গালার জমি ছাড়িয়া চারি পাঁচ মাইল উঁচু। আবার পৃথিবীর পিঠে স্থানে স্থানে গভীর খাল ; যেখানে খাল, সেইখানে জল দাঁড়াইয়া সমুদ্র হইয়াছে। বাঙ্গালার জমির দক্ষিণেই পৃথিবীর পিঠ হঠাৎ নামিয়া গিয়াছে। তাই সেখানে জল দাঁড়াইয়া বঙ্গসাগরের ও তাহার দক্ষিণে ভারত মহাসাগরের সৃষ্টি করিয়াছে। সমুদ্রের গভীরতা স্থানে স্থানে পাঁচ ছয় মাইলের অধিক। তাহাহইলে দেখা গেল, যে, পৃথিবীরূপ কঠিন বৃহৎ বর্তুলের পিঠ কোথাও উঁচু, কোথাও নীচু। আর জল উঁচু জায়গা ছাড়িয়া নীচু জায়গায় দাঁড়াইয়াছে ও সমুদ্রের উৎপত্তি করিয়াছে।

জলের স্বভাবই এই। হিমালয়ের উপরে বর্ষাকালে কত বৃষ্টি

হয়। সেই বৃষ্টির জল কিন্তু হিমালয়ের পিঠে দাঁড়ায় না। হিমালয় হইতে নামিয়া ভারতবর্ষ ধুইয়া গঙ্গাব্রহ্মপুত্ররূপে সেই সাগরের জলে গিয়া মেশে।

জলের স্বভাব এইরূপ, তড়িতের স্বভাব যেন তাহার উল্টা। বিধাতা এককালে পৃথিবী গড়িয়া তাহার পিঠে প্রচুর জল ঢালিয়াছিলেন, সমস্ত জলটা পাহাড় পর্ব্বত ত্যাগ করিয়া নিম্নে সাগরগর্ভে জমায়েত হইয়াছে। জল না ঢালিয়া যদি তড়িৎ ঢালিতেন, তাহা হইলে উল্টা ফল হইত। তড়িৎটা সমুদ্রের নিম্নভূমি ত্যাগ করিয়া পাহাড় পর্ব্বতে পড়িত; আর পাহাড় পর্ব্বতের আবার যে জায়গাটা যত উঁচু, আর যত কুজো, আর যত ছুঁচ্লো সেই খানে তত অধিক পরিমাণে জমিত।

সমুদ্র দূরে যাক্, বাঙ্গালার এমন বিস্তীর্ণ মাঠ ছাড়িয়া অধিকাংশ তড়িৎ হিমালয়ে পড়িত ও হিমালয়ের আবার ধবলগিরি ও কাঞ্চনজঙ্ঘা শৃঙ্গের উপরই প্রচুর তড়িৎ মজুত হইত।

তড়িতের ব্যবহারটা বুঝিবার জন্য এই উপন্যাস। বস্তুতঃ তড়িতের সহিত জলের কোন মিল নাই। জল ইন্দ্রিয়গোচর তরল পদার্থ; তড়িৎ কোন জড়পদার্থ কি না তাহাই জানি না; কোন বস্তু কি না তাহাও সহসা বলিতে পারি না; উহা একটা আনুমানিক পদার্থ মাত্র। বৈজ্ঞানিকেরা উহার অস্তিত্ব কল্পনা করেন বা অনুমান করেন; লঘু দ্রব্যের প্রতি আকর্ষণ দেখিয়া অনুমান করেন; আর যেখানে দেখেন আকর্ষণের মাত্রা অধিক, সেখানে অনুমান করেন তড়িতেরও মাত্রা অধিক। ব্যাপারটা নিরবচ্ছিন্ন কল্পনা। তড়িৎ কাল্পনিক; কিন্তু উহার ক্রিয়াকলাপ প্রত্যক্ষগোচর।

ফলে এই অনুমানলব্ধ তড়িৎনামা পদার্থ—লঘু পদার্থের প্রতি

আকর্ষণ দেখিয়া যাহার অস্তিত্ব অনুমিত হয়, তাহা ধাতু দ্রব্যে আবির্ভূত হইলে উহার পিঠের উপর ছড়াইয়া পড়ে, আর পিঠের উপর আবার যে স্থানটা যত কুজো, যত ছুঁচ্‌লো থাকে, সেই স্থানটা তত পছন্দ করে। ইহার ফলে এই হয় যে, তড়িতের প্রত্যক্ষ ফল যে আকর্ষণ, সেই আকর্ষণ সেই ধাতুদ্রব্যের ভিতরে একবারে লোপ পায়।

ফাঁপা পিত্তলের বর্তুলকে তড়িন্ময় করিলে উহার ভিতরে আকর্ষণের চিহ্ন মাত্র পাওয়া যায় না; অথচ বর্তুলের বাহিরে সেই আকর্ষণ পূর্ণমাত্রায় বিরাজ করে।

কিছু দিন আগে ইংরেজের দেশে মাইকেল ফারাডে নামক এক ব্যক্তি ছিলেন। তিনি ছিলেন এক কালে বহি-বাঁধা দপ্তরী; শেষে তিনি হইয়াছিলেন এক জন জগন্মান্য বৈজ্ঞানিক। আধুনিক তড়িদ্বিজ্ঞানের সমুদয় ভিত্তিটার তিনি একাকী প্রতিষ্ঠা করেন বলিলেও চলে। তাঁহার পূর্ব্বে তড়িৎ-ঘটিত নানা কথা নানা লোকে আবিষ্কার করিয়াছিল। কিন্তু সে সকল খাপছাড়া হইয়া ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ছিল মাত্র। পূর্ব্বগামীরা কতক ইটের সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন মাত্র। মাইকেল ফারাডে আরও পাকা শক্ত ইটের সংগ্রহ করেন; স্বহস্তে মশলা তৈয়ার করিয়া ইটের উপর ইট গাঁথেন ও স্বহস্তে তড়িদ্বিজ্ঞানরূপ বিশাল অট্টালিকার নক্সা তৈয়ার করিয়া ভিত্তি গাঁথেন। পরবর্ত্তী বৈজ্ঞানিকেরা সেই দৃঢ় ভিত্তির উপর অট্টালিকা তুলিতেছেন মাত্র। যে ইংরেজের মধ্যে নিউটনের জন্ম, সেই ইংরেজের মধ্যেই ফারাডের জন্ম। ইংরেজ জাতিটা বড় ভাগ্যবান্।

সেই ফারাডে এক বৃহৎ খাঁচা তৈয়ার করিয়া তাহাকে টিনে মুড়িয়াছিলেন ও টিনেমোড়া খাঁচাকে অপরিচালক আধারের উপর রাখিয়া উহাকে তড়িন্ময় করিয়াছিলেন। প্রচুর তড়িতের আবির্ভাবে

সেই খাঁচার বাহিরে দাঁড়ান দুঃসাধ্য হইয়াছিল। ফারাডে নিজে সেই খাঁচার ভিতর প্রবেশ করিয়া তড়িতের কোন চিহ্নই টের পান নাই। তড়িতের আকর্ষণ ধরিবার জন্য নানা সূক্ষ্ম যন্ত্র লইয়াও আকর্ষণের কোন চিহ্ন পান নাই। কিরূপে পাইবেন ? তড়িৎটা খাঁচার পিঠে, অর্থাৎ বাহিরের গাত্রে এরূপ ভাবে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল, যে ভিতরে তাহার আকর্ষণের একবারে লোপ।

কতটা তড়িৎ কতদূরে থাকিলে কি মাত্রায় আকর্ষণ করিবে, তাহা হিসাব করিয়া বলা চলে।

একজন ফরাসী পণ্ডিত ফারাডের বহু পূর্ব্বে সেই হিসাবের উপায় বলিয়া দিয়াছিলেন। তড়িৎ যত দূরে থাকে, উহার আকর্ষণ ক্ষমতা তত কমে। দ্বিগুণ দূরে গেলে আকর্ষণ চারিভাগের একভাগ হয়। নিয়মটা এইরূপ। হিসাবের নিয়মটা একবার বাহির হইলে তখন গণিতজ্ঞ পণ্ডিতের হাতে পড়ে। গণিত শাস্ত্রের অব্যর্থ গণনায় বলা চলে, এখানে এতটা, ওখানে এতটা, সেখানে এতটা তড়িৎ যদি থাকে, তবে ঐখানে আকর্ষণের মাত্রা কত হইবে।

ধাতু দ্রব্যের পিঠে তড়িৎ ছড়াইয়া থাকিলেও গণিতের হিসাবে উহার আকর্ষণ বাহিরেই বা কত, ভিতরেই বা কত, তাহা বলা চলে। গণিতজ্ঞ হিসাব করিয়া দেখাইয়া দেন, যে ধাতু-দ্রব্যের পিঠে তড়িৎ এমনভাবে ছড়াইয়া পড়ে যে বাহিরে আকর্ষণ প্রকাশ পায়, কিন্তু ভিতরে আকর্ষণ থাকেই না।

ভিতরে আকর্ষণ একবারে লোপ পায় কিরূপে বুঝিবার চেষ্টা করা উচিত। মনে কর, ফারাডে খাঁচার ভিতর দণ্ডায়মান এবং তিনি নিজেই লঘু দ্রব্য। আচ্ছা, তিনি নিজে লঘু না হউন, তাঁহার রুমাল খানা লঘু বটে। এখন সেই রুমালের উপর তড়িতের আকর্ষণ আছে

কি না? তড়িৎ আছে খাঁচার সমস্ত পিঠে, রুমাল আছে খাঁচার ভিতরে। কাজেই, তড়িৎ রহিল রুমালের ডাহিনে বামে, উপরে নীচে, সম্মুখে পশ্চাতে সর্ব্বত্র। কেহ টানে ডাহিনে, কেহ বামে, কেহ সম্মুখে, কেহ পিছনে। চারিদিকের টানের ফলে সকল টানই কাটাকাটি হইয়া যায়। রুমালের উপর আর কোন টানই পড়ে না।

তড়িৎ যে ধাতু-দ্রব্যের ভিতরে না থাকিয়া পিঠের উপর ছড়াইয়া পড়ে, ও পিঠের উপরেও আবার যেখানটা বেশী কুব্জ দেখে, সেই খানটায় স্তূপীভূত হয়, ইহারই ফলে ভিতরের আকর্ষণ একবারে লোপ পায়। গণিতজ্ঞেরা ইহা হিসাব করিয়া দেখাইতে পারেন। তড়িতের যদি ঐরূপ প্রকৃতি না থাকিত, তাহা হইলে ধাতু দ্রব্যের অভ্যন্তরে আকর্ষণটা একবারে লোপ পাইত না। কিছু না কিছু থাকিয়া যাইত।

ধাতু-দ্রব্যেই অর্থাৎ পরিচালক দ্রব্যেই তড়িতের ঐরূপ ছড়াইয়া পড়িবার প্রকৃতি ও কুব্জ স্থানে স্তূপীভূত হইবার প্রকৃতি। অপরিচালক দ্রব্যে সে প্রকৃতি নাই। অপরিচালক দ্রব্যের তড়িৎ ভিতরেও থাকিতে পারে বাহিরেও থাকিতে পারে। পিঠের উপরে ও আবার কুব্জো স্থানে স্তূপীভূত হইবার তেমন প্রকৃতি দেখা যায় না। ফলে, অপরিচালক দ্রব্যে, কাচের বা গালার বা গন্ধকের কোন ফাঁপা জিনিষে তড়িৎ সঞ্চালন করিলে, উহার ভিতরেও যে আকর্ষণ লোপ পাইবে তেমন কথা নাই। লোপ না পাইবারই কথা। পরিচালক ও অপরিচালকে এই একটা মৌলিক প্রভেদ।

অপরিচালকের যেখানে যতটা ইচ্ছা তড়িৎ রাখা চলে, ওখানে আমার কর্ত্তৃত্ব চলে। কিন্তু পরিচালকের উপর আমার কর্ত্তৃত্ব নাই। উহার কোন এক খানে খানিকটা তড়িৎ প্রয়োগ মাত্র উহা নিজের

স্বভাবানুসারে পিঠের উপর ছড়াইয়া পড়ে ও এমন ভাবে ছড়াইয়া পড়ে, এমন ভাবে নিম্ন স্থান ত্যাগ করিয়া উচ্চ স্থানে উঠিয়া বসে, যে ভিতরে উহার আকর্ষণ টের পাওয়া যায় না। পরিচালকে তড়িতের ব্যবহার আর অপরিচালকে তড়িতের ব্যবহারে এই মৌলিক প্রভেদ। একটায় আমার কর্ত্তৃত্ব নাই, অন্যটা আমার ইচ্ছাধীন। যেন জল আর বালি। উঠানের উপর যেখানে যত ইচ্ছা আমি বালির স্তূপ রাখিতে পারি। কোথাও দশ হাত উঁচু, কোথাও দুই হাত উঁচু, কোথাও বা কিছুই থাকিল না। কিন্তু জলের বেলায় আমার কর্ত্তৃত্ব থাকিবে না। উঠানের এক জায়গায় জলের ঢিপি বা স্তূপ গাঁথা আমার সাধ্য নহে। জল আপনার স্বভাবানুসারে উঠানে ছড়াইয়া পড়িবে। পরিচালক দ্রব্যের পিঠে তড়িৎ যেমন আপন স্বভাবানুসারে ছড়াইয়া পড়ে, জলও তেমনি উঠানের উপর আপন স্বভাবানুসারে ছড়াইয়া পড়ে। তবে তড়িতের স্বভাব হইতেছে ঢিপির উপর চড়া, আর জলের স্বভাব হইতেছে খালের ভিতর নামা। এই তফাৎ। পরিচালক পদার্থে তড়িতের এই স্বভাব দোষেই তড়িৎকে আটকান কঠিন। একটা পিতলের দ্রব্যে খানিকটা তড়িৎ সঞ্চিত আছে; আর একটা পিতলের দ্রব্য উহাতে স্পর্শ করিবা মাত্র কতকটা তড়িৎ তৎক্ষণাৎ এই দ্বিতীয় দ্রব্যে সঞ্চালিত হইবে ও উহার পিঠের উপর আপন স্বভাবানুযায়ী স্থান করিয়া লইবে।

পৃথিবীটা নিজে এক প্রকাণ্ড পরিচালক। পিতলের দ্রব্যটায় কিছু তড়িৎ সঞ্চিত করিয়া উহাকে ভূমি স্পর্শ করাইবা মাত্র সেই তড়িৎটা তৎক্ষণাৎ পৃথিবীতে চলিয়া যায় ও প্রকাণ্ড পৃথিবীর প্রকাণ্ড পিঠে ছড়াইয়া পড়ায় উহাকে আর খুঁজিয়া পাওয়াই যায় না। ফলে, তড়িৎটা নষ্ট হয় নাই বুঝিতে হইবে। উহা ছিল পিতলের বাটির

পিঠে, এখন আছে ভূমণ্ডলের পিঠে। দুইটা পিতলের বাটি; একটায় কিছু তড়িৎ আছে, অন্যটায় কিছু নাই, অথবা দুইটাতেই কিছু কিছু আছে। দুইটা বাটি পরস্পর স্পর্শ ঘটিবা মাত্র সমুদয় তড়িৎটা দুইটার মধ্যে ভাগা-ভাগি হইয়া যায়। উহারা বেশ পরামর্শ করিয়া সমস্ত তড়িৎটা উভয়ে বাঁটিয়া লয়। মোটের উপর যেটা বড়, সেটার ভাগেই বেশী পড়ে, যেটা ছোট, সেটার ভাগে কম পড়ে।

পৃথিবীর সঙ্গে বণ্টনের ব্যবস্থা হইলে পৃথিবীর ভাগে সিংহের ভাগ পড়ে। পৃথিবী এত বড়, যে প্রায় সমস্তটাই টানিয়া লয়; অন্য দ্রব্যের ভাগে যে টুকু থাকে, তাহা আর সূক্ষ্মতম যন্ত্রেও ধরা পড়ে না। কোন ধাতুদ্রব্যে সঞ্চিত তড়িৎ যদি একবারে খেদাইতে চাও, তাহার উপায় এই। উহাকে ভূমি স্পর্শ করাও। এ পর্য্যন্ত তড়িতের ব্যবহার এক রকম বুঝা গেল। দুইটা দ্রব্যের পরস্পর ঘর্ষণে দুই দ্রব্যেই তড়িতের আবির্ভাব ঘটে। একটায় যতটা ধনতড়িৎ, অন্যটায় ঠিক ততটা ঋণতড়িৎ আবির্ভূত হয়। লঘু দ্রব্যের আকর্ষণে উভয়ের অস্তিত্ব ধরা পড়ে; অথবা লঘু দ্রব্যের আকর্ষণ হইতেছে দেখিয়াই আমরা তড়িতের আবির্ভাব অনুমান করি এবং আকর্ষণের মাত্রা দেখিয়া তড়িতেরও মাত্রা অনুমান করি। প্রবল আকর্ষণ দেখিলে মনে করি অনেকটা তড়িৎ, ক্ষীণ আকর্ষণে মনে করি অল্প তড়িৎ। দূরে গেলে সেই আকর্ষণের মাত্রা কমিতে দেখা যায়; দ্বিগুণ দূরে গেলে চারি ভাগ, তিনগুণ দূরে গেলে নয় ভাগ, এই নিয়মে কমিতে দেখা যায়। কাজেই, কত দূরে থাকিয়া কতটা আকর্ষণ করিতেছে, তাহাই দেখিয়া তড়িতের মাত্রার অনুমান চলে।

এই তড়িৎকে ধাতু দ্রব্যের একদেশে আটকান চলে না। ধাতু দ্রব্যের ভিতরে ত উহা থাকেই না; পিঠের উপরও উচ্চ স্থান পছন্দ

করিয়া লয়। এমন ভাবে ধাতু দ্রব্যের উপরে ছড়াইয়া পড়ে যে, ভিতরে মোটের উপর আকর্ষণ থাকে না, বাহিরে যথেষ্ট পরিমাণে থাকে। দুইটা ধাতুদ্রব্য পরস্পর সংলগ্ন থাকিলে একটার তড়িতের কিয়দংশ অন্যটায় যায়; দুইটার মধ্যে বাঁটাবাঁটি হইয়া যায়; বড়টার ভাগে বেশী পড়ে। অপরিচালক দ্রব্যে তড়িতের এরূপ প্রকৃতি নাই। উহার যে কোন স্থানে যতটা ইচ্ছা তড়িৎ সঞ্চিত রাখা চলে। ফলে, উহার ভিতরে বাহিরে সর্ব্বত্র তড়িতের আকর্ষণ-ফল দেখা যায়। এক স্থানে সঞ্চিত তড়িৎ অন্যত্র যাইতে চাহে না। কাজেই, অপরিচালকে তড়িৎ ধরিয়া রাখা সহজ। পরিচালকে তড়িৎ সঞ্চিত রাখিতে হইলে উহাকে অপরিচালক আধারে রাখিতে হইবে; নতুবা পৃথিবীতে সঞ্চালিত হইলে পৃথিবীর ভাগেই সমস্তটা যাইবে; কিছুই অবশেষ থাকিবে না।

এ পর্য্যন্ত বেশ। এখন একটা নূতন কথার অবতারণা আবশ্যক। মনে কর, একটা রেশমে-ঘষা কাচে খানিকটা তড়িৎ সঞ্চিত আছে। বলা বাহুল্য, সেই তড়িৎটা ধনতড়িৎ। অবশ্য উহা অপরিচালক আধারের উপর অবস্থিত, নতুবা পলাইয়া যাইত। উহার সম্মুখে হাত খানেক দূরে পিতলের একটা গোলা রাখিলাম; উহাকেও অপরিচালক আধারে রাখা গেল। বলা বাহুল্য, ঐ গোলায় কণিকামাত্র তড়িৎ ছিল না; ধনও না, ঋণও না। কিন্তু ঐ ধনতড়িতের সম্মুখে রাখিবামাত্র ঐ গোলার পিঠে তড়িতের আবির্ভাব হইবে। যে পিঠটা কাচে সঞ্চিত ধনতড়িতের সম্মুখে ও নিকটে, সেই পিঠে হইবে ঋণতড়িতের আবির্ভাব, আর যে পিঠ দূরে, সেই পিঠে হইবে ধনতড়িতের আবির্ভাব। খানিকটা ধনতড়িৎকে কে যেন ঠেলিয়া পিতলের গোলার ও-পিঠে—দূরের পিঠে সঞ্চারিত করিয়াছে। এ-পিঠে তাই ঠিক্ ততটা ধনতড়িতের অভাব হইয়াছে, অর্থাৎ ঋণতড়িতের

আবির্ভাব হইয়াছে। মনে রাখিতে হইবে, ধনতড়িতের অভাব আর ঋণতড়িতের আবির্ভাব একই কথা। কে এরূপ ঠেলা দিল? অবশ্য ঐ কাচে সঞ্চিত ধনতড়িতেরই এই কর্ম্ম। ঐ কাচের সহিত পিত্তলের গোলার কোন যোগ নাই। মাঝে বায়ুর ব্যবধান; সেই বায়ু অপরিচালক। অথচ সেই বায়ুরাশির ব্যবধান ভেদ করিয়া কাচের ধনতড়িৎ খানিকটা ধনতড়িৎকে দূরে ঠেলিয়া গোলার এ-ধার হইতে ও-ধার লইয়া গিয়াছে। কাজেই, দেখা যাইতেছে, গোলার এ-পিঠে ঋণতড়িৎ, ও-পিঠে ধনতড়িৎ। যতটা ঋণ, ঠিক ততটা ধন। এখন যদি গোলাটা ছুঁইয়া ফেলি, অমনি উহার ধনতড়িৎটা আমার দেহ মধ্য দিয়া পরিচালিত হইয়া পৃথিবীর পিঠে ছড়াইয়া পড়িবে। গোলায় থাকিবে কেবল খানিকটা ঋণতড়িৎ।

গোলাটায় প্রথমে কণিকামাত্র তড়িৎ ছিল না। ধনতড়িতের সম্মুখে রাখিবামাত্র এক পিঠে ঋণ, অন্য পিঠে ধনতড়িতের বিকাশ হইল। উভয়ের মাত্রা কিন্তু সমান। যতটা ঋণ, ততটা ধন, মোটের উপর ফল শূন্য। পূর্ব্বেও ছিল শূন্য, এখনও শূন্য। কিন্তু ভূমি-স্পর্শের পর আর শূন্য নাই। তখন খানিকটা ঋণতড়িৎ মাত্র অবশিষ্ট। ধন-তড়িৎ খানিকটা যখন বাহির হইয়া গিয়াছে, তখন ঋণতড়িৎ থাকিবে বৈ আর কি? হাতে যেখানে এক কড়ি সম্বল নাই, তখন খয়রাৎ করিতে হইলে ঋণ উপার্জ্জন ভিন্ন উপায় কি? গোলার সম্বল ছিল মোটের উপর শূন্য; বাহিরে গেল ধন, হাতে থাকিল ঋণ। কেবল ঋণ।

কোন ধাতু-দ্রব্যে ঋণতড়িৎ সঞ্চয়ের এই সহজ উপায়। ধন-তড়িৎ সঞ্চয়ের উপায় ঠিক্ তাহার উল্টা। এ ক্ষেত্রে সেই ধাতু দ্রব্যকে ঋণতড়িতের সম্মুখে স্থাপিত করিতে হইবে। পশমে-ঘষা

গালার সম্মুখে অপরিচালক আধারের উপর রাখিতে হইবে। গালায় এবার আছে ঋণতড়িৎ। সেই ঋণতড়িৎ বায়ুর ব্যবধান সত্ত্বেও গোলার এ-পিঠ হইতে খানিকটা ঋণতড়িৎকে ঠেলিয়া ও-পিঠে লইয়া যাইবে। এ-পিঠে খানিকটা ঋণতড়িতের অভাব অর্থাৎ ঠিক ততটা ধনতড়িতের আবির্ভাব হইবে। এখন ভূমিস্পর্শ মাত্রে ঋণ-তড়িৎটা পৃথিবীতে চলিয়া যাইবে। গোলায় থাকিবে কেবল ধন। ঋণ-মোচনের ফল ধনবৃদ্ধি। পিতলের গোলায় ধনতড়িৎ সঞ্চিত হইল।

ধাতুদ্রব্যে ধনতড়িৎ বা ঋণতড়িৎ এইরূপে সহজে সঞ্চিত করা চলে। তড়িৎ সঞ্চয়ের এই উপায় নানা কাজে লাগান চলে। ঘর্ষণ দ্বারা অপরিচালক দ্রব্যে তড়িৎ সঞ্চয়ে সুবিধা আছে। কিন্তু ধাতু দ্রব্যে ঘর্ষণে সুবিধা হয় না। ঘর্ষণ করিতে গেলেই হস্তস্পর্শের আশঙ্কা থাকে, আর হস্তস্পর্শ মাত্রেই ভূমিতলে অন্তর্দ্ধানের আশঙ্কা। কিন্তু এই নূতন উপায়ে যে-কোন ধাতুদ্রব্যে যে-কোন তড়িৎ সঞ্চয় করা যায়। অপরিচালক আধারের উপর রেশমে-ঘষা কাচের বা পশমে-ঘষা গালার সম্মুখে রাখিয়া স্পর্শ করিলেই দেখা যাইবে, হয় ঋণ কিংবা ধনতড়িতের আবির্ভাব হইয়াছে। স্পর্শের সঙ্গে সঙ্গে খানিকটা ধনতড়িৎ পলাইয়া ঋণ রাখিয়া গিয়াছে, অথবা ঋণ অপসৃত হইয়া ধন রাখিয়া গিয়াছে। এখন যাহা সঞ্চিত আছে, তাহা আর সহজে পলাইবে না। এখন দশ দণ্ড কাল ছুঁইয়া থাকিলেও পলাইবে না। তবে যাহার বলে আছে, সেই রেশম-ঘষা কাচ অথবা পশম-ঘষা গালা যদি অপসৃত করি, তখন আর উহাকে রাখা চলিবে না। ছুঁইবামাত্র অন্তর্দ্ধান করিবে।

ইহাতে তড়িতের ব্যবহারে একটু রহস্য পাওয়া গেল। ধন-তড়িৎ দূরে থাকিয়াও ধনতড়িৎকে ঠেলিয়া আরও দূরে প্রেরণ করিতে

চায়, আর ঋণতড়িৎকে টানিয়া কাছে রাখিতে চায়। ঋণতড়িৎ সেইরূপ ঋণতড়িৎকে দূরে ঠেলিতে চায় ও ধনতড়িৎকে কাছে রাখিতে চায়। উভয়ের পরস্পর সম্বন্ধই এইরূপ।

উভয়ের এই স্বভাব। এই স্বভাবের ফলই ধনে ধনে বিকর্ষণ, ঋণে ঋণে বিকর্ষণ আর ধনে ঋণে আকর্ষণ। এই স্বভাবের ফলে যে সকল কাণ্ড ঘটে, তাহার আর দুই একটা উদাহরণ দিব।

মনে কর একটা টিনের বাক্স অপরিচালক টেবিলের উপর আছে। একটা পয়সায় ধনতড়িৎ সঞ্চয় করিয়া রেশমী সুতা দিয়া বাক্সের ভিতর ঝুলাইয়া দিলাম। পয়সায় যতটুকু ধন তড়িৎ আছে, ঠিক্ ততটুকু ধনতড়িৎ বাক্সের বাহিরের পিঠে আবির্ভূত হইবে, আর ঠিক্ ততটুকু ঋণতড়িৎ উহার ভিতরের পিঠে আবির্ভূত হইবে। অর্থাৎ পয়সায় সঞ্চিত ধনতড়িৎ আপন সমান মাত্রার ধনতড়িৎকে বাক্সের ভিতর হইতে ঠেলিয়া বাহিরের পিঠে চালাইয়া দিবে। বাক্সের ভিতরে হইবে ধনের অভাব বা ঋণের সঞ্চার, আর বাহিরে হইবে ধনের সঞ্চার। এখন ঐ বাক্স ছুঁইবা মাত্র, বাহিরের ধনটা ভূ-গামী হইবে। বাহিরে কিছুই থাকিবে না। কেবল ভিতরের পিঠে থাকিবে ঋণতড়িত। পয়সার ধন যেন তাহাকে টানিয়া রাখিয়াছে। এখন পয়সাটি বাহির করিয়া দূরে সরাও—বাক্সের ভিতর পিঠের ঋণতড়িৎ অমনি বাহির হইয়া বাহিরের পিঠে আসিবে। বাক্সটা পরিচালক পদার্থ। তড়িৎ উহার ভিতরে থাকিতে চাহে না, বাহিরের পিঠেই থাকিতে চাহে। তবে ভিতরে পয়সাটি ছিল, ও ঐ পয়সাতে ধনতড়িৎ ছিল। সেই ধনতড়িতের খাতিরে উহা বাক্সের ভিতর পিঠে আটকান ছিল। পয়সা অপসৃত হইবামাত্র উহা নিজের স্বভাববশে বাহিরে চলিয়া আসিল।

আর একটা উদাহরণ। একখানা পিতলের থালায় ধনতড়িৎ সঞ্চিত করিয়া অপরিচালক আধারে রাখ। উহার সম্মুখে আর একখানি থালা আর একটা অপরিচালক আধারে রাখ। দ্বিতীয় থালায় কণিকামাত্র তড়িৎ ছিল না; কিন্তু প্রথম থালার সম্মুখে রাখিবামাত্র উহার এ-পিঠে ঋণ আর ও-পিঠে ধনতড়িতের আবির্ভাব হইবে। সম্মুখের পিঠে ঋণ ও পশ্চাতের পিঠে ধনের আবির্ভাব হইবে। ছুঁইবামাত্র ধনটা ভূ-গামী হইবে। থাকিবে কেবল এ-পিঠে ঋণতড়িৎ।

এখন কি দেখিতেছি? দুইখানা থালা সামনা-সামনি অবস্থিত। উভয়ের মধ্যে অপরিচালক বায়ুর ব্যবধান। একের পিঠে আছে খানিকটা ধনতড়িৎ, অন্যের পিঠে আছে খানিকটা ঋণতড়িৎ। এ-থালার ধনতড়িৎ ও-থালার ঋণতড়িৎকে সম্মুখে আটকাইয়া রাখিয়া অবস্থিত আছে। ঐ ঋণতড়িৎ যতক্ষণ ইচ্ছা আটকান থাকিবে; ছুঁইলেও পলাইবে না।

মাঝে আছে বায়ুর ব্যবধান। বায়ুর ব্যবধান না থাকিয়া কাচের বা গন্ধকের বা অন্য পরিচালক পদার্থের ব্যবধান থাকিলেও ঐরূপই ঘটিত। এ-থালার ধনতড়িৎ বায়ুর ব্যবধান সত্ত্বেও ও-থালার ঋণতড়িৎকে আটকাইয়া রাখে। কেবল যে আটকাইয়া রাখে, তাহা নহে। রীতিমত সবলে আকর্ষণ করে। ফলে, এ-থালা ও-থালার নিকটে যাইতে যায়। এই আকর্ষণের বল নিতান্ত সামান্য নহে। উহা মাপিয়া দেখান চলে।

একটা নিক্তির এক পাল্লায় রেশমের সূতা দিয়া একখানি পিতলের রেকাবি ঝুলাও, উহাতে ধনতড়িৎ মজুত আছে। অন্য পাল্লায় বাটখারা দিয়া নিক্তির দাঁড়ি সমান দেখিয়া লও; রেকাবির ওজন বাটখারার ওজনের সমান। এখন ঐ রেকাবির নীচে আর

একখানি রেকাবি ধর। ধরিবামাত্র উঁহাতে ঋণতড়িতের আবির্ভাব হইবে। উপরের রেকাবির নীচের পিঠে আছে ধন, আর নীচের রেকাবির উপরের পিঠে আছে ঋণ। মাঝে বায়ুর ব্যবধান। বায়ুর ব্যবধান সত্বেও নীচের রেকাবি উপরের রেকাবিকে সবলে নিম্নমুখে টানিবে। ফলে নিক্তির দাঁড়ি অসমান হইবে। আবার বাটখারা চড়াইয়া দাঁড়ি সমান করা হইলে বুঝা যাইবে উভয় রেকাবির আকর্ষণ-বল কতটা ওজনের সমান।

মধ্যে বায়ুর ব্যবধান থাকিলে ঐরূপ আকর্ষণের জোর ধরিতে ও মাপিতে পারা যায়। কাচের ব্যবধান থাকিলে অবশ্য ঐরূপে মাপা চলে না। একখানা কাচের দুই পিঠে টিন মুড়িয়া এক পিঠের টিনে ধন-তড়িৎ সঞ্চয় করিলে অন্য পিঠে ভূমিস্পর্শ মাত্রেই ঋণতড়িতের আবির্ভাব হয়। কাচের এ-পিঠে থাকে ধন, ও-পিঠে থাকে ঋণ। এ-পিঠের টিন ও-পিঠের টিনকে আকর্ষণ করে বটে, কিন্তু এখানে ত আর বায়ুর ব্যবধান নাই, কঠিন কাচের ব্যবধান। কাজেই, কাচ ঠেলিয়া অগ্রসর হইতে পারে না। তবে এ-পিঠে ধন ও-পিঠে ঋণ সামনা-সামনি আটকান থাকে মাত্র।

একটা বোতলের বাহিরে ও ভিতরে টিনের পাত বসাইয়া ভিতরে ধনতড়িৎ সঞ্চিত করিলে বাহিরে ঋণতড়িতের ও ভিতরে ঋণতড়িৎ সঞ্চিত করিলে বাহিরে ধনতড়িতের আবির্ভাব হয়। অবশ্য আবির্ভাবের পূর্ব্বে বাহিরের পিঠের ভূমিস্পর্শ আবশ্যক।

ঐরূপ বোতলে তড়িৎ সঞ্চয় করিয়া রাখা খুব সুবিধা। এক পিঠের টিনে ধনতড়িৎ অন্য পিঠের টিনে ঋণতড়িৎকে আটকাইয়া রাখে। মাঝের কাচের ব্যবধান সত্বেও আটকাইয়া রাখে। এই রকম বোতলের নাম লীডেন জার। লীডেন জারের মালা সাজাইয়া প্রচুর

তড়িৎ সঞ্চয় করিয়া রাখা চলে। আর উদাহরণ আবশ্যক নহে। পরিচালক ধাতুদ্রব্যে তড়িৎ সঞ্চয়ের উপায় বলা গেল। ধাতু দ্রব্যকে অন্য দ্রব্যে সঞ্চিত তড়িতের সম্মুখে রাখিয়া ভূমিস্পর্শ করাইলেই উহাতে তড়িতের আবির্ভাব হইবে। সম্মুখে ধনতড়িৎ থাকিলে ঋণতড়িতের, আর ঋণতড়িৎ থাকিলে ধনতড়িতের আবির্ভাব হইবে। এবং যতক্ষণ সম্মুখের সেই তড়িৎ উপস্থিত থাকিবে, ততক্ষণ এই নবাবির্ভূত তড়িৎ আটকান বা আবদ্ধ থাকিবে। সেই সম্মুখের তড়িৎ অপসৃত হইলে অবশ্য আর আবদ্ধ রাখা চলিবে না। তখন অপরিচালক আধারে না রাখিলে অন্তর্দ্ধানের সম্ভাবনা। কিন্তু ওখানে ধনতড়িৎ সম্মুখে থাকিলে এখানে ঋণ, আর ওখানে ঋণতড়িৎ সম্মুখে থাকিলে এখানে ধন আবদ্ধ থাকিবে। মাঝে বায়ুর ব্যবধানই থাক আর কাচের ব্যবধানই থাক। ধনের ইচ্ছা ঋণের কাছে যাই, ঋণেরও ইচ্ছা ধনের কাছে যাই। কিন্তু মাঝের অপরিচালক ব্যবধান ভেদ করিয়া যাইতে পারে না। কেবল সামনা-সামনি পরস্পরকে চোখের উপর রাখিয়া বাঁধিয়া রাখে মাত্র। কাচের বোতলের দুই পিঠে টিন মুড়িয়া এক পিঠে ধন ও অন্য পিঠে ঋণতড়িৎ সঞ্চয় রাখার খুব সুবিধা; তাই এই তড়িৎ সঞ্চয়ের জন্য ঐরূপ কাচের বোতল বা বোতলের মালা সাজান থাকে। ঐ বোতলের ইংরেজী নাম লীডেন জার। এখন এই লীডেন জার অবলম্বনে কয়েকটা নূতন কথার অবতারণা হইবে।

তড়িৎ-প্রবাহ

লীডেন জারের এক পিঠে ধন অন্য পিঠে ঋণতড়িৎ সঞ্চিত আছে। এমন সময়ে যদি এক গাছা সূতা জলে ভিজাইয়া দুই পিঠ ঐ সূতাদ্বারা ছুঁইয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে একটা নূতন ঘটনা ঘটে। এ-পিঠের

ধনতড়িৎ সূতার ভিতর দিয়া ওপিঠে যায়। ওপিঠে ঋণতড়িৎ ছিল; অর্থাৎ ধনতড়িতের অভাব ছিল। এখন এ-পিঠের ধনতড়িৎ ওপিঠে যাওয়ায় সেই অভাব পূর্ণ হয়, তখন আর ধনতড়িতের অভাব থাকে না, অর্থাৎ ঋণতড়িৎ লুপ্ত হয়। ইহার শেষ ফল এ-পিঠের ও-পিঠের দুই পিঠের তড়িতের লোপ। উঠানের একধারে মাটি খুঁড়িয়া সেই মাটি উঠানের অন্যত্র ফেলিলে এক জায়গায় মাটির আধিক্যে একটা ঢিপি, অন্য জায়গায় মাটির অল্পতাবশে একটা গর্ত্ত হয়। সূতা দিয়া লীডেন জারের দুই পিঠ সংলগ্ন করিবার পূর্ব্বে এক পিঠে তড়িতের আধিক্য আর অন্য পিঠে তড়িতের অল্পতা ছিল, আবার সেই ঢিপির মাটি তুলিয়া গর্ত্তে ফেলিলে যেমন উঠানের বন্ধুরতা দূর হয়, ঢিপিরও লোপ হয়, গর্ত্তেরও লোপ হয়, সূতাসংযোগে এ-ধারের তড়িৎ ও-ধারে যাওয়ায় সেইরূপ দুই ধারের তড়িতেরই লোপ; এধারে তড়িতের আধিক্য (ধনতড়িৎ) আর ওধারে তড়িতের অল্পতা (ঋণতড়িৎ) দুই লোপ পায়। সূতা গাছটা লম্বা আর সরু হইলে ধন-তড়িতের এপিঠ হইতে ওপিঠ যাইতে একটু সময় লাগে। সে সময় এত অল্প যে মাপা কঠিন; তবে মাপিবার জন্য সূক্ষ্ম কৌশল উদ্ভাবন করিলে সময় মাপা যায় না এমন নহে; শুকনা সূতা অপরিচালক, ভিজা সূতা পরিচালক, তবে উহার পরিচালন ক্ষমতা খুব অল্প, সেই জন্যই একটু সময় লাগে। পরিচালকতা বেশী হইলে ঘটনাটা অন্যরূপ হইত। কোন পরিচালক দ্রব্য আশ্রয় করিয়া তড়িতের এইরূপ সঞ্চলন ব্যাপারকে তড়িৎ-প্রবাহ বলে। আগে বলিয়াছি, ধনতড়িৎ ঋণতড়িতের কাছে যাইতে চায়—উহার স্বভাবই এই। লীডেন জারের এ-পিঠের ধনতড়িতের চেষ্টা ওপিঠে ঋণতড়িতের কাছে যাইবার জন্য। মাঝে অপরিচালক কাচের ব্যবধান থাকাতেই যাইতে পারিতেছিল না। এখন পরিচালক সূতার

আশ্রয় পাইবা মাত্র উহা ঋণতড়িতের কাছে গিয়া সেখানকার তড়িতের অভাব পূরণ করিল। ফলে, সূতার ভিতরে তড়িতের স্রোত বা প্রবাহ জন্মিল। জল যেমন উঁচু জায়গা হইতে নীচু জায়গায় চলিলে উহাতে প্রবাহ বা স্রোত জন্মে, সেইরূপ তড়িৎ এক জায়গা হইতে অন্য জায়গায় গেলে তড়িতের প্রবাহ জন্মে। এই তড়িৎ-প্রবাহের কতকগুলি অদ্ভুত গুণ আছে। তড়িৎ পদার্থটা আনুমানিক; উহা প্রত্যক্ষ-গোচর নহে। উহার প্রবাহও প্রত্যক্ষ-গোচর নহে। কিন্তু তড়িৎ-প্রবাহের আনুষঙ্গিক ফলগুলি প্রত্যক্ষ-গোচর। সেই ফল দেখিয়া আমরা তড়িৎ-প্রবাহের অস্তিত্ব অনুমান করি। সেই ফল কি তাহা বলিতেছি।

প্রথম ফল এই যে, প্রবাহ চলিবার সময় সূতা গাছটি একটু গরম হয়; উহাতে কিঞ্চিৎ উত্তাপ জন্মে। দ্বিতীয় ফল এই যে, ঐ সূতার নিকটে একটা চুম্বকের কাঁটা থাকিলে সেই কাঁটাতে একটা ধাক্কা লাগে। তৃতীয় ফল এই যে, ঐ সূতার মাঝখানটা কাঁচি দিয়া কাটিয়া অম্লাক্ত জলে সূতার দুই প্রান্ত ডুবাইলে সেই জলটা বিশ্লিষ্ট হইয়া এক প্রান্তে উদান অন্য প্রান্তে অম্লান মরুতের আবির্ভাব হয়।

তড়িৎ-প্রবাহের ফল এই তিনটি। প্রথম, উহা উত্তাপ জন্মায়; দ্বিতীয়, উহা চুম্বকের কাঁটাতে ধাক্কা দেয়; তৃতীয়, উহা জলকে বিশ্লিষ্ট করে। তড়িৎ-প্রবাহের এক তিন ফল; স্থির তড়িতের এরূপ কোন গুণ নাই। ধনতড়িৎ বা ঋণতড়িৎ যতক্ষণ লীডেন জারের পিঠে স্থিরভাবে অবস্থিত ছিল, ততক্ষণ উহাদের ওরূপ গুণের কোন নিদর্শন ছিল না। পরিচালক পদার্থের ভিতর চলিবার সময় ঐ তিনগুণের বিকাশ দেখা যায়। আবার প্রবাহ থামিয়া গেলে আর কোন চিহ্ন থাকে না।

লীডেন জারের দুই পিঠের তড়িৎ ভিজা সূতা দ্বারা সংলগ্ন করিলে তড়িৎ-প্রবাহ জন্মে। লীডেন জারেরই প্রয়োজন কি? কোন দুইটা ধাতু দ্রব্যে তড়িৎ সঞ্চিত করিয়া উহাদিগকে ঐরূপ ভিজা সূতা দিয়া সংলগ্ন করিলে একটার কিয়দংশ তড়িৎ অন্যটায় যায়। দুইটা দ্রব্য সমস্ত তড়িৎ বণ্টন করিয়া লয়। বণ্টনকালে এটার খানিকটা তড়িৎ—সমস্তটা নহে—ওটায় যায়—সূতা বাহিয়া যায়। সূতায় তখন তড়িৎ-প্রবাহ জন্মে; এবং সেই তড়িৎ-প্রবাহের ঐ তিন গুণ।

তবে এরূপ ক্ষেত্রে তড়িৎ-প্রবাহ ক্ষণস্থায়ী; তড়িতের পরিমাণও খুব বেশী নহে। ঐ প্রবাহ এত অল্পক্ষণ থাকে, ও সেই অল্পক্ষণে প্রবাহিত তড়িতের পরিমাণও এত অল্প যে, তাহাতে যে উত্তাপ জন্মে সে উত্তাপ অনুভব করাই কঠিন। তাহাতে জলের যে বিশ্লেষণ ঘটে, সে বিশ্লেষণের প্রমাণ পাওয়াই কঠিন। প্রচুর উত্তাপ জন্মাইতে হইলে বা প্রচুর পরিমাণ জল বিশ্লেষণ দেখাইতে হইলে অথবা চুম্বকের কাঁটাকে ধাক্কা দিয়া অধিকক্ষণ স্থানভ্রষ্ট অবস্থায় রাখিতে হইলে এমন প্রবাহ উৎপাদন করিতে হইবে, যাহা বহুক্ষণস্থায়ী হয়, এবং যাহাতে প্রচুর পরিমাণ তড়িৎ প্রবাহিত হয়। লীডেন জারের মালা সাজাইয়াও সে পরিমাণ তড়িৎ পাওয়া যায় না। এইরূপ স্থায়ী তড়িৎ-প্রবাহ উৎপাদনের জন্য অন্যরূপ বন্দোবস্ত আছে। সে কথা পরে বলিব।

লীডেন জারের দুই পিঠে ভিজা সূতা সংলগ্ন করিলে সূতার মধ্যে অল্পক্ষণ-স্থায়ী প্রবাহ জন্মে। ধনতড়িৎ এ-পিঠ হইতে ও-পিঠে যায়; অথবা ঋণতড়িৎ ও-পিঠ হইতে এ-পিঠে আসে বলিলেও সেই ফল। কেননা, ধনতড়িতের দক্ষিণে যাওয়া ও ঋণতড়িতের উত্তরে যাওয়ার একই অর্থ। একই অর্থ—কেননা, ফলে সমান। আর প্রত্যক্ষের অগোচর তড়িৎ পদার্থের আমরা কেবল ফলটাই দেখি। সে যাক্—

ভিজা সূতার মধ্যে প্রবাহ জন্মে তাহা চুম্বকের ধাক্কায় বা উত্তাপের আবির্ভাবে বুঝা যায়। ভিজা সূতা পরিচালক বলিয়াই উহার মধ্য দিয়া তড়িৎ চলে বা তড়িতের প্রবাহ চলে। তামার তারের পরিচালকতা আরও বেশী। তামার তার দিয়া দুই পিঠ যোগ করিলে উহাতে প্রবাহ হয় কি না?

ইহার উত্তর যে, প্রবাহ হয় বটে, কিন্তু সে প্রবাহটা একটু অদ্ভুত গোছের। মনে কর লীডেন জারের—অর্থাৎ ভিতরে বাহিরে টিনে মোড়া বোতলের—ভিতর পিঠে ধন আর বাহির পিঠে ঋণতড়িৎ আছে। ভিজা সূতায় দুই পিঠ যোগ করিলে ভিতরের ধনতড়িৎ সূতা বাহিয়া বাহিরে আসিবে। কাজেই, ধনতড়িতের প্রবাহ হইবে ভিতর হইতে বাহিরে, আর তাহার ফল হইবে ভিতর বাহির উভয়ত্র তড়িতের লোপাপত্তি। ভিজা সূতার বদলে তামার তার দিয়া যোগ করিলে প্রবাহ হয়, কিন্তু সে অদ্ভুত প্রবাহ। ধনতড়িৎ প্রথমটায় ভিতর হইতে বাহিরে আসে, কিন্তু আসিয়াই থামে না। আবার উল্টামুখে চলিয়া বাহির হইতে ভিতরে যায়। আবার ভিতর হইতে বাহির, আবার বাহির হইতে ভিতর। এইরূপে পুনঃপুনঃ গতায়াত করিতে থাকে। ভিজা সূতার বেলায় ভিতর হইতে বাহিরে আসিয়াই থামিয়া যায়। কিন্তু তামার তারের বেলায় বাহিরে যায় আবার ফিরিয়া আসে, আবার যায় আবার আসে, এইরূপে পুনঃপুনঃ গতায়াত করিতে থাকে। দুই দশবার নহে; দুই লাখ দশ লাখ বার গতায়াত করিয়া শেষ পর্য্যন্ত থামিয়া যায়। যখন থামে তখন আর বাহিরে ভিতরে কোথাও আর কোন তড়িতের চিহ্ন পাওয়া যায় না। কিন্তু থামিবার পূর্ব্বে লাখ বার গতায়াত করিয়া তবে থামে। এই গতায়াতে সময় লাগে কতটুকু। নিমেষ

মধ্যে এই গতায়াত সমাপ্ত হইয়া যায়। চোখের পলক ফেলিতে না ফেলিতে তড়িতের বহু সহস্র বা বহু লক্ষ বার গতায়াত সমাপ্ত হয়। তামার তার আনিবার পূর্ব্বে এক পিঠে ছিল ধনতড়িৎ, অন্য পিঠে ছিল ঋণতড়িৎ। আর তামার তার আনিয়া দুই পিঠে যোগ করিয়া চোখের পলক না ফেলিতেই দুই পিঠের তড়িতের তিরোভাব হইয়াছে, ইহা দেখান সহজ। কিন্তু সেই পলকের মধ্যে যে ধন-তড়িৎ লাখবার তারের মধ্যে দিয়া একবার এদিক্ একবার ওদিক্ যাতায়াত করিল, ইহা শুনিতে হেঁয়ালির মত লাগে; বিশ্বাস করাই কঠিন; প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখানই কঠিন। প্রত্যক্ষ প্রমাণ সংগ্রহ দুঃসাধ্য বলিয়া এত কাল এই ব্যাপার বৈজ্ঞানিকদের অজ্ঞাত ছিল। তামার তার দিয়া তড়িতের প্রবাহ চলে, তাহা বৈজ্ঞানিকেরা বহুকাল হইতে জানেন; কিন্তু সেই তড়িতের প্রবাহের যে এত গুণ, ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ অতি অল্প দিন হইল পাওয়া গিয়াছে। সার অলিবার লজ ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখাইয়াছেন; তাহার পরে আরও অনেকে দেখাইয়াছেন। লর্ড কেলবিন পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন, ঐরূপ গতায়াতই হওয়া উচিত। কিন্তু তখন কেহ প্রত্যক্ষ প্রমাণ উপস্থিত করিতে পারেন নাই। এখন লজের ও তাঁহার অনুবর্ত্তীদের প্রদর্শিত প্রমাণে আর ঐ ঘটনায় অবিশ্বাসের উপায় নাই।

ভিজা সূতার পরিচালকতা খুব অল্প; আর তামার বা পিতলের তারের খুব অধিক। এই হেতু উভয়ের ব্যবহারে এই পার্থক্য। ভিজা সুতা দিয়া তড়িৎ-প্রবাহ হুস করিয়া এপিঠ হইতে ওপিঠে যায় ও হুস করিয়া গিয়াই থামে। কিন্তু তামার তার দিয়া হুস—আ—হুস হুস—আ হুস করিয়া যাতায়াত করিয়া তারপর থামে, আর ব্যাপারটা নিমেষের মধ্যে সম্পন্ন হইয়া যায়।

এইরূপ পুনঃপুনঃ যাতায়াতকে ঠিক প্রবাহ না বলিয়া আন্দোলন বলাই উচিত। প্রবাহ একমুখে গতি, আর আন্দোলন এ-মুখে ও-মুখে গতি বা গতায়াত। যেমন পেণ্ডুলাম। পেণ্ডুলামকে স্থানভ্রষ্ট করিয়া ছাড়িয়া দিলে উহা আন্দোলিত হয়, নামে উঠে—নামে উঠে—এধার ওধার—এধার ওধার গতায়াত করিতে থাকে। তামার তারে তড়িতের আন্দোলন কতকটা সেইরূপ, উহাও এধার ওধার—এধার ওধার করিয়া চলে। প্রভেদ এই, পেণ্ডুলামকে একবার দোলাইয়া দিলে উহা বহুক্ষণ ঢুলিতে থাকে, বহুক্ষণ ঢুলিয়া তবে থামে। আর লীডেন জারের তড়িৎকে দোলাইয়া দিলে উহা তারের ভিতর ক্ষণেকের মধ্যে শতসহস্রবার ঢুলিয়া ক্ষণেকের মধ্যেই থামিয়া যায়। পেণ্ডুলাম থামিতেই চায় না—শেষ পর্য্যন্ত থামে বটে, কিন্তু বহু বিলম্বে; ঢুলিবার সময় বাতাস ঠেলিয়া ঢুলিতে হয়, তথাপি বিলম্বে থামে। বাতাস ঠেলিতে না হইলে আরও বিলম্বে থামিত। জলের মধ্যে পেণ্ডুলাম ঢুলাইলে জল ঠেলিয়া ঢুলিতে হইলে আরও শীঘ্র থামিত। গুড়ের মধ্যে ঢুলাইলে গুড় ঠেলিয়া ঢুলিতে হইলে আরও শীঘ্র থামিত। আর কাদার মধ্যে ঢুলাইয়া দিলে ঢুলিতেই পারিত না। প্রথম আন্দোলনেই কাদা ঠেলিয়া আসিতে আসিতে উহার গতিশক্তি ফুরাইত। আর ঘুরিয়া ও-মুখে ফিরিতে পারিত না। তড়িৎ তারের ভিতরেও ঢুলিতে থাকে; হয়ত কিছু ঠেলিয়া চলিতে হয় বলিয়া শীঘ্র থামিয়া যায়। অবশ্য কোন একটা বাধা ঠেলিতে হয়, নতুবা অত শীঘ্র থামিবে কেন। তামা উত্তম পরিচালক বটে; কিন্তু তাই বলিয়া তড়িতের সঞ্চালনে যে একবারে বাধা দেয় না এমন নহে: তড়িৎকে আটকাইতে পারে না এই পর্য্যন্ত; কিন্তু সঞ্চালনে একটু সময় লাগায়। ঐ বাধা ঠেলিয়া চলিতে হয় বলিয়া তড়িতের আন্দোলন শীঘ্র থামিয়া যায়।

তামার পরিচালকতা যদি আরও অধিক হইত, যদি বাধা একবারেই না থাকিত তাহা হইলে বুঝি আন্দোলন থামিত না। ভিজা সূতার পরিচালকতা তামার তারের চেয়ে অনেক কম; উহাতে বাধা দেয় আরও বেশী। তামার তারে তড়িতের আন্দোলন যেন গুড়ের ভিতর পেণ্ডুলামের আন্দোলন। আর ভিজা সূতার ভিতর তড়িতের গতি যেন কাদা ঠেলিয়া পেণ্ডুলামের গতি। ইহাতে একবার যাইতেই গতিশক্তিটা সমস্ত নষ্ট হইয়া যাওয়াতে আর ফেরা ঘটে না—গমন ঘটে কিন্তু আগমন হয় না। প্রবাহ মাত্র হয়, আন্দোলন হয় না।

সুপরিচালক ধাতুদ্রব্যের তারের ভিতর বা দণ্ডের ভিতর লীডেন জারের তড়িৎ চলিতে হইলেই এইরূপ আন্দোলন জন্মে। এই আন্দোলনের সম্প্রতি প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। প্রত্যক্ষ প্রমাণ কেন, এই আন্দোলনের সাহায্য লইয়া আকাশপথে দূরে খবর পাঠান সম্ভবপর। মার্কণি সাহেব আজকাল আকাশপথে যে খবর পাইতেছেন, সে এই আন্দোলনের সাহায্যে। ইহার কথা আবার উঠিবে।

লীডেন জারের দুই পিঠ ভিজা সূতায় যোগ করিলে তড়িতের প্রবাহ জন্মে; আর তামার তার দিয়া যোগ করিলে তড়িতের আন্দোলন জন্মে। উভয়ই ক্ষণস্থায়ী। প্রবাহও ক্ষণস্থায়ী, আন্দোলনও ক্ষণস্থায়ী। প্রবাহই বল, আর আন্দোলনই বল, মধ্যস্থ দ্রব্যের পরিচালকতাই উহার উৎপাদনের হেতু। তামার তার ভাল পরিচালক, তাই উহাতে আন্দোলন জন্মে; সূতা মন্দ পরিচালক, তাই উহাতে প্রবাহ জন্মে। কিন্তু কোন সম্পূর্ণ অপরিচালক দ্রব্য—যেমন গালার ছড়ি দিয়া যোগ করিলে প্রবাহও হইত না, আন্দোলনও হইত না। ধনতড়িৎ ও ঋণতড়িৎ আপন আপন স্থানেই স্থিরভাবে

বসিয়া থাকিত। অপরিচালক দ্রব্য ভেদ করিয়া যাইতে পারিত না। লীডেন জার ত কাচের বোতল, বোতলের দুই পিঠ টিন, আর সেই টিনের গায়ে তড়িৎ। কাচ অপরিচালক বলিয়াই এ-পিঠের তড়িৎ ও-পিঠে যায় না। বায়ু অপরিচালক, তাই বায়ুপথেও ভিতর হইতে বাহিরে আসে না।

কিন্তু এই বায়ু সময়বিশেষে পরিচালকত্ব প্রাপ্ত হয়। আগে বলিয়াছি, ধাতু দ্রব্যে তড়িৎ সঞ্চয় করিলে উহার পিঠের যেখানটা কুজো বা ছুঁচল, তড়িৎ সেই খানে গিয়া জমা হয়। সূচ্যগ্র স্থান দেখিলেই তড়িৎ সেখানে এত জমে, যে তাহার নিকটবর্ত্তী বায়ু তখন সেই তড়িৎ গ্রহণ করিতে আরম্ভ করে; গ্রহণ করে, আর সে স্থান হইতে তাড়িত হইয়া দূরে অপস্থত হয়। বায়ু তড়িৎ কাঁধে লইয়া সূচীর মাথা হইতে প্রবাহিত হইতে থাকে। কাজেই, বায়ুর পরিচালকত্ব যে কখনও থাকেনা তাহা বলা চলেনা।

লীডেন জারের ভিতর বাহির দুই পিঠে দুইটা তার সংলগ্ন করিয়া তার দুইটার মুখ কাছাকাছি আনিলে একটা নূতন ব্যাপার দেখা যায়। দুই তারের মুখের মধ্যে বায়ুর অল্প ব্যবধান থাকিলে সহসা আগুনের একটা স্ফুলিঙ্গ ছুটিয়া বাহির হয়। এ-তারের মুখ হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গটা লম্ফ দিয়া ও-তারের মুখে যায়। আর তার সঙ্গে সঙ্গে দেখা যায়, লীডেন জারের উভয় পিঠের তড়িতের অন্তর্দ্ধান ঘটিয়াছে। এখানে কি বুঝিব? এই বুঝিব যে, ভিতর পিঠের ধনতড়িৎ প্রথম তার বাহিয়া উহার মুখে আসিয়া লম্ফ দিয়া বায়ুর ব্যবধানটুকু পার হইয়া দ্বিতীয় তারের মুখে প্রবেশ করিয়াছে, ও দ্বিতীয় তার বাহিয়া বাহিরের পিঠে ঋণতড়িতের লোপ করিয়াছে। ধনতড়িতের স্বভাবই ঋণতড়িতের নিকটে যাওয়া ও উহার সহিত মিলিত হওয়া। বায়ুর ব্যবধান সেই গতির অন্তরায়।

কিন্তু এ স্থলে বায়ুর সামান্য ব্যবধানটুকু আর অন্তরায় হইতে পারে নাই। তড়িৎ সেই ব্যবধান ভেদ করিয়া এ-তার হইতে ও-তারে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছে। অপরিচালক বায়ু এ স্থলে ক্ষণেকের জন্য পরিচালকত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে।

তড়িৎ সাধারণতঃ বায়ুর ব্যবধান লঙ্ঘন করিতে পারে না; তবে ঐ ব্যবধান যদি খুব সামান্য হয়, তবে লঙ্ঘন করে; বায়ু তখন পরিচালকত্ব প্রাপ্ত হয়। ছোট একটা লীডেন জারে এই ব্যবধানটুকুও সামান্য। এক ইঞ্চির সামান্য ভগ্নাংশ মাত্র; তাহার অধিক ব্যবধান লঙ্ঘন করিতে পারে না। কিন্তু অনেকগুলি লীডেন জার সারবন্দি করিয়া বিশেষরূপে সাজাইয়া উহার মালা গাঁথিয়া দেখা গিয়াছে সারির মধ্যে প্রথম জারের ভিতরের পিঠের তড়িৎ দুই ইঞ্চি তিন ইঞ্চি বায়ুর ব্যবধান লঙ্ঘন করিয়া লম্ফ দিয়া শেষের জারের বাহিরের পিঠে উপস্থিত হইতে পারে। কাজেই, অবস্থাবিশেষে তড়িৎ-স্ফুলিঙ্গটা দুই তিন ইঞ্চি এমন কি বিশ ত্রিশ ইঞ্চি পর্য্যন্ত দীর্ঘ হইতে পারে।

তড়িৎ সঞ্চয়ের জন্য বড় বড় যন্ত্র নির্ম্মিত হইয়া থাকে। ঐ সকল যন্ত্রযোগে দশ বিশ ইঞ্চি লম্বা তড়িৎস্ফুলিঙ্গ অনায়াসে পাওয়া যায়।

দশ বিশ ইঞ্চিতেই বা থামি কেন। বিদ্যুৎ ও বজ্র তড়িৎস্ফুলিঙ্গ বই আর কিছু নহে। মেঘে তড়িৎ সঞ্চিত কিরূপে হয় বলা কঠিন। সে বিষয়ে মতভেদ আছে। বসন্তকালে ও গ্রীষ্মকালে বৈকালের মেঘ হঠাৎ দেখা দেয়; ঐ মেঘ তড়িতে এক রকম ভরা থাকে। একখানা মেঘ হইতে অন্য মেঘে তড়িৎ ঝম্প দিয়া যাইবার সময় যে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ দেখা দেয়, তাহারই নাম বিদ্যুৎ। আর মেঘ হইতে ভূতলে ঝম্প দিবার সময় যে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ দেখা দেয়, তাহাই বজ্র। এই সকল স্থলে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, যে দশ বিশ ইঞ্চি কেন, দুই এক মাইল

বায়ুর ব্যবধান ভেদ করিয়া মেঘে স্তূপীকৃত তড়িৎ ভূতলে প্রবেশ করিতেছে।

লীডেন জারের এ-পিঠ হইতে ও-পিঠে ঝম্প দিবার সময় স্ফুলিঙ্গের সঙ্গে পটাপট্ শব্দ হয়। আর মেঘ হইতে মেঘে বা মেঘ হইতে ভূমিতে ঝম্পের সময় গভীর গর্জ্জন হয়। মেঘের গর্জ্জন ও বজ্রধ্বনি সর্ব্বজন-পরিচিত। বায়ুস্তর ভেদ করিয়া আগুনের স্ফুলিঙ্গ চলিবামাত্র বায়ুস্তর সহসা উত্তপ্ত ও প্রসারিত হয়। বায়ুর আকস্মিক প্রসারে পাশের বায়ুতে ধাক্কা লাগে। সেই ধাক্কার ফলে যে কম্পন বা আন্দোলন, তাহার ফলে এই শব্দ।

ঐ স্ফুলিঙ্গকে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বলিব, না তড়িৎস্ফুলিঙ্গ বলিব। তড়িৎ পদার্থ চক্ষুর গোচর নহে, কিন্তু অগ্নি চক্ষুর গোচর। আমরা যাহা দেখি তাহা খানিকটা আলো। বায়ু সহসা উত্তপ্ত হইয়া প্রদীপ্ত হওয়ায় ঐ আলো। কাজেই, যাহাকে স্ফুলিঙ্গ বলিতেছি তাহা তড়িৎ নহে, তাহা উত্তাপ ও আলোক। কিন্তু ঐ উত্তাপ ও আলোক তড়িৎ সঞ্চালনের ফল। বায়ুপথে তড়িৎ সঞ্চালনের সমকালে সেই পথের বায়ু তপ্ত হয় ও দীপ্ত হয়; তাহার ধাক্কায় বায়ুরাশি কাঁপিয়া উঠিয়া শব্দ হয়; পথের মাঝে গাছ-পালা পড়িলে জ্বলিয়া যায়, ঘর-বাড়ী পড়িলে ভাঙ্গিয়া যায়, আর কোন হতভাগ্য জীব পড়িলে তাহার জীবনটাও দেহ হইতে ছিন্ন হয়। বৃহৎ তড়িৎস্ফুলিঙ্গের এমনি প্রতাপ।

তড়িৎস্ফুলিঙ্গের যে স্ফুলিঙ্গত্ব, উহা উত্তাপের ও আলোকের ফল। উহা প্রত্যক্ষগোচর। ঐ উত্তাপ ও আলোক আবার তড়িৎ-প্রবাহের ফল, বায়ু মধ্য দিয়া তড়িৎপ্রবাহ চলিয়াছে বলিয়াই উত্তাপাদির আবির্ভাব। সেই তড়িৎপ্রবাহ প্রত্যক্ষ-গোচর নহে, উহা অনুমান মাত্র।

লীডেন জারে যে তড়িৎস্ফুলিঙ্গ দেখা যায়, উহা তড়িৎ সঙ্কলনের ফল বটে ; বায়ুর আকস্মিক পরিচালকতা-প্রাপ্তিই এই সঙ্কলনের হেতু বটে। কিন্তু প্রশ্ন উঠে, ইহা তড়িতের প্রবাহ, না আন্দোলন? ভিজা সূতা ধরিয়া তড়িতের প্রবাহ বহে, কিন্তু তামার তারে প্রবাহ না বহিয়া তড়িতের আন্দোলন ঘটে। বায়ুস্তর ভিন্ন করিয়া তড়িৎ লম্ফ দিয়া যাইবার সময় প্রবাহ জন্মায় না, আন্দোলন জন্মায়। প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে যে, উহা প্রবাহ নহে, আন্দোলনই বটে। তড়িৎ এখানেও ক্ষণেকের মধ্যে—নিমেষের মধ্যে যাতায়াত করে ; লম্ফ দিয়া একবার ও-তারে যায়, একবার এ-তারে আসে। এই আন্দোলনেরই ফল ঐ উত্তাপ আর আলোক।

তাপের স্বরূপ আলোচনা কালে আমরা দেখিয়াছি যে, তাপ শক্তির রূপান্তর মাত্র। শক্তি আপনা হইতে সৃষ্ট হয় না ; উহা এক রূপ হইতে অন্য রূপ গ্রহণ করে। তড়িৎ-স্ফুলিঙ্গে যখন একটা তাপ জন্মিতেছে, তখন স্বীকার করিতে হইবে, শক্তির কোন না কোন রূপ তাপে পরিণত হইয়াছে মাত্র। লীডেন জারের পিঠে যে তড়িৎ সঞ্চিত ছিল সেই তড়িৎ স্থির হইয়া থাকিলেও উহাতে খানিকটা শক্তি নিহিত ছিল। তড়িন্নিহিত সেই শক্তিই এখন তাপে পরিণত হইয়াছে। তড়িতের স্বরূপ কি তাহা আমরা জানিনা ; তবে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি, উহা শক্তিমান্ পদার্থ। কোন দ্রব্যের গায়ে যখন স্থিরভাবে আছে, তখনও উহাতে খানিকটা শক্তি বিদ্যমান আছে। আবার তড়িৎ যখন ঝম্প দিয়া বায়ুপথে আন্দোলিত হয়, তখন সেই শক্তি তাপে পরিণত হয়। বায়ুকে তপ্ত ও প্রদীপ্ত করিয়া তোলে। তড়িতের শক্তি সম্বন্ধে আরও কথা পরে উঠিবে।

তড়িতের স্বরূপ কি, তাহা আমরা এখনও কিছুই জানিলাম না। তড়িৎই আনুমানিক পদার্থ; উহার স্বরূপ কি, সে বিষয়ে অনুমান কিছু করি নাই। স্বরূপ যাহাই হউক, উহার গুণ, উহার ধর্ম্ম, উহার ফলাফল আমাদের প্রত্যক্ষগোচর হয়। কাজেই, অবেক্ষণের ও পরীক্ষণের বিষয় হয়। তড়িৎ যাহাই হউক, উহা একস্থান হইতে স্থানান্তরে যাইতে সমর্থ, ইহাতে সংশয় নাই। আবার তড়িতের স্বরূপ যাহাই হউক, উহা যে শক্তিমান্ তাহাতেও সন্দেহ নাই। শক্তির নানা মূর্ত্তি; তন্মধ্যে এই একটা মূর্ত্তি। তড়িতে যে শক্তি নিহিত, তাহাকে আমরা তড়িৎ-শক্তি নাম দিব। তড়িৎ বায়ুপথে আন্দোলিত হইবার সময় এই তাড়িত শক্তি তাপে পরিণত হয়। তপ্ত বায়ুর কম্পনফলে পাশের বায়ুতে ঢেউ উঠিয়া শব্দ ও আকাশে ঢেউ উঠিয়া আলোক উৎপন্ন হয়। শক্তির বিবিধরূপ গ্রহণের ইহা উত্তম উদাহরণ।

তড়িৎ সঞ্চলনের দুইটি প্রকারভেদ বর্ণিত হইল। এক তড়িতের আন্দোলন। তড়িতের আন্দোলনে কিরূপে দূরে আকাশপথে খবর পাঠান হয়, সে কথা পরে উঠিবে। তড়িৎপ্রবাহ সম্বন্ধে আরও কয়েকটি কথা বক্তব্য। তড়িৎপ্রবাহের তিনগুণের কথা বলিয়াছি, উহা তাপ জন্মায়, চুম্বকে ধাক্কা দেয়, আর জলকে বিশ্লিষ্ট করে। লীডেন জারের তড়িতের পরিমাণ এত সামান্য যে এই তিন ক্রিয়ার প্রত্যক্ষ প্রদর্শনে সুবিধা হয় না। তড়িৎ-প্রবাহের এই তিন আনুষঙ্গিক ফল ভাল করিয়া বুঝিতে হইলে প্রচুর পরিমাণে তড়িৎ উৎপাদনের ও বহুক্ষণ ধরিয়া প্রবাহ চালনার ব্যবস্থা চাই। লীডেন জারে তাহা হয় না, ঘর্ষণজ তড়িতেই তাহা হয় না। সৌভাগ্যক্রমে ঘর্ষণ ব্যতীত অন্য উপায়ে আমরা প্রচুর পরিমাণে তড়িতের উৎপাদন করিয়া যতক্ষণ ইচ্ছা—

নিমেষব্যাপী নহে—ঘটিকাব্যাপী বা দিবসব্যাপী তড়িৎপ্রবাহের উৎপাদন করিতে পারি।

ব্যবস্থা খুব সহজ। একটা ভাঁড়ে গন্ধকদ্রাবক মিশাইয়া খানিকটা জল ঢাল। একখানা তামা আর একখানা দস্তা ঐ অম্লজলে অর্দ্ধমগ্ন করিয়া ডুবাও। দেখিবে, তামায় কিঞ্চিৎ ধনতড়িতের আর দস্তায় কিঞ্চিৎ ঋণতড়িতের আবির্ভাব হইয়াছে। এখানে ঘর্ষণাদি নাই; ঐ অম্লাক্ত জলে দুইটা ধাতু ডুবান মাত্র দুইখানায় বিভিন্ন তড়িতের আবির্ভাব হইয়াছে। এখন একটা তামার তার লইয়া তামার সহিত দস্তার যোগ করিয়া দিবা মাত্র তামার ধনতড়িৎ সেই তার আশ্রয় করিয়া দস্তার ঋণতড়িতের অভিমুখ চলিতে থাকিবে। তারের মধ্যে রীতিমত তড়িতের প্রবাহ ছুটিবে।

এই প্রবাহ কিন্তু ক্ষণস্থায়ী নহে। এই প্রবাহ বহুক্ষণ ধরিয়া চলে। তাম্র-খণ্ড হইতে ধনতড়িৎ যেমন বাহির হয়, সঙ্গে সঙ্গে আবার ধনতড়িৎ কোথা হইতে উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হইয়াই তার বাহিয়া ছুটিতে থাকে। রাশি রাশি তড়িৎ ক্রমাগত কোথা হইতে ঐ তাম্রখণ্ডে উৎপন্ন হইয়া ক্রমাগত তার বাহিয়া ছুটিতে থাকে, আর তড়িতের প্রবাহ রক্ষা করে। তার বাহিয়া তড়িৎ-প্রবাহ ক্রমাগত চলে, আর ভাঁড়ের মধ্যে দস্তার ক্ষয় হয়। দস্তা ক্ষয় পাইয়া গন্ধক দ্রাবকের সহিত সম্মিলনে একটা লাবণিক পদার্থ উৎপন্ন করে ও তাহা সেই অম্লাক্ত জলে মিশে। এদিকে তারে তড়িৎ-প্রবাহ চলিতে থাকে। ওদিকে দস্তা ক্রমশঃ ক্ষয় পায়। যতক্ষণ দস্তার অবশেষ থাকে ততক্ষণ প্রবাহ চলে। সমস্ত দস্তাটা ক্ষয় পাইলে তড়িৎ-প্রবাহ বন্ধ হয়।

ভাঁড়ের বাহিরে তামার তার বাহিয়া তামা হইতে দস্তার অভিমুখে ধনতড়িতের প্রবাহ চলে। ভাঁড়ের ভিতরে প্রবাহ চলে কি

না? চলে বৈ কি। ভাঁড়ের ভিতরে যে গন্ধক দ্রাবকমিশ্রিত জল থাকে, সেই জল বাহিয়া তড়িতের প্রবাহ চলে। কোন্ মুখে চলে? ভাঁড়ের বাহিরে ধনতড়িতের প্রবাহ তামা হইতে দস্তার অভিমুখে চলে, কিন্তু ভাঁড়ের ভিতরে দস্তা হইতে তামার অভিমুখে চলে।

এই তড়িতের প্রবাহ যতক্ষণ ইচ্ছা রাখিতে পারা যায়, ইহা ক্ষণস্থায়ী নহে। তামাতে ধনতড়িৎ উৎপন্ন হইয়া দস্তার অভিমুখে চলিতেছে; সঙ্গে সঙ্গে নূতন তড়িৎ উৎপন্ন হইয়া আবার চলিতেছে, তড়িতের স্রোত বাহাল রাখিতে হইলে এইরূপে নিরন্তর তড়িতের উৎপাদন আবশ্যক। লীডেন জারে যে কিঞ্চিৎ তড়িৎ সঞ্চিত থাকে, সেইটুকু বাহির হইয়া গেলেই প্রবাহ থামিয়া যায়, কাজেই, উহার প্রবাহ ক্ষণস্থায়ী। আর এই তড়িদ্‌ভাণ্ডে যেন তড়িতের প্রস্রবণ রহিয়াছে। উহা যেন ফুরায় না। কোথা হইতে এত তড়িতের উৎপাদন হয়, তাহার অনুসন্ধান পরে করিব।

এই প্রবাহ স্থায়ী প্রবাহ। এই হেতু তড়িৎ-প্রবাহের গুণসকল ইহাতে পরীক্ষা করা সহজ। প্রথম গুণ এই যে, যে তামার তার বাহিয়া প্রবাহ চলে, সেই তারটা ক্রমেই গরম হয়; তার যত সরু হয়, ততই গরম হয়। এত গরম হয় যে শেষ পর্য্যন্ত হয় ত প্রদীপ্ত হইয়া আলো দিতে আরম্ভ করে। তামার তারের বদলে অন্য ধাতুর তার লইলেও ঐরূপ তাপের উৎপত্তি হয়। প্লাটিনমের সরু তার অতি শীঘ্র তপ্ত ও প্রদীপ্ত হইয়া উঠে। কয়লার তার তৈয়ার করিলে উহা আরও তপ্ত হইয়া শুভ্র আলোকে দীপ্তিমান হয়। তড়িৎ-প্রবাহের এই ক্ষমতা আছে বলিয়া উহার সাহায্যে আমরা আঁধার ঘরে আলো জ্বালিতে পারি। তাড়িতপ্রদীপ—বিজলী বাতি আজকাল সহরের লোকের ঘরে ঘরে। প্লাটিনমের অথবা কয়লার বা অন্য কোন পদার্থের সরু তারের

ভিতর তাড়িত-প্রবাহ চালাইলে উহাই প্রদীপ্ত হইয়া আলোক দিতে থাকে। তাহাই বিজলী বাতি। কয়লার তারে আলো দেয় খুব বেশী, কিন্তু উহার একটা দোষ আছে। কয়লা দাহ্য পদার্থ। তপ্ত হইলে উহা পুড়িতে আরম্ভ করে, বায়ুর অম্লানের সহিত যুক্ত হইয়া শীঘ্র ক্ষয় পায়। সেই জন্য কয়লার তারে বিজলী বাতি তৈয়ার করিতে হইলে ঐ তারকে কাচের পাত্রের ভিতর আবদ্ধ করিয়া ঐ পাত্রের বায়ু নিষ্কাশন করিয়া লইতে হয়। বায়ুহীন স্থানে কয়লা দীপ্ত হইয়া আলো দেয়—কিন্তু পোড়ে না।

প্রশ্ন উঠে, বিজলী বাতিতে এই যে প্রচুর তাপ জন্মিতেছে, উহার মূল কোথায়? তাপ ত শক্তি। এত শক্তি কোথা হইতে আসিতেছে? ইহার উত্তর পূর্ব্বে দিয়াছি। তড়িৎ শক্তিমান্ পদার্থ। তড়িতে নিহিত শক্তিই তাপে রূপান্তরিত হইতেছে। তড়িৎ যখন স্থির থাকে, তখন উহার শক্তি গুপ্তভাবে থাকে। তড়িতের প্রবাহে সেই গুপ্ত শক্তি ব্যক্ত অবস্থায় আসিয়া তাপে পরিণত হয়। কিন্তু এই উত্তর চরম উত্তর হইল না। তড়িতের শক্তিই বা কোথা হইতে আসিল? তামা আর দস্তা গন্ধকদ্রাবকে ডুবাইয়াছিলাম; ডুবাইবার পূর্ব্বে তড়িৎও ছিল না, তড়িৎ-শক্তিও ছিল না। ডুবানোর পর তার দিয়া তামা ও দস্তা যোগ করিবামাত্র রাশি রাশি তড়িৎ জন্মিতে লাগিল; এবং সেই রাশি রাশি তড়িতে নিহিত রাশি রাশি শক্তি তারের ভিতর তাপে পরিণত হইতে লাগিল। তড়িৎ সৃষ্টি হইতেছে। তার সঙ্গে শক্তিও তবে সৃষ্টি হইতেছে। কিন্তু শক্তির সৃষ্টি ত ঘটে না। শক্তি আপনা হইতে জন্মিতে পারে না। এখানে শক্তি আসিল কোথা হইতে?

ইহার উত্তর ঐ ভাঁড়ের ভিতর অনুসন্ধান করিলে পাওয়া যাইবে।

ভাঁড়ের ভিতরে গন্ধকদ্রাবক আছে আর তামা আর দস্তা আছে। ঐ দস্তার সঙ্গে গন্ধকদ্রাবকের রাসায়নিক সম্বন্ধ আছে। একটা মাটির বাটিতে খানিকটা গন্ধকদ্রাবক লইয়া উহাতে দস্তা ফেলিলেই দেখা যায়, দস্তা গন্ধকদ্রাবকে মিলিত হইতেছে। গন্ধকদ্রাবকে উদান আছে; আর উদানের সঙ্গে গন্ধক ও অম্লান আছে। দ্রাবকমাত্রেই ও অম্ল পদার্থমাত্রেই উদান থাকে, আগে বলিয়াছি। দস্তার ন্যায় ধাতুপদার্থ ঐ উদানকে তাড়াইয়া দেয়। উদানকে অপসারিত করিয়া অবশিষ্ট গন্ধকও অম্লানের সহিত মিলিত হয়। মিলিত হইলে একটা লাবণিক পদার্থ উৎপন্ন হয়; কাজেই, গন্ধকদ্রাবকে দস্তা ফেলিলে উদান বাহির হইয়া যায়। উদান তৈয়ার করিবার সহজ উপায়ই এই। উদানকে সরাইয়া দিয়া দস্তা তাহার স্থানে যায়। দস্তা গন্ধক ও অম্লানের সহিত মিলিত হয়। এই মিলনের ফলে প্রচুর তাপ জন্মে। গন্ধকদ্রাবকের সন্নিধানে দস্তার রাসায়নিক শক্তি গুপ্ত অবস্থায় নিহিত থাকে। সেই রাসায়নিক শক্তি তাপে পরিণত হয়।

এস্থলে তড়িদ্‌ভাণ্ডে ও গন্ধকদ্রাবকে দস্তা ডুবান আছে। এখানেও দস্তা ক্রমে ক্ষয় হইয়া দ্রাবকের উদানকে সরাইয়া দিয়া গন্ধক ও অম্লানে মিলিত হইতেছে। কিন্তু যতটা তাপ জন্মান উচিত, ততটা তাপ জন্মিতেছে না। ঘর্ম্মমান যন্ত্রে পরীক্ষা করিলেই বুঝা যাইবে, গন্ধক-দ্রাবকের সহিত দস্তার সম্মিলনে অন্যত্র যে তাপ জন্মে, তড়িদ্ভাণ্ডে সে তাপ জন্মিতেছে না। তাপের বদলে অন্যরূপ শক্তি উৎপন্ন হইতেছে—তাপের বদলে তড়িৎ শক্তি উৎপন্ন হইতেছে। সেই তাড়িত শক্তি আবার প্রবাহ-সঞ্চালন কালে তাপে পরিণত হইতেছে।

তড়িৎ-প্রবাহের একটা কাজ তাপ জন্মান, আর একটা কাজ জলকে বিশ্লিষ্ট করা। জল কেন, ক্ষার পদার্থ, অম্ল পদার্থ ও লাবণিক

পদার্থমাত্রই জলে দ্রব অবস্থায় থাকিলে তাড়িতপ্রবাহ বলে বিশ্লিষ্ট হয়। তুঁতে লাবণিক পদার্থ, তড়িদ্ভাণ্ডের তাম্রখণ্ডে একটা তার আর দস্তা খণ্ডে একটা তার যোগ করিয়া দুই তারের মুখ তুঁতের জলে ডুবাইলে দেখা যায়, তুঁতের জল আশ্রয় করিয়া তড়িৎ-প্রবাহ চলিতেছে। ধাতুদ্রব্য দিয়া তড়িৎ-প্রবাহ যেমন চলে, তুঁতের জলের মধ্য দিয়াও তেমনি চলে। তুঁতে যৌগিক পদার্থ, উহাতে তামা আছে, গন্ধক আছে আর অম্লান আছে। তড়িৎ-প্রবাহ তুঁতেকে বিশ্লিষ্ট করে। তামা পৃথক্ হইয়া যায় একদিকে; গন্ধক আর অম্লান এক যোগে পৃথক্ হইয়া যায় অন্য দিকে। যে তারটা দস্তাখণ্ডে যুক্ত আছে, তাহার গায়ে তামা জমিতে থাকে। আর যে তারটা তাম্রখণ্ডে যুক্ত আছে, তাহার গায়ে গন্ধক আর অম্লান জমিতে থাকে। ঐ গন্ধক আবার জলের খানিকটা উদান টানিয়া লয়। গন্ধক, অম্লান ও উদান এক-যোগে গন্ধকদ্রাবক প্রস্তুত হইয়া তারের নিকট জমিতে থাকে। এইরূপে যতক্ষণ তড়িৎ-প্রবাহ চলে, ততক্ষণ একটা তারের মুখে তামা আর একটা তারের মুখে গন্ধকদ্রাবক জমিতে থাকে। ফলে, তুঁতেটা ক্রমশঃ বিশ্লিষ্ট হইয়া যায়। তুঁতে যৌগিক পদার্থ, উহার মধ্যে তামা আছে। তুঁতেকে বিশ্লেষণ করিয়া সেই তামাকে বাহির করিয়া লওয়া সহজ কথা নহে। এই কাজের জন্য শক্তির ব্যয় আবশ্যক। তড়িতের যদি শক্তি না থাকিত, তাহা হইলে এইরূপে যৌগিক পদার্থকে বিশ্লেষণ করা চলিত না। তড়িৎ-প্রবাহের শক্তি তুঁতেকে বিশ্লেষণ করে।

উদাহরণ স্বরূপ তুঁতের কথা বলিলাম। নানাবিধ যৌগিক পদার্থকে এইরূপে তড়িৎ-প্রবাহ দ্বারা বিশ্লেষণ করা চলে। যে সকল যৌগিক লাবণিক পদার্থে সোণা রূপা আছে, তার মধ্যে তড়িৎ-প্রবাহ চালাইলে

সোণা রূপা পৃথক হইয়া পড়ে। স্বর্ণকারেরা আজকাল সোণার রূপার গিল্‌টি করিবার জন্ত তড়িৎ-প্রবাহ ব্যবহার করে।

তড়িৎ-প্রবাহ তাপ জন্মায়, আর যৌগিক পদার্থের বিশ্লেষণ করে। তদ্ভিন্ন ইহার তৃতীয় কাজ চুম্বককে ধাক্কা দেওয়া। এক হিসাবে এই গুণটা সব চেয়ে প্রধান। ইহার আলোচনার পূর্ব্বে চুম্বক জিনিসটা কি তাহার আলোচনা আবশ্যক।

চুম্বক

এদেশের প্রাচীন পণ্ডিতেরা জানিতেন, লোহা স্থলবিশেষে লোহা টানিবার ক্ষমতা রাখে। যে লোহার ঐরূপ ক্ষমতা আছে, তাহাকে অয়স্কান্ত মণি বলা হইত। খনির মধ্যে ঐরূপ লোহা পাওয়া যায়। উহা লোহা আর ইস্পাত আকর্ষণ করে। লোহা মোটামুটি তিন রকমের; পেটাই লোহাতে এদেশের কামারে কাজ করে; উহা কোমল ও ঘাতসহ; পিটিলে ভাঙ্গে না। ঢালাই লোহা অত্যন্ত দৃঢ় ও ভঙ্গপ্রবণ; বিলাতি লোহার অধিকাংশ ঢালাই। উহা তপ্ত করিলে সহজে তরল হয়, তখন ঢালিয়া ছাঁচে ফেলিয়া নানাবিধ দ্রব্য গঠন হয়। আর এক রকমের লোহার নাম ইস্পাত। ইস্পাতের প্রধান গুণ কঠোরতা ও স্থিতিস্থাপকতা।

এই তিন রকমের লোহার কোনটাই খাঁটি লোহা নহে। লোহার সঙ্গে অন্ত পদার্থ মিশ্রিত থাকে; তার মধ্যে কয়লা প্রধান। পেটাই লোহাতে কয়লার ভাগ খুব কম; ঢালাই লোহাতে খুব বেশি, আর ইস্পাতে মাঝামাঝি।

খনিতে যে চুম্বক পাওয়া যায়, তাহা যৌগিক পদার্থ। লোহা অম্লানে যুক্ত হইয়া উহার সৃষ্টি করে।

কোমল লোহা আর দৃঢ় ইস্পাত উভয়ই খনিজ চুম্বকের ঘর্ষণে চুম্বক ধর্ম্ম প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ লোহা আকর্ষণ করিতে সমর্থ হয়। কোমল লোহার ঐ চুম্বকত্ব স্থায়ী হয় না, কিন্তু ইস্পাতের চুম্বকত্ব স্থায়ী হয়। ছোট ছোট ছুঁচ ঐরূপে চুম্বকে ঘষিয়া স্থায়ী চুম্বক তৈয়ার করা চলে। ইস্পাতের কাঁটা বা ইস্পাতের ছড়িকে চুম্বকে লম্বালম্বি ঘষিলে ঐ কাঁটা বা ছড়িও স্থায়ী চুম্বকে পরিণত হয়।

ঐরূপ কাঁটা বা ছড়ি সূতা দিয়া বুঝাইলে দেখা যায়, উহার এক প্রান্ত উত্তর মুখে অন্য প্রান্ত দক্ষিণ মুখে থাকিতে চায়। অন্য মুখে রাখিলেও ঘুরিয়া উত্তর দক্ষিণে ফিরিয়া আসে। চুম্বকের কাঁটার এই গুণ থাকায় উহা বহুকাল হইতে দিগ্‌দর্শন-শলাকারূপে নাবিকগণ কর্ত্তৃক ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। জমি জরিপের সময় ঐরূপ কাঁটা দিক্ নির্ণয়ের জন্য ব্যবহৃত হয়। উহাকে কোম্পাস্ কাঁটা বলে।

কোম্পাসের কাঁটা চুম্বক, উহার এক প্রান্ত উত্তর দিক্, অন্য প্রান্ত দক্ষিণ দিক্ অভিমুখ করিয়া স্থির থাকিতে চায়।

ঐ উত্তরমুখী প্রান্তের সহিত দক্ষিণমুখী প্রান্তের বিপরীত সম্বন্ধ। তাহা বুঝাই যাইতেছে। এপ্রান্ত চলে উত্তরমুখে; ওপ্রান্ত চলে দক্ষিণ মুখে। আবার দুইটা কাঁটা পরস্পর নিকটে রাখিলে দেখা যায়, ইহার উত্তরমুখ প্রান্ত উহার উত্তরমুখ প্রান্তকে দূরে ঠেলে, ইহার দক্ষিণমুখ প্রান্ত উহার দক্ষিণমুখ প্রান্তকে দূরে ঠেলে। কিন্তু ইহার উত্তরমুখ প্রান্ত উহার দক্ষিণমুখ প্রান্তকে দূরে না ঠেলিয়া নিকটে টানে। ঐরূপ কাঁটা ইস্পাতের আর একটা কাঁটায় ঘষিলে ঐ ইস্পাতের কাঁটাও চুম্বকত্ব পায়; উহারও একমুখ উত্তরে, অন্যমুখ দক্ষিণে তাকাইয়া থাকিতে চায়। কোমল পেটাই লোহার কাঁটাতে ঘষিলেও উহা চুম্বকত্ব পায়; কিন্তু ইস্পাতের মত লোহার চুম্বকত্ব স্থায়ী হয় না।

ঘর্ষণেরও প্রয়োজন নাই। একটা ইস্পাতের চুম্বকের সমীপে একখানা লোহ রাখিলেই উহা অস্থায়িভাবে চুম্বকধর্ম্ম অর্জ্জন করে। যতক্ষণ ঐরূপে সমীপে থাকে, ততক্ষণের জন্য অর্জ্জন করে। উহারও একধার দক্ষিণবর্ত্তী অন্য ধার উত্তরবর্ত্তী হইতে চেষ্টা করে। তখন সম্মুখস্থ ইস্পাতের চুম্বক উহার এক ধারকে টানে অন্য ধারকে ঠেলে ; কেন না দুই ধারের ধর্ম্ম বিপরীত। যে ধারটা নিকটে সেই ধারকে টানে, যে ধার দূরে সেই ধারকে ঠেলে। নিকটের টান কিছু বেশী, দূরের ঠেল কিছু অল্প, কাজেই, লোহাটা মোটের উপর ইস্পাতের দিকে আকৃষ্ট হয়।

চুম্বক যে লোহাকে আকর্ষণ করে, তাহার তাৎপর্য্যই এই। চুম্বকের সম্মুখে আসিয়া লোহা অস্থায়িভাবে চুম্বকত্ব পায়। তখন উহার এক ধারে টান ও অন্য ধারে ঠেল পড়ে, ও মোটের উপর উহা আকৃষ্ট হয়।

একটা চুম্বকের কাঁটা দ্বিখণ্ডে বা শত খণ্ডে ভাঙিলেও দেখা যায়, যে উহার প্রত্যেক খণ্ডে চুম্বকত্ব বর্ত্তমান আছে। প্রত্যেক ভগ্নখণ্ডের একমুখ উত্তরবর্ত্তী ও অন্য মুখ দক্ষিণবর্ত্তী হইতে চায়। ইহাতে স্বতঃই অনুমান হয় যে, চুম্বকের প্রত্যেক কণিকাই বুঝি চুম্বক ; সেই কণিকা যত ছোটই হউক না, উহা একটি ক্ষুদ্র চুম্বক।

চুম্বকের এই অদ্ভুত স্বভাব। অতি বড় চুম্বক ও অতি ছোট কণিকা প্রমাণ চুম্বক, উভয়েরই এই অদ্ভুত স্বভাব যে, উহার এক প্রান্ত উত্তরবর্ত্তী ও অন্য প্রান্ত দক্ষিণবর্ত্তী হইবে। জোর করিয়া পূর্ব্ব-পশ্চিমে দাঁড়াইয়া দিলেও উহা পূর্ব্ব-পশ্চিমে দাঁড়াইবে না। ছাড়িয়া দিবা মাত্র ঘুরিয়া উত্তর-দক্ষিণে দাঁড়াইবে। এ রকম অদ্ভুত স্বভাব আর কোন জিনিসের দেখা যায় না। লোহা বা ইস্পাত

যতক্ষণ চুম্বকত্ব না পায়, ততক্ষণ উহার এই স্বভাব থাকে না। কিন্তু চুম্বকত্ব পাইবা মাত্র কোথা হইতে কিরূপে এই অদ্ভুত স্বভাব আসিয়া পড়ে।

এইরূপে একটা দিক্ লক্ষ্য করিয়া দাঁড়াইবার প্রকৃতি আর কোন জিনিসের দেখা যায় না, তবে স্থলবিশেষে নানা দ্রব্যকে ঐরূপ ধর্ম্ম উপার্জ্জন করিতে দেখা যায়।

যেমন লাটিম খেলা। লাটিম যতক্ষণ বেগে ঘুরে, ততক্ষণ উহার মাঝের কাঁটা খাড়া হইয়া উর্দ্ধমুখে দাঁড়াইয়া থাকে। যতক্ষণ বেগে ঘুরে, ততক্ষণ দাঁড়ায়। বেগ কমিলে তখন ঢলিয়া ভূতলশায়ী হয়।

একটা পয়সাকে উহার কিনারার উপর ভর দিয়া খাড়া দাঁড়াইয়া রাখা চলে না। পয়সাকে ঘুরাইয়া দিলে উহা গাড়ীর চাকার মত ঘুরিতে ঘুরিতে খাড়া দাঁড়াইয়া চলে। ঘূর্ণন-বেগ থামিবা মাত্র ভূতলশায়ী হয়।

এ কালের দ্বিচক্র গাড়ি—বাই-সাইকেল ঐরূপ জিনিস। চাকা যতক্ষণ বেগে ঘুরে, ততক্ষণ উহা খাড়া থাকিবে, থামিলেই ভূতলশয়ন অনিবার্য্য।

অধিক কি, এই ভূমণ্ডলটাই একটা প্রকাণ্ড লাটিম। উহা আপন অক্ষরেখার চারিদিকে বেগে ঘুরিতেছে; প্রতি চব্বিশ ঘণ্টায় এক পাক আবর্ত্তন করিতেছে। ঐরূপ ঘুরিতেছে বলিয়াই উহার অক্ষরেখা নিরন্তর খগোলে ধ্রুব-নক্ষত্রের অভিমুখে চাহিয়া আছে। চুম্বকের ঐরূপ একটা নির্দ্দিষ্ট দিক্ লক্ষ্য করিয়া দাঁড়াইবার প্রবৃত্তি দেখিয়া সহজেই অনুমান হয়, উহার কণিকাগুলিও ঐরূপ বেগে ঘূর্ণ্যমান। সেই কণিকাগুলি অতি ক্ষুদ্র ও চক্ষুর অগোচর,

উহাদের ঘূর্ণীও অগোচর; কিন্তু প্রত্যেক কণিকা যত ছোট হউক না কেন, উহা যখন একটা দিকে গোঁ ধরিয়া থাকিতে চায়, তখন উহা আপন ক্ষুদ্র অক্ষরেখার চারিদিকে বেগে ঘুরিতেছে ইহা মনে করা অসঙ্গত নহে।

বেগে ঘূর্ণ্যমান দ্রব্যমাত্রেরই এই জেদ বা গোঁ দেখা যায়। উহা গাড়ির চাকাই হউক আর কুমারের চাকাই হউক, আর ভগবানের করাবর্ত্তিত সুদর্শন চক্রই হউক। উহা ধাবিত হইবার সময়ও আপনার গোঁ ছাড়ে না। একটা নির্দ্দিষ্ট দিকে ঘাড় বাঁকাইয়া চলিতে থাকে। সেই গোঁ ছাড়ান কঠিন, আর সেই গোঁর সম্মুখে দাঁড়াইলে বিপদ্।

নদীর স্রোতে মাঝে মাঝে জলের ঘূর্ণী বা ভ্রমি থাকে, উহার ঐরূপ গোঁ। কোন খড়, পাতা, কাঠ ভাসিতে ভাসিতে ঐ ঘূর্ণীতে পড়িলে ঘূর্ণী উহাকে সাতপাক খাওয়াইয়া ডুবাইয়া দেয়। বড় বড় নদীর বড় বড় ঘূর্ণীতে নৌকা পড়িলে নৌকাও সাত পাক খাইয়া ডুবিবার আশঙ্কা থাকে। বাতাসের মত লঘু দ্রব্যের ঘূর্ণীও ভয়ানক। ঘূর্ণী বাত্যা যে দেশের উপর দিয়া যায়, সে দেশে আপনার ভ্রমণের চিহ্ন রাখিয়া যায়। গাছপালা সমূলে উৎপাটিত হয়, দালান ঘরের ছাদ উপড়াইয়া যায়, রাস্তার জিনিস গাছের মাথায় উঠে, একতলার জিনিস তেতলার ছাতে চড়ে। যে জিনিসটা জলের ঘূর্ণীর মধ্যে পড়ে, জল তাহাকে সাত পাক খাওয়ায় ও পরে অধোমুখে টানিয়া ডুবাইয়া দেয়। যে জিনিসটা বাতাসের ঘূর্ণীতে পড়ে, বাতাস তাহাকে ঘুরাইয়া দেয় ও পরে ঊর্দ্ধ মুখে টানিয়া তোলে।

বৈজ্ঞানিকেরা অনুমান করেন, চুম্বকের অদৃশ্য কণিকাগুলি বেগে ঘুরিতেছে। প্রত্যেক কণিকা ঐরূপ ঘুরিতেছে বলিয়া গোটা চুম্বকটারই এই গোঁ। চুম্বকের কাঁটার উত্তর মুখে দাঁড়াইবার জেদ।

জোর করিয়া সরাইয়া দিলেও উহা ঘুরিয়া আপন জেদে উত্তর মুখ হইবে। শুধু তাহাই নহে। চুম্বকের কাঁটার আশে-পাশে চারিদিকে আকাশ নামক পদার্থ আছে। আলোকতত্ত্ব বুঝাইবার সময় আমরা দেখিয়াছি, ঐরূপ একটা প্রত্যক্ষের অগোচর বিশ্বব্যাপী পদার্থ কল্পনা না করিলে আলোকতত্ত্ব বুঝা যায় না। যে স্থানকে আমরা শূন্য স্থান বলি, সেখানেও ঐ আকাশ বিদ্যমান। চুম্বকের আশে-পাশে চারি-দিকে, এমন কি অভ্যন্তরেও ঐ আকাশ আছে। চুম্বকের কণিকাগুলির ঘূর্ণনে ঐ আকাশেও ঘূর্ণী উৎপন্ন হয়। চুম্বকের বাহিরে ও চারিপাশে অদৃশ্য আকাশে অদৃশ্য ঘূর্ণী উৎপন্ন হয়। ঐ ঘূর্ণীর মধ্যে লোহা আনিবামাত্র লোহার কণিকাগুলিও সাতপাক খাইতে আরম্ভ করে। উহাও চুম্বকত্ব প্রাপ্ত হয়। আকাশের ঘূর্ণী লোহার কণিকায় ঘূর্ণী জন্মাইয়া উহাদিগকে আপনার গোঁ যে দিকে, সেই দিকে টান দেয়। নদীর স্রোতের ঘূর্ণী যেমন কাঠকে কোলের দিকে টানিয়া ডুবাইয়া দেয়, তেমনি ঐ আকাশের ঘূর্ণী লোহার কণিকাগুলিতে ঘূর্ণী উৎপাদন করিয়া গোটা লোহাটাকেই যে দিকে উহার গোঁ, সেই দিকে টানিয়া ঠেসিয়া ধরে। তাহারই ফলে ঐ লোহা চুম্বকের অভিমুখে আকৃষ্ট হয়।

চুম্বকের পাশে আকাশ, অর্থাৎ যে আকাশ মধ্যে চুম্বক নিমগ্ন আছে, সেই আকাশ ঘূর্ণীতে পরিপূর্ণ। সেই জন্য সেই ঘূর্ণীতে পড়িবামাত্র লোহাতে টান পড়ে, ও উহার চুম্বকত্ব প্রাপ্তি ঘটে। এইরূপ অনুমান দ্বারা চুম্বক কর্তৃক লোহের আকর্ষণের একটা হেতু নির্দ্দেশ অসঙ্গত নহে।

আপত্তি হইতে পারে—চুম্বক লোহাকেই আকর্ষণ করে, অন্য অন্য জিনিসকে আকর্ষণ করে না কেন? চুম্বকের পার্শ্ববর্ত্তী আকাশে

ঘূর্ণীই যদি লৌহের ও লৌহজ পদার্থের চুম্বকত্ব প্রাপ্তির কারণ হয়, তবে সেই আকাশে সোণা রূপা কাঠ কাগজ থাকিলে তাহাতে ঘূর্ণী জন্মে না কেন, তাহাতে টান পড়ে না কেন; তাহার চুম্বকত্ব প্রাপ্তি ঘটে না কেন?

ইহার উত্তর মাইকেল ফারাডে দিয়াছিলেন। তিনিই প্রথমে দেখান চুম্বকত্ব প্রাপ্তি কেবল লোহার ও লৌহজ দ্রব্যেরই "একচেটিয়া" ধর্ম্ম নহে। নিকেল ও কোবাল্ট নামে দুই ধাতু আছে, উহারও চুম্বক সন্নিধানে চুম্বকত্ব প্রাপ্তি সহজেই দেখান চলে; তবে লোহার চেয়ে অনেক কম—লোহার সহিত উহাদের মাত্রাগত প্রভেদ। ফারাডে দেখান, লোহা নিকেল কোবাল্ট কেন, যাবতীয় পদার্থই চুম্বকের সন্নিধানে চুম্বকত্ব পায়। প্রভেদ কেবল মাত্রাগত। সোণা রূপা কাঠ কাগজও চুম্বকত্ববর্জ্জিত নহে। তবে উহাদের বেলায় মাত্রা এত সামান্য যে, বিশেষ আয়োজন ব্যতীত ঘূর্ণীর খুব বেশী জোর ব্যতীত উহা টের পাওয়া যায় না। ফারাডে প্রত্যক্ষ প্রমাণে দেখাইয়া গিয়াছেন, কঠিন তরল মারুত, যাবতীয় পদার্থই চুম্বক সন্নিধানে ঘূর্ণীপূর্ণ আকাশে আনীত হইলে অল্পবিস্তর টান পায়, কোথাও বা ঠেল পায়। একবারে টান পায় না বা ঠেল পায় না, এমন জিনিস কিছুই নাই। লোহার কণিকাগুলি আকাশের ঘূর্ণীতে যত সহজে ধরা দেয়, অন্য জিনিসের কণিকা তত সহজে ধরা দেয় না। অবশ্য লোহার সহিত ঐ সকল দ্রব্যের কণিকার কোন প্রভেদ আছে। কিন্তু সেই প্রভেদ কেবল মাত্রাগত প্রভেদ। পৃথিবী নিজেই একটা বৃহৎ চুম্বক। পৃথিবী এই চুম্বকত্ব কোথা হইতে কিরূপে পাইল তাহা বলা কঠিন। কেহ মনে করেন, উহার গর্ভে কোথাও বড় বড় জোরাল লোহার চুম্বক আছে। কেহ বা মনে করেন, আস্ত পৃথিবীটাই চুম্বক। যাহাই

হউক, উহার পার্শ্ববর্ত্তী আকাশে ঘূর্ণী থাকায় লৌহখণ্ড বা ইস্পাতখণ্ড সেই ঘূর্ণীতে পড়িয়া চুম্বকত্ব পায় ও চুম্বকত্ব পাইয়া পৃথিবীরূপ চুম্বকের গোঁ যে দিকে সেই দিকে হেলিয়া দাঁড়ায়।

তড়িৎ-প্রবাহের চুম্বকত্ব

ওয়াষ্টেড নামক পণ্ডিত আবিষ্কার করেন, ধাতুদ্রব্যে পরিচালিত তড়িৎপ্রবাহেরও চুম্বকের কাঁটাকে ধাক্কা দিয়া একটা নির্দ্দিষ্ট দিকে চাপিয়া ধরিবার প্রবৃত্তি আছে। চুম্বকের কাঁটার জেদ উত্তর-দক্ষিণে দাঁড়াইবার জন্য। কিন্তু উহার পাশে যদি উত্তর-দক্ষিণে লম্বা করিয়া একগাছি তামার তার ধরা যায়, আর সেই তারে একটা তড়িদ্ভাণ্ড হইতে তড়িৎপ্রবাহ চালান যায়, তখন সেই কাঁটা ধাক্কা খাইয়া পূর্ব্ব-পশ্চিমের দিকে হেলিয়া দাঁড়ায়। তড়িৎপ্রবাহ যখন ছিল না, তখন কাঁটার জেদ ছিল, উত্তর দক্ষিণে দাঁড়াইবার ; তড়িৎপ্রবাহ চলিবামাত্র উহার জেদ দাঁড়ায় অন্যমুখে দাঁড়াইবার জন্য। বায়ুকোণ হইতে অগ্নিকোণে লম্বা হইয়া দাঁড়াইবার জন্য অথবা ঈশান হইতে নৈঋর্তে লম্বা হইয়া দাড়াইবার জন্য। যতক্ষণ তড়িৎপ্রবাহ চলে, ততক্ষণ ঐ নূতন স্থলে দাঁড়াইবার জেদ থাকে।

ইস্পাতের চুম্বকের কাছে লোহা ধরিলে ঐ লোহায় যেমন চুম্বকত্বের আবির্ভাব হয়, তড়িৎপ্রবাহের সন্নিধানে লোহা ধরিলে উহাতেও চুম্বকত্বের আবির্ভাব দেখা যায়।

ইহাতে কি বুঝিতে হইবে? ইস্পাতের চুম্বক যেমন পার্শ্ববর্ত্তী আকাশে ঘূর্ণী জন্মায়, তড়িৎ-প্রবাহ ধাতুদ্রব্য দিয়া মাত্র বাহির হইবার সময়ও তেমনি পার্শ্বস্থ আকাশে ঐরূপ ঘূর্ণী জন্মাইয়া থাকে। উভয়েরই ফল সমান।

তড়িৎ-প্রবাহের চৌম্বক ধর্ম্ম

তড়িৎপ্রবাহের এই ধর্ম্ম থাকায় আমরা উহাকে একটা কাজে লাগাই। কলিকাতায় তড়িদ্ভাণ্ড রাখিয়া তদুৎপন্ন তড়িৎ তারযোগে দিল্লীতে পাঠান চলে, দিল্লী হইতে সেই প্রবাহ হয় তারপথে অথবা ভূমিপথে আবার কলিকাতার তড়িদ্ভাণ্ডে ফিরিয়া আসে। দিল্লীতে তারের পাশে একটা চুম্বকের কাঁটা রাখিলে ঐ তারের প্রবাহিত তড়িৎপ্রবাহ ঐ কাঁটাকে ধাক্কা দিয়া ঠেলিয়া দিবে। ঐ তার দিয়া তড়িৎপ্রবাহ পুনঃপুনঃ চালাইতে ও থামাইতে থাকিলে কাঁটাতেও পুনঃপুনঃ ধাক্কা লাগিয়া কাঁটার চাঞ্চল্য উপস্থিত হইবে। এখন কলিকাতার লোকে আর দিল্লীর লোকে আগে হইতে একটা পরামর্শ আঁটিয়া রাখিতে পারে। কাঁটায় একবার ঠেলা পড়িলে হইবে ক, দুইবার পড়িলে হইবে খ, তিনবারে হইবে গ। এইরূপে সঙ্কেত দ্বারা উভয়ের মধ্যে কথাবার্ত্তা চালান চলিবে। এইরূপে তড়িৎপ্রবাহ সঞ্চালিত করিয়া তদ্দ্বারা দূরের চুম্বকের কাঁটায় নাড়া দিয়া সঙ্কেত দ্বারা সংবাদ প্রেরণের নাম তারে খবর দেওয়া বা টেলিগ্রাম। দূরে খবর দেওয়া কেন, এই উপায়ে আমরা চঞ্চল কাঁটার আঘাতে দূরে ঘণ্টা পর্য্যন্ত বাজাইতে পারি, পিস্তল ছুঁড়িতে পারি বা আগুন জ্বালিতে পারি।

ও সকল কাজের কথা। বৈজ্ঞানিকেরা প্রকৃতির গুপ্ত তত্ত্ব সমূহ আবিষ্কার করেন, আর কাজের লোকে সেই আবিষ্কৃত তত্ত্বের সহায়তায় নিজের সুবিধা করে ও পরের সুবিধা করিয়া নিজে পয়সা উপার্জ্জন করে। উহা বিজ্ঞানের মুখ্য উদ্দেশ্য নহে। অতএব ও সকল কাজের কথায় অধিক আলোচনা এখানে অনাবশ্যক।

একটা তারকে যদি আংটির মত চক্রাকারে জড়াইয়া উহাতে তাড়িত প্রবাহ চালান যায়, তাহা হইলে উহা প্রকৃতই চুম্বকের মত কাজ করে। উহার সম্মুখে একটা চুম্বকের কাঁটা রাখিলে, সেই কাঁটাকে টানিয়া আপনার কেন্দ্রবর্ত্তী করিতে চাহে। কাঁটাটা যেন ঐ তড়িৎ-প্রবাহ কর্ত্তৃক উৎপাদিত হইয়া আবর্ত্ত মধ্যে পড়িয়া আবর্ত্তের টানে তারের কেন্দ্রের দিকে অগ্রসর হয়। এই আকর্ষণটা পরস্পরের প্রতি। আকর্ষণ মাত্রই পরস্পরের প্রতি। পৃথিবী যেমন চন্দ্রকে আকর্ষণ করে, চন্দ্রও তেমনি পৃথিবীকে আকর্ষণ করে। পৃথিবী যেমন নারিকেলকে টানে, নারিকেলও তেমনি পৃথিবীকে টানে। তারের তাড়িত প্রবাহ যেমন চুম্বকের কাঁটাকে টানে, চুম্বকের কাঁটাও সেইরূপ তাড়িতপ্রবাহসমেত তারকে টানে। কাঁটাটা যদি চাপিয়া ধরা যায়, আর তারটা স্বাধীনভাবে বিচরণক্ষম হয়, তাহা হইলে তারটাই কাঁটার অভিমুখে গিয়া কাঁটাকে আপনার কেন্দ্রে স্থাপন করিতে চাহে।

ফলে একটা চুম্বক যেমন আর একটা চুম্বককে আকর্ষণ করে, ঐ তড়িৎপ্রবাহও তেমনি চুম্বককে ও চুম্বক তড়িৎপ্রবাহকে আকর্ষণ করে। ইহা ত হইবেই। চুম্বকের যে ধর্ম্ম, তড়িৎপ্রবাহেরও সেই ধর্ম্ম। একটা চুম্বক যেমন পার্শ্বস্থ আকাশে আবর্ত্ত উৎপাদন করে, ঐ তড়িৎপ্রবাহও তেমনি আবর্ত্ত উৎপাদন করে। চুম্বকের ক্ষুদ্র কণিকাগুলিও ছোট চুম্বক, হয়ত উহার প্রত্যেক অণুটাই এক একটি ছোট চুম্বক। এই জন্য আম্পেয়ার নামক পণ্ডিত মনে করিয়াছেন যে, চুম্বকের লোহার প্রত্যেক অণুকে বেষ্টন করিয়া তড়িৎ-প্রবাহ বহিতেছে। প্রত্যেক অণুকে বেষ্টন করিয়া যেন একটা তড়িৎ-প্রবাহের ছোট আংটি পরান আছে। ঐরূপ অনুমান অসঙ্গত নহে। দুইটা তারের আংটি পরস্পর সমান্তরালভাবে রাখিয়া ঐ তারে তড়িৎপ্রবাহ

চালাইলেও ঐরূপ ঘটনা দেখা যায়। দুইটা প্রবাহ যেন দুইটা চুম্বক। তড়িৎপ্রবাহ দুই তারে একমুখে চলিলে এ-তারটা ও-তারকে আকর্ষণ করে। উভয়ের আকর্ষণে পরস্পর সন্নিকর্ষে আসিবার চেষ্টা করে। তড়িৎ-প্রবাহ দুই তারে এক মুখে না চলিয়া ভিন্ন মুখে চলিলে পরস্পর আকর্ষণের পরিবর্ত্তে বিকর্ষণ ঘটে; পরস্পর দূরে যাইবার চেষ্টা করে। একটা চুম্বকের কাঁটার উত্তর মুখ যেমন অন্য কাঁটার উত্তর মুখকে ঠেলিয়া দূরে পাঠাইবার চেষ্টা করে, সেইরূপ।

একটা তারের তড়িৎপ্রবাহ অন্য তারের তড়িৎপ্রবাহকে এইরূপে টানিয়া আনে বা ঠেলিয়া দেয়। তড়িৎপ্রবাহের এই ক্ষমতাকেও কাজের লোকে কাজে লাগাইয়াছে। এই আকর্ষণের ও বিকর্ষণের সাহায্য লইয়াই আজকাল তড়িৎপ্রবাহ দ্বারা তড়িৎপ্রবাহ টানিয়া বা ঠেলিয়া পাখাটানা হইতে গাড়ী চালান পর্য্যন্ত সাধ্য হইয়াছে। কলিকাতার রাস্তায় ট্রামগাড়ী তড়িৎপ্রবাহের বলে চলিতেছে; ভদ্রলোকের বাড়ীতে উহারই বলে পাখাটানা হইতেছে। ইহার মূল এইখানে। এ সকল কাজের লোকের কাজের কথা। ইহার আলোচনায় অধিক সময় দিব না।

কিন্তু ইহার মধ্যে একটা আসল কথা আছে। একটা তারের তড়িৎ-প্রবাহ অন্য তারের তড়িৎ-প্রবাহকে টানে; তার সমেত টানে; আবার একটা চুম্বকও তার সমেত তড়িৎ-প্রবাহকে টানে। কখনও টানে, কখনও বা ঠেলে। টানুকই আর ঠেলুকই, উহার ফলে গতি উৎপন্ন হয়। যাহা ছিল স্থির, তাহা হয় অস্থির। যাহা ছিল নিশ্চল, তাহা হয় গতিশীল। গতি উৎপাদনের ফল শক্তি উৎপাদন। তামার তার গতিশীল হইলেই উহা খানিকটা ব্যক্ত শক্তি উপার্জ্জন করে। ঐ শক্তি অবশ্য সৃষ্ট হইতে পারে না। শক্তির সৃষ্টি নাই,

বিনাশও নাই। বুঝিতে হইবে, গুপ্ত শক্তি রূপান্তরিত হইয়া ব্যক্ত শক্তিতে পরিণত হইয়াছে। কোন্ শক্তির পরিণামে এই ব্যক্ত শক্তির উৎপত্তি? খুঁজিলেই সন্ধান মিলিবে। দেখা যাইবে, যে তারে তড়িৎ-প্রবাহ সঞ্চালিত হইতেছে, সে তারটা যতটা গরম হওয়া উচিত ছিল, ততটা গরম হয় নাই। পরিচালক ধাতুদ্রব্যে তড়িৎ-প্রবাহ চলিতে থাকিলে উহা গরম হয়। উহাতে খানিকটা তাপ জন্মে। এ ক্ষেত্রে দেখা যাইবে, তাপের পরিমাণটা কমিয়া গিয়াছে। তাপের পরিমাণের সঙ্গে সঙ্গে তড়িৎপ্রবাহের মাত্রাও কমিয়া গিয়াছে। আচ্ছা, যে সময়ে যতটা তড়িৎ প্রবাহিত হইতেছিল, এখন সে সময়ে ততটা তড়িৎ প্রবাহিত হইতেছে না। মনে করা যাইতে পারে, আগে কেবল ধনতড়িতেরই প্রবাহ তার দিয়া যাইতেছিল, এখন খানিকটা ঋণতড়িতের প্রবাহও উৎপন্ন হইয়া ধনতড়িতের প্রবাহকে কমাইয়া দিয়াছে। অথবা ঋণতড়িতের প্রবাহ চলিতেছিল; এখন খানিকটা ধনতড়িতের প্রবাহ উৎপন্ন হইয়া উহাকে কমাইয়া দিয়াছে।

চুম্বকের কাছেই হউক, আর তড়িৎ-প্রবাহের কাছেই হউক, অন্য একটা তড়িৎ-প্রবাহ রাখিলে—জোর করিয়া চাপিয়া স্থিরভাবে রাখিলে—ঐ তড়িৎ-প্রবাহের শক্তি কেবলই তাপে পরিণত হয়। তাড়িত-ভাণ্ডের মধ্যে দস্তার সহিত গন্ধকদ্রাবকের যোগে যে শক্তির উৎপত্তি হইতেছিল, তাহার সমস্তটাই তারের মধ্যে তাপে পরিণত হয়। কিন্তু ঐ তড়িৎ-প্রবাহকে চাপিয়া না ধরিলে উহা তারসমেত গতিশীল হইবে। খানিকটা ব্যক্ত শক্তি উপার্জ্জন করিবে। সঙ্গে সঙ্গে উহাতে তাপের উৎপত্তি কমিয়া যাইবে, তড়িৎপ্রবাহও ক্ষীণ হইয়া পড়িবে। ধনতড়িতের প্রবাহ থাকিলে ঋণতড়িতের প্রবাহ উৎপন্ন

হইয়া, আর ঋণতড়িতের প্রবাহ থাকিলে ধনতড়িতের প্রবাহ উৎপন্ন হইয়া আদি প্রবাহকে ক্ষীণ করিয়া দিবে।

তারটা যত দ্রুত গতি অর্জ্জন করিবে, উহার তড়িৎপ্রবাহ ততই ক্ষীণ হইবে। এই ক্ষীণ হওয়ার অর্থ উল্টা প্রবাহের উৎপত্তি।

তাই একটা তারকে একটা চুম্বকের কাছে ঘুরাইয়া উহাতে ঋণ-তড়িতের বা ধনতড়িতের প্রবাহ ইচ্ছামত উৎপন্ন করা চলে। যত দ্রুত ঘুরাইবে, ঐ উৎপাদিত তাড়িত প্রবাহ ততই বলবান্ হইবে। আদি প্রবাহকে ইহা ক্রমেই ক্ষীণ করিবে। এমন কি, আদি প্রবাহ অপেক্ষা এই নূতন প্রবাহকে বলবত্তর করা যাইতে পারে; আদি প্রবাহ অতিক্ষীণ, এমন কি নগণ্য হইলেও এই নূতন উল্টা প্রবাহ উহা অপেক্ষা বলবত্তর করা চলে। সে ক্ষেত্রে অবশ্য তড়িদ্ভাণ্ডে উৎপাদিত শক্তিতে কুলায় না। বাহির হইতে শক্তি প্রয়োগ করিতে হয়; কুলি খাটাইয়াই প্রয়োগ কর বা কয়লা পোড়াইয়া এঞ্জিন যোগেই প্রয়োগ কর। একালে ডাইনামো নামক বৃহৎ যন্ত্রে এঞ্জিনযোগে বড় বড় তারের আংটি চুম্বকের নিকট বা অন্য ক্ষীণ তড়িৎপ্রবাহের নিকট ঘুরাইয়া ঐ আংটিতে প্রচুর প্রবাহ জন্মান হইতেছে। এক একটা ডাইনামোতে যেরূপ প্রবল প্রবাহ জন্মে, তাড়িত ভাণ্ডের সাহায্যে তত প্রবল প্রবাহ উৎপাদন অসম্ভব। এই সকল প্রবল তাড়িত প্রবাহ-যোগেই সহরের রাস্তায় ট্রামগাড়ী চালান ও লোকের বাড়ীতে পাখা টানা হইতে বিজলী বাতি জ্বালা পর্য্যন্ত কার্য্য সম্পাদিত হইয়া থাকে।

সমাপ্ত